নির্বাচিত রচনা ও বয়ানসমগ্র
ইসলাম ও আমাদের জীবন-১৫

মুসলিম মনীষীগণের শিক্ষণীয় ঘটনাবলী

নির্বাচিত রচনা ও বয়ানসমগ্র

ইসলাম ও আমাদের জীবন-১৫

মুসলিম মনীষীগণের শিক্ষণীয় ঘটনাবলী

মূল: শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, মাকতাবা : ০৫
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
দ্বিতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১৯ ঈসায়ী
প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৮ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ: ইবনে মুমতায ❖ গ্রাফিক্স: সাঈদুর রহমান

মুদ্রণ: মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN: 978-984-91725-8-1

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com/maktabatulashraf, kitabghor.com, khidmashop.com
16297 or 01519521971 01675187135 01939773354

মূল্য : চারশত আশি টাকা মাত্র

MUSLIM MONISIGONER
SHIKSANIO GHATONABALI

By: Shaikhul Islam Mufti Muhammad Taqi Usmani
Translated by: Maulana Muhammad Jalaluddin

Price: Tk. 480.00 US$ 20.00

ইসলাম ও আমাদের জীবন

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যতসব জটিলতা ও দুর্ভাবনার সম্মুখীন হই, কেবল কুরআন-হাদীছেই আছে তার নিখুঁত সমাধান। সে সমাধান অবহেলা ও সীমালংঘন উভয়রূপ প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত। ইসলামের সেই অমূল্য শিক্ষা মোতাবেক আমরা কিভাবে পরিমিত ও ভারসাম্যমান পথে চলতে পারি? কিভাবে যাপন করতে পারি এমন এক জীবন, যা দ্বীন দুনিয়ার পক্ষে হবে স্বস্তিদায়ক ও হৃদয়-মনের জন্য প্রীতিকর? এসব মুসলিমমাত্রেরই প্রাণের জিজ্ঞাসা। 'ইসলাম ও আমাদের জীবন' সরবরাহ করে সেই জিজ্ঞাসারই সন্তোষজনক জবাব।

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی

اما بعد:

بندہ بنگلہ دیش کے سفروں میں جناب مولانا حبیب الرحمن خان صاحب سے متعارف ہوا، اور معلوم ہوا کہ انہوں نے مکتبۃ الاشرف کے نام سے یہاں ایک باوقار اشاعتی ادارہ قائم کیا ہوا ہے جس سے وہ اکابر علماء دیوبند کی اہم کتابوں کے بنگلہ تراجم شائع کرتے رہتے ہیں جن میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی اور حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب قدس سرہم کی اہم تالیفات شامل ہیں۔ نیز انہوں نے اس ناکارہ کی تالیفات میں سے ذکر و فکر، جہان دیدہ، اصلاحی مجالس اور دوسری متعدد اہم کتابوں کا معیاری بنگلہ ترجمہ بھی شائع فرمایا ہے۔ اور اس مرتبہ ڈھاکہ حاضری کے وقت دیکھا کہ بندے کے "آسان ترجمۂ قرآن" کی پہلی جلد کا ترجمہ بھی جو مولانا ابو البشر صاحب نے کیا ہے، نہایت دیدہ زیب طباعت کے ساتھ شائع ہو گئی ہے، اور باقی جلدیں زیر طبع ہیں۔

بندہ بنگلہ زبان سے نابلد ہے، لیکن مستند و معتمد علماء کو ان تراجم کے بارے میں نہ صرف مطمئن بلکہ ترجمے کو صحیح اور بامحاورہ ہونے پر رطب اللسان پایا، اور یہ دیکھ کر مزید خوشی ہوئی کہ تمام کتابیں جدید ذوق کے مطابق کتابت و طباعت اور ظاہری حسن کے اعتبار سے بھی ماشاء اللہ اعلیٰ معیار پر ہیں۔

الحمد للہ، مکتبۃ الاشرف نے یہ بڑی عظیم خدمت انجام دی ہے اور مسلسل دے رہا ہے جس کی اہل علم و دانش کو پذیرائی کرنی چاہئے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما کر اسے خدمت دین کا ذریعہ اور تمام متعلقین کیلئے ذخیرۂ آخرت بنائیں۔ آمین۔

بندہ

محمد تقی عثمانی عفی عنہ
نزیل حال ڈھاکہ

۲۶ رجمادی الاولیٰ ۱۴۳۱ھ
۹ رمئی ۲۰۱۰ء

[শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম-এর স্বহস্তে লিখিত অভিমত ও দুআ]

মাকতাবাতুল আশরাফ সম্পর্কে

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম-এর

অভিমত ও দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ.

বাংলাদেশের বিভিন্ন সফরে জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান সাহেবের সাথে বান্দার পরিচয়। এ সূত্রেই জানতে পারলাম মাকতাবাতুল আশরাফ নামে তাঁর একটি অভিজাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আছে। এ প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি উলামায়ে দেওবন্দের গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলীর বাংলা তরজমা প্রকাশ করে থাকেন। ইতোমধ্যে হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ., মুফতী আযম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ., হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. ও হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী রহ.-এর বেশকিছু মূল্যবান রচনার তরজমা তাঁর এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া তিনি এই অকর্মন্যের যিক্‌র ও ফিক্‌র, জাহানে দীদাহ, ইসলাহী মাজালিসসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনার মানসম্মত বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন। এবারের এই সফরে দেখতে পেলাম বান্দার আসান তরজমায়ে কুরআন-এর প্রথম খণ্ডও মাওলানা আবুল বাশার সাহেবের অনুবাদে অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন মুদ্রণে প্রকাশিত হয়েছে, বাকি দুই খণ্ডও মুদ্রণাধীন।

বাংলা ভাষা সম্পর্কে বান্দা পরিচিত নয়। তবে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামকে দেখেছি তাঁরা এসব অনুবাদের প্রতি যথেষ্ট আস্থাশীল। তাঁদের মতে এগুলো বাংলা ভাষাশৈলী ও বিশুদ্ধতার মানে উত্তীর্ণও বটে। অধিকতর আনন্দের বিষয় হল, সবগুলো বইয়ের লিপি ও মুদ্রণ আধুনিক রুচিসম্মত এবং এগুলোর বাহ্যিক অলংকরণও মাশাআল্লাহ উৎকৃষ্টমানের।

আলহামদুলিল্লাহ মাকতাবাতুল আশরাফ উম্মতের বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে এবং নিরবচ্ছিন্ন দিয়ে যাচ্ছে। উলামায়ে কেরাম ও জ্ঞানী-গুণীজনের এ খেদমতের বিশেষ সমাদর করা উচিত। অন্তর থেকে দু'আ করি আল্লাহ তাআলা এসব মেহনত কবুল করে নিন এবং একে দ্বীনী খেদমতের মাধ্যম এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য আখেরাতের সঞ্চয় বানিয়ে দিন।

বিনীত

(বান্দা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী)
ঢাকায় অবস্থানকালে

২৯ জুমাদাউল উলা ১৪৩১ হিজরী
৯ মে ২০১০ ঈসায়ী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ. اَمَّا بَعْدُ!

বছরের পর বছর ধরে কলম ও যবান নিজ সামর্থ অনুযায়ী কসরত করে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য- জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের যে কালজয়ী দিকনির্দেশনা রয়েছে, তা দ্বারা নিজেও উপকৃত হওয়া এবং অন্যদের কাছেও সে দিকনির্দেশকে পৌঁছিয়ে দেয়া। বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্পর্কে এ জাতীয় লেখাজোখা ও বক্তৃতা-বিবৃতি যেমন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, তেমনি স্বতন্ত্র পুস্তক-পুস্তিকা কিংবা বিশেষ সংকলনের অংশরূপেও প্রকাশিত হয়েছে। এবার স্নেহের ভাতিজা জনাব সউদ উসমানী সেগুলোর একটি 'বিষয়ভিত্তিক সমগ্র' প্রকাশের আগ্রহ ব্যক্ত করলেন এবং জনাব মাওলানা ওয়ায়েস সরওয়ার ছাহেবকে সেটি তৈরি করে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। তিনি অত্যন্ত মেহনতের সাথে বিক্ষিপ্ত সেসব রচনা ও বক্তৃতাসমূহ, বিভিন্ন বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা থেকে খুঁজে-খুঁজে সংগ্রহ করেন এবং বিষয়ভিত্তিক আকারে সেগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত করেন, যাতে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত একই জায়গায় জমা হয়ে যায়। তাছাড়া বক্তৃতাসমূহে যেসব কথা বিনা বরাতে এসে গিয়েছিল, তিনি অনুসন্ধান করে তার বরাতও উল্লেখ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে এর উত্তম প্রতিদান দিন এবং এ সমগ্রটিকে তার, অধম বান্দার ও প্রকাশকের জন্য আখেরাতের সঞ্চয়রূপে কবূল করুন আর পাঠকদের জন্য একে উপকারী বানিয়ে দিন।

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ

বান্দা
মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দারুল উলূম করাচী
৩০ রবিউল আউয়াল, ১৪১৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রকাশকের কথা

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম বাংলাদেশ সফরে এসেছেন। সন্ধ্যায় হাঁটতে গেলেন ঢাকার একটি পার্কে। এসময় মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী (ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার) বসুন্ধরা ঢাকা এর প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুর রহমান ছাহেব রহ.-এর কনিষ্ঠ পুত্র আমাদের প্রিয় ভাই মুফতী শাহেদ রহমানী দামাত বারাকাতুহুম আমাকে দেখিয়ে হযরতকে বললেন, 'হযরত! আমাদের হাবীব ভাই তার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে আপনার সফরনামাসহ অনেক কিতাবের খুবই উন্নত বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন। মাশাআল্লাহ সারা দেশের উলামায়ে কেরাম এ সকল কিতাবকে খুবই পছন্দ করছেন। হযরত একথা শুনে খুব দু'আ দিলেন। সেসময় থেকেই হযরতের সাথে সম্পর্ক আরো মজবুত হলো। এ সফরেই অথবা অন্য কোন সফরে আমি হযরতকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এ পর্যন্ত হযরতের যত কিতাবের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলো ছিলো আমাদের নির্বাচন, হযরতের দৃষ্টিতে কোন্ কিতাবের অনুবাদ হলে এদেশের সাধারণ মুসলমানের জন্য বেশি উপকারী হবে? হযরত সামান্য সময় চিন্তা করে উত্তর দিলেন, আমার মতে 'আসান নেকীয়াঁ' ও 'ইসলাহী খুতবাত'-এর অনুবাদ সাধারণ লোকদের জন্য বেশী উপকারী হবে।

হযরতের এ পরামর্শের পর থেকেই আমরা হযরতের খুতবাত অনুবাদ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। কিন্তু মূল খুতবাত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর আমার মনে হলো, এসকল বয়ানকে যদি বিষয়ভিত্তিক সাজানো যেতো তাহলে সাধারণ মানুষের জন্য এ কিতাব থেকে উপকৃত হওয়াটা তুলনামূলক সহজ হতো। এ চিন্তা থেকেই আমাদের কয়েকজন অনুবাদক বন্ধুকে খুতবাতসমূহ বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত করতে বলি। কেউ কেউ কিছু কিছু কাজ করলেও তাকে পরিপূর্ণতায় পৌঁছানো হয়ে ওঠেনি। ইতোমধ্যে আল্লাহপাকের অশেষ মেহেরবানীতে পাকিস্তানের স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'ইদারায়ে ইসলামিয়্যাত'-এর তত্ত্বাবধানে জনাব মাওলানা ওয়ায়েস সরওয়ার ছাহেব, হযরত শাইখুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুমের সকল উর্দূ রচনা হতে সাধারণ

মুসলমানের জন্য উপকারী বিষয়সমূহ এবং ইসলাহী বয়ানসমূহ বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত করেন এবং প্রথমবার প্রকাশকালে দশ খণ্ড ও পরবর্তীতে আরো পাঁচটি খণ্ড এ পর্যন্ত মোট পনের খণ্ড প্রকাশ করেন। এ কিতাবের প্রথম খণ্ড 'ইসলামী আকীদা বিষয়ক', দ্বিতীয় খণ্ড 'ইবাদাত- বন্দেগী-এর স্বরূপ', তৃতীয় খণ্ড 'ইসলামী মু'আমালাত', চতুর্থ খণ্ড 'ইসলামী মু'আশারাত', পঞ্চম খণ্ড 'ইসলাম ও পারিবারিক জীবন', ষষ্ঠ খণ্ড 'তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধি', সপ্তম খণ্ড 'মন্দ চরিত্র ও তার সংশোধন', অষ্টম খণ্ড 'উত্তম চরিত্র : ফযীলত, প্রয়োজনীয়তা ও অর্জনের উপায়' নবম খণ্ড 'ইসলামী জীবনের কল্যাণময় আদব', দশম খণ্ড 'দৈনন্দিন কাজে প্রিয় নবীর ﷺ প্রিয় দুআ ও আমল', একাদশ খণ্ড 'ইসলামী মাসমূহের ফাযায়েল ও মাসায়েল', দ্বাদশ খণ্ড 'সীরাতে রাসূল ﷺ ও আমাদের জীবন', ত্রয়োদশ খণ্ড 'দ্বীনী মাদরাসা, উলামা ও তলাবা' এবং চতুর্দশ খণ্ড 'ইসলাম ও আধুনিক যুগ' বিষয়ক। আর পঞ্চদশ খণ্ড 'মুসলিম মনীষীগণের শিক্ষণীয় ঘটনাবলী' এখন ছাপা হচ্ছে।

গ্রন্থনাকালে হযরত মাওলানা ওয়ায়েস সরওয়ার ছাহেব এমন কিছু বিশেষ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন যাতে কিতাবের মান আরো উন্নত হয়েছে।

ক. তিনি সকল কুরআনী আয়াতের সূরার নাম উল্লেখপূর্বক আয়াত নম্বর লাগিয়েছেন।

খ. সকল আয়াত ও হাদীসে হরকত লাগিয়েছেন।

গ. হাদীসসমূহের ক্ষেত্রে কিতাবের নাম, পৃষ্ঠা ও হাদীস নম্বরের বরাত দিয়েছেন।

ঘ. এ সংকলনে এমন অনেক খুতবা আছে যা পূর্বে ছাপা হয়নি।

আল্লাহপাক তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

আমরা সবগুলো খণ্ডের অনুবাদই প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ!

আমাদের বর্তমান আয়োজন এ ধারারই পঞ্চদশ খণ্ড (এবং এ পর্যন্ত প্রকাশিত সর্বশেষ খণ্ড) **'মুসলিম মনীষীগণের শিক্ষণীয় ঘটনাবলী'**।

এ কিতাবে হযরত শাইখুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুম সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈনসহ বিভিন্ন যুগের আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দ্বীনের বিস্ময়কর ঘটনাবলী এমন আঙ্গিকে আলোচনা করেছেন যে, যা পাঠকমাত্রেরই ঈমানকে জাগিয়ে তুলে। আল্লাহ্পাকের সন্তুষ্টির পথে চলার জন্য অনুপ্রেরণা জোগায়।

আল্লাহ পাক এ সকল বরেণ্য ব্যক্তিত্বের মহান জীবনালোচনা দ্বারা আমাদেরকে উপকৃত করুন। আমীন

আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এ গ্রন্থকে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। তারপরও কোনো ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। যদি কারও দৃষ্টিতে কোনো অসংগতি ধরা পড়ে, তাহলে আমাদেরকে অবগত করলে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেব।

আমাদের ধারণা উলামা-তলাবা, খতীব-ইমাম, ওয়ায়েয ও সাধারণ মুসলমানসহ সকলের জন্য এ গ্রন্থ অতীব উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ। এ গ্রন্থ প্রকাশে অনেকেই অনেকভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহপাক তাঁদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। এবং মূল গ্রন্থকার, সংকলক, অনুবাদক ও প্রকাশক, পাঠক-পাঠিকাসহ সকলের জন্য নাজাতের উসীলা বানান। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

তারিখ
০২ যিলহজ্জ ১৪৩৯ হিজরী
১৪ আগস্ট ২০১৮ ঈসায়ী

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
৭ এ্যালিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

ইসলাম ও আমাদের জীবন সিরিজের বইসমূহ

ইসলাম ও আমাদের জীবন-১
ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস

ইসলাম ও আমাদের জীবন-২
ইবাদত-বন্দেগী

ইসলাম ও আমাদের জীবন-৩
ইসলামী মু'আমালাত

ইসলাম ও আমাদের জীবন-৪
ইসলামী মু'আশারাত

ইসলাম ও আমাদের জীবন-৫
ইসলাম ও পারিবারিক জীবন

ইসলাম ও আমাদের জীবন-৬
তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধি

ইসলাম ও আমাদের জীবন-৭
মন্দ চরিত্র ও তার সংশোধন

ইসলাম ও আমাদের জীবন-৮
উত্তম চরিত্র

ইসলাম ও আমাদের জীবন-৯
ইসলামী জীবনের কল্যাণময় আদব

ইসলাম ও আমাদের জীবন-১০
প্রিয়নবীর সা. প্রিয় দুআ ও আমল

ইসলাম ও আমাদের জীবন-১১
ইসলামী মাসসমূহ

ইসলাম ও আমাদের জীবন-১২
সীরাতে রাসূল সা. ও আমাদের জীবন

ইসলাম ও আমাদের জীবন-১৩
দীনী মাদরাসা, উলামা ও তলাবা

ইসলাম ও আমাদের জীবন-১৪
ইসলাম ও আধুনিক যুগ

ইসলাম ও আমাদের জীবন-১৫
মুসলিম মনীষীগণের শিক্ষণীয় ঘটনাবলী

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

আল্লাহর নামে শুরু
যিনি সকলের প্রতি দয়াবান,
পরম দয়ালু।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর ঘটনাবলী

হযরত আবু বকর ও ওমরের পারস্পরিক সম্পর্ক

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. ও হযরত ওমর ফারূক রাযি. উম্মতের শ্রেষ্ঠতম দুই ব্যক্তি। তাঁদেরকে একত্রে 'শাইখাইন' বলা হয়। নবীগণের পরেই তাঁদের মর্যাদা। তাঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো লোক ভূ-পৃষ্ঠে কখনও জন্ম গ্রহণ করেনি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এবং তাঁদের পরস্পরেও এতো গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক ছিলো যে, সাহাবায়ে কেরাম বলেন, তাঁদের নাম যুগলভাবেই নেওয়া হতো। আমরা বলতাম-

جَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ. ذَهَبَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ. خَرَجَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ.

'আবু বকর ও ওমর এসেছেন, আবু বকর ও ওমর গিয়েছেন, আবু বকর ও ওমর বের হয়েছেন'।

যেখানেই নাম আসে, দু'জনের একসঙ্গে আসে। এভাবে তাঁরা দুই দেহ একপ্রাণ ছিলেন। কোনো বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরামর্শের প্রয়োজন হলে তিনি হুকুম দিতেন যে, আবু বকর ও ওমরকে ডেকে আনো। দু'জনের মধ্যে কখনও বিচ্ছিন্নতা কল্পনা করা যেতো না।

উভয়ের মধ্যে এমন ভালোবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধার সম্পর্ক থাকলেও দু'জনের স্বভাব ও প্রকৃতির মধ্যে ভিন্নতা ছিলো। যে কারণে তাঁদের মধ্যে মতভিন্নতাও দেখা দিতো।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, একবার দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা চলছিলো। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. এমন একটা কথা বললেন, যার কারণে হযরত ওমর ফারূক রাযি. নারাজ হয়ে উঠে গেলেন। হযরত আবু বকর রাযি. বুঝতে পারলেন, তিনি কষ্ট পেয়েছেন। তাঁকে খুশি করার জন্যে নিজেও পিছনে-পিছনে ছুটলেন। হযরত ওমর ফারূক রাযি. গিয়ে নিজ ঘরে

প্রবেশ করলেন এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন। হযরত আবু বকর রাযি. যখন দেখলেন যে, তিনি খুব বেশি নারাজ হয়েছেন, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দূর থেকে তাঁর চেহারা দেখে বা ওহী মারফত বিষয়টা জানতে পেরে তিনি মজলিসে পৌছার আগেই সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ করে বললেন, ওই যে তোমাদের বন্ধু আসছেন, তিনি আজ কারও সাথে ঝগড়া করেছেন। হযরত আবু বকর রাযি. মজলিসে এসে বসলেন।

অপরদিকে হযরত ওমর রাযি. ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার পর যখন ঘরে একা হলেন, তখন খুব লজ্জিত হলেন। ভাবলেন, আমি খুবই খারাপ কাজ করলাম, প্রথমত হযরত আবু বকর রাযি.-এর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করলাম, তারপর তিনি যখন আমার পিছনে পিছনে আসলেন, তখন আমি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। এ কথা চিন্তা করে তিনি ঘর থেকে বের হয়ে পড়লেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর পিছনে পিছনে ছুটলেন। মসজিদে নববীতে পৌছে দেখেন, সেখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপবিষ্ট রয়েছেন। হযরত আবু বকর রাযি.-ও উপস্থিত আছেন। তিনি সেখানে পৌছে নিজের অনুতাপ-অনুশোচনা প্রকাশ করতে লাগলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ভুল হয়েছে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমারই ভুল ছিলো। তাঁর তেমন ভুল নেই। আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। আসলে আমিই ভুল করেছিলাম। সব শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর ফারূক রাযি. ও অন্যান্য সাহাবাকে লক্ষ করে এক বিস্ময়কর কথা বললেন,

'তোমরা আমার সঙ্গীকে আমার জন্যে ছেড়ে দেবে কি? আমি যখন বলেছিলাম, হে লোকসকল! আল্লাহ আমাকে তোমাদের সকলের কাছে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন, তোমরা সকলে বলেছিলে- 'তুমি মিথ্যা বলছো', কেবল সেই বলেছিলো- 'আপনি সত্য বলছেন'। একমাত্র সেই আমাকে বিশ্বাস করেছিলো।'[১]

'বাড়িতে রেখে এসেছি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে'

তাবুক যুদ্ধ ছিলো বড়ো কঠিন এক যুদ্ধ। তাবুক যুদ্ধের মতো কঠিন ও ধৈর্যসঙ্কুল যুদ্ধ ও অভিযান আর কোনোটি দেখা দেয়নি। উত্তপ্ত গ্রীষ্মকাল।

---

১. বুখারী, হাদীস নং- ৪২৭৪

আকাশ অগ্নি বর্ষণ করছিলো। জমিন আগুন উগ্লিয়ে দিচ্ছিলো। প্রায় বারো শ' কিলো মিটার দূরত্ব। মরুভূমির সফর। খেজুর পাকার মৌসুম। সারা বছরের ব্যয়ভার এর উপর নির্ভরশীল। বাহনের সঙ্কট। অর্থের অভাব। এমন কঠিন মুহূর্তে সকল মুসলমানের জন্য যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ার ব্যাপক নির্দেশ দেওয়া হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন, কঠিন যুদ্ধ অত্যাসন্ন। বাহন প্রয়োজন। উষ্ট্রি প্রয়োজন। অর্থ-কড়ি প্রয়োজন। মুসলমানগণ প্রতিযোগিতামূলক এতে চাঁদা দিয়ে অংশগ্রহণ করবে। যে ব্যক্তি এখানে চাঁদা দিবে, আমি তার জন্যে জান্নাতের দায়িত্ব নেবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানে জান্নাতের জামানতের ঘোষণা শোনার পর সাহাবায়ে কেরাম কী করে পিছিয়ে থাকতে পারেন! প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থ্য মতো চাঁদা দিচ্ছেন। কেউ এটা দিচ্ছেন, কেউ ওটা দিচ্ছেন।

হযরত ওমর ফারূক রাযি. বলেন, আমি বাড়িতে গিয়ে বাড়ির সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম ও টাকা-পয়সা সমান দু' ভাগ করে অর্ধেক নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। মনে মনে ভাবছিলাম, আজ হয়তো আবু বকরের চেয়ে এগিয়ে যেতে পারবো। তাঁর এই এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণাই হলো 'মুসাবাকাত ইলাল খাইরাত' তথা ভালো কাজে প্রতিযোগিতামূলক এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু তাঁর অন্তরে কখনো এই প্রেরণা জাগ্রত হয়নি যে, আমি টাকা-পয়সায় হযরত ওসমান গনীর উপর এগিয়ে যাবো। এ প্রেরণাও কখনো জাগ্রত হয়নি যে, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফের অনেক টাকা, তার চেয়ে অধিক টাকার আমি মালিক হবো। হ্যাঁ, এ প্রেরণা জাগ্রত হয়েছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-কে আল্লাহ তা'আলা নেক কাজে যেই উঁচু মাকাম দান করেছেন, আমি তারচে' অগ্রগামী হবো।

কিছুক্ষণ পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-ও তাশরীফ আনলেন এবং যাকিছু ছিলো পেশ করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, ওমর বাড়িতে কী রেখে এসেছো?

হযরত ওমর রাযি. নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অর্ধেক সম্পদ বাড়ির লোকদের জন্যে রেখে এসেছি, আর অর্ধেক জিহাদের জন্যে নিয়ে এসেছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্যে দু'আ করলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার মালের মধ্যে বরকত দান করুন!

এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি বাড়িতে কী রেখে এসেছো?

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বাড়িতে আল্লাহ ও রাসূলকে রেখে এসেছি। ঘরের সবকিছুই এখানে নিয়ে এসেছি।

হযরত ওমর ফারূক রাযি. বলেন, সেদিন আমি বুঝতে পেরেছি যে, সারা জীবন চেষ্টা করেও আমি হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর চেয়ে অগ্রগামী হতে পারবো না।[২]

হিজরতের রাত আমাকে দিয়ে দিন

একবার হযরত ওমর ফারূক রাযি. হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-কে বললেন, আপনি আমার সঙ্গে একটি কারবার করলে আমি আপনার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ হবো।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী সেই কারবার?

হযরত ওমর ফারূক রাযি. বললেন, আমার সারা জীবনের সমস্ত নেক আমল আপনি নিয়ে নিবেন, আর যেই রাতে আপনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে গারে সাওরে অবস্থান করে ছিলেন, সেই রাতের সওয়াব আমাকে দিয়ে দিবেন। (অর্থাৎ, যেই রাতটি আপনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে গারে সাওরে ছিলেন তা আমার সারা জীবনের নেক আমলের চেয়ে অধিক ওজনী।)[৩]

ইনি আমাকে পথের দিশা দেন

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আপন মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করছিলেন, তখন হযরত আবু বকর রাযি. তাঁর সঙ্গে ছিলেন। মক্কার মুশরিকরা নবীজিকে ধরে নিতে সবদিকে লোক পাঠিয়েছে। ঘোষণা দিয়েছে, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদকে ধরে আনতে পারবে, তাকে একশো উট পুরস্কার দেওয়া হবে। ঘোষণা শুনে মক্কার সব লোক পাগলপারা হয়ে ছুটছে।

---

২. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৬০৮

৩. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১৮০; হিলইয়াতুল আওলিয়া, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৩

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার পথে এগিয়ে চলছেন। হযরত আবু বকর রাযি. তাঁর সঙ্গে আছেন। পথে এক লোকের সঙ্গে দেখা। সে হযরত আবু বকর রাযি.-কে চেনে, কিন্তু নবীজিকে চেনে না। লোকটি হযরত আবু বকর রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলো, আপনার সঙ্গে ইনি কে? হযরত আবু বকর রাযি. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচয় গোপন রাখতে চাচ্ছিলেন, যাতে কাফেরদের পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে তথ্য পৌছতে না পারে। এখন লোকটির প্রশ্নের উত্তরে সঠিক কথা বলে দিলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। আর সঠিক উত্তর না দিলে মিথ্যা বলা হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আল্লাহ পাকই তাঁর বান্দাকে সাহায্য করে থাকেন। হযরত আবু বকর রাযি. উত্তর দিলেন,

هٰذَا الرَّجُلُ يَهْدِيْنِي السَّبِيْلَ

'ইনি আমাকে পথ দেখিয়ে থাকেন।'[৪]

তিনি এমন এক উত্তর দিলেন যে, লোকটি চিন্তা করলো, সাধারণত মানুষ সফরে যাওয়ার পথে যেমন কোনো পথপ্রদর্শক সাথে নিয়ে থাকে, এমনই কোনো পথপ্রদর্শক হবেন। আর হযরত আবু বকর রাযি. অর্থ নিয়েছেন, ইনি আমার দ্বীনের পথপ্রদর্শক। জান্নাতের পথপ্রদর্শক। আল্লাহর দিকে পথপ্রদর্শক। এবার লক্ষ করুন! এ ক্ষেত্রে তিনি সরাসরি মিথ্যা বলা পরিহার করেছেন। বরং এমন শব্দ বলেছেন যে, তাৎক্ষণিকভাবে তার কাজও হয়ে গিয়েছে, আবার মিথ্যাও বলতে হয়নি।

হযরত আবু বকর ও ওমর রাযি.-এর তাহাজ্জুদ পড়ার ঘটনা

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো রাতের বেলা সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্যে বের হতেন। একবার দেখলেন, হযরত আবু বকর রাযি. তাহাজ্জুদের নামাযে খুব নিম্নস্বরে কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করছেন। সামনে অগ্রসর হয়ে দেখলেন হযরত ওমর রাযি. খুব উচ্চস্বরে কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করছেন। উভয়ের তিলাওয়াত শুনে ঘরে ফিরে এলেন। ফজরের নামাযের পর হযরত আবু বকর রাযি. এলে তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, রাতে দেখলাম, আপনি নামাযে খুব নিম্নস্বরে কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করছেন। এতো নিম্নস্বরে কেন তিলাওয়াত করছিলেন? উত্তরে

৪. সহীহ বোখারী, হাদীস নং- ৩৬২১; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ১১৬১৫

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. খুব সুন্দর একটি কথা বললেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল!

أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ

'আমি যাঁর সঙ্গে গোপনালাপ করছিলাম, তাঁকে শুনিয়েছি।'

সুতরাং আমার আওয়াজ উঁচু করার কী প্রয়োজন। তিনি তো সবই শোনেন।

এরপর হযরত ওমর রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি গত রাতে এতো উচ্চস্বরে কেন তিলাওয়াত করছিলেন? তিনি উত্তর দিলেন,

أُوقِظُ الْوَسْنَانَ وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ

'ঘুমন্তদেরকে জাগানোর জন্যে এবং শয়তানকে ভাগানোর জন্যে আমি জোরে পড়ছিলাম।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-কে বললেন,

اِرْفَعْ قَلِيْلًا

'আপনি আরেকটু উঁচু আওয়াজে তিলাওয়াত করুন।'

এবং হযরত ওমর রাযি.-কে বললেন,

اِخْفِضْ قَلِيْلًا

'আপনি আরেকটু নিচু আওয়াজে তিলাওয়াত করুন।'[৫]

---

৫. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং- ৪০৯; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং- ১১৩৩

হযরত ওমর ফারূক রাযি.-এর ঘটনাবলী

আল্লাহর তাকদীরের প্রতিই পলায়ন করছি

হযরত ওমর ফারূক রাযি. একবার সিরিয়া সফরে যাচ্ছিলেন। পথে জানতে পারলেন যে, সিরিয়ায় প্লেগের মহামারি দেখা দিয়েছে। প্লেগের সেই মহামারি এতো মারাত্মক হয়েছিলো যে, মানুষ মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তো। সেই মহামারিতে হাজার হাজার সাহাবী শহীদ হন। আজও জর্দানে হযরত আবূ উবাইদা রাযি.-এর মাযারের পার্শ্ববর্তী পুরো কবরস্তানটি সে সকল সাহাবায়ে কেরামের কবর দ্বারা পরিপূর্ণ, যাঁরা সেই প্লেগে শহীদ হন।

যাইহোক, হযরত ওমর ফারূক রাযি. সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে সেখানে যাবেন নাকি ফিরে যাবেন, সে বিষয়ে পরামর্শ করলেন। সে সময় হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাযি. একটি হাদীস শোনান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোনো অঞ্চলে প্লেগের মহামারি দেখা দিলে, যারা ঐ এলাকার বাইরে আছে, তারা সেখানে প্রবেশ করবে না। আর যারা সেখানে বসবাস করছে, তারা সেখান থেকে পালিয়ে যাবে না। হাদীসটি শুনে হযরত ওমর ফারূক রাযি. বললেন, এ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, এমন অঞ্চলে প্রবেশ করা উচিৎ নয়। তাই তিনি সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা মুলতবি করেন। তখন সম্ভবত হযরত আবূ উবাইদা রাযি. হযরত ওমর ফারূক রাযি.-কে বললেন,

'আপনি কি আল্লাহর তাকদীর থেকে পলায়ন করছেন?'

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা এ মহামারির মাধ্যমে মৃত্যু লিখে থাকলে মৃত্যু আসবেই। আর যদি মৃত্যু লিখে না থাকেন, তাহলে যাওয়া আর না যাওয়া সমান।

উত্তরে হযরত ওমর ফারূক রাযি. বলেন, আবূ উবাইদা! আপনি ছাড়া অন্য কেউ এ কথা বললে আমি তাকে মাজুর মনে করতাম। কিন্তু আপনি তো

বাস্তবতা পুরোপুরিই জানেন, তো আপনি এটা কেমন করে বলছেন যে তাকদীর থেকে পালাচ্ছেন? তিনি আরো বলেন যে, হ্যাঁ, আমরা আল্লাহর তাকদীর থেকে আল্লাহর তাকদীরের দিকেই পালাচ্ছি।[৬]

পূর্ববর্তী উম্মত যেভাবে পথভ্রষ্ট হয়েছে

হযরত ওমর ফারূক রাযি. হজে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন হজের পর অনেক মানুষ একটি গাছের নিকট যাচ্ছে। একে অন্যের আগে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে কী হচ্ছে? লোকেরা বললো, এটা একটা মসজিদ, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়েছিলেন। এ জন্যে মানুষ সেখানে নামায পড়তে আগ্রহী। তখন হযরত ওমর রাযি. বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মত এ জন্যে ধ্বংস হয়েছিলো যে, তারা তাদের নবীগণের স্মৃতি বিজড়িত জায়গাকে মসজিদ বানিয়েছিলো, সেখানে নামায পড়তে আরম্ভ করেছিলো এবং সেটাকে সওয়াবের বিষয় বানিয়ে ছিলো।[৭]

যে জন্য হাজরে আসওয়াদের চুম্বন

হযরত ওমর ফারূক রাযি. হজে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। হাজারে আসওয়াদকে চুমু খাওয়ার সময় তাকে সম্বোধন করে বললেন, হে হাজারে আসওয়াদ! আমি জানি, তুমি একটি পাথর ছাড়া কিছু নও। খোদার কসম আমি যদি মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুমু খেতে না দেখতাম, তাহলে আমি কখনো তোমাকে চুমু খেতাম না। আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চুমু খেতে দেখেছি। এটা তাঁর সুন্নাত। এ কারণে আমি তোমাকে চুমু খাচ্ছি।[৮]

হযরত ওমরের আত্মমর্যাবোধের প্রতি নবীজীর সম্মান প্রদর্শন

একবার হযরত ওমর ফারূক রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে ওমর! আমি আশ্চর্যজনক একটি স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নে জান্নাতে

---

৬. সহীহ বোখারী, হাদীস নং- ৫২৮৮

৭. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস নং- ৭৫৫০

৮. সহীহ বোখারী, হাদীস নং- ১৪৯৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২২৩০; সুনানে ইবনে মাজা, হাদীস নং- ২৯৩৪; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ২৬৩; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ১৫৩; হায়াতুস সাহাবা, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৭৭

দেখলাম এবং সেখানে একটি দৃষ্টি নন্দন বিরাট অট্টালিকা দেখলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কার? আমাকে বলা হলো, এটা ওমরের মহল। তাঁর জন্যে এটি তৈরি করা হয়েছে। অট্টালিকাটি আমার এতোই ভালো লাগলো যে, আমার মন চাইলো ভিতরে গিয়ে দেখি ওমরের মহলটি কেমন? কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়লো যে, আল্লাহ তোমার মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ খুব বেশি দান করেছেন। সুতরাং তোমার পূর্বে এ মহলে প্রবেশ করা এবং তা দেখা তোমার আত্মমর্যাদাবোধের পরিপন্থী হবে। এ জন্যে আমি আর সেই মহলে প্রবেশ করিনি। এ কথা শুনে হযরত ওমর রাযি. কেঁদে ফেললেন এবং বললেন,

أَوَعَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ أَغَارُ؟

'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতিও কি আমি আত্মমর্যাদাবোধ দেখাবো?'[৯]

আত্মমর্যাদাবোধ তো রয়েছে অন্যের সাথে। আপনি আমার মহলে আমার আগে প্রবেশ করবেন, এটা তো গর্বের বিষয়।

জনৈক বক্তাকে নিয়ন্ত্রণ

হযরত ওমর ফারূক রাযি.-এর যুগে এক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে এসে ওয়ায করতো। হযরত আয়েশা রাযি.-এর কামরা মসজিদে নববীর একেবারে সংলগ্ন ছিলো। যদিও সে যুগে লাউড স্পিকার ছিলো না, কিন্তু ঐ লোক খুব উঁচু আওয়াজে ওয়ায করতো। তার আওয়াজ হযরত আয়েশা রাযি.-এর কামরার ভিতরে পৌঁছতো। তিনি নিজের ইবাদত, তিলাওয়াত, যিকির বা অন্য কাজে মশগুল থাকতেন। ঐ ব্যক্তির আওয়াজে তাঁর কষ্ট হতো। হযরত আয়েশা রাযি. হযরত ওমর ফারূক রাযি.-এর নিকট সংবাদ পাঠান যে, এক ব্যক্তি আমার কামরার নিকট এসে এভাবে ওয়ায করে। এতে আমার কষ্ট হয়। আপনি তাকে বলে দিন, অন্য কোথাও গিয়ে ওয়ায করুক, না হয় নিচু আওয়াজে ওয়ায করুক। হযরত ওমর ফারূক রাযি. তাকে ডেকে বোঝালেন যে, আপনার আওয়াজে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযি.-এর কষ্ট হয়। আপনি এখানে ওয়ায করা বন্ধ করে দিন। সুতরাং সে থেমে গেলো। কিন্তু লোকটির ওয়াযের প্রতি আগ্রহ ছিলো। কিছুদিন পর আবারও ওয়ায করতে শুরু করলো। হযরত ওমর ফারূক রাযি. জানতে পারলেন যে, সে পুনরায় ওয়ায

---

৯. সহীহ বোখারী, হাদীস নং- ৩৪০৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৪৪০৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- ১০৪; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ৮১১৫

করতে শুরু করেছে। তিনি পুনরায় তাকে ডাকলেন এবং বললেন যে, এবার আমি আপনাকে শেষবারের মতো নিষেধ করলাম। এর পর যদি আমি জানতে পারি যে, আপনি এখানে ওয়ায করেন, তাহলে এই ছড়ি আপনার উপর ভাঙ্গবো। অর্থাৎ, এ পরিমাণ প্রহার করবো যে, আপনার উপর এই ছড়ি ভেঙ্গে যাবে।

আমার পিঠে দাঁড়িয়ে নালা ঠিক করুন

একবার হযরত ওমর ফারূক রাযি. মসজিদে নববীর মধ্যে তাশরীফ আনলেন। বৃষ্টি হচ্ছিলো। তিনি দেখলেন এক ব্যক্তির বাড়ির নালা দিয়ে মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় পানি পড়ছে। তিনি বললেন, বাড়ির নালা দিয়ে মসজিদের মধ্যে পানি পড়া উচিত নয়। মসজিদ এ জন্যে নয় যে, মানুষ তার মধ্যে নিজের বাড়ির নালা দিয়ে পানি ফেলবে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কার ঘর? লোকেরা বললো, এটা হযরত আব্বাস রাযি.-এর ঘর। তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা। হযরত ওমর রাযি. বললেন, এটা ঠিক নয়। মসজিদ কারো জায়গীর হতে পারে না। তার মধ্যে ঘরের নালা দিয়ে পানি ফেলা ঠিক নয়। একথা বলে তিনি নালাটি ভেঙ্গে ফেললেন।

এরপর হযরত আব্বাস রাযি. তাশরীফ আনলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, আমীরুল মুমিনীন! এই নালা আপনি কেন ভেঙ্গেছেন?

হযরত ওমর রাযি. বললেন, মসজিদে নববী ওয়াকফকৃত সম্পদ। আল্লাহ তা'আলার ঘর। আর এই নালা আপনার ব্যক্তিগত ঘরের। মসজিদের মধ্যে এটা পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। এই নালা লাগানো জায়েয নয়, এজন্যে আমি ভেঙ্গেছি।

হযরত আব্বাস রাযি. বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আপনার জানা নেই যে, এই নালা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতিক্রমে লাগিয়েছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতিক্রমে লাগানো নালা আপনি ভেঙ্গে দিয়েছেন।

এ কথা শুনে হযরত ওমর ফারূক রাযি. হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং বললেন, হে আব্বাস! বাস্তবিকই কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুমতি দিয়েছিলেন?

হযরত আব্বাস রাযি. বললেন, হ্যাঁ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিয়েছিলেন।

হযরত ওমর ফারূক রাযি. বললেন, আমি আপনার সামনে হাতজোড় করে বলছি, আল্লাহর ওয়াস্তে এ কাজটি করুন। আমি এখানে ঝুঁকে দাঁড়াচ্ছি, আপনি আমার পিঠের উপর দাঁড়িয়ে এখনই এই নালা ঠিক করুন।

হযরত আব্বাস রাযি. বললেন, আপনি ক্ষান্ত হোন। আপনি অনুমতি দিয়েছেন ব্যাপার চুকে গেছে। আমি নালা লাগিয়ে নেবো।

হযরত ওমর রাযি. বললেন, কেউ আমার পিঠের উপর দাঁড়িয়ে এই নালা না লাগানো পর্যন্ত আমি শান্তি পাবো না। খাত্তাবের ছেলের এই দুঃসাহস হলো কি করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি দেওয়া নালার মধ্যে হস্তক্ষেপ করেছে এবং তা ভেঙ্গে ফেলেছে। সুতরাং হযরত ওমর রাযি. তাঁকে নিজের পিঠে আরোহণ করিয়ে ঐ নালা ঠিক করান।[১০]

সেই তালিকায় "ওমর" নেই তো?

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভেদজান্তা রূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কারণ তাঁকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাফিকদের তালিকা বলেছিলেন যে, মদীনায় অমুক অমুক ব্যক্তি মুনাফিক। বিশেষ হিকমতের কারণে হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. ছাড়া অন্য কাউকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নামের তালিকা জানাননি। তাই কারো ইন্তিকাল হলে মানুষ লক্ষ করতো যে, হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. তার জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করেছেন কি না? কারণ তাঁর অংশগ্রহণ এ কথার আলামত ছিলো যে, এ ব্যক্তির নাম মুনাফিকদের তালিকার মধ্যে নেই। আর তিনি শরীক না হলে বোঝা যেতো যে, তার নাম মুনাফিকদের মধ্যে শামিল আছে। আর এ কারণেই হযরত হুযাইফা রাযি. তার জানাযায় শরীক হননি। যাইহোক, হযরত ওমর রাযি. তাঁর নিকট গিয়ে কসম দিয়ে বললেন, আল্লাহর ওয়াস্তে বলুন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাফিকদের যেই তালিকা আপনাকে বলেছেন তার মধ্যে আমার নাম নেই তো?[১১]

আমীরুল মুমিনীনের আল্লাহ তো দেখছেন!

ঘটনা বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর ফারূক রাযি. তাঁর খেলাফতকালে মানুষের অবস্থা জানার জন্যে রাতের বেলা ঘুরে বেড়াতেন। কারো সম্পর্কে

---

১০. তবাকাত ইবনে সা'আদ, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১২; কানযুল উম্মাল, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৬৬; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২০৬; হায়াতুস সাহাবা, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪২৪

১১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ১৯

যদি জানতে পারতেন যে, অমুক ব্যক্তি উপবাসে আছে তাহলে তার সাহায্য করতেন। যদি জানতে পারতেন যে, অমুক ব্যক্তি বিপদগ্রস্থ তাহলে তার বিপদ দূর করতেন। কাউকে অন্যায় কাজ করতে দেখলে তাকে সংশোধন করতেন। একদিন তিনি তাহাজ্জুদের সময় মদীনার অলিগলিতে ঘুরছেন এমন সময় এক ঘর থেকে দুই মহিলার কথার আওয়াজ এলো। আওয়াজে বোঝা গেলো, তাদের একজন বুড়ী এবং একজন যুবতী। বুড়ী মহিলা তার যুবতী মেয়েকে বলছে, তুমি যেই দুধ দোহন করেছো তার মধ্যে পানি মেশাও। তাহলে দুধ বেড়ে যাবে। বেশি দুধ বিক্রয় করতে পারবে। মেয়ে উত্তর দিলো, আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারূক রাযি. নির্দেশ জারি করেছেন, কোনো দুধবিক্রেতা যেন দুধের মধ্যে পানি না মেশায়। তাই আমাদের পানি মেশানো উচিত নয়। উত্তরে মা বললো, আমীরুল মু'মিনীন তো এখানে বসে নেই। তুমি দুধের মধ্যে পানি মেশালে কে দেখবে? এখন অন্ধকার রাত, দেখার মতো কেউ নেই। তিনি তো তার বাড়িতে অবস্থান করছেন। তিনি কি করে জানতে পারবেন যে, তুমি পানি মিশিয়েছো? উত্তরে মেয়ে বললো, আম্মাজান! আমীরুল মু'মিনীন তো দেখছেন না, কিন্তু আমীরুল মু'মিনীনের উপর যিনি শাসক আল্লাহ তা'আলা তো দেখছেন, তাই এ কাজ আমি করবো না।

দরজার বাইরে হযরত ওমর রাযি. তাদের এ কথাবার্তা শুনছিলেন। সকাল বেলা তিনি তথ্য সংগ্রহ করলেন এ মহিলা কে এবং এই মেয়ে কে? তথ্য সংগ্রহ করার পর ঐ মেয়ের সঙ্গে তার ছেলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি.-এর বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। এবং ঐ মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের বিবাহ করালেন। এই বিবাহের ফলে ঐ মেয়ের বংশে তার নাতি হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয জন্ম গ্রহণ করেন। যাকে মুসলমানদের পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ বলা হয়। যাইহোক, ঐ মেয়ের অন্তরে এ কথা জাগে যে, যদিও আমীরুল মু'মিনীন দেখছেন না, কিন্তু আল্লাহ তো দেখছেন। নির্জন নিরিবিলি জায়গায় রাতের অন্ধকারে অন্য কেউ না দেখলেও আল্লাহ তা'আলা ঠিকই দেখছেন। এরই নাম হলো 'তাকওয়া'।

আমানতের অনুভূতি

বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত ওমর ফারূক রাযি.-এর উপর যখন হত্যা করার জন্যে আক্রমণ করা হয় এবং তিনি মারাত্মক আহত হন, তখন কিছু সাহাবী তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করেন যে, হযরত আপনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন, তাই আপনার পরবর্তী কোনো খলীফার নাম

ঘোষণা করে যান। তিনি আপনার পরবর্তীতে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। কেউ কেউ প্রস্তাব করে যে, আপনি আপনার ছাহেবজাদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের নাম ঘোষণা করুন, যাতে আপনার পরে তিনি খলীফা হন। হযরত ওমর ফারূক রাযি. প্রথমে তো না সূচক উত্তর দিয়ে বলেন যে, তোমরা আমার দ্বারা এমন এক ব্যক্তিকে খলীফা বানাতে চাচ্ছো, যে নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত তালাক দিতে পারে না।[১২]

ঘটনা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. ঋতুমতী অবস্থায় তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ছিলেন। শরীয়তে ঋতুমতী অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া জায়েয নেই। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি.-এর এ মাসআলা জানা ছিলো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি জানতে পেরে বলেন যে, তুমি ভুল করেছো। তুমি তাকে এখন ফিরিয়ে নাও। এরপর তালাক দিতে হলে পবিত্র অবস্থায় তালাক দিও। হযরত ওমর রাযি. এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন যে, তোমরা এমন লোককে খলীফা বানাতে চাচ্ছো, যে নিজের স্ত্রীকে তালাক পর্যন্ত দিতে জানে না।[১৩]

এরপর হযরত ওমর রাযি. তাদেরকে দ্বিতীয় উত্তর এই দেন যে, আসল কথা হলো, খেলাফতের ভারি ফাঁদ খাত্তাবের সন্তানদের একজনের গলায় ফেঁসেছে এটাই যথেষ্ট। তিনি এ কথা দ্বারা নিজেকে বুঝিয়েছেন যে, দীর্ঘ বারো বছর এই ফাঁদ আমার গলায় আটকে ছিলো এটাই যথেষ্ট। এখন আর আমি এই খান্দানের অন্য কারো গলায় এ ফাঁদ আটকাতে চাই না। কারণ, আমার তো জানা নেই, আল্লাহর সামনে যখন এই দায়িত্বের হিসাব আমাকে দিতে হবে, তখন আমার কী অবস্থা হবে? অথচ তিনি এমন এক ব্যক্তি, যিনি খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানে এই সুসংবাদ শুনেছেন যে, عُمَرُ فِي الْجَنَّةِ 'ওমর জান্নাতে যাবে'।[১৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে এ সুসংবাদ শোনার পর জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো আশঙ্কা থাকে না। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার সামনে হিসাব-কিতাবের ভয় এবং এই আমানতের এতো বড়ো অনুভূতি!

---

১২. তারীখুল খুলাফা, সুয়ূতীকৃত, পৃষ্ঠাঃ ১১৩

১৩. তারীখুল খুলাফা, সুয়ূতীকৃত, পৃষ্ঠাঃ ১১৩; তারীখে তবারী, খণ্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ ২৯২

১৪. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৬৮০

একবার তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন যদি আমি এই আমানতের হিসাবে সমান সমানেও ছাড়া পাই যে, আমার কোনো গোনাহও থাকবে না, সওয়াবও থাকবে না, বরং আমাকে আ'রাফে জায়গা দেওয়া হবে, তাহলে আমার জন্যে এটাই যথেষ্ট, এবং আমি মুক্তি পেয়ে যাবো। (আ'রাফ জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি জায়গা। সেখানে ঐসব লোকদেরকে রাখা হবে, যাদের গোনাহ ও নেকী সমান হবে।) মূলত এটাই হলো, সেই আমানতের অনুভূতি, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দান করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা যদি এর সামান্যতম অংশও আমাদেরকে দান করতেন, তাহলে আমাদের সব সমস্যার সমাধন হয়ে যেতো।

রাতের টহল

হযরত ওমর ফারূক রাযি. রাতের বেলা মদীনা মুনাওয়ারার অলি-গলিতে টহল দিতেন। এক রাতে তিনি শুনতে পেলেন একটি বাড়ি থেকে গানের আওয়াজ আসছে, সেই সঙ্গে কিছু গ্লাস নাড়াচাড়ার শব্দও। ভাবলেন এ বাড়িতে হয়ত সুরা পানের আসর চলছে, সঙ্গে গানবাজনাও হচ্ছে। কিছুক্ষণ তো তিনি সব শুনতে থাকলেন। তারপর দেওয়াল টপকে ভেতরে ঢুকলেন। দেখলেন ঠিকই সুরাপান চলছে এবং গানবাজনাও হচ্ছে। তিনি তাদের হাতেনাতে ধরে ফেললেন। জলসার কর্তা ব্যক্তিটি ছিলো চতুর। সে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি আমাদের গ্রেপ্তার করলেন কেন?

হযরত ওমর ফারূক রাযি. বললেন, তোমরা মদ্যপান করছিলে এবং গান বাজনায়ও লিপ্ত ছিলে; সেই অপরাধে তোমাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

লোকটি বললো, আমরা তো একটা অপরাধই করছিলাম, আপনি যে কয়েকটা অপরাধ করলেন?

তিনি বললেন, সেগুলো কী?

সে বললো, একটি অপরাধ তো এই করেছেন যে, আপনি গোয়েন্দগিরি করেছেন, আমাদের দোষ খুঁজে বেড়িয়েছেন, ভেতরে কী হচ্ছে তা অনুসন্ধান করেছেন। এটা গোনাহের কাজ।

দ্বিতীয় অপরাধ করেছেন অনুমতি ছাড়া ভেতরে ঢুকেছেন। কারও ঘরে বিনা অনুমতিতে ঢোকা জায়েয নেই।

তৃতীয় গোনাহ এই করেছেন যে, আপনি দেওয়াল টপকে ভিতরে প্রবেশ করেছেন। অথচ কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا

'তোমরা ঘরে ঢুকবে তার দরজা দিয়ে।'[১৫]

এভাবে আপনি তিন তিনটি অপরাধ করেছেন, আমরা তো করেছিলাম মাত্র একটি।

হযরত ওমর ফারূক রাযি. তার কথা শুনে এসব অপরাধের জন্যে ইস্তিগফার করলেন যে, হয়তো আমার দ্বারা বাস্তবেই এ সব গোনাহ হয়েছে। তাই আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।[১৬]

আমাদের মতো কেউ হলে তাকে দুই থাপ্পড় মেরে বলতো, হতভাগা! একে অপরাধ করছো, আবার আমার উপর আপত্তি? চুরির উপর সিনাজুরি? কিন্তু তাঁরা তো নিজের নফসেরও এলাজ করতেন। তাই তিনি চিন্তা করলেন, অভিযোগ যেহেতু আমার নিজের সম্পর্কে, তাই রদ না করে বরং তার প্রতিকার করা উচিত। সুতরাং তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইস্তিগফার করলেন।

অতঃপর হযরত ওমর রাযি. বিষয়টা সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে তুলে ধরে বললেন, লোকটি আমাকে এই এই কথা বলেছে। আমি নাকি তিনটি গোনাহ করেছি। তা বাস্তবিকই কি আমি গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধ করেছি। এভাবে অনুসন্ধান চালানোতে কি আমি ছিদ্রান্বেষণের গোনাহ করে ফেলেছি? দেওয়াল টপকে ঘরের ভেতর ঢোকা কি আমার জন্যে নাজায়েয ছিলো? সাহাবায়ে কেরামের সে মজলিস আলোচনা-পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত দিলো, কোনো কর্মকাণ্ড সম্পর্কে যদি এই আশঙ্কা দেখা দেয় যে, তা জনগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে এবং সমাজে তার কুফল ছড়িয়ে পড়তে পারে, তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্যে তাতে নজরদারি করা এবং বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ করা, এমনকি দেওয়াল টপকে হলেও সেখানে প্রবেশ করা জায়েয হবে।

কিন্তু অপরাধটি যদি একান্তই ব্যক্তিগত হয় এবং তা দ্বারা সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা না থাকে, তবে এরূপ গুপ্তচরগিরি জায়েয হবে না। যেমন কোনো লোক নিজ গৃহে গোপনে কোনো অপরাধ করছে, যার ক্ষতি কেবল তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, সমাজে সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা নেই, এক্ষেত্রে সরকারি নজরদারি জায়েয নেই। আমাদের

---

১৫. সূরা বাকারা : ১৮৯

১৬. কানযুল উম্মাল, ২/১৬৭

ফকীহগণ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কোন কোন অবস্থায় গুপ্তচরবৃত্তি জায়েয এবং কোন কোন অবস্থায় জায়েয নয়, তার বিশদ ব্যাখ্যা তারা প্রদান করেছেন।

ক্রোধের নিয়ন্ত্রণ ও যথার্থ ব্যবহার

জাহেলিয়াতের যুগে লোকদের ক্রোধ সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিলো। সামান্য বিষয়ে পরস্পরে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যেতো। অনেক সময় চল্লিশ বছর পর্যন্ত সে যুদ্ধ অব্যাহত থাকতো। কিন্তু তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবতপ্রাপ্ত হওয়ার পর এমন মোমে পরিণত হন যে, এরপর তাঁদের ক্রোধ সঠিক জায়গায় উদ্রেক হতো এবং তা সীমার মধ্যে থাকতো। যতটুকু ক্রোধের উদ্রেক হওয়া উচিত ততটুকুই হতো। তার চেয়ে অধিক হতো না। জাহেলিয়াতের যুগে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.-এর নাম শুনে মানুষ কেঁপে উঠতো। মানুষ মনে করতো, তাঁর ক্রোধের উদ্রেক হলে আমাদের কল্যাণ নেই। এই ক্রোধের অবস্থায় একবার নিজের ঘর থেকে বের হলেন। মুহাম্মাদ নবুওয়াতের দাবি করেছে। নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছে। পুরাতন ধর্মকে ভুল আখ্যা দিচ্ছে। তাই আমি তাঁর মাথা কেটে ফেলবো। লম্বা ঘটনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর কানের মধ্যে কুরআন ঢেলে দিলেন। কুরআনের আয়াতকে তাঁর পরিবর্তনের মাধ্যম বানিয়ে দিলেন। এভাবে তাঁর অন্তরে ইসলাম জায়গা করে নিলো। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে নিজের পুরো জীবনকে কুরবানী করে দিলেন।[১৭]

হযরত ওমর ফারূক রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে তাশরীফ আনলেন। তাঁর সোহবত গ্রহণ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ তারবিয়াত ও সোহবতের মাধ্যমে তাঁর সীমাতিরিক্ত ক্রোধকে এমন ভারসাম্যপূর্ণ করে দিলেন যে, যখন তিনি খলীফা এবং আমীরুল মু'মিনীন হলেন, তখন একদিন তিনি মসজিদে নববীতে জুমার খুৎবা দিচ্ছিলেন। সামনে প্রজাদের বিরাট সমাবেশ। এমতাবস্থায় তিনি একটি প্রশ্ন করলেন, প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যে এক বেদুঈন দাঁড়ালো। সে বললো, হে ওমর! তুমি বাঁকা পথে চললে আমি এই তরবারী দিয়ে তোমাকে সোজা করে দেবো। এমন এক ব্যক্তিকে এ কথা বলা হচ্ছে, যিনি অর্ধেক দুনিয়ার

---

১৭. সীরাতে ইবনে হিশাম, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৪৩-৩৪৪; উসদুল গাবা, ওমর ইবনে খাত্তাব রাযি.-এর আলোচনা

বাদশা। পৃথিবীর যেই অংশ তখন তাঁর শাসনাধীন ছিলো আজ সেই অংশে পঁচিশটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সেই বেদুঈনের কথায় হযরত ওমর রাযি.-এর ক্রোধের উদ্রেক হয়নি। তিনি বলেছেন,

'হে আল্লাহ! আমি আপনার শোকর আদায় করছি যে, এই উম্মতের মধ্যে আপনি এমন লোক সৃষ্টি করেছেন, আমি ভুল করলে যে আমাকে সোজা করে দিবে।'[১৮]

যাইহোক, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.-এর যেই ক্রোধ জাহেলিয়াতের যুগে প্রবাদতুল্য ছিলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবত ও তারবিয়াতের ফলে তা ভারসাম্যের মধ্যে চলে আসে।

আর যখন ক্রোধের সঠিক ক্ষেত্র আসতো, জালেম ও অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় আসতো, তখন কাইসার ও কিসরার মতো পরাশক্তিসমূহ তাঁর নাম শুনে কেঁপে উঠতো। তিনিই কাইসার ও কিসরার রাজসিংহাসন ধুলোয় মিশিয়ে দেন। তো যেখানে ক্রোধ উদ্রেক হওয়ার সঠিক ক্ষেত্র ছিলো না, সেখানে ক্রোধের উদ্রেক হয়নি। যেখানে যেই পরিমাণ ক্রোধের উদ্রেক হওয়ার ছিলো, সেখানে সেই পরিমাণ ক্রোধের উদ্রেক হয়েছে। এর অতিরিক্ত হয়নি। তাঁর সম্পর্কেই বলা হয়েছে,

كَانَ وَقَّافًا عِنْدَ حُدُوْدِ اللهِ

অর্থাৎ, হযরত ওমর রাযি. আল্লাহ তা'আলার বেঁধে দেওয়া সীমারেখার সামনে থেমে যেতেন। তার মধ্যে এ চরিত্র কোথেকে এলো? কিতাব পড়ে এবং দর্শন আউড়িয়ে কি তার মধ্যে এ গুণ এসেছে? না, বরং তা অর্জনের একটাই রাস্তা, তা হলো, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবত লাভ করেছেন। তাঁর তারবিয়াতে থেকেছেন। তাঁর খেদমত করেছেন। পরিণতিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমস্ত চরিত্রকে পরিচ্ছন্ন, পরিশুদ্ধ ও পাক-পবিত্র করে দিয়েছেন।

হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান রাযি.-এর ঘটনাবলী

তাঁকে লজ্জা করেন ফেরেশতাগণও

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে অবস্থান করছিলেন, তাঁর পরিধানের লুঙ্গি কিছুটা উপরে উঠানো ছিলো। কোনো বর্ণনা মতে হাঁটু পর্যন্ত খোলা ছিলো। সম্ভবত এটা তখনকার ঘটনা, যখন হাঁটু সতর হিসেবে বিধিত হয়নি। অবশ্য কোনো বর্ণনায় এসেছে হাঁটু আবৃত ছিলো। ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি দরজায় করাঘাত করলো। জানা গেলো, তিনি হযরত আবু বকর রাযি.। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিলে তিনি ভিতরে প্রবেশ করে পাশে বসলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে পা খোলা অবস্থায় ছিলেন সেভাবেই থাকলেন। কিছুক্ষণ পর আবার অন্য কেউ দরজায় আওয়াজ দিলো, জানা গেলো, তিনি হযরত ওমর ফারূক রাযি.। তাঁকেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তিনিও এসে পাশে বসলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ববৎ পা খোলা অবস্থায় বসে থাকলেন। অবস্থার কোনো পরিবর্তন করলেন না। একটু পর আবার কেউ দরজায় করাঘাত করলো। জিজ্ঞাসা করলেন কে? উত্তরে জানা গেলো, তিনি হযরত ওসমান গণী রাযি.। সঙ্গে সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লুঙ্গি টেনে পাগুলো সুন্দরভাবে ঢেকে নিলেন। এরপর বললেন, তাকে আসতে বলো। অতএব তিনিও এসে বসলেন।

এ দৃশ্য দেখে একজন জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যখন হযরত সিদ্দীকে আকবর রাযি. তাশরীফ আনলেন, তখন আপনি লুঙ্গি ঠিক করলেন না, যখন হযরত ওমর ফারূক রাযি. আসলেন, তখনও একই অবস্থায় থাকলেন, কিন্তু যখন ওসমান গণী রাযি. তাশরীফ আনলেন, তখন আপনি অবস্থার পরিবর্তন ঘটালেন এবং লুঙ্গি টেনে পা ঢেকে নিলেন, এর কারণ কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন,

'আমি এমন ব্যক্তিকে কেন লজ্জা করবো না, যাঁকে ফেরেশতারাও লজ্জা করে?'[১৯]

---

১৯. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৪৪১৪; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ৪৮৪

সুন্নতের অনুসরণে অবিচলতা

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় হযরত ওসমান গনী রাযি. আলোচনার উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত হয়ে মক্কা শরীফে তাশরীফ নিয়ে যান। সেখানে গিয়ে তাঁর চাচাতো ভাইয়ের বাড়িতে অবস্থান করেন। সকালে যখন মক্কার সরদারদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্যে ঘর থেকে বর হন, তখন হযরত ওসমান রাযি.-এর পায়জামা টাখনু গিরার উপরে পায়ের গোছার মাঝ বরাবর ছিলো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ হলো, গিরার নীচে লুঙ্গি ঝুলিয়ে দেওয়া নাজায়েয, তবে গিরার উপরে হলে জায়েয আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সাধারণত গোছার মাঝ পর্যন্ত লুঙ্গি উঠিয়ে পরতেন। এর চেয়ে নীচে নামাতেন না। হযরত ওসমান রাযি.-এর চাচাতো ভাই বললেন, জনাব! আরবদের দস্তুর হলো, যার লুঙ্গি যতো বেশি ঝুলানো থাকে, তাকে ততো বেশি বড়ো মানুষ মনে করা হয়। সরদাররা নিজেদের লুঙ্গি অধিক পরিমাণে ঝুলিয়ে রাখে। তাই আপনি আপনার লুঙ্গি এভাবে উপরে উঠিয়ে পরে গেলে তাদের নিকট আপনার কোনো গুরুত্ব থাকবে না। ফলে আলোচনা কোনো গুরুত্ব পাবে না। হযরত ওসমান গনী রাযি. নিজের চাচাতো ভাইয়ের কথা শুনে একটা উত্তরই দিলেন,

لَا! هٰكَذَا إِزْرَةُ صَاحِبِنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'না, আমি আমার লুঙ্গি এর চেয়ে নিচু করতে পারবো না, আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লুঙ্গি এমনটিই হয়ে থাকে।'[২০]

অর্থাৎ, এরা আমাকে ভালো মনে করুক আর খারাপ মনে করুক, আমাকে সম্মান করুক চাই অসম্মান করুক, যাই করুক, আমি তার পরোয়া করি না। আমি তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লুঙ্গি দেখেছি। তাঁর লুঙ্গি যেমন, আমার লুঙ্গিও তেমনই থাকবে। আমি এটা পরিবর্তন করতে পারবো না। এভাবে সুন্নাতের পায়রোবি করে তাঁরাই জগদ্বাসী থেকে মর্যাদা আদায় করে নিয়েছেন।

২০. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, খণ্ডঃ ৭, পৃষ্ঠাঃ ৩৮৬, হাদীস নং- ৩৬৮৫২

হযরত আলী রাযি.-এর ঘটনাবলী

আল্লাহর কসম! আমি তা মুছতে পারি না

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মক্কার কাফেরদের মধ্যে যখন সন্ধিপত্র লেখানো হচ্ছিলো, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাযি.-কে ডেকে বললেন, তুমি লেখো। তিনি বললেন, ঠিক আছে। যখন সন্ধির শর্তসমূহ লিখতে আরম্ভ করলেন, তখন হযরত আলী রাযি. সন্ধিপত্রের উপর লিখলেন 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম'। তখন কাফেরদের পক্ষ থেকে যে ব্যক্তি সন্ধির শর্ত চূড়ান্ত করতে এসেছিলো, সে বললো, না আমি তো 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' লিখতে দিবো না। যেহেতু এ সন্ধিপত্র উভয় পক্ষ থেকে, তাই এর মধ্যে এমন বিষয় থাকা উচিত, যার উপর উভয় পক্ষ একমত। আমরা 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' দ্বারা কাজ আরম্ভ করি না। আমরা তো 'বিসমিকাল্লাহুম্মা' লিখি। জাহেলিয়াতের যুগে মানুষ 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম'-এর পরিবর্তে 'বিসমিকাল্লাহুম্মা' লিখতো। অর্থাৎ, হে আল্লাহ আপনার নামে আমরা শুরু করছি। এ কারণে সে বললো, এটা মুছে দাও এবং 'বিসমিকাল্লাহুম্মা' লিখো। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাযি.-কে বললেন, আমাদের জন্যে এতোদুভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। 'বিসমিকাল্লাহুম্মা'-ও আল্লাহর নাম। ঠিক আছে ওটা মুছে এটা লিখে দাও। হযরত আলী রাযি. 'বিসমিকাল্লাহুম্মা' লিখে দিলেন। তারপর হযরত আলী রাযি. লিখতে আরম্ভ করলেন– এই চুক্তি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মক্কার সর্দারদের মধ্যে চূড়ান্ত হয়েছে। কাফেরদের পক্ষ থেকে যে প্রতিনিধি ছিলো, সে আবারো আপত্তি করলো যে, আপনারা মুহাম্মাদ শব্দের সঙ্গে 'রাসূলুল্লাহ' কেন লিখলেন? আমরা যদি আপনাকে রাসূলুল্লাহই মেনে নেই তাহলে আর ঝগড়া কিসের? সব ঝগড়া তো এ বিষয়ের উপরেই যে, আমরা আপনাকে রাসূল মানি না। এজন্যে যে চুক্তিপত্রে আপনি মুহাম্মাদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহও লিখবেন, আমি তার উপর স্বাক্ষর করবো না। আপনি শুধু লিখবেন, এই চুক্তিপত্র মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ও কুরাইশদের সর্দারদের মাঝে চূড়ান্ত হয়েছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাযি.-কে বললেন, ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার নয়,

তুমি তো আমাকে আল্লাহর রাসূল মানো, তাই মুহাম্মাদের সাথে রাসূলুল্লাহ শব্দ মুছে দাও এবং মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ লিখে দাও। হযরত আলী রাযি. প্রথম বিষয় তো মেনে নিয়েছিলেন এবং 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম'-এর স্থলে 'বিসমিকাল্লাহুম্মা' লিখে দিয়েছিলেন, কিন্তু যখন 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কেটে 'মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ' লিখে দিতে বললেন, তখন হযরত আলী রাযি. অবিলম্বে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন,

وَاللهِ لَا أَمْحُوْهُ

'খোদার কসম! আমি 'রাসূলুল্লাহ' শব্দ মুছবো না।'

হযরত আলী রাযি. মুছতে অস্বীকার করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার আবেগ উপলব্ধি করলেন এবং বললেন, আচ্ছা তুমি না মুছলে আমাকে দাও। আমি নিজ হাতে মুছে দিবো। সুতরাং তিনি চুক্তিপত্র তার থেকে নিয়ে নিজ পবিত্র হাতে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দ মুছে দিলেন।[২১]

আল্লাহর জন্য প্রতিশোধ

হযরত আলী রাযি.-এর ঘটনা আছে যে, এক ইহুদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবিপূর্ণ কোনো কথা বললে তিনি ক্রোধান্বিত হন। তিনি ঐ ইহুদিকে ধরাশায়ি করে তার বুকের উপর উঠে বসেন। ইহুদি যখন দেখলো আর কোনো উপায় নেই তখন সে মাটিতে শোয়া অবস্থায়ই হযরত আলী রাযি.-এর চেহারায় থুথু নিক্ষেপ করে। তখন হযরত আলী রাযি. তাকে ছেড়ে দেন। লোকেরা বললো, এবার তো সে আরো বেশি গোস্তাখি করলো, ফলে তাকে আরো বেশি মারা উচিত ছিলো। হযরত আলী রাযি. বললেন, সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে গোস্তাখি করেছিলো। তখন আমার ক্রোধ আমার নিজের জন্যে ছিলো না, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা রক্ষার্থে ছিলো, এজন্যে আমি তার উপর উঠে বসি। কিন্তু সে আমাকে থুথু নিক্ষেপ করলে আমার অন্তরে নিজের জন্যে ক্রোধের সৃষ্টি হয়, নিজের জন্যে প্রতিশোধ গ্রহণের প্রেরণা অন্তরে জেগে ওঠে। তখন আমার স্মরণ হয় যে, নিজের জন্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করা ভালো নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনই নিজের জন্যে কারো থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। এজন্যে আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি।

---

২১. সহীহ বোখারী, হাদীস নং- ২৫২৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৩৩৩৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ৬২১

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.-এর ঘটনাবলী

দৌড় প্রতিযোগিতা

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি দাওয়াতে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রযি.-ও সাথে ছিলেন। পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। পথে একটি প্রান্তর পড়ে। বিজন প্রান্তর। সেখানে দেখার মতো কেউ নেই, তাই বেপর্দা হওয়ারও আশঙ্কা ছিলো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযি.-কে বললেন, আয়েশা আমার সাথে দৌড়ের প্রতিযোগিতা করবে? হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, হ্যাঁ, করবো। এই দৌড়ের প্রতিযোগিতার দ্বারা এক দিকে তো হযরত আয়েশা রাযি.-কে খুশি করা উদ্দেশ্য ছিলো, অপরদিকে উম্মতকে এই শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য ছিলো যে, অতি বেশি বুযুর্গ হয়ে এক কোণে বসে থাকা ভালো বিষয় নয়। দুনিয়াতে মানুষের মতো থাকা উচিৎ।

অপর এক হাদীসে হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সঙ্গে দুই বার দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগিয়ে যান। আর দ্বিতীয় বার যখন প্রতিযোগিতা হয়, তখন যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ তুলনামূলক ভারী হয়ে গিয়ে ছিলো, এ জন্যে আমি এগিয়ে যাই, তিনি পিছনে পড়েন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, تِلْكَ بِتِلْكَ অর্থাৎ, এবার সমান সমান হলো একবার তুমি জিতেছো, একবার আমি জিতেছি।[২২]

এ বছর আমিও ইতিকাফ করছি না

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফ করার ইচ্ছা করলেন। আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমারও আপনার সঙ্গে ইতিকাফে বসতে ইচ্ছা হচ্ছে। এমনিতে তো

---

২২. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং- ২২১৪

নারীদের জন্যে মসজিদে ইতিকাফ করা ঠিক নয়। নারীরা ইতিকাফ করতে চাইলে ঘরেই করবে। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি.-এর অবস্থান এ দিক থেকে ভিন্ন ছিলো যে, তাঁর ঘরের দরজা মসজিদের ভিতরের দিকেই খোলা হতো। সুতরাং ঘরের দরজার সামনেই যদি মসজিদে তাঁর ইতিকাফের জায়গা করা হয়, আর তার সাথেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইতিকাফের জায়গা করা হয় তাহলে এতে পর্দার কোনো সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। প্রয়োজনে ঘরে চলে যাবেন, আবার প্রয়োজন সেরে ইতিকাফের জায়গায় ফিরে আসবেন। এ জন্যে তাঁর মসজিদে ইতিকাফ করাতে কোনো সমস্যা ছিলো না। বিধায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অনুমতি দান করেন।

রমাযানের ২০ তারিখে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের বাইরে গেলেন, তখন ফিরে এসে দেখেন, মসজিদের বিভিন্ন জায়গায় অনেকগুলো তাঁবু টানিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন, এসব তাঁবু কাদের? লোকেরা বললো, এগুলো উম্মুল মুমিনীনদের তাঁবু। আয়েশা রাযি. যখন মসজিদে ইতিকাফ করার অনুমতি পেয়ে গেলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য বিবিগণও চিন্তা করলেন যে, আমরাও এ সৌভাগ্য অর্জন করি। তাই তাঁরাও মসজিদে নিজ নিজ তাঁবু টানিয়ে নিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবলেন, আয়েশার বিষয়টি তো ছিলো ভিন্ন। তার ঘর মসজিদের সঙ্গে। তার জন্যে তো পর্দা রক্ষা করেও মসজিদে ইতিকাফ করা সম্ভব। কিন্তু অন্যদের ঘর দূরে। তারা মসজিদে ইতিকাফ করলে বারবার ঘরে যাতায়াতে পর্দা লঙ্ঘন হবে। এভাবে তো নারীদের ইতিকাফ করা ঠিক নয়। তাই তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

آلْبِرَّ يُرِدْنَ؟

'তারা কি বস্তুত কোনো নেক কাজের ইচ্ছা করছে?'

উদ্দেশ্য ছিলো নারীদের এভাবে মসজিদে ইতিকাফ করা কোনো নেক কাজ নয়।

কিন্তু সমস্যা ছিলো এই যে, তিনি যেহেতু আয়েশা রাযি.-কে ইতিকাফের অনুমতি দিয়েছিলেন– যদিও তাকে অনুমতি দেওয়াটা সঙ্গত কারণেই ছিলো, যা অন্যদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো না– তথাপিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তা করলেন, যদি আমি আয়েশার তাঁবু রেখে অন্যদেরকে নিষেধ করি, তাহলে এটা তাদের জন্যে কষ্টকর হতে পারে। এ জন্যে অন্যদের তাঁবু

উঠানোর সঙ্গে সঙ্গে হযরত আয়েশা রাযি.-কেও বললেন, তোমার তাঁবুও উঠিয়ে নাও। কিন্তু যখন ভাবলেন আয়েশাকে তো সুস্পষ্ট অনুমতি দিয়েছিলাম, এখন তাঁবু উঠিয়ে দিলে তাঁর জন্যে কষ্টের কারণ হতে পারে, এ জন্যে তাঁর প্রতি খেয়াল করে ঘোষণা দিলেন যে, আমিও এ বছর ইতিকাফ করবো না। এ কারণে তিনি ঐ বছর আর ইতিকাফই করলেন না।[২৩]

অভিনব অভিমান

একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.-কে বললেন, তুমি কখন আমার উপর খুশি থাকো আর কখন নারাজ তা আমি বেশ বুঝতে পারি। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, তা কীভাবে? তিনি বললেন, যখন তুমি আমার প্রতি খুশি থাকো তখন কসম করো وَرَبِّ مُحَمَّدٍ '(মুহাম্মাদের রবের কসম) বলে। আর নারাজ থাকলে কসম করো وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ 'ইবরাহীমের রবের কসম' বলে। তখন তুমি আমার নাম উচ্চারণ করো না। বরং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নাম নাও। হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, إِنِّي لَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে ক্ষেত্রে আমি কেবল আপনার নামটাই ছাড়ি, না হয় আমার অন্তরে আপনার ভালোবাসায় ছেদ পড়ে না।[২৪]

---

২৩. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২০০৭; সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং- ৭০২; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং- ২১০৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- ১৭৬১

২৪. বোখারী, হাদীস নং- ৪৮২৭; মুসলিম, হাদীস নং- ৪৪৬৯; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ২৩১৮২

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাযি.-এর ঘটনাবলী

এ হলদে দাগ কিসের?

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাযি. একজন বিখ্যাত সাহাবী। তিনি আশারায়ে মুবাশ্‌শারার অন্যতম। অর্থাৎ, যেই দশজন সৌভাগ্যবান সাহাবীকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট ভাষায় জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সকল সাহাবীরই গভীর সম্পর্ক ছিলো, তবে আশারায়ে মুবাশশারা ছিলেন আখাসসুল খাওয়াস। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাঁদের ছিলো সবিশেষ সম্পর্ক। আর হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাযি. ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে হাজির হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জামায় হলুদ দাগ দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার জামায় এ হলুদ দাগ কিসের? উত্তরে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বিবাহ করেছি। বিবাহের কারণে সুগন্ধি লাগিয়ে ছিলাম, এটা তার দাগ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দু'আ দিয়ে বললেন,

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَعَلَيْكَ

'আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বরকত দান করুন।'

অতঃপর বললেন,

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

'একটি ছাগল দিয়ে হলেও ওলীমা করো।'[২৫]

---

২৫. সহীহ বোখারী, হাদীস নং- ১৯০৭

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর ঘটনাবলী

হাদীস অর্জনের জন্য কঠোর-কঠিন সফর

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. হলেন ইমামুল মুফাসসিরীন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় যুগে তিনি ছিলেন খুব অল্প বয়সী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো মাত্র দশ বছর। এতো অল্প বয়সে ইলম শেখার তেমন সুযোগ লাভ হয় না। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল হলে আমার মনে চিন্তা জাগলো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তো আমি তাঁর থেকে ইলম অর্জন করতে পারিনি। এখন তিনি দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন। যে সব হাদীস অন্যেরা তাঁর থেকে শিখেছেন, সেগুলো আমি কীভাবে শিখতে পারি? আমি চিন্তা করলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড়ো বড়ো সাহাবী, যাঁরা তাঁর থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন, তাঁদের থেকে আমার হাদীস শিখতে হবে। তাই আমি স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম যে, আমি বড়ো বড়ো সাহাবীর নিকট যাবো এবং তাঁদের থেকে হাদীস শিখবো। সুতরাং আমি কারো সম্পর্কে যদি জানতে পারতাম যে, অমুক সাহাবীর নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস রয়েছে, তো আমি সফর করে তাঁর নিকট যেতাম এবং হাদীস সংগ্রহ করতাম।

তিনি নিজেই নিজের ঘটনা বর্ণনা করেন যে, অনেক সময় তীব্র গ্রীষ্ম কাল হতো। হিজাযের গ্রীষ্ম, যা না দেখলে কল্পনা করা যাবে না। আকাশ অগ্নি বর্ষণ করে। জমিন আগুন উগ্‌রিয়ে দেয়। এমন উত্তপ্ত রোদের মধ্যে দুপুরে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সংগ্রহের জন্যে কোনো সাহাবীর নিকট যেতাম। গিয়ে দেখতাম বাড়ির দরজা বন্ধ। তিনি ভিতরে অবস্থান করছেন। তখন আমার সাহস হতো না যে, যাঁকে আমি ওস্তায ও শায়েখ বানাবো, যাঁর থেকে আমি হাদীস শিখবো, তাঁর দরজায় করাঘাত করে

তাঁকে বাড়ি থেকে বের হয়ে আসার কষ্ট দেবো। আমার কাছে এটা বেয়াদবি মনে হতো। এ কারণে আমি দরজায় করাঘাত না করে বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করতাম। তিনি নিজে যখন বের হয়ে আসবেন, তখন আমি আমার প্রয়োজনের কথা বলবো। আমি বাইরে বসা থাকতাম। দুপুরের সময়। তীব্র গরম। লু হাওয়া বইছে। বালু উড়ছে। কোনো কোনো সময় আসর পর্যন্ত তিনি দরজা খুলতেন না, তাই আমি বসা থাকতাম। ফলে আমার মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত বালুতে ঢেকে যেতো।

আমার অবস্থা দেখে তিনি বলতেন, হে আল্লাহর রাসূলের চাচাতো ভাই! আপনার এ অবস্থা! আপনি দরজায় করাঘাত করে আমাকে ডাকেন নি কেন? আমি নিজে আপনার খেদমত করতাম।

তিনি উত্তরে বলতেন, এখন আমি তালেবে ইলম হয়ে এসেছি। তালেবে ইলমের জন্যে নিজের ওস্তাযকে কষ্ট দেওয়া সমীচীন নয়। এ কারণে দরজায় করাঘাত করে আপনাকে বাইরে ডেকে আনা আমি সমীচীন মনে করিনি। আমি এখন আপনার নিকট থেকে সেই হাদীস জানতে এসেছি, যা আপনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে শিখেছেন, বা শুনেছেন।

এতো কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে তবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. ইমামুল মুফাসসিরীন হয়েছেন। এরূপ এক-দু'টি দৃষ্টান্ত নয়, বরং সকল সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈয়নে এযাম এরূপ মেহনত-মুজাহাদা ও কষ্ট-কুরবানী করেই এ সব হাদীস শিক্ষা করেছেন।

প্রবল বৃষ্টিতে ঘরে নামায

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. একবার মসজিদে বসা ছিলেন। আযানের সময় হলো। সাথে সাথে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হলো। মুয়াযযিন আযান দিলো। তারপর তিনি মুয়াযযিনকে বললেন, ঘোষণা করে দাও,

اَلصَّلٰوةُ فِى الرِّحَالِ

অর্থাৎ, সকলে নিজ নিজ ঘরে নামায পড়ুন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও এ কথাই প্রমাণিত আছে যে, এমন ক্ষেত্রে এ ঘোষণা দেওয়া উচিত। এখন মানুষের জন্যে এটা ছিলো খুবই অপরিচিত ব্যাপার। সারাজীবন তো দেখে এসেছে যে, মসজিদ থেকে ঘোষণা হয়-

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

'নামাযের জন্যে এসো, কামিয়াবির জন্যে এসো।'

কিন্তু এখানে উল্টা ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে যে, নিজেদের ঘরে নামায পড়ো। সুতরাং লোকেরা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর নিকট আপত্তি করলো যে, হযরত আপনি এ কি করছেন! আপনি মানুষদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করছেন। উত্তরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন,

نَعَمْ أَفْعَلُ ذٰلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّيْ وَمِنْكَ

'হ্যাঁ, আমি এমন ঘোষণাই করাবো। কারণ, এ ঘোষণাও সেই সত্তাই করিয়েছেন, যিনি আমার থেকে উত্তম এবং তোমাদের থেকেও উত্তম।'[২৬]

---

২৬. সহীহ বোখারী, হাদীস নং- ৬২৮

হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-এর ঘটনাবলী

প্রচণ্ড ক্ষুধা-অনাহারে হাদীস অর্জন

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে বিখ্যাত। শুধু তাঁর থেকে ৫৩৭৪টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি এ সব হাদীস কীভাবে অর্জন করেছেন? তিনি নিজের সমস্ত কাজকর্ম ও পরিবার-পরিজন থেকে আলাদা হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ শেখার উদ্দেশ্যে তাঁর খেদমতে এসে পড়ে থাকেন। এমনভাবে পড়ে থাকেন যে, তিনি বলেন, আমি কোনো কোনো সময় কয়েক বেলা অনাহারে থাকার কারণে নিস্তেজ হয়ে মসজিদে নববীতে পড়ে যেতাম। মানুষ মনে করতো আমি বেহুঁশ হয়ে গিয়েছি, কখনো মনে করতো, আমার মৃগি রোগ হয়েছে। মানুষের মধ্যে প্রচলন ছিলো যে, মৃগি রোগীর ঘাড়ে পা দিয়ে চাপ দিলে রোগ ভালো হয়ে যায়, তাই মানুষ আমার ঘাড়ে পা দিয়ে চাপ দিতো, অথচ-

وَمَا بِيْ إِلَّا الْجُوْعُ

প্রকৃতপক্ষে না আমার মৃগি রোগ ছিলো, আর না আমি বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছিলাম, বরং আমার তো কেবল ক্ষুধার কষ্ট ছিলো। ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে নিস্তেজ অবস্থায় পড়ে থাকতাম।

এই হলেন হযরত আবু হুরায়রা রাযি., যাঁর থেকে সর্বাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর আমরা তাঁর হাদীস দ্বারা উপকৃত হচ্ছি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি.-এর ঘটনাবলী

তাহলে আল্লাহ কোথায়?

একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. সফর করছিলেন। সঙ্গের পথসম্বল শেষ হয়ে গিয়েছিলো। তিনি দেখলেন মাঠে ছাগল পাল বিচরণ করছে। আরবদের রীতি ছিলো, তারা মুসাফেরদেরকে বিনা মূল্যে দুধ দিয়ে মেহমানদারী করতো। তাই তিনি রাখালের নিকট গিয়ে বললেন, আমি একজন মুসাফের। আমার পাথেয় শেষ হয়ে গিয়েছে। তুমি ছাগলের দুধ দোহন করে আমাকে দাও, আমি পান করবো।

রাখাল বললো, আপনি মুসাফের, আপনাকে আমি অবশ্যই দুধ দোহন করে দিতাম, কিন্তু এ ছাগলগুলো তো আমার নয়। এগুলোর মালিক অন্য মানুষ। আমি এগুলো চরিয়ে থাকি। এগুলো আমার নিকট আমানত। এগুলোর দুধও আমানত। তাই এ দুধ আপনাকে দেওয়া আমার জন্যে জায়েয নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. তার দ্বীনদারি পরীক্ষা করার জন্যে বললেন যে, এই ছাগল পাল থেকে যদি একটি ছাগল তুমি আমার কাছে বিক্রি করো তাহলে তোমারও লাভ, আমারও লাভ। কারণ, তুমি এর মূল্য পাবে, আর আমি পথে এর দুধ পান করতে পারবো। মালিককে তুমি বলবে যে, একটি ছাগল বাঘে নিয়েছে। সেও তোমার কথা বিশ্বাস করবে, কারণ বাঘ ছাগল নিয়েই থাকে। এ কথা শুনতেই রাখাল মুখ ঘুরিয়ে নিলো এবং আসমানের দিকে আঙ্গুল উঠিয়ে বললো,

فَأَيْنَ اللّٰهُ؟

'আল্লাহ কোথায় গেছেন?

এ কথা বলে সে রওয়ানা হয়ে গেলো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. রাখালের কথা শুনে বললেন, তোমার মতো মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে কোনো জালেম অন্যের উপর জুলুম করবে না।[২৭]

---

২৭. উসদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২২৮

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের গীবত

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সম্পর্কে প্রায় সকল মুসলমানই জানেন যে, সে সীমাহীন অত্যাচার করেছে। বহু আলেমকে শহীদ করেছে এবং বহু হাফেযকে হত্যা করেছে। এমনকি সে কা'বা শরীফের উপরে আক্রমণ করেছে। এসব খারাপ কাজ সে করেছে। যে মুসলমানই এসব বিষয় পড়ে তার অন্তরেই তার ব্যাপারে ঘৃণা সৃষ্টি হয়। কিন্তু একবার এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি.-এর সামনে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের দোষ চর্চা শুরু করে এবং তার গীবত করে। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. সাথে সাথে ধরে বসেন এবং বলেন যে, এ কথা মনে করবে না যে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ জালেম বলে তার গীবত করা হালাল হয়ে গিয়েছে বা তার উপর অপবাদ দেওয়া হালাল হয়ে গিয়েছে। মনে রাখবে! যখন আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ থেকে তার অন্যায়, হত্যা, জুলুম ও খুনের বদলা নিবেন, তখন তুমি তার যে গীবত করছো বা তার উপর যে অপবাদ আরোপ করছো, তার বদলাও আল্লাহ তা'আলা তোমার থেকে নিবেন। এমন নয় যে, যে ব্যক্তি দুর্নামগ্রস্থ হয়েছে তার উপর যা ইচ্ছা দোষ চাপিয়ে যাবে। অপবাদ দিতে থাকবে। গীবত করতে থাকবে। এজন্যে শত্রুতা প্রকাশও ভারসাম্যের সাথে করো এবং ভালোবাসাও প্রকাশ করো ভারসাম্যের সাথে।

মৃত্যুর আগে আগে সময় ও সুযোগের মূল্যায়ন

একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. কোথাও সফরে যাচ্ছিলেন। পথে একটি কবর দেখতে পেলেন। সেখানে বাহন থেকে নেমে তিনি দু' রাকাত নামায পড়লেন। তারপর বাহনে আরোহণ করে সম্মুখপানে যাত্রা করলেন। সঙ্গীরা মনে করলো, কোনো বিশেষ ব্যক্তির কবর হবে, এজন্যে এখানে অবতরণ করে দু' রাকাত নামায পড়লেন। তাই তারা জিজ্ঞাসা করলো, হযরত! ব্যাপার কী? এখানে নামলেন কেন?

তিনি উত্তর দিলেন, আসলে আমি যখন এখান দিয়ে অতিক্রম করি, তখন আমার মনে চিন্তা জাগে যে, যারা কবরে চলে গেছে তাদের আমল তো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে, কবরবাসীরা কবরের মধ্যে আক্ষেপ করে যে, হায়! আমরা যদি দু' রাকাত নামায পড়ার সুযোগ পেতাম, তাহলে আমাদের আমলনামায় আরো দু রাকাত নফল নামাযের নেকী যুক্ত হতো! কিন্তু আক্ষেপ সত্ত্বেও তারা দু' রাকাত নামায পড়ার সুযোগ লাভ করে না। তো আমার চিন্তা হলো, আল্লাহ তা'আলা তো আমাকে এ সুযোগ দিয়েছেন। তাই তাড়াতাড়ি দু' রাকাত নামায পড়ে নিলাম।

হযরত হাসান-হুসাইন রাযি.-এর ঘটনাবলী

নবীবংশের জন্য যাকাত বৈধ নয়

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, হযরত ফাতেমা রাযি. ও হযরত আলী রাযি.-এর ছেলে হযরত হাসান রাযি. শিশু অবস্থায় একবার সদকার একটি খেজুর মুখে দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা দেখে সাথে সাথে 'কাখ কাখ' বলে উঠলেন। আরবী ভাষায় এ শব্দটি আমাদের ভাষায় 'থু থু' বলার মতো। শিশু কোনো জিনিস মুখে দিলে তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে তা মুখ থেকে বের করানোর জন্যে এ শব্দ ব্যবহার করা হয়। যাইহোক, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কাখ কাখ'। অর্থাৎ, এটা মুখ থেকে বের করে ফেলে দাও! তুমি জানো না, আমরা বনী হাশেমের লোকেরা সদকার মাল খাই না?

আদরের নাতি

হযরত হাসান রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাতি। তিনি এমন প্রিয় নাতি যে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে খুৎবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় হযরত হাসান রাযি. মসজিদে প্রবেশ করেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে নেমে সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁকে কোলে তুলে নেন।

কখনো এমনও হতো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ছেন, আর হযরত হাসান রাযি. কাঁধে সোয়ার হয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় যাওয়ার সময় একহাতে ধরে তাঁকে নামিয়ে দেন।

কখনো এমনও হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কোলে নিতেন এবং বলতেন, সন্তান কৃপণতা ও ভীরুতার কারণ।[২৮]

---

২৮. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- ৩৬৫৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ১৬৯০৪

‘ওযু আমারই ভুল ছিল’

একবার হযরত হাসান ও হুসাইন রাযি. সম্ভবত ফোরাতের তীর দিয়ে যাচ্ছিলেন। দু'জনে দেখলেন– নদীর তীরে এক বুড়ো মানুষ ওযু করছে, কিন্তু ভুল পদ্ধতিতে। তাদের চিন্তা হলো– তার ভুল ধরে দেওয়া উচিত। কারণ, অন্যের ভুল ধরে দেওয়াও একটি দ্বীনী দায়িত্ব। কিন্তু তিনি হলেন বড়ো আর আমরা হলাম ছোট, তাকে কীভাবে বলা উচিত, যাতে তার মন ভেঙ্গে না যায় এবং অসন্তুষ্ট না হয়? সুতরাং উভয়ে পরামর্শ করলেন এবং উভয়ে মিলে বুড়ো লোকটির কাছে গেলেন। কাছে গিয়ে বসলেন। কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করলেন। তারপর বললেন, আপনি আমাদের বড়ো, আমরা ওযু করলে আমাদের সন্দেহ হয় যে, ওযু সুন্নাত মোতাবেক হয় কি না, এজন্যে আমরা আপনার সামনে ওযু করি, আপনি একটু দেখুন, আমাদের ওযুর মধ্যে কোনো ভুল-ভ্রান্তি বা সুন্নাতের খেলাফ কিছু নাই তো? থাকলে বলে দিন। সুতরাং দুই ভাই তাদের সামনে ওযু করলেন। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এবার বলুন, আমরা এতে কোনো ভুল তো করিনি। বুড়ো লোকটি তার ভুল বুঝতে পারলেন যে, আমি যে পদ্ধতিতে ওযু করেছি তা ভুল ছিলো এবং এদের পদ্ধতি সঠিক। বুড়ো লোকটি বললেন, আসলে আমিই ভুল পদ্ধতিতে ওযু করেছি। এবার তোমাদের বলায় আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে। ইনশা আল্লাহ, এখন থেকে সঠিক পদ্ধতিতে ওযু করবো।[২৯]

২৯. মানাকেবে ইমামে আযম, কুরদরীকৃত খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৯-৪০

হযরত হানযালা রাযি.-এর ঘটনাবলী

নিজের উপর মুনাফিক হওয়ার আশঙ্কা

একবার হযরত হানযালা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে গেলেন এবং নিবেদন করলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে? তিনি বললেন, আমি মুনাফেক হয়ে গেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, কীভাবে মুনাফেক হয়ে গেছো? উত্তরে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার মজলিসে আমি যখন বসি তখন অন্তরে ভালো আবেগ-উদ্দীপনা ও ভালো চিন্তা-চেতনা জাগ্রত হয়। অন্তরে আল্লাহর স্মরণ জীবন্ত থাকে। নিজের সংশোধনের চিন্তা জাগে। আখেরাতের নেয়ামতের কথা স্মরণ হয়। কিন্তু যখন জীবনের ব্যস্ততায় মগ্ন হই, পরিবার-পরিজনের কাছে যাই, তখন সে অবস্থা অবশিষ্ট থাকে না। এটা তো মুনাফেকি যে, বাহ্যিকভাবে তো মুসলিম, আর অন্তরে খারাপ চিন্তা জাগ্রত হচ্ছে। এজন্যে ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো মুনাফেক হয়ে গেছি। আপনি বলুন, এ থেকে আমি কীভাবে মুক্তি পেতে পারি?

লক্ষ করুন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী এ কথা বলছেন। সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে পুরা উম্মত একমত যে, 'তাঁরা সকলে আদেল'। তাঁদের সকলে নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত ও পরহেযগার। তাঁদের মধ্যে কেউ ফাসেক হতে পারে না। আর তাঁদেরই সন্দেহ হচ্ছে যে, আমি মুনাফেক হয়ে যাইনি তো!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে, ঘরে যাওয়ার পর তোমার চিন্তার যেই পরিবর্তন অনুভব হয় এবং অবস্থার যেই ভিন্নতা উপলব্ধি হয়, সে জন্যে পেরেশান হয়ো না। কারণ, এতে মানুষ মুনাফেক হয় না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থা হয়েই থাকে। কখনো মানুষের মনে আল্লাহর স্মরণ প্রবল হয় এবং সে কারণে মন বিগলিত হয়। আর কখনো এতো প্রবল হয় না। অবস্থার এই পরিবর্তনে মানুষ মুনাফেক হয় না।[৩০]

---

৩০. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৪৯৩৭

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি.-এর ঘটনাবলী

প্রতিশ্রুতি রক্ষা

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. বিখ্যাত সাহাবীগণের অন্যতম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন কথা তিনি জানতেন। তিনি বনু আবাছ কবিলার লোক। স্বদেশেই পিতার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার প্রকৃত নাম হাসাল এবং উপাধি ছিলো ইয়ামান। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে রওয়ানা হন। ঘটনাচক্রে তখন ছিলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদর যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের সময়। আবু জাহ্লের বাহিনী মোকাবেলার জন্যে তখন পবিত্র মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে গিয়েছে।

পথে আবু জাহ্লের বাহিনীর সঙ্গে হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. এবং তাঁর পিতার সামনাসামনি দেখা হয়ে যায়। তারা উভয়কে বন্দী করে বলে, তোমরা কি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাচ্ছো? তাঁরা বললেন, আমরা তো মদীনায় যাচ্ছি। তখন আবু জাহ্লের লোকেরা তাঁদেরকে বললো, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমাদের সঙ্গে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ না হবে যে, 'তোমরা শুধু মদীনায় যাবে, কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁদের সঙ্গী হবে না' ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তোমাদেরকে ছাড়বো না। বাধ্য হয়ে তাঁরা ওয়াদাবদ্ধ হন।

সে সময় হক ও বাতিলের সর্বপ্রথম যুদ্ধ বদর যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিলো। এমন এক যুদ্ধ, যাকে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা 'ইয়াউমুল ফুরকান' তথা হক ও বাতিলের মাঝে ফয়সালাকারী যুদ্ধ বলে আখ্যা দিয়েছেন। যেই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীকে 'বদরী' সাহাবী বলা হয়। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে 'বদরী সাহাবাগণের' অনেক উঁচু মাকাম রয়েছে। বদরী সাহাবাগণের নাম ওযীফা স্বরূপ পাঠ করা হয়। তাঁদের নাম পাঠ করে দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা সে দু'আ কবুল করে থাকেন। বদরী সাহাবাগণ সম্পর্কে রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তআলা সকল বদরীকে মাফ করে দিয়েছেন।

এমন এক জিহাদ হতে যাচ্ছিলো, যেখানে রণসাজে সজ্জিত কোরাইশের কাফের বাহিনীর সঙ্গে মুসলিম বাহিনীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিলো। কাফেরদের সংখ্যা ছিলো মুসলমানদের তিন গুণেরও অধিক। তাই মুসলমানদের জন্যে একেকজন লোক ছিলো অত্যন্ত মূল্যবান।

তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গিয়ে সমস্ত ঘটনা জানান। এবং আবেদন করেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরাও বদর যুদ্ধে আপনার সঙ্গে অংশ নিতে চাই। তারা তো আমাদের থেকে জোরপূর্বক ওয়াদা নিয়েছে। তাই আপনি আমাদেরকে জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি দান করুন! যাতে করে আমরাও এর ফযীলত লাভ করতে পারি। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থাতেও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার ইচ্ছা মেনে নেননি। তিনি বললেন,

نَفِيْ بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِيْنُ اللهَ عَلَيْهِمْ

'আমরা তাদের সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণ করবো এবং তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য কামনা করবো।'[৩১]

এ কারণে তাঁরা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। আমানত ও প্রতিশ্রুতি পূরণের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অন্য কোনো জাতির ইতিহাসে পাওয়া যাবে কি?

সুন্নতের অনুসরণে অবিচলতা

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. ইরান-বিজয়ী সাহাবী ছিলেন। তিনি যখন ইরান আক্রমণ করেন, তখন আলোচনার জন্যে কিসরা তাঁকে নিজ দরবারে ডেকে পাঠায়। তিনি সেখানে গেলে প্রথমে আপ্যায়নের উদ্দেশ্যে তাঁর সম্মুখে খাবার দেওয়া হয়। তিনি খেতে আরম্ভ করেন। খাওয়ার মাঝে তাঁর হাত থেকে একটি লোকমা পড়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা হলো, খাবার পড়ে গেলে তা নষ্ট করবে না। কারণ, তা আল্লাহর রিযিক। জানা তো নেই, এর কোন অংশে বরকত রয়েছে। তাই এর অবমূল্যায়ন করবে না। তা উঠিয়ে পরিষ্কার করে খাবে। লোকমা নীচে পড়ে

---

৩১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ১৭৭৮; মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৩৯৫; মুসতাদরাকে হাকেম, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৭৯, আল ইসাবা, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩১৬

গেলে হযরত হুযাইফা রাযি.-এর এই হাদীসের কথা মনে পড়ে। তিনি পড়ে যাওয়া খাবার উঠানোর জন্যে নীচের দিকে হাত বাড়ান। তাঁর পাশে এক ব্যক্তি বসা ছিলেন। তিনি তাঁকে কনুই দ্বারা আঘাত করে ইশারা করেন যে, এ কী করছেন! এটা তো পরাশক্তি কিসরার দরবার। এমন দরবারে মাটিতে পড়ে যাওয়া খাবার উঠিয়ে খেলে এদের মনে আপনাদের গুরুত্ব থাকবে না। এরা মনে করবে যে, এরা কোনো দিন ভালো খাবার দেখেনি। তাই এটা খাবার উঠিয়ে খাওয়ার ক্ষেত্র নয়। আজকে এটা রেখে দিন। উত্তরে হযরত হুযাইফা রাযি. কী বিস্ময়কর কথা বলেছেন-

أَأَتْرُكُ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ؟

'আমি কি এই নির্বোধদের জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ছেড়ে দিবো?'

এরা ভালো মনে করুক চাই খারাপ মনে করুক, সম্মান করুক চাই অসম্মান করুক, চাই ঠাট্টা করুক, আমি তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ছাড়তে পারবো না।

এবার বলুন, তাঁরা নিজেদেরকে সম্মানিত করেছেন, নাকি সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে আজ আমরা নিজেদেরকে সম্মানিত করছি? তাঁরাই নিজেদেরকে সম্মানিত করেছেন। এমন সম্মানিত করেছেন যে, একদিকে তো পড়ে যাওয়া লোকমা উঠিয়ে খাচ্ছেন, অপরদিকে মূর্তিমান অহঙ্কার পারস্যের মুকুটকে এমনভাবে ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِذَا هَلَكَ كِسْرٰى فَلَا كِسْرٰى بَعْدَهُ

কিসরা হালাক হওয়ার পর আর কোনো কিসরা থাকবে না। দুনিয়া থেকে তার নাম-নিশানা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।[৩২]

এর পূর্বের ঘটনা, হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. এবং হযরত রিব'য়ী ইবনে আমের রাযি. আলোচনার জন্যে যখন কিসরার মহলে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁরা নিজেদের সাদামাটা পোশাকই পরা ছিলেন। দীর্ঘ পথ সফর করে এসেছিলেন, তাই কিছুটা ময়লা হয়ে থাকাও স্বাভাবিক ছিলো। এ অবস্থা দেখে দরবারের দারোয়ান ভিতরে যেতে বাধা দেয়। সে

৩২. সহীহ বোখারী, হাদীস নং- ৩৩৪৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৫১৯৭; সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং- ২১৪২; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ৬৮৮৭

বলে, এতো বড়ো বাদশার দরবারে তোমরা এমন পোশাক পরে যাচ্ছো? এ কথা বলে সে একটি জুব্বা দিয়ে বলে, এটি পরে ভিতরে যাও। হযরত রিব'য়ী ইবনে আমের রাযি. দারোয়ানকে বললেন, কিসরার দরবারে যাওয়ার জন্যে যদি তার দেওয়া জুব্বা পরা জরুরী হয়, তাহলে তার দরবারে যাওয়ার আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি গেলে এ পোশাকেই যাবো। এ পোশাকে যদি সে সাক্ষাৎ করতে না চায়, তাহলে আমারও তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আগ্রহ নেই। তাই আমি ফিরে চললাম।

দারোয়ান ভিতরে খবর পাঠালো যে, এক অদ্ভূত ধরনের লোক এসেছে, যে জুব্বা নিতেও তৈরি নয়। এই ফাঁকে হযরত রিব'য়ী ইবনে আমের রাযি. তরবারীর ভাঙ্গা অংশে প্যাচানো ছিড়া কাপড়ের টুকরাগুলো ঠিক করছিলেন। চৌকিদার লোকটি বললো, আমাকে একটু তোমার তরবারীটা দেখতে দাও! তিনি তরবারী তার হাতে দিলেন।

সে তরবারী দেখে বললো, তুমি এই তরবারী দিয়ে ইরান জয় করবে?

হযরত রিব'য়ী ইবনে আমের রাযি. বললেন, কেবল তো তরবারী দেখেছো, তরবারী চালনাকারী হাত তো দেখোনি।

সে বললো, ঠিক আছে, হাতও দেখাও!

হযরত রিব'য়ী ইবনে আমের রাযি. বললেন, হাত দেখতে চাইলে এক কাজ করো, তরবারীর আঘাত প্রতিহত করার জন্যে তোমাদের নিকট সবচেয়ে বেশি মজবুত যেই ঢাল আছে, তা আনো, এরপর আমার হাত পরীক্ষা করো।

সুতরাং সেখানকার সবচেয়ে মজবুত ঢাল, যার সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিলো যে, এ ঢাল কোনো তরবারী কাটতে সক্ষম হবে না, তা চেয়ে আনলো। হযরত রিব'য়ী ইবনে আমের রাযি. বললেন, তোমাদের কেউ একজন এটা হাতে নিয়ে দাঁড়াও। এক ব্যক্তি ঢাল হাতে নিয়ে দাঁড়ালো। হযরত রিব'য়ী ইবনে আমের রাযি. সেই ছেড়া কাপড় প্যাচানো তরবারী দ্বারা তার উপর আঘাত করা মাত্র ঢাল ভেঙ্গে দুই টুকরা হয়ে গেলো। সকলে এ দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেলো যে, আল্লাহই জানেন, এ কেমনতর মাখলুক এসেছে!

যাইহোক, এরপর দারোয়ান ভিতরে খবর পাঠালো যে, এক বিরল-বিস্ময়কর মাখলুক এসেছে। তারা আপনার দেওয়া পোশাক পরে না। বাহ্যিকভাবে তাদের তরবারী ভাঙ্গা হলেও তা সবচেয়ে শক্তিশালী ঢাল দুই টুকরা করে ফেলেছে। সুতরাং অল্পক্ষণ পর তাঁকে ভিতরে ডেকে নেওয়া হলো। কিসরার রাজদরবারের নিয়ম ছিলো যে, কিসরা নিজে সিংহাসনে

উপবিষ্ট থাকতো আর দরবারীরা সকলে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো। হযরত রিব'য়ী ইবনে আমের রাযি. কিসরাকে বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী। এক ব্যক্তি বসে থাকবে আর অন্যেরা দাঁড়িয়ে থাকবে, এরূপ করতে তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। এ কারণে এভাবে আলোচনা করতে আমরা প্রস্তুত নই। হয় আমাদের জন্যেও চেয়ার আনানো হোক, না হয় কিসরাও আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে যাক।

কিসরা দেখলো যে, এরা তো আমাদেরকে লাঞ্ছিত করার জন্যে এসেছে। তাই সে একটি মাটি ভর্তি টুকরি মাথায় দিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলো এবং বললো যে, আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই না। সুতরাং তাঁকে একটি মাটি ভর্তি টুকরি দেওয়া হলো। হযরত রিব'য়ী ইবনে আমের রাযি. দরবার থেকে বের হওয়ার সময় বললেন, কিসরা মনে রেখো! তুমি ইরানের মাটি আমাকে দিয়ে দিয়েছো! এ কথা বলে তিনি রওয়ানা হয়ে গেলেন। ইরানীরা সংশয়গ্রস্থ মানসিকতার অধিকারী ছিলো। তারা চিন্তা করলো, সে যে বললো, 'ইরানের মাটি আমাকে দিয়ে দিয়েছো' এটা তো বড়ো অশুভ কথা। তখন কিসরা অবিলম্বে তাঁর পিছনে একজন লোক পাঠালো যে, দ্রুত গিয়ে মাটির টুকরি ফিরিয়ে আনো। কিন্তু ইতোমধ্যে হযরত রিব'য়ী ইবনে আমের রাযি. তাদের নাগালের বাইরে চলে যেতে কামিয়াব হয়েছেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ইরানের মাটি এই ভাঙ্গা তরবারীওয়ালাদের জন্যে লিখে দিয়েছিলেন।

খন্দকের যুদ্ধে হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন। যুদ্ধের শেষ রজনীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কাফের বাহিনীর সংবাদ সংগ্রহের জন্যে প্রেরণ করেন। তিনি অত্যন্ত বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিচক্ষণতার সাথে সুকৌশলে এই গুরুত্বপূর্ণ বিপদসংকুল কর্ম সম্পাদন করেন। শেষ পর্যন্ত কাফের বাহিনী সেখান থেকে পলায়ন করে।

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের আদমশুমারীর দায়িত্বও তাঁর উপর অর্পণ করেন। তিনি উত্তমরূপে তা সম্পাদন করেন। সে সময় মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো দেড় হাজার।[৩৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ভবিষ্যতকালীন ফেৎনা সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছিলেন। অনেক মুনাফেককে চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন। তাই তাঁকে 'সাহিবুস্ সির্র' (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভেদজান্তা) বলা হতো। এমনকি একবার হযরত ওমর রাযি.

---

৩৩. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ১৪৯

কসম দিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমার নাম মুনাফেকদের তালিকায় নেই তো? হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. না সূচক জবাব দেন।[৩৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পরও তিনি অব্যাহতভাবে যুদ্ধে শরীক হতে থাকেন। দায়নুর অঞ্চল তাঁরই পবিত্র হাতে বিজিত হয়। ইরাক ও ইরানের বিজয়ধারাতেও তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। কিসরার দরবারে তিনি সেই উৎসাহব্যঞ্জক ও সাহসদীপ্ত ভাষণ দান করে, যা কিসরার প্রাসাদে কম্পন সৃষ্টি করে।

ইরান বিজয়ের পর হযরত ওমর রাযি. তাঁকে মাদায়েনের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি কিসরার রাজধানীর গভর্নর নিযুক্ত হয়ে একটি গাধায় আরোহণ করে সেখানে পৌঁছেন। তার গদির সাথে সামান্য পাথেয় রাখা ছিলো। মাদায়েনবাসী তাঁকে স্বাগত জানায় এবং নিবেদন করে, আমরা আপনার সকল বাসনা পূর্ণ করতে প্রস্তুত। তিনি উত্তর দেন,

'আমার জন্যে খাবার এবং আমার এই গাধার জন্যে কিছু ঘাস প্রাপ্তিই যথেষ্ট।'

দীর্ঘদিন পর্যন্ত হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. অত্যন্ত সরলতার সঙ্গে মাদায়েনের গভর্নররূপে দায়িত্বপালন করতে থাকেন। একবার তিনি মাদায়েন থেকে মদীনায় আসেন। হযরত ওমর রাযি. পূর্ব থেকেই তাঁর আসার পথে আত্মগোপন করে বসে ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো মাদায়েন থেকে কোনো ধনসম্পদ আনলে তা যেন তিনি গোপনে অবগত হতে পারেন। কিন্তু দেখা গেলো, তিনি যে অবস্থায় গিয়েছিলেন সে অবস্থাতেই ফিরে এসেছেন। হযরত ওমর রাযি. এ অবস্থা দেখে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।[৩৫]

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. শেষ জীবনে মাদায়েনেই অবস্থান করেন। তিনি হযরত ওসমান রাযি.-এর শাহাদতের চল্লিশ দিন পর এখানেই ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁকেও সন্তুষ্ট করেছেন।

---

৩৪. কানযুল উম্মাল, খণ্ড: ১৩, পৃষ্ঠা: ৩৪৪

৩৫. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবীকৃত, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৬৬

হযরত আমীরে মুআবিয়া রাযি.-এর ঘটনাবলী

চুক্তিরক্ষার বিস্ময়কর ঘটনা

হযরত মুআবিয়া রাযি. এমন এক সাহাবী, যাঁর উপর জালেম লোকেরা অনেক অপবাদের বৃষ্টি বর্ষণ করেছে। আল্লাহ রক্ষা করুন! আমীন। মানুষ তাঁর শানে গোস্তাখি করে থাকে। তাঁর একটি ঘটনা শুনুন!

হযরত মুআবিয়া রাযি. ছিলেন শামের গভর্নর। যদ্দরুন তৎকালীন রোমের সাথে তার যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকতো। রোম সাম্রাজ্যকে তৎকালীন সুপার পাওয়ার মনে করা হতো। অসাধারণ সামরিক শক্তির অধিকারী ছিলো। একবার হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর সাথে তাদের যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়। একটি মেয়াদ স্থির করা হয় যে, এ মেয়াদ পর্যন্ত আমরা একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে-আগে হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর মাথায় একটি কৌশল জাগে। তিনি চিন্তা করেন, মেয়াদের ভেতর যুদ্ধ করা তো জায়েয নয়, কিন্তু প্রস্তুতি গ্রহণে দোষ কী? কাজেই আমার সৈনিকদের সীমান্ত এলাকায় জড়ো করে রাখি, যাতে মেয়াদ শেষ হওয়া মাত্র আক্রমণ শুরু করা যায়। তাতে জয়লাভ খুব সহজ হবে। কেননা, শত্রুরা তো ভাববে মুসলিম সৈন্যরা মেয়াদের ভেতর যেহেতু হামলা করবে না, তাই তাদের কোনও রকম রণপ্রস্তুতিও থাকবে না। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রস্তুতি নিয়ে এই এলাকায় পৌছতে তাদের দীর্ঘ সময় লেগে যাবে।

হযরত মুআবিয়া রাযি. তাঁর সৈন্যদেরকে সীমান্ত এলাকায় সমবেত করলেন। কিছু সৈন্য সীমান্তের ভিতরে অবস্থান নিলো। মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে তিনি তাদেরকে সামনে অগ্রসর হওয়ার হুকুম দিলেন। বাহিনী এগিয়ে চললো এবং এলাকার পর এলাকা তাদের দখলে চলে আসলো। কেননা, শত্রুসৈন্য এই আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিলো না। তারা বিনা বাধায় একের পর এক নগর ও জনপদ জয় করতে থাকলো। এভাবে রোম সাম্রাজ্যের বহু দূর পর্যন্ত তারা পৌছে গেলো। বিজয়ের নেশায় তখন তারা দুর্নিবার। সামনে চলছে তো চলছেই। এই অবস্থায় অকস্মাৎ এক

ঘোড়সওয়ারের প্রতি নজর পড়ল। পিছন দিক থেকে দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে আসছে। হযরত মুআবিয়া রাযি. তার অপেক্ষায় থেমে গেলেন। হযরত আমীরুল মু'মিনীনের দূত কোনো নতুন ফরমান নিয়ে আসছে। ঘোড়সওয়ার আরও কাছে এসে পৌঁছলে তার আওয়াজ শোনা গেলো-

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ. قِفُوْا عِبَادَ اللهِ. قِفُوْا عِبَادَ اللهِ

'আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! আল্লাহর বান্দাগণ তোমরা থামো! আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা থামো।'

ঘোড়সোয়ার আরও নিকটে এলে হযরত মুআবিয়া রাযি. দেখেন তিনি হযরত আমর ইবনে আবাসা রাযি.। জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কী?

তিনি বললেন-

وَفَاءٌ لَا غَدَرٌ. وَفَاءٌ لَا غَدَرٌ

'চুক্তিরক্ষাই মুমিনের কাজ, বিশ্বাসঘাতকতা নয়; চুক্তিরক্ষাই মুমিনের কাজ বিশ্বাসঘাতকতা নয়।'

হযরত মুআবিয়া রাযি. বললেন, আমি তো চুক্তি ভঙ্গ করিনি। আমি যুদ্ধবিরতির মেয়াদের ভেতর আক্রমণ করিনি; বরং মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই করেছি।

হযরত আমর ইবনে আবাসা রাযি. বললেন, যদিও হামলার আগে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু আপনি আপনার সীমান্তে সেনাসমাবেশ ঘটিয়েছিলেন তার আগেই। কিছু সংখ্যক সৈন্য তখনই সীমান্ত অতিক্রম করে ভেতরে ঢুকে পড়েছিলো। এটা স্পষ্টই চুক্তির লংঘন ছিলো। আমি নিজ কানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحُلَّنَّهُ وَلَا يَشُدَّنَّهُ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ أَجَلٌ لَهُ أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ

'কোনো সম্প্রদায়ের সাথে যার কোনো চুক্তি হয়েছে, সে তা খুলবেও না এবং বাঁধবেও না (অর্থাৎ যথাযথভাবে তা রক্ষা করবে)-যাবত না তার মেয়াদ শেষ হয় বা খোলাখুলি ঘোষণা করে দেয় যে, আমরা চুক্তি বাতিল করলাম।'[৩৬]

৩৬. তিরমিযী, হাদীস নং- ১৫০৬

হযরত মুআবিয়া রাযি. তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি নিজে এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন? হযরত আমর ইবনে আবাসা রাযি. বললেন, আমি নিজে শুনেছি। হযরত মুআবিয়া আর একটা কথাও বাড়ালেন না। তখনই সৈন্যদেরকে ফিরে আসার হুকুম দিলেন এবং বিজিত সব এলাকা বিজিতদের হাতে ফিরিয়ে দিলেন।

হযরত আলীর দিকে মন্দ দৃষ্টিতে তাকালে...

সিফ্ফীন যুদ্ধে লড়াই চলাকালে উভয় বাহিনীর সৈন্যরা পরস্পরের বিরুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এমন সময় হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর নিকট রোম সম্রাটের এই পয়গাম আসে যে, আমি শুনতে পেরেছি যে, আপনার ভাই হযরত আলি রাযি. আপনার সঙ্গে অনেক বাড়াবাড়ি করছেন। তিনি হযরত ওসমান রাযি.-এর হত্যাকারীদের থেকে কেসাস নিচ্ছেন না। এমতাবস্থায় আপনি চাইলে আমি আপনার সাহায্যে অনেক বড়ো সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দিবো, যাতে আপনি তাদের সাথে মোকাবেলা করতে পারেন। হযরত মুআবিয়া রাযি. সেই পয়গামের তাৎক্ষণিক যেই উত্তর দিয়ে ছিলেন, তা ছিলো এই-

হে খ্রিস্টান বাদশা! তুমি আমাদের বিরোধের সুযোগ নিয়ে হযরত আলীর বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে চাও! মনে রেখো! তুমি হযরত আলীর বিরুদ্ধে মন্দ দৃষ্টিতে তাকানোর দুঃসাহস করলে হযরত আলী রাযি.-এর বাহিনী থেকে অগ্রসরমান প্রথম ব্যক্তি যে তোমার গরদান উড়িয়ে দিবে, সে হবে মুআবিয়া![৩৭]

তাহাজ্জুদ পড়তে না পারার ঘটনা

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর একটি ঘটনা লিখেছেন। হযরত মুআবিয়া রাযি. প্রতিদিন তাহাজ্জুদের নামায পড়ার জন্যে উঠতেন। একদিন তাহাজ্জুদের সময় ঘুম ভাঙ্গলো না। সময় পার হয়ে গেলো। ইতিপূর্বে কখনো তাহাজ্জুদ ছোটেনি। এই প্রথমবার এমন ঘটনা ঘটলো। তাহাজ্জুদ ছুটে গেলো। ফলে তাঁর এ পরিমাণ অনুশোচনা ও মনোবেদনা হলো যে, সারাদিন কেঁদে কাটালেন। হে আল্লাহ! আজকে আমার তাহাজ্জুদের নামায ছুটে গেলো!

পরবর্তী রাতে তাহাজ্জুদের সময় এক বুযুর্গ তাশরীফ আনলেন। তাঁকে তাহাজ্জুদের নামাযের জন্যে জাগাতে আরম্ভ করলেন। উঠুন! তাহাজ্জুদ পড়ুন।

---

৩৭. তাজুল উরূস, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ২০৮

হযরত মুআবিয়া রাযি. অবিলম্বে উঠে গেলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? এখানে কীভাবে এলে?

সে উত্তর দিলো, আমি ইবলিস শয়তান।

হযরত মুআবিয়া রাযি. বললেন, তোমার কাজ তো মানুষকে গাফলতের মধ্যে লিপ্ত করা। নামাযের জন্যে উঠানোর সাথে তোমার কী সম্পর্ক?

শয়তান বললো, এ নিয়ে বিতর্ক করবেন না, যান, তাহাজ্জুদের নামায পড়ুন। নিজের কাজ করুন।

হযরত মুআবিয়া রাযি. বললেন, না, প্রথমে বলো, এর কারণ কী? আমাকে কেন উঠিয়েছো, তা না বলা পর্যন্ত তোমাকে ছাড়বো না। তিনি খুব বেশি পীড়াপীড়ি করলে শয়তান বললো, আসল কথা হলো, গত রাতে আমি আপনার উপর উদাসীনতা আরোপ করেছিলাম। যাতে করে আপনার তাহাজ্জুদের নামায ছুটে যায়। সুতরাং আপনার তাহাজ্জুদের নামায ছুটে গেলো। তাহাজ্জুদ ছুটে যাওয়ার কারণে আপনি সারাদিন অনেক বেশি পরিমাণে কাঁদলেন, যার ফলে আপনার মর্যাদা অনেক বেশি বৃদ্ধি পেলো। আপনি যদি তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন তাহলেও এ পরিমাণ মর্যাদা বৃদ্ধি পেতো না। ফলে আমারই ক্ষতি হয়েছে। এজন্যে আমি চিন্তা করলাম, আজকে আপনাকে জাগিয়ে দেই, যাতে অধিক মর্যাদা বৃদ্ধির পথ বন্ধ হয়ে যায়।

হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযি.-এর ঘটনাবলী

হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে সকল মহান সাহাবীর অন্যতম, যাঁদের মহত্ত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে সে যুগের সকল শ্রেষ্ঠ গুণ ও প্রশংসনীয় মর্যাদার সমন্বয় ঘটেছিলো। তিনি ছিলেন 'সাবিকীনে আওয়ালীনে'র অন্যতম। তিনি সে সময় ইসলাম গ্রহণ করেন, যখন মুসলমানদের সংখ্যা হাতেগোনা যেতো। তিনি সেই সৌভাগ্যবান দশ সাহাবীর অন্যতম, যাঁদেরকে 'আশারায়ে মুবাশশরা' (বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন) বলা হয়। যাঁদেরকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। তিনি সে সকল সাহাবীর মধ্যেও গণ্য, যাঁদের দুবার হিজরত করার সৌভাগ্য হয়েছে। প্রথমে তিনি হাবশায় হিজরত করেন, পরে মদীনায় হিজরত করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তিনি শুধু যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেননি, বরং সবসময় জান বাজি রেখে নবীপ্রেম, আনুগত্য ও অনুসরণের চিরস্থায়ী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন।

বদর যুদ্ধকালে তাঁর পিতা মক্কার কাফেরদের সঙ্গে মুসলমানদের বিপক্ষে লড়তে এসেছিলো। যুদ্ধ চলাকালে সে তার পুত্র (হযরত আবু উবাইদা)-কে তালাশ করছিলো শুধু তাই নয়, বরং যে কোনোভাবে তাঁর সামনাসামনি হওয়ারও চেষ্টা করছিলো। হযরত আবু উবাইদা রাযি. যদিও পিতার কুফুরীর কারণে অসন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্তু নিজহাতে তার উপর অসি চালানো পছন্দ করছিলেন না। তাই যখনই সে সম্মুখে এসে মোকাবেলা করতে চাইতো, তখনই তিনি তাকে এড়িয়ে যেতেন। কিন্তু পিতা তাঁর পিছু ছাড়লো না। ফলে তাঁকে মোকাবেলা করতেই হলো, আর তখন আল্লাহর সম্পর্ক তাঁর পথের প্রতিবন্ধক সকল সম্পর্ককে ছিন্ন করে দিলো। পিতা-পুত্রের তরবারী পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তোলিত হলো। ঈমান কুফরের উপর জয়ী হলো। পিতা পুত্রের হাতে নিহত হলো।[৩৮]

উহুদ যুদ্ধের সময় কাফেরদের অতর্কিত ও অকস্মাৎ আক্রমণে উভয় জগতের সরদার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিরস্ত্রাণের দু'টি

---

৩৮. আল ইসাবা, হাফেয ইবনে হাজারকৃত, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৪৪

টুকরা তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে বিদ্ধ হলে হযরত আবু উবাইদা রাযি. আপন দাঁত দিয়ে চেপে ধরে তা বের করেন। এমনকি এই টানাটানিতে তাঁর সামনের দু'টি দাঁত পড়ে যায়। দাঁত পড়ে যাওয়ার পর মুখশ্রী লোপ পাওয়ার কথা ছিলো, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনামতে তাঁর মুখশ্রী আরও বৃদ্ধি পেয়েছিলো। লোকেরা বলতো দন্তহীন কোনো লোককে হযরত আবু উবাইদা রাযি. থেকে অধিক সুশ্রী দেখা যায়নি।[৩৯]

এ উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তিত্ব

ইয়েমেনের অধিবাসীরা ইসলাম কবুল করে তাদের নিকট একজন শিক্ষক পাঠানোর জন্যে আবেদন করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযি.-এর উভয় হাত ধরে বললেন,

هٰذَا أَمِيْنُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ

'এ ব্যক্তি এই উম্মতের 'আমীন' তথা বিশ্বস্ত ও আমানতদার।'[৪০]

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাহু ওয়াসাল্লামের এ উক্তি সহীহ বোখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে,

لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِيْنٌ وَأَمِيْنُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَبُوْ عُبَيْدَةَ ابْنُ الْجَرَّاحِ

'প্রত্যেক উম্মতেরই একজন 'আমীন' (বিশ্বস্ত-আমানতদার) থাকে, এ উম্মতের 'আমীন' আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ।'

একদা হযরত আয়েশা রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর সাহাবীদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় কে ছিলেন? হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, ওমর। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো, তারপর কে? উত্তরে হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ।[৪১]

হযরত হাসান বসরী রহ. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বলেছিলেন,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا لَوْ شِئْتُ لَأَخَذْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ خُلُقِهٖ. إِلَّا أَبَا عُبَيْدَةَ.

'আমি চাইলে একমাত্র আবু উবাইদা ছাড়া তোমাদের প্রত্যেকের স্বভাবের কোনো না কোনো ত্রুটি ধরতে পারি।'[৪২]

---

৩৯. মুস্তাদরাকে হাকেম, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৬৬; তাবাকাতে ইবনে সা'দ, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৯৮
৪০. আল ইসাবা, হাফেয ইবনে হাজারকৃত, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৪৩
৪১. জামে' তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৬৫৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, ১০২
৪২. মুস্তাদরাকে হাকেম, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৬৬; আল ইসাবা, হাফেয ইবনে হাজারকৃত, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৪৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরলোকগমনের পর সাকীফায়ে বানী সা'য়েদাতে যখন সাহাবায়ে কেরামের সমাবেশ হয় এবং খেলাফত বিষয়ে আলোচনা চলতে থাকে, তখন হযরত সিদ্দীকে আকবর রাযি. খেলাফতের জন্যে দু'টি নাম পেশ করেন। এক. হযরত ওমর রাযি., দুই. আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাযি.। কিন্তু হযরত সিদ্দীকে আকবর রাযি. বর্তমান থাকাকালে অন্য কারো সম্পর্কে একমত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সকল মুসলমান তাঁর ব্যাপারেই ঐক্যমত পোষণ করেন। তবে এ স্থলে হযরত আবু বকর রাযি.-এর পক্ষ থেকে হযরত আবু উবাইদার নাম পেশ হওয়ায় সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে তাঁর উচ্চ মর্যাদার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সিরিয়ার সেনাপতি ও গভর্নর

হযরত সিদ্দীকে আকবার রাযি. তাঁর খেলাফতকালে সিরিয়ার রণক্ষেত্রের দায়িত্ব হযরত আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাযি.-এর হাতেই ন্যস্ত করেন। সুতরাং জর্দান ও সিরিয়ার সিংহভাগ অঞ্চল তাঁরই পবিত্র হাতে জয় হয়। মাঝখানে ইয়ারমুকের যুদ্ধ চলাকালে হযরত আবু বকর রাযি. হযরত খালেদ ইবনুল ওলীদ রাযি.-কে ইরাক থেকে সিরিয়ায় পাঠান, তখন হযরত খালেদ রাযি.-কে সিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রের আমীর নিযুক্ত করেন। কিন্তু হযরত ওমর রাযি. তাঁর খেলাফতকালের সূচনাতেই হযরত খালেদ রাযি.-কে সেনাপতির পদ হতে অব্যাহতি দিয়ে হযরত আবু উবাইদাকে আমীর নিযুক্ত করেন। তারপর সম্পূর্ণ সিরিয়া তাঁর নেতৃত্বেই জয় হয়। তখন হযরত খালেদ রাযি. তাঁর অধীনে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন।[৪৩] হযরত আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাযি. হযরত ওমর রাযি.-এর পক্ষ হতে সিরিয়ার গভর্নরের দায়িত্বও পালন করেন।

দুনিয়া তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি

উর্বরতা, জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে সিরিয়ার ভূখণ্ড আরবের মরুবাসীদের জন্যে ভূস্বর্গের চেয়ে কম ছিলো না। অপরদিকে সেখানে সে যুগের শ্রেষ্ঠতম সভ্যতা ও সংস্কৃতি তথা রোমান সভ্যতার প্রাধান্য ছিলো। কিন্তু উভয় জাহানের সরদার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের ফয়েযে যেই চির অম্লান রঙ সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের মনমগজে ধারণ করেছিলেন, তাতে তাঁরা এতো অধিক পরিপক্ক ছিলেন যে,

৪৩. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ডঃ ৭, পৃষ্ঠাঃ ৯৪

সিরিয়ার বিচিত্র রঙ ও বর্ণ অল্পতুষ্টি এবং পরকালের নিরবচ্ছিন্ন চিন্তায় অণু পরিমাণও প্রভাব ফেলতে পারেনি। এর বাস্তবতা হযরত আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাযি.-এর একটি ঘটনা থেকে ভাস্বর হয়ে ওঠে।

হযরত আবু উবাইদা রাযি. সিরিয়ার গভর্নর থাকাকালীন হযরত ওমর রাযি. সেখানে ভ্রমণে যান। একদিন হযরত ওমর রাযি. তাঁকে বললেন, 'আমাকে আপনার ঘরে নিয়ে চলুন।'[৪৪]

হযরত আবু উবাইদা রাযি. উত্তরে বললেন, 'আপনি আমার ঘরে গিয়ে কী করবেন? সেখানে গিয়ে হয়তো আমার দুরাবস্থা দেখে আপনার অশ্রু বিসর্জন করা ছাড়া কোনো লাভ হবে না।'

কিন্তু হযরত ওমর রাযি. পীড়াপীড়ি করায় তিনি তাঁকে ঘরে নিয়ে যান। হযরত ওমর রাযি. ঘরে প্রবেশ করে কোনো প্রকার আসবাপত্র দেখতে পেলেন না। ঘরটি সকল প্রকার আসবাবপত্র থেকে শূন্য ছিলো। হযরত ওমর রাযি. অভিভূত হয়ে বললেন, 'আপনার আসবাবপত্র কোথায়? এখানে তো শুধু অশ্বের একটি জিন, একটি বাটি এবং একটি মশক দেখছি। আপনি সিরিয়ার গভর্নর, আপনার নিকট আহার করার মতো কিছু আছে কি?

একথা শুনে হযরত আবু উবাইদা রাযি. একটি তাকের দিকে অগ্রসর হলেন এবং সেখান থেকে শুকনো রুটির কয়েকটি টুকরা তুলে আনলেন। হযরত ওমর রাযি. এ অবস্থা দেখে কেঁদে ফেললেন। তখন হযরত আবু উবাইদা রাযি. বললেন,

'আমিরুল মুমিনীন! আমি তো পূর্বেই আপনাকে বলেছিলাম যে, আপনি আমার অবস্থা দেখে অশ্রু বিসর্জন করবেন। আসল কথা এই যে, মানুষের জন্যে এতটুকু আসবাবই যথেষ্ট, যা তাকে তার শয়নক্ষেত্র (কবর) পর্যন্ত পৌছিয়ে দিবে।

হযরত ওমর রাযি. বললেন, আবু উবাইদা! দুনিয়া আমাদের সবাইকে পাল্টে দিয়েছে, কিন্তু তোমাকে পাল্টাতে পারেনি।[৪৫]

---

৪৪. হযরত ওমর রাযি. সব সময় চিন্তা করতেন যে, তার গভর্নর বহির্দেশীয় সভ্যতায় প্রভাবিত হয়ে আবার বেশি ভোগ-বিলাসিতায় লিপ্ত না হয়। তাই হযরত আবূ উবাইদা রাযি.-এর ঘর দেখতে চাওয়ার পিছনে হয়তো এ চিন্তাই কার্যকর ছিলো।

৪৫. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবীকৃত, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৭; ইবনে আ'রাবীর বর্ণনা এবং সুনানে আবু দাউদের উদ্ধৃতিতে। এ ঘটনার সারসংক্ষেপ ইমাম আবু নু'আইম রহ. হিলইয়াতুল আউলিয়া, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১০১-১০২; মুসান্নাফে আব্দুর রায়যাক, হাদীস নং-২০৬২৮ এবং ইমাম আহমাদ রহ.-এর কিতাবুয যুহদ, পৃষ্ঠা: ১৮৪-তেও বর্ণিত আছে।

আল্লাহু আকবার! এই সেই আবু উবাইদা, যাঁর নামে রোম সম্রাট কায়সারের দোর্দণ্ড শক্তি প্রকম্পিত ছিলো। যাঁর হাতে রোমের বিশাল বিশাল কেল্লা জয় হচ্ছিলো। যাঁর পদতলে প্রত্যহ রোমান ধনসম্পদের ভাণ্ডারসমূহ স্তুপীকৃত হচ্ছিলো। তিনিই রুটির শুকনা টুকরা খেয়ে জীবন যাপন করছিলেন। দুনিয়ার স্বরূপ সঠিকভাবে অনুধাবন করে কেউ একে তুচ্ছ ও লাঞ্ছিত করে থাকলে, তা একমাত্র সরকারে দোআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণ উৎসর্গকারী এ সকল সাহাবীই করেছিলেন।

شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی

'দুনিয়াদারদের প্রতাপের কোনো গুরুত্বই
তাঁদের চোখে ছিলো না।'

হযরত আবু উবাইদা রাযি. সে সকল সৌভাগ্যবানের অন্যতম ছিলেন, যাঁরা চির সত্যবাদী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবানে জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া কোনো সংবাদে সামান্যতম সংশয় পোষণ করার প্রশ্নও তাঁদের মাঝে ছিলো না। এতদসত্ত্বেও তাঁর খোদাভীতি এমন প্রবল ছিলো যে, কখনো কখনো তিনি বলতেন,

وَدِدْتُ أَنِّيْ كُنْتُ كَبْشًا. فَيَذْبَحُنِيْ أَهْلِيْ. فَيَأْكُلُوْنَ لَحْمِيْ. وَيَحْسُوْنَ مَرَقِيْ.

'আহা! আমি যদি একটি ভেড়া হতাম, আমার মনিব আমাকে জবাই করে আমার গোশত ভক্ষণ করতো, আর আমার গোশতের ঝোল পান করতো।'[৪৬]

তাহলে আমি আবু উবাইদাহকে খলীফা মনোনীত করব

হযরত ওমর রাযি. তাঁকে এতো অধিক মূল্যায়ন করতেন যে, একবার তাঁর পরবর্তী খলীফা নিয়োগের প্রশ্ন উঠলে তিনি বলেন, আবু উবাইদার জীবদ্দশায় আমার অন্তিম মুহূর্ত এসে গেলে কারো সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজনও আমার হবে না, আমি তাঁকে আমার পরবর্তী খলীফা বানানোর জন্যে মনোনীত করে যাবো। তাঁকে মনোনীত করার ব্যাপারে আল্লাহ পাক আমাকে প্রশ্ন করলে আমি নিবেদন করতে পারবো যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, 'প্রত্যেক উম্মতের

---

৪৬. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবীকৃত, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৮, তাবাকাতে ইবনে সা'দ, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩০০

একজন 'আমীন' (অতি বিশ্বস্ত আমানতদার) থাকে, আর এ উম্মতের আমীন আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ।'[৪৭]

শাহাদাতবরণ

জর্দান ও সিরিয়ার সেই ঐতিহাসিক প্লেগ (মহামারী) বিস্তার লাভ করলে যাতে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলো, হযরত ওমর রাযি. হযরত আবু উবাইদা রাযি.-এর নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন, যার বক্তব্য ছিলো এই–

سَلَامٌ عَلَيْكَ. أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَتْ لِيْ إِلَيْكَ حَاجَةٌ. أُرِيْدُ أَنْ أُشَافِهَكَ بِهَا نَعْزَمْتُ عَلَيْكَ إِذَا نَظَرْتَ فِيْ كِتَابِيْ هٰذَا أَنْ لَا تَضَعَهُ مِنْ يَدِكَ حَتّٰى تُقْبِلَ إِلَيَّ.

'সালাম বাদ, আমার একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে, সে ব্যাপারে আপনার সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করতে চাই। তাই আমি অতীব তাগিদ সহকারে আপনাকে বলছি, আমার এ চিঠি পড়ে শেষ করে তা হাত থেকে রাখার পূর্বেই আপনি আমার নিকট রওনা করবেন।'

হযরত আবু উবাইদা রাযি. আজীবন আমীরের অনুগত থাকেন। কিন্তু এ পত্র দেখামাত্র তিনি অনুধাবন করেন যে, হযরত ওমর রাযি.-এর সেই ভীষণ প্রয়োজন (যে জন্যে আমাকে পবিত্র মদীনায় আহ্বান করেছেন) শুধু এই যে, তিনি আমাকে প্লেগাক্রান্ত এ অঞ্চল থেকে বের করে নিয়ে যেতে চান। সুতরাং তিনি পত্র পাঠ করে সঙ্গীদেরকে বলেন,

عَرَفْتُ حَاجَةَ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يَسْتَبْقِيَ مَنْ لَيْسَ بِبَاقٍ.

'আমি আমীরুল মুমিনীনের প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পেরেছি। তিনি এমন এক ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে রাখতে চান, মূলত যে বাঁচবার নয়।'

একথা বলে তিনি হযরত ওমর রাযি.-এর পত্রের এই উত্তর লিখে পাঠান–

يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنِّيْ قَدْ عَرَفْتُ حَاجَتَكَ إِلَيَّ. وَإِنِّيْ فِيْ جُنْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لَا أَجِدُ بِنَفْسِيْ رَغْبَةً عَنْهُمْ. فَلَسْتُ أُرِيْدُ فِرَاقَهُمْ حَتّٰى يَقْضِيَ اللهُ فِيَّ وَفِيْهِمْ أَمْرَهُ وَقَضَاءَهُ فَخَلِّنِيْ مِنْ عَزِيْمَتِكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ. وَدَعْنِيْ فِيْ جُنْدِيْ.

৪৭. মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৮, মুস্তাদরাকে হাকেম, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৬৮

'আমীরুল মুমিনীন! যে প্রয়োজনে আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, সে বিষয়ে আমি অবগত আছি। কিন্তু আমি মুসলমানদের এমন এক সেনাদলের মধ্যে অবস্থান করছি, যাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোনো আগ্রহ আমি আমার অন্তরে পাই না। তাই আমি তাঁদেরকে ত্যাগ করে ততক্ষণ পর্যন্ত আসতে চাই না, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা আমার এবং তাঁদের বিষয়ে স্বীয় তাকদীরের চূড়ান্ত ফয়সালা করেন। হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি আমাকে আপনার এই তাগিদপূর্ণ নির্দেশ থেকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে আমার সেনাবাহিনীর মধ্যেই অবস্থান করতে দিন।'

হযরত ওমর রাযি. পত্র পাঠ করলেন। তাঁর চক্ষু অশ্রুতে ভরে উঠলো। পাশে উপবেশনকারী লোকেরা জানতো যে, পত্রটি সিরিয়া থেকে এসেছে। হযরত ওমর রাযি.-কে অশ্রুসিক্ত দেখে তারা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আবু উবাইদা রাযি. কি ইন্তিকাল করেছেন?' হযরত ওমর রাযি. বললেন, 'ইন্তিকাল তো করেননি ঠিক তবে মনে হচ্ছে যেন তিনি ইন্তিকাল করবেন।' তারপর হযরত ওমর রাযি. দ্বিতীয় পত্র লিখলেন,

سَلَامٌ عَلَيْكَ. أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّكَ أَنْزَلْتَ النَّاسَ أَرْضًا عَمِيقَةً فَارْفَعْهُمْ إِلَى أَرْضٍ مُرْتَفِعَةٍ نَزِهَةٍ.

'সালাম বাদ! আপনি লোকদেরকে নিচু ভূমিতে অবস্থান করাচ্ছেন। এখন তাদেরকে নির্মল বায়ুসম্পন্ন কোনো উঁচু স্থানে স্থানান্তর করুন।'

হযরত আবু মূসা আশআরী রাযী. বলেন, পত্রটি হযরত আবু উবাইদার নিকট পৌছলে তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে এ পত্র এসেছে। এখন আপনি এমন কোনো উপযুক্ত স্থান সন্ধান করুন, যেখানে সেনাদলকে অবস্থান করানো যেতে পারে। আমি সেই জায়গার সন্ধানে বের হওয়ার জন্যে প্রথমে আমার ঘরে যাই। গিয়ে দেখি আমার স্ত্রী প্লেগে আক্রান্ত হয়েছে। ফিরে এসে হযরত আবু উবাইদা রাযি.-কে বিষয়টি জানালে তিনি নিজেই সেই জায়গার খোঁজে বের হতে ইচ্ছা করেন। উটের পিঠে হাওদা বসালেন। তিনি হাওদার পা দানিতে মাত্র পা রেখেছেন এমতাবস্থায় তাকেও প্লেগ আক্রমণ করে বসে এবং সেই প্লেগ রোগেই তাঁর মৃত্যু হয়।[৪৮] আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকেও সন্তুষ্ট করুন।

---

৪৮. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৭৮, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবীকৃত, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৮-১৯, মুস্তাদরাকে হাকেম, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৬৩

হযরত আবু উবাইদা রা.-এর অন্তর্দৃষ্টির ঈমানদীপ্ত ঘটনা

হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযি. আশারায়ে মুবাশশারার অন্যতম উঁচু স্তরের সাহাবী এবং শাম বিজয়ী ছিলেন। শামের বিরাট অঞ্চলের বিজয়মুকুট আল্লাহ তা'আলা তাঁর মস্তকে স্থাপন করেন। পরবর্তীতে তিনি শামের গভর্ণর হন। আমি আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী ছাহেব রহ. থেকে এ ঘটনাটি শুনেছিলাম। এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। হযরত ওমর ফারূক রাযি.-এর পবিত্র যুগে একবার তিনি অমুসলিমদের দুর্গ অবরোধ করেন। অবরোধ কাল দীর্ঘ হতে থাকে। দুর্গ জয় হচ্ছিলো না। অবশেষে যখন দুর্গের লোকেরা দেখলো মুসলিমরা খুব দৃঢ়তার সাথে অবরোধ করে আছে, তখন তারা একটা ষড়যন্ত্র করলো। তারা বললো, আমরা আপনাদের জন্যে দুর্গের দরজা খুলে দিচ্ছি আপনারা আপনাদের সৈন্য সহ শহরে প্রবেশ করুন। তাদের ষড়যন্ত্র এই ছিলো যে, শহরের ফটক যেদিকে খুলতো সেদিকে দীর্ঘ বাজার ছিলো, যার উভয়দিকে ছিলো দোকান। সেই বাজারটি শাহী মহলে গিয়ে শেষ হতো। তারা বাজারের উভয় দিকের প্রত্যেক দোকানে নারীদেরকে সাজিয়ে বসিয়ে দেয়। নারীদেরকে গুরুত্বের সাথে বলে দেয় যে, মুজাহিদরা প্রবেশ করার পর তোমাদেরকে উত্যক্ত করতে চাইলে এবং তোমাদের সাথে কোনো কিছু করতে চাইলে, তোমরা অস্বীকার করবে না, বাধা দিবে না। তারা চিন্তা করেছিলো, এরা আরবভূমি থেকে এসেছে। কয়েক মাস ধরে বাড়ি থেকে দূরে অবস্থান করছে। ভিতরে প্রবেশ করার পর আকস্মিকভাবে যখন তারা সুন্দর ও সজ্জিত নারীদেরকে দেখতে পাবে তারা সেদিকে আকৃষ্ট হবে। যখন তারা এদের নিয়ে ব্যস্ত হবে তখন আমরা পিছন দিক থেকে তাদের উপর আক্রমণ করবো।

পরিকল্পনা তৈরি করে দুর্গের তত্ত্বাবধায়ক হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযি.-এর নিকট এই পয়গাম পাঠায় যে, আমরা পরাজয় স্বীকার করছি এবং আপনাদের জন্যে আমরা দুর্গের ফটক খুলে দিচ্ছি। আপনারা আপনাদের সৈন্য নিয়ে দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন। আল্লাহ তা'আলা যখন ঈমান দান করেন তখন ঈমানী ফেরাসাত তথা অন্তর্দৃষ্টিও দান করেন। হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللهِ

'তোমরা মুমিনের অন্তর্দৃষ্টি সম্পর্কে সতর্ক থাকো, কারণ তারা আল্লাহ তা'আলার নূর দিয়ে দেখে থাকে।'[৪৯]

---

৪৯. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং- ৩০৫২

এই সংবাদ পেয়ে হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযি.-এর মাথায় খটকা লাগলো। তিনি চিন্তা করলেন, এতদিন পর্যন্ত এরা মোকাবেলা করার জন্যে প্রস্তুত ছিলো, দরজা খুলছিলো না, হঠাৎ এখন কি হলো যে, তারা দরজা খুলে দেওয়ার প্রস্তাব করছে। সৈন্যদেরকে প্রবেশ করার অনুমতি দিচ্ছে। অবশ্যই এর মধ্যে কোনো ষড়যন্ত্র আছে।

তিনি পুরো সেনাবাহিনীকে একত্রিত করলেন। তাদের সামনে খুৎবা দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ তা'আলার শোকর দুশমন অস্ত্র সমর্পণ করেছে। তারা আমাদেরকে ভিতরে প্রবেশ করার দাওয়াত দিচ্ছে। আপনারা অবশ্যই ভিতরে প্রবেশ করবেন। তবে আমি আপনাদের সামনে কুরআনুল কারীমের একটি আয়াত পাঠ করছি, আপনারা এই আয়াত পাঠ করতে করতে এবং এর উপর আমল করতে করতে প্রবেশ করবেন। তখন তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ

'মুমিনদেরকে বলে দিন! তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।'[৫০]

সুতরাং সেনাবাহিনী নত চোখে দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করে, এ অবস্থাতেই পুরো বাজার পার হয়ে শাহী মহল পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কেউ ডান-বামে চোখ তুলে তাকিয়েও দেখে না যে, কি ফেৎনা এই দোকানগুলোতে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে?

শহরের অধিবাসীরা এ দৃশ্য দেখে পরস্পরে বলতে লাগলো, এরা কেমনতর মানুষ! কোনো সৈন্য যখন বিজয়ী বেশে শহরে প্রবেশ করে, তখন বুক টান করে প্রবেশ করে, স্বাধীন ভাব নিয়ে প্রবেশ করে, লুট করে, সতিত্ব হরণ করে, কিন্তু এই বিরল-বিস্ময়কর সৈন্য বাহিনী এমনভাবে প্রবেশ করলো! তাদের সেনাপতি বলেছিলো দৃষ্টি নত রাখবে, তাদের সকলের দৃষ্টি নত ছিলো। এমতাবস্থায় পুরো সেনাবাহিনী বাজার পার হয়ে গেলো, শহরের অসংখ্য মানুষ শুধু এই দৃশ্য দেখে মুসলিম হয়ে গেলো।

৫০. সূরা নূর, আয়াত : ৩০

হযরত উম্মে হাবীবা রাযি.-এর ঘটনাবলী

হযরত উম্মে হাবীবা রাযি.-এর আসল নাম ছিলো 'রমলা'। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের (পবিত্রা স্ত্রীগণের) অন্যতম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাঁর বিবাহের ঘটনাটি বড়ো বিচিত্র। তিনি হযরত আবু সুফিয়ান রাযি.-এর কন্যা ছিলেন। হযরত আবু সুফিয়ান রাযি. মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হন। ইতোপূর্বে তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রু ছিলেন। বদর যুদ্ধে আবু জাহ্ল ও অন্যরা মারা গেলে মক্কার কাফেরদের নেতৃত্ব তাঁর হাতেই আসে। সে কারণে তিনি ওহুদ, খন্দক ও অন্যান্য যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড়ো প্রতিপক্ষ ছিলেন।

হযরত উম্মে হাবীবা রাযি. ছিলেন সেই আবু সুফিয়ানেরই কন্যা। আবু সুফিয়ান উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিয়েছিলেন। আবু সুফিয়ানের গৃহে রাতদিন মুসলমানদের বিরোধিতার চর্চা চলতো। এটি ইসলামের নির্মল সত্যতার আকর্ষণ ছিলো যে, এরূপ শত্রুগৃহে আবু সুফিয়ানের এই মেয়ে ও জামাই উভয়ে মুসলমান হয়ে যান। সে সময় ইসলাম কবুল করা অসংখ্য বিপদাপদকে ডেকে আনারই নামান্তর ছিলো। বিশেষ করে যেই পরিবারে দিন-রাত মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা পরিকল্পনা করা হতো, তার সদস্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করা আরও অধিক মারাত্মক অপরাধ ছিলো।

সুতরাং হযরত উম্মে হাবীবা রাযি. এবং তাঁর স্বামী উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশ উভয়ে পবিত্র মক্কা থেকে হিজরত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তখন বহু সংখ্যক মুসলমান হিজরত করে ইথিওপিয়া চলে গিয়েছিলেন। হযরত উম্মে হাবীবা রাযি. ও তাঁর স্বামীও ইথিওপিয়া গিয়ে বসবাস শুরু করেন। সেখানেই তাঁদের মেয়ে হাবীবা জন্মগ্রহণ করেন। সে কারণেই তাঁকে 'উম্মে হাবীবা' বলা হয়।

এক রাতে হযরত উম্মে হাবীবা রাযি. স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর স্বামী উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশের মুখমণ্ডল বিশ্রীভাবে বিকৃত হয়ে গেছে। তিনি ভীত হয়ে জেগে ওঠেন এবং মনে মনে ভাবতে থাকেন, সম্ভবত উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশের অবস্থার খারাপ কোনো পরিবর্তন আসবে। স্বামীর সঙ্গে দেখা হলে স্বামী তাঁকে বললো, 'আমি সকল ধর্ম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, খ্রিস্টধর্ম থেকে উৎকৃষ্ট কোনো ধর্ম নেই, তাই

আমি খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছি।' ভেবে দেখুন, একথা শুনে হযরত উম্মে হাবীবা রাযি. কেমন আঘাত পেয়েছেন! তিনি তাড়াতাড়ি উবাইদুল্লাহকে নিজের স্বপ্নের কথা শুনিয়ে ধর্মান্তর থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন, কিন্তু তার ভাগ্যে হিদায়াত ছিলো না। স্বপ্নের বিষয়টিকে সে গুরুত্ব না দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলো এবং মদপানে লিপ্ত হলো। এই ধর্মান্তরিত অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়।

এ সময়ে হযরত উম্মে হাবীবা রাযি.-এর অসহায়ত্বের কথা অনুমান করাও কঠিন। তিনি ইসলামের খাতিরে মা, বাপ, ভাই, বোন এবং পুরো পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। এমনকি মাতৃভূমিকেও ত্যাগ করেছিলেন। সবশেষে একমাত্র স্বামীই এই ভিনদেশে হিতাকাঙ্ক্ষী ও সহানুভূতিশীল হতে পারতো। কিন্তু সেও মুরতাদ হয়ে গেলো এবং কয়েক দিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করলো। এখন তিনি এই প্রবাস জীবনে সম্পূর্ণ একা হয়ে গেলেন।

এই অসহায় অবস্থায় এক রাতে ঘুমের ঘোরে তিনি স্বপ্নে দেখেন, একজন আহ্বানকারী তাঁকে 'উম্মুল মুমিনীন' বলে আহ্বান করছে। এ স্বপ্নের তিনি এই ব্যাখ্যা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিবাহ করবেন।

এ স্বপ্ন দেখার কয়েকদিন পরেই তাঁর গৃহদ্বারের কড়া বেজে উঠলো। দরজা খুলে দেখেন আবিসিনিয়ার নরপতি নাজ্জাশীর একজন দাসী (নাম আবরাহা) বাদশাহর পাঠানো পয়গাম নিয়ে এসেছে। দাসী বললো, আমাকে বাদশাহ পাঠিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, 'আমার নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র এসেছে। তিনি আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, আমি যেন আপনার সঙ্গে তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা করি। তাই আপনি কাউকে আপনার বিবাহের উকিল বানিয়ে দিন, যেন সে আপনার পক্ষ থেকে বিবাহের কার্যাদি সম্পন্ন করতে পারে।'

হযরত উম্মে হাবীবা রাযি. একথা শুনে অত্যন্ত পুলকিত হন। সেই আনন্দে তিনি তাঁর পরিহিত সব অলঙ্কার খুলে ঐ দাসীকে দিয়ে দেন। হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস রাযি.-এর কাছে সংবাদ পাঠিয়ে তাঁকে নিজের পক্ষ থেকে উকিল নির্ধারণ করেন। নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালিব ও অন্যান্য মুসলানকে একত্রিত করেন। উপস্থিত সমাবেশে তিনি বিবাহের খুৎবা পাঠ করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে হযরত উম্মে হাবীবা রাযি.-এর ৪০০ স্বর্ণমুদ্রা মোহর নির্ধারণ করে তখনই তা নিজের পক্ষ হতে হযরত খালেদ ইবনে সাঈদের হাতে অর্পণ করেন। হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ রাযি. উকিল হয়ে এ বিবাহ কবুল করেন। বিবাহ শেষে

সব লোক চলে যেতে আরম্ভ করলে নাজ্জাশী বললেন, আপনারা সকলেই একটু অপেক্ষা করুন। নবীদের সুন্নাত হলো বিবাহের পর তাঁরা ওলীমা করে থাকেন। সুতরাং খানা আনা হলো। খাবার শেষে সকলে বিদায় হলেন।

হযরত উম্মে হাবীবা রাযি. বলেন, আমাকে মোহর স্বরূপ যেই ৪০০ স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হয়, তার মধ্য থেকে ১০০ স্বর্ণমুদ্রা আবরাহাকে অতিরিক্ত পুরস্কার হিসাবে দিতে চাই। কিন্তু সেই দাসী বললো, বাদশাহ আমাকে আপনার থেকে কোনো কিছু নিতে নিষেধ করেছেন এবং আপনি যেসব অলঙ্কার আমাকে দিয়েছেন সেগুলোও ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে তাগিদ করেছেন। এর পরিবর্তে তিনি নিজে আমাকে অনেক কিছু দিয়েছেন।

নাজ্জাশী রাযি. পরে হযরত উম্মে হাবীবা রাযি.-এর খেদমতে অনেক উপঢৌকন পাঠান। তার মধ্যে বাদশাহর বিশেষ সুগন্ধিও ছিলো। বাদশাহ অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে তাঁকে পবিত্র মদীনায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। হযরত উম্মে হাবীবা রাযি. যখন পবিত্র মদীনায় যাত্রা করেন, তখন দাসী আবরাহা তার নিকট এসে বলে, আমিও মুসলমান হয়েছি। আমার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম জানাবেন। হযরত উম্মে হাবীবা রাযি. সালাম পৌছানোর ওয়াদা করেন এবং বিদায় হন। পবিত্র মদীনায় পৌছে তিনি ওয়াদা মোতাবেক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবরাহার সালাম পৌছান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণ ঘটনা শুনে মুচকি হাসেন এবং আবরাহার জন্যে দু'আ করেন।[৫১]

এ ঘটনার পর হযরত উম্মে হাবীবা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রী এবং উম্মুল মুমিনীনের মর্যাদা লাভ করেন। অপরদিকে তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান পূর্ববৎ মুসলমানদের সবচেয়ে বড়ো প্রতিপক্ষ ছিলেন।[৫২] হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যুদ্ধ বন্ধের যেই চুক্তি হয়েছিলো, মক্কার কাফেররাই তার বিরুদ্ধাচরণ করে চুক্তি ভঙ্গ করে। ফলে সন্ধি শেষ হয়ে যায়। আবু সুফিয়ান ধারণা করেন যে, এখন যে কোনো মুহূর্তে

---

৫১. ঘটনার এ বিবরণ ইমাম ইবনে সা'দ রহ. ওয়াকেদীর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন। [ত বাকাতে ইবনে সা'দ, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৯৭-৯৮] তবে এতোটুকু বিষয় সুনানে আবু দাউদ ইত্যাদিতেও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উম্মে হাবীবার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ হাবশায় নাজ্জাশীর মাধ্যমে হয়। চার শ' দীনার মহর নির্ধারিত হয়। উম্মাহাতুল মু'মিনীনের মধ্যে সর্বাধিক মহর তাঁরই ছিলো।

৫২. তিনি জানতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মেয়েকে বিবাহ করেছেন। তখন তিনি চরম শত্রু হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যেই মন্তব্য করেন তা এই ছিলো যে, 'মুহাম্মাদ এমন ব্যক্তিগণের অন্যতম, যাঁদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা যায় না।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার উপর আক্রমণ করতে পারেন। তাই তিনি যুদ্ধ বন্ধের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পবিত্র মদীনায় হাজির হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

তখন তিনি নিজের মেয়ে [হযরত উম্মে হাবীবা রাযি.]-এর নিকট গিয়ে তাঁর দ্বারা সুপারিশ করানোর কথা চিন্তা করেন। দুনিয়ার সাধারণ নিয়মানুযায়ী তার এ প্রত্যাশ্যা অহেতুকও ছিলো না যে, মেয়ে তাঁর স্বামী (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট অবশ্যই সুপারিশ করবেন। সুতরাং আবু সুফিয়ান হযরত উম্মে হাবীবা রাযি.-এর নিকট যান। প্রাথমিক সাক্ষাতের পর তিনি বিছানায় বসতে গেলে হযরত উম্মে হাবীবা রাযি. দ্রুত অগ্রসর হয়ে বিছানা উঠিয়ে ফেলেন। আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করেন, 'এই বিছানা আমার উপযুক্ত নয়, না আমি এই বিছানার উপযুক্ত নই?' হযরত উম্মে হাবীবা রাযি. উত্তর দেন, 'এটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা, আর আপনি এখনও পর্যন্ত কুফুর ও শিরকের অপবিত্রতায় লিপ্ত।'

আবু সুফিয়ান মেয়ের এ উত্তর শুনে বিচলিত হন এবং বলেন, আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তোমার মধ্যে কতো পরিবর্তন এসেছে!

ইনিই হলেন হযরত উম্মে হাবীবা রাযি.! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর তিনি ৩০/৪০ বছর বেঁচেছিলেন। হযরত মুআবিয়া রাযি. ছিলেন তাঁর ভ্রাতা। এ জন্যেই তাঁর উপাধি 'খালুল মুমিনীন' (মুসলমানদের মামা) প্রসিদ্ধ হয়। তিনি খলীফা হলে হযরত উম্মে হাবীবা রাযি. তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্যে দামেশক আগমন করেন। হযরত মুআবিয়া রাযি. তাঁর নিকট থেকে ফিক্হের অনেকগুলো মাসআলা শিক্ষা করেন এবং অনেক হাদীস তাঁর থেকে বর্ণনা করেন। এতটুকু তো ইতিহাসে প্রমাণিত আছে। পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে কারো কারো ধারণা এই যে, হযরত উম্মে হাবীবা রাযি. দামেশকেই অবস্থান করেন, এখানেই তাঁর মৃত্যু হয় এবং 'আল বাবুস সগীর' কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। হাফেয ইবনে আসাকের রহ. আল বাবুস সগীরের কবরসমূহের মধ্যে তাঁর কবরের কথাও উল্লেখ করেছেন।[৫৩] কিন্তু হাফেয যাহাবী রহ. কঠোরভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন যে, তাঁর কবর দামেশকে নয়; বরং মদীনা মুনাওয়ারায়।[৫৪] মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

---

৫৩. তাহযীবে তারীখে ইবনে আসাকের, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৬৪

৫৪. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবীকৃত, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২২০

হযরত ফাতেমা যাহরা রাযি.-এর ঘটনা

হযরত ফাতেমা রাযি. জান্নাতের সমস্ত নারীর সরদার। বিবাহের পর যখন হযরত আলী রাযি.-এর বাড়িতে এলেন, তখন তাঁরা স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করে নিলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন হযরত আলী রাযি. বাইরের কাজ সামলাবেন আর হযরত ফাতেমা রাযি. ঘরের কাজ করবেন। সেমতে তিনি ঘরের কাজকর্ম করতেন। আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে সবকিছু আনজাম দিতেন। স্বামীর সেবা-যত্নও করতেন। এতে খুব পরিশ্রম হতো। আজকালের মতো তো নয় যে, সুইচ অন করে দিলো আর খাবার তৈরি হয়ে গেলো। বরং রুটি বানাতে হলে প্রথমে চাক্কি (যাতাকল) দ্বারা আটা পিষতে হতো। চুলা জ্বালানোর জন্যে কাঠ আনতে হতো। সবকিছুই প্রাচীন দিনের শ্রমসাধ্য ব্যাপার। সুতরাং তাঁর কাজের এক দীর্ঘ তালিকা ছিলো। কিন্তু তিনি তা করতেন। আগ্রহের সাথেই করতেন। এতে অনেক কষ্ট হতো।

খায়বার যুদ্ধে প্রচুর গনীমতের মাল এলো। যার মধ্যে অনেক গোলাম-বাঁদীও ছিলো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বণ্টন করছিলেন, তখন কেউ এসে হযরত ফাতেমা রাযি.-কে বললো, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি দাসী চান। তাতে আপনার কষ্ট কিছুটা লাঘব হবে। সুতরাং তিনি 'উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরে এসে হাজির হলেন এবং তাকে অনুরোধ করলেন, যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন যে, চাক্কি পিষতে পিষতে আমার হাতে কড়া পড়ে গেছে এবং পানির মশক বইতে বইতে কাঁধে নীল দাগ পড়ে গেছে। গনীমতের মাল বণ্টন হচ্ছে। তাতে বহু গোলাম-বাঁদীও আছে। আমাকে যদি একটি গোলাম বা বাঁদী দেওয়া হয়, তাহলে আমি এই কষ্ট থেকে কিছুটা মুক্তি পাই। এই বলে তিনি নিজ বাড়িতে চলে এলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে এলে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার মেয়ে ফাতেমা এসেছিলো এবং এই এই বলছেন। কোনও বাপ যখন তার আদরের দুলালী

সম্পর্কে শোনে, চাক্কি পিষতে পিষতে হাতে কড়া পড়ে গেছে আর মশক বইতে বইতে কাঁধ নীল হয়ে গেছে, তখন কল্পনা করুন তার অন্তরে আবেগের কি তোলপাড় শুরু হয়ে যায়!

তিনি হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে ডাকালেন। বললেন, ফাতেমা! তুমি দাস বা দাসীর জন্যে অনুরোধ করেছো। কিন্তু যতক্ষণ মদীনার প্রত্যেকের ভাগে একটি দাস বা দাসী না পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত তো মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতেমাকে কোনো দাস-দাসী দিতে পারি না! তবে হ্যাঁ, আমি তোমাকে একটা ব্যবস্থা দিচ্ছি, যা তোমার পক্ষে দাস-দাসী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হবে। রাতে যখন তুমি বিছানায় যাবে, তখন তেত্রিশ বার سُبْحَانَ اللهِ তেত্রিশবার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এবং চৌত্রিশবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ পড়ে নেবে। এটা তোমার জন্যে দাস-দাসী অপেক্ষা উত্তম হবে। মেয়েও তো ছিলেন দোজাহানের সর্দার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে। তিনি পাল্টা কিছু বললেন না। বরং এ শিক্ষাতেই তিনি খুশি হয়ে গেলেন এবং শান্ত মনে বাড়ি ফিরে গেলেন। এ কারণেই একে 'তাসবীহে ফাতেমী' বলা হয়।[৫৫]

---

৫৫. জামে'উল উসূল, খণ্ড: ৬, ১০৫

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি.-এর ঘটনাবলী

অপূর্ব ক্রয়-বিক্রয়

হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন আনসারী সাহাবী এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ প্রিয়পাত্র। হাদীসের কিতাবসমূহে তাঁর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, বনুল মুস্তালিকের যুদ্ধ শেষে তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফিরে আসছিলেন। তাঁর উটটি ছিলো অত্যন্ত ধীরগতি। তিনি দ্রুত হাঁকানোর চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু সেটি চলছিলো না। কাফেলার সকলে সামনে চলে যেত আর তিনি পিছনে পড়তেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন, তিনি বারবার পিছনে পড়ে যাচ্ছেন, তখন তিনি তাঁর কাছে চলে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কাফেলার সাথে কেন চলছো না? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উটটি ভালো চলছে না। আমি একে দ্রুত চালানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু এটি পিছনে পড়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকটবর্তী ঝোঁপ থেকে একটা লাঠি ভেঙ্গে নিলেন এবং তা দিয়ে উটটিকে মৃদু আঘাত করলেন। তিনি আঘাত করা মাত্র তাতে বিদ্যুৎ খেলে গেলো। সেটি দ্রুত ছুটতে শুরু করলো এমনকি গোটা কাফেলাকে পিছনে ফেলে দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফের তাঁর কাছে পৌছলেন। বললেন, এবার তো তোমার উট খুব দৌড়াচ্ছে। হযরত জাবের রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার বরকতে এটা দ্রুতগামী হয়ে গেছে। এখন কাফেলার সকলের আগে ছুটছে।

তিনি বললেন, এটি তো খুবই ভালো উট। আমার কাছে বিক্রি করবে কি? হযরত জাবের রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিক্রির কি প্রয়োজন; আপনার পছন্দ হলে এটি আমি আপনাকে হাদিয়া দিলাম। আপনি কবুল করুন। তিনি বললেন, হাদিয়া নয়; বরং দাম দিয়েই নেবো। বিক্রি করতে চাইলে বলো। হযরত জাবের রাযি. বললেন, অগত্যা যদি কিনতেই চান, আপনার যা ইচ্ছা একটা দাম দিয়ে দিন। বললেন, না, তুমিই বলো, কি দাম

হলে বিক্রি করবে? হযরত জাবের রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক উকিয়া রূপা (প্রায় চল্লিশ দিরহাম) হলে বিক্রি করবো। তিনি বললেন, তুমি খুব বেশি দাম চাইলে। এ দামে তো আরও অনেক বড়ো উট কেনা যায়। জাবের রাযি. বললেন, আপনার যা ইচ্ছা দিন। তিনি বললেন, আচ্ছা এক উকিয়া রূপার বিনিময়েই কিনলাম; মদীনায় পৌছে দাম পরিশোধ করবো।

হযরত জাবের রাযি. উট থেকে নেমে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নামলে কেন? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, উটটি তো আপনি কিনে নিয়েছেন। এখন এটা আপনার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে কি তুমি পায়ে হেঁটে মদীনায় ফিরবে? তার চে' বরং তুমি উটে চড়েই মদীনায় চলো। সেখানে পৌছে এটা নিয়ে নিবো এবং মূল্য পরিশোধ করবো।

মদীনা মুনাওয়ারায় পৌছে তিনি উটটি নিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাম হিসেবে এক উকিয়া রূপা তাকে পরিশোধ করলেন। তারপর দাম নিয়ে যখন ফিরে যাচ্ছিলেন, আবার ডেকে পাঠালেন এবং উটটিও তাঁকে দিয়ে দিলেন। বস্তুত এটা ছিলো বেচাকেনার ছলে তাঁর প্রতি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক অনুদান।

হাদীস শরীফে আছে, উটটি যখন দ্রুত চলছিলো এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর সাথে চলছিলেন, তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, জাবের! তুমি কি বিয়ে করেছো? জাবের রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ যুদ্ধে আসার কিছু আগে আমি বিয়ে করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোনো কুমারীকে বিয়ে করেছো, না পূর্ব বিবাহিতাকে? উত্তর দিলেন, এক পূর্ববিবাহিতাকে। তার পূর্বের স্বামী ইন্তিকাল করেছে, তারপর আমি বিয়ে করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, কুমারীকে বিয়ে করলে না কেন? তিনি উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা তো ইন্তিকাল করেছেন। (তিনি উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন) আমার ছোট ছোট বোন আছে। তাই আমার এমন এক মহিলার দরকার ছিলো, যে তাদের দেখাশোনা করতে পারবে। অল্প বয়সের কোনো মেয়েকে বিয়ে করলে সে ঠিকমত তাদের পরিচর্যা করতে পারবে না। সে জন্যেই এক বিধবাকে বিবাহ করা। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হলেন। তিনি তার জন্যে দু'আ করলেন–

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَعَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا بِخَيْرٍ

'আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বরকত দান করুন এবং মহব্বত ও ভালোবাসার সাথে তোমাদের মিলিয়ে রাখুন'।[৫৬]

একটি হাদীসের জন্য মদীনা থেকে সুদূর দামেশক সফর

বোখারী শরীফে আছে, বিখ্যাত সাহাবী হযরত জাবের রাযি., যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যন্ত প্রিয় আনসারী সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর এক দিন তিনি জানতে পারলেন, তাহাজ্জুদ নামায সংক্রান্ত একটি হাদীস এমন আছে, যা আমি জানতে পারিনি। অন্য এক সাহাবী হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি শুনেছেন। তিনি এখন সিরিয়ার দামেশক নগরীতে অবস্থান করেন। তিনি চিন্তা করলেন, যেই সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীসটি শুনেছেন, আমি তাঁর থেকে সরাসরি না শুনে মাধ্যম দিয়ে কেন শুনবো? হযরত জাবের রাযি. অবস্থান করছিলেন মদীনা শরীফে। মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দামেশকের দূরত্ব প্রায় পনের শ' কিলো মিটার।[৫৭]

মদীনা মুনাওয়ারা থেকে সড়কপথে আমি দামেশকে গিয়েছি। জনমানবহীন মরুভূমি। না কোনো টিলা আছে, না গাছ আছে, না পানি আছে। সুতরাং অবিলম্বে হযরত জাবের রাযি. উট আনিয়ে তাতে আরোহণ করে সফর শুরু করলেন। পনেরো শ' কিলো মিটার পথ অতিক্রম করে দামেশক পৌছলেন। সেখানে গিয়ে ঐ সাহাবীর ঘর খুঁজে বের করলেন। দরজায় করাঘাত করলেন। ঐ সাহাবী দরজা খুললেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কী উদ্দেশ্যে আসা হয়েছে? হযরত জাবের রাযি. বললেন, আমি শুনেছি যে, তাহাজ্জুদের ফযীলত সম্পর্কে একটি হাদীস আপনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন। সেই হাদীসটি শুনতে এসেছি। ঐ সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি মদীনা শরীফ থেকে শুধু এ উদ্দেশ্যেই এসেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, শুধু এ উদ্দেশ্যে এসেছি। তখন ঐ সাহাবী বললেন, ঐ হাদীস তো আমি পরে শোনাবো, আগে অন্য একটি হাদীস শুনুন, যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। তারপর তিনি এই

---

৫৬. বোখারী, হাদীস ৪৯৪৮; মুসলিম, হাদীস ২৬৬৪; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৪৪৮২
৫৭. সাফহাতুম মিন সাবরিল উলামা আলা শাদাইদিল ইলমি ওয়াত তাহ্সীল, পৃষ্ঠা: ৪৪

হাদীসটি শোনালেন যে, যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন শেখার জন্যে কোনো পথ অতিক্রম করে, আল্লাহ তা'আলার তার জন্যে বেহেশতের পথ সহজ করে দেন। প্রথমে এ হাদীস শোনালেন তারপর তাহাজ্জুদের হাদীস শোনালেন। হাদীস শোনানোর পর ঐ সাহাবী বললেন, এবার ভিতরে এসে একটু বসুন এবং খানা খান। হযরত জাবের রাযি. বললেন, না, আমি খানা খাবো না। কারণ, আমি চাই যে, এ সফরটি কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শোনার জন্যে হোক। এ সফরে অন্য কোনো কাজের সামান্য অংশও অন্তর্ভুক্ত না হোক। আমি এখন অন্য কোনো কাজ করতে চাই না। হাদীস আমি পেয়ে গেছি। আমার উদ্দেশ্য লাভ হয়েছে। এবার আমি মদীনা শরীফে ফিরে যাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযি.-এর ঘটনা

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযি. একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। প্রত্যেক সাহাবীকে আল্লাহ বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তাঁর বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি খুব সুন্দর করে কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করতেন। তাঁর সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ

'সাহাবাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর কুরআন তিলাওয়াতকারী হলেন উবাই ইবনে কা'ব রাযি.।'[৫৮]

একদিন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে বসা ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে এই সংবাদ পাঠিয়েছেন যে, আপনি উবাই ইবনে কা'বকে বলুন সে যেন আপনাকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনায়। উবাই ইবনে কা'ব রাযি. যখন এ কথা শুনলেন, তখন জিজ্ঞাসা করলেন যে, স্বয়ং আল্লাহ কি আমার নাম নিয়ে বলেছেন যে, উবাই ইবনে কা'বকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতে বলুন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ তোমার নাম নিয়ে বলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযি.-এর মধ্যে এমন ভাব ও আবেগের সৃষ্টি হলো যে, তিনি ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। আর বললেন, আল্লাহ আমাকে স্মরণ করবেন এবং আমার নাম নিবেন, আমি তো কখনো এ সৌভাগ্যের যোগ্য নই।[৫৯]

---

৫৮. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৭২৩; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- ১৫১; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ১২৪৩৭

৫৯. সহীহ বোখারী, হাদীস নং- ৩৫২৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৪৫০৯; সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৭২৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ১১৮

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাযি.-এর ঘটনাবলী

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিতীয় মুয়াযযিন ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তিনি বেশির ভাগ ফজরের আযান দিতেন। তিনি মক্কার অধিবাসী। উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা রাযি.-এর মামাতো ভাই। বাল্যকালেই চোখ নষ্ট হয়ে তিনি অন্ধ হয়ে যান। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বেই হিজরত করে পবিত্র মদীনায় বসবাস শুরু করেন। পবিত্র কুরআনের দু'টি আয়াত তাঁর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়।

সূরা নিসার ৯৫ নম্বর আয়াতটি প্রথমে এরূপ ছিলো–

لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

'যে সকল মুহাজির জিহাদে না গিয়ে বসে আছে (অর্থাৎ, জিহাদে অংশগ্রহণ করেনি) তাঁরা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীরা সমান হতে পারে না।'

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাযি. অন্ধত্বের কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারছিলেন না, তাই এ আয়াত অবতীর্ণ হলে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অন্ধত্বের কারণে নিজের অপারগতার কথা তুলে ধরেন। তখন এ আয়াতেরই এ টুকরা অবতীর্ণ হয়–

غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ

'তারা ছাড়া, যাদের সমস্যা রয়েছে।'[৬৩]

এমনিভাবে সূরা আবাসার প্রথম আয়াতসমূহও তাঁর ব্যাপরেই অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র মক্কার সর্দারদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাযি. একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে আসেন। অন্ধ হওয়ার কারণে

---

৬৩. সহীহ বোখারী, হাদীস নং- ৪৫৯৩-৪৫৯৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কারা বসে আছে তা দেখতে না পেয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বারবার সম্বোধন করে প্রশ্ন করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর সঙ্গের অকৃত্রিম সম্পর্কের কথা ভেবে) তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং সর্দারদের সাথে কথা বলতে থাকেন। তখন এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়-

عَبَسَ وَ تَوَلّٰۤی ۙ اَنۡ جَآءَہُ الۡاَعۡمٰی ؕ وَ مَا یُدۡرِیۡکَ لَعَلَّہٗ یَزَّکّٰۤی ۙ اَوۡ یَذَّکَّرُ فَتَنۡفَعَہُ الذِّکۡرٰی ؕ اَمَّا مَنِ اسۡتَغۡنٰی ۙ فَاَنۡتَ لَہٗ تَصَدّٰی ؕ وَ مَا عَلَیۡکَ اَلَّا یَزَّکّٰی ؕ وَ اَمَّا مَنۡ جَآءَکَ یَسۡعٰی ۙ وَ ہُوَ یَخۡشٰی ۙ فَاَنۡتَ عَنۡہُ تَلَہّٰی ۚ

"(রাসূল) মুখ বিকৃত করল ও চেহারা ফিরিয়ে নিল। কারণ তার কাছে অন্ধ লোকটি এসে পড়েছিল। (হে রাসূল!) তোমার কি জানা আছে? হয়ত সে শুধরে যেত! অথবা উপদেশ গ্রহণ করত এবং উপদেশ দান তার উপকারে আসত! আর যে ব্যক্তি অগ্রাহ্য করছিল তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছ অথচ সে নিজেকে না শোধরালে তোমার উপর কোনও দায়িত্ব আসে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শ্রম ব্যয় করে তোমার কাছে আসল এ অবস্থায় যে, সে আল্লাহকে ভয় করে, তার প্রতি তুমি অবজ্ঞা প্রদর্শন করছ!"[৬১]

উপরোক্ত আয়াতে 'অন্ধ' দ্বারা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমই উদ্দেশ্য। তাঁর উচ্চমর্যাদার প্রমাণের জন্যে এটাই কম কি যে, পবিত্র কুরআন তাঁর খোদাভীতির সাক্ষ্য দিয়েছে!

পবিত্র মদীনায় হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জিহাদ বা অন্য কোনো কাজে মদীনার বাহিরে গমন করতেন, তখন অধিকাংশ সময় তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাযি.-কেই মদীনায় নিজের প্রতিনিধি নিয়োগ করতেন। এ ধারায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ১৩ বার পবিত্র মদীনায় নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।[৬২]

পবিত্র কুরআন তাঁকে জিহাদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করলেও তাঁর মধ্যে জিহাদের স্পৃহা এতো বেশি ছিলো যে, তিনি অনেক যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। তিনি সেনাপতির নিকট আবেদন করতেন যে, আমি অন্ধ হওয়ার কারণে পালাতে পারবো না, তাই পতাকা আমার হাতে দিন।[৬৩]

---

৬১. সূরা আবাসা, আয়াত ১-১০

৬২. আল ইসাবা, হাফেয ইবনে হাজারকৃত, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৫১৬-৫১৭

৬৩. তাবাকাতে ইবনে সা'দ, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১৫৪

হযরত ওমর রাযি.-এর যুগে ইরানের বিরুদ্ধে জগতখ্যাত কাদেসিয়ার যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিনি কালো রঙের একটি পতাকা ধারণ করেছিলেন এবং বক্ষে বর্ম পরেছিলেন।[৬৪]

কাদেসিয়ার যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না। কেউ কেউ বলেন, তিনি কাদেসিয়াতেই শহীদ হন। আর কেউ বলেন, সেখান থেকে তিনি পবিত্র মদীনায় ফিরে আসেন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন।[৬৫]

৬৪. তাবাকাতে ইবনে সা'দ, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১৫৫
৬৫. আল ইসাবা, হাফেয ইবনে হাজারকৃত, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৫১৬, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবীকৃত, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৬৫

হযরত আসমা বিনতে উমাইস রাযি.-এর ঘটনা

আসমা বিনতে উমাইস রাযি. একজন খ্যাতনামা মহিলা সাহাবী। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা রাযি.-এর বৈপিত্রেয় বোন ছিলেন। ইসলামের একদম শুরুর অবস্থায় তিনি মুসলমান হন। হযরত জা'ফর তাইয়ার রাযি.-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। হযরত জা'ফর তাইয়ার রাযি.-এর হাবশায় হিজরতের সময় তিনিও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সপ্তম হিজরীতে স্বামীর সঙ্গে হাবশা থেকে পবিত্র মদীনায় ফিরে আসেন। হযরত জা'ফর রাযি. মুতার যুদ্ধে শহীদ হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর সঙ্গে তাঁকে বিবাহ দেন।

বিদায় হজ্বের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হজ্বের উদ্দেশ্যে পবিত্র মদীনা থেকে যাত্রা করলে যুল হুলাইফাতে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর জন্মগ্রহণ করেন। এতদসত্ত্বেও তিনি এহরাম বেঁধে হজ্বের সফর অব্যাহত রাখেন। হযরত ফাতেমা রাযি.-এর অন্তিম রোগে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর পক্ষ হতে হযরত আসমা রাযি. তাঁর সেবা শুশ্রূষা করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর মৃত্যুর পর তিনি হযরত আলীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর গর্ভে দু'টি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। একবার তাঁর দুই ছেলে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর এবং মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর এর মধ্যে বিতর্ক হয়। মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর বলেন, আমার পিতা (হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.) শ্রেষ্ঠ। আর মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর বলেন, আমার পিতা (অর্থাৎ, জা'ফর তাইয়ার রাযি.) শ্রেষ্ঠ। হযরত আলী রাযি., হযরত আসমা বিনতে উমাইস রাযি.-কে বলেন, তুমি এর ফয়সালা দাও। হযরত আসমা উত্তর দেন, আমি আরবের কোনো যুবককে জা'ফর থেকে উৎকৃষ্ট দেখিনি এবং কোনো প্রৌঢ় ব্যক্তিকে আবু বকর থেকে উৎকৃষ্ট পাইনি। হযরত আলী রাযি. বললেন, তুমি আমার জন্যে তো কিছুই বাদ রাখনি। তবে তুমি যেই উত্তর দিয়েছো, এতদভিন্ন অন্য কোনো উত্তর যদি তুমি দিতে তাহলে আমি অসন্তুষ্ট হতাম। তখন হযরত আসমা রাযি. বললেন, এই তিন ব্যক্তি- যাঁর মধ্যে আপনি তৃতীয়– সকলেই ভালো মানুষ।[৬৬]

---

৬৬. তাবাকাতে ইবনে সা'দ, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ২৮৫, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবীকৃত, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৮৭, জাহানে দীদাহ পৃষ্ঠা: ২৭১ থেকে সংগৃহীত

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রাযি.-এর ঘটনা

কোনো মুসলমানের নিকট হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রাযি.-এর পরিচয় দানের অপেক্ষা রাখে না। হযরত আবু আইয়ূব রাযি.-এর নাম খালেদ ইবনে যায়েদ। তিনি পবিত্র মদীনার খাযরাজ গোত্রের লোক। শুরুতেই তিনি ইসলাম কবুল করেন। তিনিই সেই মহাসৌভাগ্যবান সাহাবী, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় হিজরতের পর যিনি এক মাস কাল তাঁর মেহমানদারী করার মর্যাদা লাভ করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহন 'কাসওয়া' তাঁর গৃহের সামনে এসেই থেমে যায়।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইচ্ছায় তিনি তাঁকে নীচের তলায় থাকতে দেন। আর নিজের পরিবারসহ উপরের কক্ষে অবস্থান করেন। একবার উপরের কক্ষে পানি পড়ে গেলে তাঁরা আশঙ্কা করেন যে, পানি চুয়ে নীচে পড়লে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কষ্ট হতে পারে। তাই তাঁরা চাদর দ্বারা সেই পানি শুকিয়ে নেন। প্রত্যেকটি গাযওয়াতে তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকেন। হযরত আলী রাযি. তাঁকে পবিত্র মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করেন। পরে জেহাদের আগ্রহে তিনি হযরত আলী রাযি.-এর নিকট চলে যান। হযরত আলী রাযি.-এর সঙ্গে খারেজী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন।

হযরত মুয়াবিয়া রাযি. স্বীয় পুত্র ইয়াযীদের নেতৃত্বে কন্সট্যান্টিনোপল আক্রমণের জন্যে প্রথম যেই বাহিনী প্রেরণ করেন, তার মধ্যে হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রাযি.-ও ছিলেন। এখানকার অবরোধ দীর্ঘ হয়। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ইয়াযীদ পরিচর্যার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট গিয়ে বলেন, কোনো কাজ থাকলে নির্দেশ করুন। উত্তরে হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রাযি. বলেন,

'আমার একটি মাত্র বাসনা রয়েছে, তা হলো, আমার মৃত্যুর পর আমার লাশ ঘোড়ায় উঠিয়ে যতোদূর সম্ভব শত্রুভূমির অভ্যন্তরে নিয়ে যাবে এবং সেখানে নিয়ে দাফন করবে।'

এরপর তিনি ইন্তিকাল করেন। ইয়াযীদ তাঁর ওসিয়ত পূরণ করেন এবং কন্সট্যান্টিনোপলের নগর-প্রাচীরের নিকট তাঁকে দাফন করেন।[৬৭]

ইতিহাসে আছে যে, সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ কন্সট্যান্টিনোপল বিজয়ের পর গুরুত্ব সহকারে হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রাযি.-এর কবর খোঁজ করেন। তখন একজন বুযুর্গের সহযোগিতায় এখানে সেই কবর পেয়ে যান। সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ 'জামে আবি আইয়ূব' নামে এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তখন থেকে এ স্থানটি সাধারণ ও বিশিষ্ট নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষের যিয়ারতকেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানকার পুরো মহল্লাটিকেই 'আবু আইয়ূব' বলা হয়। পবিত্র মাযারে বসে বসে লোকেরা কুরআন তিলাওয়াত করে থাকে।[৬৮]

মহান এই সাহাবী, আল্লাহ পাক যাঁকে রহমাতুল্লিল আলামীনের মেহমানদারী করার মর্যাদায় ভূষিত করেন, স্বদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে দূর-দেশের এই মাটিতে আখেরাতের পথে যাত্রা করেন। জীবনের শেষ মুহূর্তের একমাত্র বাসনা ছিলো যে, আল্লাহর কালেমাকে নিয়ে শত্রুর ভূখণ্ডে যতদূর যাওয়া সম্ভব যেতে থাকবেন। মৃত্যুর পর কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত যদিও তাঁর কবর সম্পর্কে কারো জানা ছিলো না, কিন্তু কন্সট্যান্টিনোপলের প্রকৃত বিজেতা ছিলেন তিনিই। তাঁর মাধ্যমেই এ ভূখণ্ডে প্রথমবার ইসলামের কালেমা পৌছে। তাঁর উসিলাতেই এ ভূখণ্ড রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবীর সমাধিস্থল হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁকেও সন্তুষ্ট করেছেন।[৬৯]

৬৭. আল ইসাবাহ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪০৫

৬৮. তারীখে দওলতে ওসমানিয়া, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১২১, ডা: মুহাম্মাদ আযীযকৃত,

৬৯. জাহানে দীদাহ পৃষ্ঠা: ৩৫৫ থেকে সংগৃহীত

হযরত আবু সা'লাবা খুশানী রাযি.-এর ঘটনা

হযরত আবু সা'লাবা খুশানী রাযি. বানু খুশাইন গোত্রের লোক ছিলেন। খাইবার যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের প্রাক্কালে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে মুসলমান হন এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় বাইআতে রিযওয়ানেও তিনি শামিল ছিলেন। হযরত আলী রাযি. এবং হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর মধ্যকার যুদ্ধে তিনি নিরপেক্ষ থাকেন। তিনি দারিয়ায় এসে বসবাস শুরু করেন। শেষ জীবনে বলতেন, আল্লাহর নিকট আমি আশা করি যে, মৃত্যুর সময় আমার মৃত্যু-যন্ত্রণা হবে না। সুতরাং একদিন তাহাজ্জুদ নামাযে সিজদারত অবস্থায় তাঁর রূহ দেহ ত্যাগ করে। তাঁর মেয়ে তখন ঘুমিয়ে ছিলেন। ঘুমের মধ্যে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর পিতা মারা গেছেন। তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে জেগে ওঠেন এবং উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করেন 'আমার পিতা কোথায়?' কেউ উত্তর করলো, তিনি নামায পড়ছেন। তিনি তার পিতাকে ডাক দিলেন। কোনো উত্তর না পেয়ে তিনি তাঁর কক্ষে চলে যান। সেখানে গিয়ে তাঁর পিতাকে সিজদারত দেখতে পান। তাঁকে নাড়া দিলে তিনি পড়ে যান। তখন বুঝতে পারেন যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে।[৭০]

---

৭০. আল ইসাবা, হাফেয ইবনে হাজারকৃত, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৩০

হযরত কা'ব রাযি.-এর ঘটনা

হযরত কা'ব রাযি. একবার কোথাও যাচ্ছিলেন। দেখলেন এক ব্যক্তি কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করছে এবং দু'আ করছে। এটা দেখে তিনি কিছু সময়ের জন্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। তার তেলাওয়াত ও দু'আ শুনতে আরম্ভ করলেন। বাহ্যত তাঁর দাঁড়ানোর কোনো কারণ ছিলো না। কারণ, লোকটি নিজের ইবাদতে মশগুল, আর ইনি নিজ সফরে বের হয়েছেন। এখানে দাঁড়িয়ে পথ খাটো করার কী প্রয়োজন? কিন্তু এ কথা চিন্তা করে তিনি দাঁড়িয়ে যান যে, এক ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদতে মশগুল রয়েছে তার নিকট কিছু সময়ের জন্যে দাঁড়িয়ে তার কথা শোনা অনেক সময় মানুষের জন্যে অনেক উপকারী হয়ে থাকে। লোকটি আল্লাহর নিকট কেমন মাকবুল এবং তার উপর আল্লাহ তা'আলার রহমতের কেমন বারী বর্ষণ হচ্ছে, তা তো জানা নেই। তাই অল্প সময়ের জন্যে এখানে দাঁড়ালে হতে পারে রহমতের সেই বারীর একটি ছিঁটা আমার উপরেও পড়বে। এ শিক্ষা দেওয়ার জন্যেই হযরত কা'ব রাযি. লোকটির নিকটে দাঁড়িয়ে যান।

যাইহোক, হযরত কা'ব রাযি. লোকটির দু'আ ও তেলাওয়াত শুনে যখন সম্মুখে অগ্রসর হন তখন বলেন,

'তাদেরকে শাবাশ, যারা কিয়ামতের দিনের পূর্বেই নিজের জন্যে কান্না করে। কারণ, পূর্বে কান্না না করলে কিয়মতের দিন কাঁদতে হবে, যা কোনো কাজে আসবে না।'[৭১]

---

৭১. কিতাবুয যুহ্দ, ইবনুল মুবারককৃত, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩২, হাদীস নং-৯৬

হযরত আবু দুজানা রাযি.-এর ঘটনা

হযরত আবু দুজানা রাযি. একজন বীর সাহাবী। উহুদের যুদ্ধকালে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে তাঁকে একখানি তরবারী দিয়েছিলেন। তিনি সেই তরবারী নিয়ে যখন শত্রুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে চতুর্দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটে আসছিলো। হযরত আবু দুজানা রাযি. থমকে দাঁড়ালেন। মুহূর্তের মধ্যেই তিনি কর্তব্য স্থির করলেন এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ফিরে তীরের দিকে পিঠ পেতে দাঁড়ালেন। সব তীর নিজ পিঠে বিঁধতে দিলেন। তীর অভিমুখে বুক পাততে চাইলে অবশ্যই তিনি তা পারতেন, কিন্তু তাতে প্রিয় নবী পিছনে পড়ে যান আর তাঁর জ্যোর্তিময় সত্তা দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায়, তা যে সহ্য করা অনেক বেশি কঠিন। সুতরাং সেই ঘোর যুদ্ধাবস্থায়ও এতটা সতর্কতা, যাতে প্রিয়নবীর দিকে পিছন পড়ে না যায়। তার চে' পৃষ্ঠদেশ শত্রুর দিকেই থাকুক, সব তীর তাতেই বিদ্ধ হোক, সেই সঙ্গে পবিত্র সত্তাও চোখের সামনে দীপ্তিমান থাকুক।[৭২]

---

৭২. আল-মু'জামুল-কাবীর, হাদীস নং- ১৫৩৫৬, খণ্ডঃ ১৩, পৃষ্ঠাঃ ২৩৬, মাজমা'উয-যাওয়াইদ, খণ্ডঃ ৬, ১১৩

হযরত বেলাল হাবশী রাযি.-এর ঘটনা

হযরত বেলাল হাবশী রাযি. এবং ইসলামের জন্যে তাঁর অবদানসমূহ সর্বজনবিদিত। এমন মুসলমান খুব কমই রয়েছে, যে হযরত বেলাল রাযি.-এর সম্মানিত নাম উচ্চারিত হতেই হৃদয়ে ভক্তি ও ভালোবাসার স্নিগ্ধতা অনুভব করে না। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পবিত্র মক্কায় তিনি দাসত্বের জীবন অতিবাহিত করেন। উভয় জাহানের সরদার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির পর যাঁরা সর্বপ্রথম ঈমান আনেন, হযরত বেলাল রাযি. তাঁদের অন্যতম। এমনকি যখন হযরত আমর ইবনে আবাছা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর পরিচয় লাভের জন্যে জিজ্ঞাসা করেন, (তাওহীদের) এ পয়গামে আপনার সঙ্গে আর কে কে আছে? তখন উত্তরে তিনি বলেন, حُرٌّ وَعَبْدٌ অর্থাৎ, একজন স্বাধীন, আরেকজন ক্রীতদাস।[৭৩] স্বাধীন ব্যক্তি দ্বারা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-কে এবং ক্রীতদাস দ্বারা হযরত বেলাল রাযি.-কে বুঝিয়েছেন।

ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর মনিব তাঁর উপর জুলুম-অত্যাচারের যেই স্ট্রীম রোলার চালায়, তার ঘটনাসমূহ খুবই প্রসিদ্ধ। তাঁকে প্রচণ্ড রোদে উত্তপ্ত পাথরের উপর শোয়ানো হতো এবং লাত ও উয্যাকে মাবুদ মানতে বাধ্য করা হতো। কিন্তু তাঁর মুখ থেকে 'আহাদ' 'আহাদ' ছাড়া অন্য কোনো শব্দ বের হতো না। অবশেষে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. তাঁকে ক্রয় করে মুক্ত করেন।

তারপর থেকে হযরত বেলাল রাযি. আবাসে ও প্রবাসে সর্বদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়মিত মুয়াযযিন নিযুক্ত হন। তাঁর উচ্চ মর্যাদার জন্যে সেই একটিমাত্র হাদীসই যথেষ্ট যেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর নামাযের পর হযরত বেলাল রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার সেই আমলের কথা আমাকে বলো, যে আমল

---

৭৩. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৮৩২

তোমার নিকট সর্বাধিক আশাপ্রদ। কেননা আমি আজ রাতে জান্নাতের মধ্যে আমার সামনে তোমার পায়ের শব্দ পেয়েছি।' হযরত বেলাল রাযি. নিবেদন করলেন, 'আমি রাতদিনের যে সময়েই ওযু করি, আমার প্রভুর জন্যে তাওফীক মতো অবশ্যই নামায পড়ি।'[৭৪]

কালেমা তায়্যিবা পড়ার কারণে যেই পবিত্র মক্কাভূমিতে হযরত বেলাল রাযি.-কে নির্যাতন করা হতো, সেখানেই মক্কা বিজয় হলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে তিনি কা'বাগৃহের ছাদে আরোহণ করে সর্বপ্রথম আযান দেন।[৭৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর হযরত বেলাল রাযি.-এর জন্যে পবিত্র মদীনায় অবস্থান করা সম্ভবপর হলো না। তিনি জিহাদে অংশগ্রহণের জন্যে সিরিয়ায় বসবাস শুরু করেন। কোনো কোনো বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর খেলাফতকালেই সিরিয়া এসেছিলেন। আর কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, হযরত আবু বকর রাযি. তাঁকে বাধা দেন, পরে হযরত ওমর রাযি.-এর শাসনকালে তিনি সিরিয়া আসেন।

স্বপ্নে নবীজীর দীদার এবং মদীনায় আগমন

একটি বর্ণনায় আছে যে, সিরিয়ায় থাকাকালে হযরত বেলাল রাযি. স্বপ্নে দেখেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলছেন, 'বেলাল! একি অমানবিক আচরণ! এখনও কি আমার কাছে এসে মিলিত হওয়ার সময় হয়নি।' ঘুম থেকে তিনি জেগে উঠলেন। অত্যন্ত চিন্তান্বিত হলেন। অবিলম্বে বাহন প্রস্তুত করে পবিত্র মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পবিত্র রওযায় হাজির হয়ে খুব কাঁদলেন। হযরত হাসান-হুসাইন রাযি. সেখানে আসলেন। হযরত বেলাল রাযি. তাঁদেরকে আলিঙ্গন করলেন। তাঁরা দু'জন হযরত বেলাল রাযি.-কে বললেন, আপনার আযান শুনতে আমাদের মন চায়। হযরত বেলাল রাযি. ছাদে দাঁড়িয়ে আযান দিতে শুরু করেন। তাঁর কণ্ঠে 'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিত হওয়ার সাথে সাথে পবিত্র মদীনা গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার সাথে সাথে হৈচৈ পড়ে যায়। আর যখন 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'

---

৭৪. তাবাকাতে ইবনে সা'দ, খণ্ডঃ ৩/১, পৃষ্ঠাঃ ১৬৭

৭৫. তারীখে মক্কা, আযরাকীকৃত

বলেন, তখন পর্দানসীন নারীরা পর্যন্ত দিশেহারা অবস্থায় ঘর হতে বের হয়ে আসে, আর বলতে থাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় প্রেরিত হয়েছেন। বলা হয় যে, পবিত্র মদীনায় ঐ দিনের চেয়ে অন্য কোনো দিন লোকদেরকে অধিক কাঁদতে দেখা যায়নি।[৭৬]

উপরোক্ত বর্ণনাটি সনদের দিক থেকে দুর্বল। এর চেয়ে ঐ বর্ণনাটি অধিক মজুবত, যেখানে বলা হয়েছে ঘটনাটি সিরিয়ায় ঘটেছে। অর্থাৎ, হযরত ওমর রাযি. যখন সিরিয়ায় আগমন করেন, তখন তিনি হযরত বেলাল রাযি.-কে আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি আযান দিলে মানুষ কাঁদতে থাকে; মানুষকে ঐ দিন থেকে অন্য কোনো দিন অধিক কাঁদতে দেখা যায়নি।[৭৭]

হযরত বেলাল রাযি.-এর জীবন চরিত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আখেরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় ব্যাকুল ছিলো। সুতরাং মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি আত্মভোলা অবস্থায় এই কবিতা আবৃত্তি করতে থাকেন-

غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّةْ مُحَمَّدًا وَحِزْبَهْ

'কাল প্রিয় ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে।
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহবীদের সঙ্গে।'

মৃত্যুর প্রচণ্ড কষ্ট দেখে তাঁর স্ত্রী বললেন,

'হায় আফসোস!'

কিন্তু হযরত বেলাল রাযি. বললেন,

'হায় কী আনন্দ!'[৭৮]

---

৭৬. উসদুল গাবাহ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৪৪-২৪৫
৭৭. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবীকৃত, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৫৭
৭৮. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবীকৃত, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৫৯

হযরত খালেদ বিন ওলীদ রাযি.-এর ঘটনা

হযরত খালেদ বিন ওলীদ রাযি.-এর নাম ও কীর্তি সম্পর্কে প্রত্যেকটা মুসলিম শিশুও অবগত। ইসলামের জন্যে তিনি শতাধিক যুদ্ধ করেছেন। তাঁর এ উক্তি প্রসিদ্ধ আছে যে,

'যেই রাতে আমাকে কোনো নববধূ দেওয়া হবে, বা কোনো সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হবে, তা আমার নিকট সেই রাতের চেয়ে অধিক প্রিয় নয়, যে রাতে চরম বিভিষিকার মাঝে আমি মুজাহিদ বাহিনীর সঙ্গে শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত থাকবো।'[৭৯]

কুদরতের কারিশমা যে, এতোগুলো যুদ্ধ লড়ার পরেও হযরত খালেদ বিন ওলীদ রাযি.-এর মৃত্যু বিছানায় হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক তাঁর এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে,

'মৃত্যুর সম্ভাব্য সবগুলো জায়গাতেই আমি (শাহাদতের সন্ধানে) গিয়েছি। কিন্তু আমার ভাগ্যলিপি ছিলো, আমি বিছানায় শায়িত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবো। তিনি আরো বলেন, কালেমায়ে তায়্যেবার পর আমার কোনো আমলের বিষয়ে এতো অধিক সওয়াবের আশা নেই, যতো রয়েছে সেই রাতের বিষয়ে, যেই রাতটি আমি মাথার উপর ঢাল রেখে এমতাবস্থায় অতিবাহিত করেছি যে, ভোর পর্যন্ত আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হয়েছে, আর ভোর বেলা আমরা কাফেরদের উপর আক্রমণ করেছি।'

এরপর তিনি ওসিয়ত করেন যে, আমার সমস্ত অস্ত্র এবং ঘোড়া আল্লাহর রাহে জিহাদের জন্যে দান করে দিবে। প্রসিদ্ধ হলো, তিনি হিমসে মৃত্যু বরণ করেন। আরেকটি বর্ণনায় আছে যে, তিনি মদীনা শরীফে ইন্তিকাল করেন। হযরত ওমর রাযি.-ও তাঁর জানাযায় শরীক হন। আল্লামা হামবী রহ. এটাকেই বিশুদ্ধ বলেছেন। কিন্তু হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন যে, অধিকাংশ বর্ণনা তাঁর হিমসে ইন্তিকালের উপরেই প্রমাণ বহন করে।[৮০]

---

৭৯. আলইসাবা, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১২৮

৮০. মু'জামুল বুলদান, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩০৩, আলইসাবাহ, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২১৯, সিরিয়ার দ্বিতীয় সফর থেকে সগৃহীত, আলবালাগ, পৃষ্ঠা: ১৭-১৮, সংখ্যা: সেপ্টেম্বর, ২০০৬

হযরত দিহইয়ায়ে কালবী রাযি.-এর ঘটনা

হযরত দিহইয়ায়ে কালবী রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে সকল সাহাবীর অন্যতম, যাঁরা রূপ-লাবণ্যে যুগের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের সদৃশ বলেছেন। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম মানুষের রূপে আগমন করলে সাধারণত হযরত দিহইয়ায়ে কালবী রাযি.-এর রূপ ধরে আগমন করতেন।

একবার হযরত আয়েশা রাযি. দেখেন যে, হযরত দিহইয়ায়ে কালবী রাযি. একটি ঘোড়ায় উপবিষ্ট আছেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ঘোড়ার উপর হাত রেখে তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন। হযরত আয়েশা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন,

'তিনি তো জিবরাঈল ছিলেন।'[৮১]

এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি এতো অধিক রূপ-লাবণ্যের অধিকারী ছিলেন যে, নতুন কোনো এলাকায় গেলে যুবতী মেয়েরা তাঁকে দেখার জন্যে বাড়ির বাইরে চলে আসতো।[৮২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোম সম্রাট কায়সারের নিকট দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে যেই পত্র লিখেছিলেন, তা তাঁর মাধ্যমেই পাঠিয়েছিলেন। এতে করে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত হওয়ার সৌভাগ্যও অর্জন করেন। তিনি কায়সারকে পত্র দিয়ে মদীনায় ফেরার পথে সিরিয়া থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে পেস্তা, আখরোট, কা'আক,[৮৩] একটি পশমী জুব্বা এবং দু'টি চামড়ার মোজা

---

৮১. তাবাকাতে ইবনে সা'দ, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২৫০

৮২. আল মিসবাহুল মুযী', ইবনে আবী হাদীদাহকৃত, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৬৮

৮৩. 'কা'আক' বিশেষ এক ধরনের শুষ্ক গোল রুটি। মাঝখানে বৃত্তের মতো শূন্য থাকে। প্রাচীন কাল থেকে সিরিয়ার এ রুটি বিখ্যাত। বিস্কুট ও কেকের মতো তা পছন্দ করা হতো। মানুষ উপঢৌকনের মধ্যে এটা দিতো। [তাজুল উরূস, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ১৭২]

হাদিয়া স্বরূপ নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সমস্ত উপঢৌকন গ্রহণ করেন এবং মোজাটি এতো বেশি পরিধান করেন যে, তা ফেটে যায়।[৮৪]

হাদীস শরীফে এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মিসরের চিকন সুতার তৈরি 'কিবতিয়্যা' নামক কয়েকটি কাপড় আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার একাংশ হযরত দিহইয়াকে প্রদান করে বলেন, একে দু'ভাগ করে এক ভাগ দ্বারা নিজের জন্যে জামা বানিয়ে নিও এবং অপরাংশ তোমার স্ত্রীকে দিও। সে তা দ্বারা ওড়না বানিয়ে নিবে। হযরত দিহইয়া রাযি. কাপড়টি নিয়ে চলে যেতে লাগলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পুনরায় ডেকে বললেন, তোমার স্ত্রীকে বোলো, সে যেন এর নীচে এক পরত কাপড় লাগিয়ে নেয়। যেন কাপড়ের ভিতর থেকে শরীর ফুটে না ওঠে।[৮৫]

---

৮৪. আল মিসবাহুল মুযী', ইবনে আবী হাদীদাহকৃত, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৬৮
৮৫. ইবনে আসাকের, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ২১৯, আবু দাউদের উদ্ধৃতিতে

হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা রাযি.-এর ঘটনা

হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা রাযি. সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। সকল সাহাবীর মধ্যে একমাত্র তাঁরই নাম পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে। এ সম্মান অন্য কোনো সাহাবীর লাভ হয়নি।

এমনিভাবে তাঁর আরেকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সৌভাগ্য এই যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নিজের পালকপুত্র বানিয়েছিলেন। এ বিষয়ের কাহিনীটিও বড়ো চমৎকার! তা হলো,

হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা রাযি.-এর পিতা (হারেছা) বনু কাআব গোত্রের লোক ছিলেন। আর তাঁর মাতা সু'দা ছিলেন বনু মা'আন গোত্রের লোক। একবার হযরত যায়েদ রাযি.-এর মাতা তাকে সঙ্গে নিয়ে নিজ পিত্রালয়ে যান। তখন তিনি ছিলেন ছোট বালক। সেটা ছিলো জাহেলিয়াতের যুগ। সে সময় আরবের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকতো। হযরত যায়েদ রাযি.-এর নানার বংশের উপর তাদের শত্রু পক্ষ আক্রমণ করে বসে এবং হযরত যায়েদ রাযি.-কে ক্রীতদাস বানিয়ে নিয়ে যায়। ফলে তিনি মাতাপিতা থেকে অনেক দূরে দাসত্বের জীবন যাপন করতে থাকেন। একবার উকাযের মেলায় তাঁর মনিব তাঁকে বিক্রি করার জন্যে নিয়ে আসে। ঘটনাচক্রে ঐ মেলায় উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা রাযি.-এর ভাতিজা হযরত হাকীম ইবনে হিযাম রাযি. (যিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধভাইও ছিলেন।) তাশরীফ আনেন এবং চারশ' দিরহামের বিনিময়ে তার ফুফু হযরত খাদীজার জন্যে এই দাসটি ক্রয় করেন।

পরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হযরত খাদীজা রাযি.-এর বিবাহ হলে হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা রাযি.-কে তাঁর নিকট গোলাম স্বরূপ দান করেন। এভাবে তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়মিত দাসে পরিণত হন।

ওদিকে হযরত যায়েদ রাযি.-এর পিতা হারেছা ছেলের খোঁজে দিশেহারা ছিলেন। তিনি তাঁর কোনো খোঁজ পাচ্ছিলেন না। পুত্রের স্মরণে তিনি এই কবিতাও আবৃত্তি করেন-

بَكَيْتُ عَلَى زَيْدٍ وَلَمْ أَدْرِ مَا فَعَلْ
أَحَيٌّ فَيُرْجَى. أَمْ أَتَى دُوْنَهُ الْأَجَلْ

'আমি যায়েদের জন্যে অশ্রু বিসর্জন করছি,
আমি জানি না যে, তার কী হয়েছে?
সে কি বেঁচে আছে যে,
আমি তার মিলনের প্রত্যাশা করবো?
নাকি তার মৃত্যু এসে গেছে?'

হজ্বের মওসুমে বনু কালব গোত্রের কিছু লোক হজ্বের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কায় আসে। তারা সেখানে হযরত যায়েদ রাযি.-কে দেখে চিনতে পারে এবং হযরত যায়েদ রাযি.-ও তাদেরকে চিনতে পারেন। তিনি তাদেরকে একটি কবিতা শুনিয়ে বলেন, আমার এ কবিতা আমাদের পরিবারের লোকদের নিকট পৌছিয়ে দিও–

أُحِنُّ إِلَى قَوْمِيْ وَإِنْ كُنْتُ نَائِيًا
بِأَنِّيْ قَطِيْنُ الْبَيْتِ عِنْدَ الْمَشَاعِرِ

'আমি দূরে অবস্থান করেও আমার স্বজাতিকে স্মরণ করে থাকি।
আমি পবিত্র স্থানসমূহের নিকট বাইতুল্লাহর প্রতিবেশী হয়েছি।'

এরা ফিরে গিয়ে হযরত যায়েদ রাযি.-এর পিতার নিকট সম্পূর্ণ ঘটনা শোনায় এবং হযরত যায়েদ রাযি.-এর ঠিকানা জানিয়ে দেয়। হারেছা হযরত যায়েদ রাযি.-এর চাচা কাআবকে সঙ্গে করে তাঁর খোঁজে পবিত্র মক্কায় এসে পৌছেন। সেখানে এসে জানতে পারেন যে, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্রীতদাস অবস্থায় আছেন। তারা লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করে করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে পৌছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদে হারামে অবস্থান করছিলেন। তারা নিকটে এসে নিবেদন করলেন, 'আপনি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান। তিনি স্বজাতির নেতা ছিলেন। আপনারা পবিত্র কা'বাগৃহের

হেফাজতকারী। আপনাদের সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, আপনারা ক্রীতদাসদেরকে মুক্ত করে দেন এবং কয়েদীদের খাবার খাওয়ান। আমার ছেলে যায়েদ আপনার ক্রীতদাস। আমি তার বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। আপনি আমাদের উপর কৃপা করুন। আপনি মুক্তিপণ স্বরূপ যা চাইবেন আমরা তাই দিতে রাজি আছি। আপনি মুক্তিপণ নিয়ে তাকে ছেড়ে দিন।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা তো জটিল কোনো বিষয় নয়। আমি এখনই তাকে ডেকে আনছি। আপনারা তার ইচ্ছা জেনে নিন। সে যদি আপনাদের সঙ্গে যেতে চায়, তাহলে কোনোরূপ মুক্তিপণ ছাড়াই আমি তাকে আপনাদের হাতে দিয়ে দিবো। কিন্তু সে যদি নিজের থেকে আমার সঙ্গে থাকতে পছন্দ করে, তাহলে যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে থাকা পছন্দ করে তাকে মুক্ত করে মুক্তিপণ গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তারা বললো, আপনি তো আমাদের অর্ধেকের বেশি সমস্যা সমাধান করে দিয়েছেন। (তাদের ধারণা ছিলো যে, হযরত যায়েদ রাযি. নিশ্চয়ই তার বাপ -চাচার সঙ্গে যেতে পছন্দ করবেন) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, এই দুই ব্যক্তিকে তুমি চেনো?

হযরত যায়েদ বললেন, জ্বি হ্যাঁ, ইনি আমার পিতা আর উনি আমার চাচা।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি আমার সঙ্গে দীর্ঘদিন ছিলে। এখন তোমার ইচ্ছা, তুমি চাইলে আমার সঙ্গে থাকতে পারো আর চাইলে তাদের সাথে যেতে পারো।

হযরত যায়েদ রাযি. উত্তরে বললেন, আমি আপনার মোকাবেলায় কাউকে প্রাধান্য দিতে পারি না। আপনিই আমার পিতা এবং আপনিই আমার চাচা।

তার পিতা এবং চাচা একথা শুনে চিৎকার করে বললেন, যায়েদ! এ তোমার কি হলো? তুমি দাসত্বকে মুক্তির উপর এবং আপন বাপ-চাচা ও পরিবারের লোকদের উপর অপরিচিত এক ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিচ্ছো!

হযরত যায়েদ রাযি. উত্তরে বললেন, জ্বি হ্যাঁ। আমি এ ব্যক্তির নিকট এমন এক বস্তু দেখেছি, যা দেখার পর তাঁর মোকাবেলায় কাউকে প্রাধান্য দিতে পারি না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা রাযি.-এর এ কথা শুনে তাঁর হাত ধরে হাতিমে নিয়ে যান এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন, তোমরা সকলে সাক্ষী থাকো, আজ থেকে যায়েদ আমার ছেলে। সে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং আমি তার উত্তরাধিকারী হবো।[৮৬]

হযরত যায়েদ রাযি.-এর পিতা এবং চাচা এ দৃশ্য দেখে নিশ্চিন্ত হন এবং সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরে যান।[৮৭]

৮৬. ইসলামের প্রথম যুগে পালকপুত্রকে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করা হতো। পরবর্তীতে কুরআনে কারীমে এ বিধান রহিত করা হয়েছে। অতএব এখন আর পালকপুত্রকে উত্তরাধিকারী বানানো বৈধ নয়। এতদ্ব্যতীত পরে এ হুকুমও এসেছে যে, নবীদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন হয় না।

৮৭. এ পুরো ঘটনা হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. 'আল ইসাবাহ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫৪৫-৫৪৬ এ উদ্ধৃত করেছেন।

হযরত সালমান ফার্সী রাযি.-এর ঘটনাবলী

হযরত সালমান ফার্সী রাযি. মূলত ইরানের অধিবাসী এবং অগ্নিপূজক পরিবারের সদস্য ছিলেন। সত্যান্বেষণ তাঁকে অগ্নিপূজার প্রতি বীতঃশ্রদ্ধ করে তোলে। অগ্নিপূজক পিতাকে ছেড়ে তিনি সিরিয়া গমন করেন। সিরিয়া ও ইরাকের বিভিন্ন খ্রিস্টান পণ্ডিতের সান্নিধ্যে অবস্থান করে পরিশেষে তিনি উমুরিয়ার এক খ্রিস্টান পাদ্রীর সংশ্রবে থাকতে আরম্ভ করেন। এই পাদ্রীর মৃত্যু আসন্ন হলে হযরত সালমান ফার্সী রাযি. তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমি এ পর্যন্ত অমুক অমুক পাদ্রীর সংশ্রবে ছিলাম, এখন আমি কার সংশ্রবে যাবো?'

উত্তরে সেই খ্রিস্টান পাদ্রী বলেন, 'আমি তোমাকে এমন কোনো আলেমের সন্ধান দিতে পারছি না, যিনি পরিপূর্ণরূপে সঠিক পথে অবিচল রয়েছেন। তবে এখন একজন নবীর আবির্ভাবের সময় আসন্ন। তিনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ধর্মাবলম্বী হবেন। তিনি আরব ভূখণ্ডে প্রেরিত হবেন এবং এমন এক অঞ্চলে হিজরত করবেন, যা খেজুর বাগানে পূর্ণ থাকবে। তোমার জন্যে যদি সেই নবীর নিকট গমন করা সম্ভব হয়, তাহলে অবশ্যই সেখানে যাবে। সেই নবীর তিনটি নিদর্শন থাকবে–

১. তিনি সদকার মাল ভক্ষণ করবেন না।

২. তিনি হাদিয়া গ্রহণ করবেন।

৩. তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে নবুওয়াতের মোহর থাকবে।

সেই খ্রিস্টান পাদ্রীর মৃত্যুর পর হযরত সালমান ফার্সী রাযি. একটি কাফেলার সঙ্গে আরব অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু কাফেলার অন্য সঙ্গীরা পথে তাঁকে এক ইহুদীর হাতে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করে দেয়। ঐ ইহুদী ছিলো মদীনার অধিবাসী। সে হযরত সালমান ফার্সী রাযি.-কে মদীনায় নিয়ে আসে। এ অঞ্চলের খেজুর বাগান দেখার পর তিনি প্রায় নিশ্চিত হন যে, এটাই সেই স্থান, যার সম্পর্কে খ্রিস্টান পাদ্রী তাঁকে জানিয়েছিলেন। এই ইহুদীর নিকট ক্রীতদাসরূপে কাজ করা অবস্থায় দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়। একদিন তিনি একটি বৃক্ষে আরোহণ করে কাজ করছিলেন এবং তাঁর ইহুদী

মনিব সেই বৃক্ষের নীচে বসেছিলো। এমতাবস্থায় ইহুদীর এক চাচাত ভাই সেখানে এসে বলে, আল্লাহ বনী কায়লা (আনসার)-কে ধ্বংস করুন। কেননা তারা কোবা পল্লীতে মক্কা থেকে আগত এক ব্যক্তির নিকট একত্রিত হয়েছে এবং তাঁকে নবী ও পয়গাম্বর বলে আখ্যা দিচ্ছে।

হযরত সালমান ফার্সী রাযি. নিজেই বলেন, এ কথাগুলো শ্রুতিগোচর হতেই আমার দেহে বিদ্যুৎ খেলে যায়। মনে হচ্ছিলো যে, আমি গাছ থেকে আমার মনিবের উপরেই পড়ে যাবো।

মনের উত্তেজনা সামলে নিয়ে বৃক্ষ থেকে অবতরণ করি। ইহুদী মনিবের নিকট বিস্তারিত জানতে চাই। উত্তরে ইহুদী মনিব আমাকে একটি থাপ্পড় মারে। থাপ্পড় খেয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিতির আশা মনেই চাপা রয়ে যায়। সন্ধ্যায় কাজ থেকে অবসর লাভের পর আমার সামান্য পুঁজিসহ কোবা পল্লীতে গমন করি। সেখানে পৌঁছে আমার সেই পুঁজি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পেশ করে নিবেদন করি, 'আপনারা অভাবী লোক, তাই আমি আপনার ও আপনার সাথীদের জন্যে কিছু সদকা দিতে চাই।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজের জন্যে সদকা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন এবং তা সাহাবীদেরকে গ্রহণের জন্যে অনুমতি দান করলেন। হযরত সালমান ফার্সী রাযি.-এর নিকট প্রথম নিদর্শনটি প্রকাশ পেলো।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোবা থেকে মদীনায় আগমন করেন, তখন হযরত সালমান ফার্সী রাযি. পুনরায় তাঁর দরবারে উপস্থিত হন এবং সদকার পরিবর্তে কিছু হাদিয়া পেশ করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা গ্রহণ করেন। হযরত সালমান ফার্সী রাযি.-এর জন্যে এটি ছিলো দ্বিতীয় নিদর্শন।

দু'-চার দিন পর হযরত সালমান ফার্সী রাযি. পুনরায় যখন দরবারে উপস্থিত হন, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি জানাযার সঙ্গে 'বাকী'তে গমন করেছিলেন। সাহাবাদের একটি জামাআত তাঁর সঙ্গে ছিলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত সালমান ফার্সী রাযি. সামনে গিয়ে সালাম করেন এবং তৃতীয় নিদর্শন অর্থাৎ, 'মহরে নবুওয়াত' দেখার জন্যে সম্মুখ থেকে পিছনে এসে বসেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পিছনে যাওয়ার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে পবিত্র পৃষ্ঠের চাদর সরিয়ে ফেলেন। হযরত সালমান

ফার্সী রাযি. 'মহরে নবুওয়াত' দেখামাত্রই চিনে ফেলেন। সত্যের অন্বেষায় দীর্ঘ বন্ধুরপথ অতিক্রমের পর আজ সেই অভিষ্ঠ লক্ষ্য সম্মুখে বিরাজমান। যেই মহান সত্তার প্রতীক্ষায় মুসাফিরের জীবন থেকে শুরু করে দাসত্বের জীবন পর্যন্ত কতো না দুঃখ-যাতনা সহ্য করতে হয়েছে, আজ সেই মহান ব্যক্তিত্ব তাঁর দৃষ্টির সামনে স্বর্গ হয়ে দেখা দিয়েছেন। বহু বছরের অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ফল অকস্মাৎ শান্তি ও তৃপ্তিরূপে দৃষ্টির সম্মুখে আজ উদ্ভাসিত তাই হৃদয়ে লালিত দীর্ঘদিনের ভক্তি ও ভালোবাসা অশ্রুধারারূপে বিগলিত হয়ে নয়নযুগল থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তিনি 'মহরে নবুওয়াত' চুম্বন করেন এবং বহু বছরের লালিত ভক্তি-ভালোবাসার অশ্রু-সওগাত পেশ করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কান্না অনুভব করতে পেরে কাছে ডেকে নিয়ে তাঁর কাহিনী জানতে চাইলেন। হযরত সালমান ফার্সী রাযি. নিজের জীবনের আদ্যপান্ত বর্ণনা করে শোনালেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতে ইসলামে দীক্ষিত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই মুসাফেরী জীবন এবং ইসলামের পথে অসংখ্য কষ্ট সহ্য করার যেই পুরস্কার দান করেন, তার জন্যে হযরত সালমান ফার্সী রাযি. আপন জন্মভূমি ও পরিবারই শুধু নয়, বরং মহাবিশ্ব ও এর অভ্যন্তরের সমস্ত সুখ-সামগ্রী কুরবান করতেও দ্বিধা করতেন না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلِ الْبَيْتِ

'সালমান আমাদের পরিবারেরই একজন।'

আল্লাহর কী লীলা! একদিকে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান রাযি.-কে তাঁর পরিবারভুক্ত হওয়ার মর্যাদা ও সম্মানের উচ্চতর সোপানে অধিষ্ঠিত করছেন, অপরদিকে তিনি এখনো এক ইহুদীর ক্রীতদাসই রয়ে গেছেন। তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পরামর্শ দেন যে, ইহুদীকে মুক্তিপণ দিয়ে তুমি দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করো। হযরত সালমান ফার্সী রাযি. এ ব্যাপারে ইহুদীর সঙ্গে কথা বলেন। মুক্তিপণের জন্যে ইহুদীর আরোপ করা শর্তসমূহ পূরণ করা ছিলো প্রায় অসম্ভব। সে বললো, চল্লিশ উকিয়া স্বর্ণ দিবে এবং তিনশ খেজুর বৃক্ষ রোপণ করে দিবে। সে সব বৃক্ষে ফল এলে তবে তুমি মুক্তি লাভ করবে। তিনশ' খেজুর বৃক্ষের ফল আসার জন্যে এক দীর্ঘকাল প্রয়োজন, কিন্তু রাসুলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে খেজুর চারা দিয়ে হযরত সালমান ফার্সী রাযি.-কে সহযোগিতা করতে অনুপ্রাণিত করলেন। ফলে সাহাবায়ে কেরামের সহযোগিতায় তিনশ' চারা জমা হলো।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সালমান রাযি.-কে চারা রোপণের জন্যে গর্ত তৈরি করতে বললেন। গর্ত তৈরি হলে তিনি স্বয়ং সেখানে গমন করে নিজহাতে সবগুলো চারা রোপণ করলেন এবং বরকতের দু'আ করলেন। সেই পবিত্র হাতে চারা রোপণ হলো, যেই পবিত্র হাত অন্তরের বিরাণ ভূমিকে সজীব করেছিলো এবং সামান্য কয়েক বছরে সত্যের মহাবৃক্ষ উৎপন্ন করেছিলো। সেই মোবারক হাতের মোজেযা প্রকাশ পেলো। মাত্র এক বছরেই সবগুলো খেজুর গাছে ফল এসে গেলো। এভাবে হযরত সালমান ফার্সী রাযি.-এর মুক্তিলাভের সর্বকঠিন শর্তটি পুরা হলো।

এখন চল্লিশ উকিয়া স্বর্ণ পরিশোধের শর্তটি অবশিষ্ট রইলো। একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোথাও থেকে কিছু স্বর্ণ এলো। তিনি তা হযরত সালমানের হাতে দিলেন যেন এর বিনিময়ে তিনি মুক্তিলাভ করতে পারেন। বাহ্যত সে স্বর্ণ ছিলো চল্লিশ উকিয়া থেকে অনেক কম। কিন্তু হযরত সালমান ফার্সী রাযি. ওজন করে দেখেন তা পূর্ণ চল্লিশ উকিয়া। এভাবেই রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদৌলতে তিনি দাসত্বের জীবন থেকে মুক্তি লাভ করেন। দাসত্বের কারণে হযরত সালমান ফার্সী রাযি. বদর ও ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সর্বপ্রথম খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁর দেওয়া পরামর্শের ভিত্তিতেই এ যুদ্ধে পরিখা খনন করা হয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর তিনি অব্যাহতভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। বিশেষ করে হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর জামানায় যখন ইরানে সেনা অভিযান চালানো হয়, তখন তিনি সেখানে উল্লেখযোগ্য একজন সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। শত শত নয় বরং হাজার হাজার আরব মুসলমান তাঁর কমাণ্ডে জিহাদ করতে থাকেন। তিরমিযী শরীফের এক বর্ণনা অনুযায়ী ইরানের কোনো দুর্গ আক্রমণের পূর্বে হযরত সালমান ফার্সী রাযি. তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন এবং তিনি বলতেন, 'আমি ইরানী হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের জন্যে আজ আরবদের আমীর হয়েছি।'

ফার্সী রাযি. 'মহরে নবুওয়াত' দেখামাত্রই চিনে ফেলেন। সত্যের অন্বেষায় দীর্ঘ বন্ধুরপথ অতিক্রমের পর আজ সেই অভিষ্ঠ লক্ষ্য সম্মুখে বিরাজমান। যেই মহান সত্তার প্রতীক্ষায় মুসাফিরের জীবন থেকে শুরু করে দাসত্বের জীবন পর্যন্ত কতো না দুঃখ-যাতনা সহ্য করতে হয়েছে, আজ সেই মহান ব্যক্তিত্ব তাঁর দৃষ্টির সামনে স্বর্গ হয়ে দেখা দিয়েছেন। বহু বছরের অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ফল অকস্মাৎ শান্তি ও তৃপ্তিরূপে দৃষ্টির সম্মুখে আজ উদ্ভাসিত। তাই হৃদয়ে লালিত দীর্ঘদিনের ভক্তি ও ভালোবাসা অশ্রুধারারূপে বিগলিত হয়ে নয়নযুগল থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তিনি 'মহরে নবুওয়াত' চুম্বন করেন এবং বহু বছরের লালিত ভক্তি-ভালোবাসার অশ্রু-সওগাত পেশ করেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কান্না অনুভব করতে পেরে কাছে ডেকে নিয়ে তাঁর কাহিনী জানতে চাইলেন। হযরত সালমান ফার্সী রাযি. নিজের জীবনের আদ্যপান্ত বর্ণনা করে শোনালেন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতে ইসলামে দীক্ষিত হলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই মুসাফেরী জীবন এবং ইসলামের পথে অসংখ্য কষ্ট সহ্য করার যেই পুরস্কার দান করেন, তার জন্যে হযরত সালমান ফার্সী রাযি. আপন জন্মভূমি ও পরিবারই শুধু নয়, বরং মহাবিশ্ব ও এর অভ্যন্তরের সমস্ত সুখ-সামগ্রী কুরবান করতেও দ্বিধা করতেন না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلِ الْبَيْتِ

'সালমান আমাদের পরিবারেরই একজন।'

আল্লাহর কী লীলা! একদিকে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান রাযি.-কে তাঁর পরিবারভুক্ত হওয়ার মর্যাদা ও সম্মানের উচ্চতর সোপানে অধিষ্ঠিত করছেন, অপরদিকে তিনি এখনো এক ইহুদীর ক্রীতদাসই রয়ে গেছেন। তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পরামর্শ দেন যে, ইহুদীকে মুক্তিপণ দিয়ে তুমি দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করো। হযরত সালমান ফার্সী রাযি. এ ব্যাপারে ইহুদীর সঙ্গে কথা বলেন। মুক্তিপণের জন্যে ইহুদীর আরোপ করা শর্তসমূহ পূরণ করা ছিলো প্রায় অসম্ভব। সে বললো, চল্লিশ উকিয়া স্বর্ণ দিবে এবং তিনশ খেজুর বৃক্ষ রোপণ করে দিবে। সে সব বৃক্ষে ফল এলে তবে তুমি মুক্তি লাভ করবে। তিনশ' খেজুর বৃক্ষের ফল আসার জন্যে এক দীর্ঘকাল প্রয়োজন, কিন্তু রাসুলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে খেজুর চারা দিয়ে হযরত সালমান ফার্সী রাযি.-কে সহযোগিতা করতে অনুপ্রাণিত করলেন। ফলে সাহাবায়ে কেরামের সহযোগিতায় তিনশ' চারা জমা হলো।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সালমান রাযি.-কে চারা রোপণের জন্যে গর্ত তৈরি করতে বললেন। গর্ত তৈরি হলে তিনি স্বয়ং সেখানে গমন করে নিজহাতে সবগুলো চারা রোপণ করলেন এবং বরকতের দু'আ করলেন। সেই পবিত্র হাতে চারা রোপণ হলো, যেই পবিত্র হাত অন্তরের বিরাণ ভূমিকে সজীব করেছিলো এবং সামান্য কয়েক বছরে সত্যের মহাবৃক্ষ উৎপন্ন করেছিলো। সেই মোবারক হাতের মোজেযা প্রকাশ পেলো। মাত্র এক বছরেই সবগুলো খেজুর গাছে ফল এসে গেলো। এভাবে হযরত সালমান ফার্সী রাযি.-এর মুক্তিলাভের সর্বকঠিন শর্তটি পুরা হলো।

এখন চল্লিশ উকিয়া স্বর্ণ পরিশোধের শর্তটি অবশিষ্ট রইলো। একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোথাও থেকে কিছু স্বর্ণ এলো। তিনি তা হযরত সালমানের হাতে দিলেন যেন এর বিনিময়ে তিনি মুক্তিলাভ করতে পারেন। বাহ্যত সে স্বর্ণ ছিলো চল্লিশ উকিয়া থেকে অনেক কম। কিন্তু হযরত সালমান ফার্সী রাযি. ওজন করে দেখেন তা পূর্ণ চল্লিশ উকিয়া। এভাবেই রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদৌলতে তিনি দাসত্বের জীবন থেকে মুক্তি লাভ করেন। দাসত্বের কারণে হযরত সালমান ফার্সী রাযি. বদর ও ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সর্বপ্রথম খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁর দেওয়া পরামর্শের ভিত্তিতেই এ যুদ্ধে পরিখা খনন করা হয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর তিনি অব্যাহতভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। বিশেষ করে হযরত ওমর ফারূক রাযি.-এর জামানায় যখন ইরানে সেনা অভিযান চালানো হয়, তখন তিনি সেখানে উল্লেখযোগ্য একজন সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। শত শত নয় বরং হাজার হাজার আরব মুসলমান তাঁর কমাণ্ডে জিহাদ করতে থাকেন। তিরমিযী শরীফের এক বর্ণনা অনুযায়ী ইরানের কোনো দুর্গ আক্রমণের পূর্বে হযরত সালমান ফার্সী রাযি. তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন এবং তিনি বলতেন, 'আমি ইরানী হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের জন্যে আজ আরবদের আমীর হয়েছি।'

ইরান বিজয়ের পর মাদায়েনকে তিনি নিজের বাসস্থান বানান। কিছুদিন তিনি সেখানকার গভর্নরও ছিলেন। গভর্নর থাকা অবস্থায়ও তিনি এমন সাদামাটা জীবন-যাপন করতেন যে, কেউ তাঁকে দেখে মাদায়েনের গভর্নর বলে বুঝতেই পারতো না।

একবার সিরিয়ার এক বণিক কিছু সামগ্রী নিয়ে মাদায়েন আসে। তখন হযরত সালমান ফার্সী রাযি. একজন সাধারণ মানুষের মতো রাস্তায় ঘোরাফেরা করছিলেন। সিরিয়ার সেই বণিক তাঁকে শ্রমিক মনে করে তার বোঝা বহন করতে বলে। হযরত সালমান ফার্সী রাযি. নির্দ্বিধায় বোঝা তুলে নেন। কিছুক্ষণ পর মাদায়েনের লোকেরা তাঁকে বোঝা বহন করতে দেখে সিরিয়ার সেই বণিককে বলে, ইনি তো মাদায়েনের গভর্নর। একথা শুনে বণিক লোকটি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত ও লজ্জিত হয়! বেচারা হযরত সালমান ফার্সী রাযি.-এর নিকট মিনতি করে বোঝা নামিয়ে রাখতে বলে। কিন্তু হযরত সালমান ফার্সী রাযি. তাতে সম্মত হন না। তিনি বলেন, আমি একটি নেককাজ করার সংকল্প করেছি, তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ বোঝা নামাবো না। সে বোঝা তিনি গন্তব্যস্থলে পৌছে দিয়েই ক্ষান্ত হন।[৮৮]

হযরত সালমান ফার্সী রাযি.-এর ইন্তিকাল হযরত ওসমান রাযি.-এর খেলাফতকালে মাদায়েনেই হয়। এখানেই তাঁকে কবরস্থ করা হয়। তাঁর পবিত্র কবরে আজও এ হাদীস অঙ্কিত আছে–

سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلِ الْبَيْتِ

'সালমান আমাদের পরিবারেরই একজন।'[৮৯]

---

৮৮. তবাকাতে ইবনে সাআদ, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৮৮
৮৯. জাহানে দীদাহ, পৃষ্ঠা: ৪৮ থেকে সংগৃহীত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রাযি.-এর ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রাযি. একজন আনসারী সাহাবী ছিলেন। ইসলামপূর্ব যুগে তিনি কবিরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর কবিতা সমগ্র আরবে প্রসিদ্ধ ছিলো। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নিয়মিত কাব্যচর্চা পরিহার করেন। একটি জিহাদের সফরকালে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নির্দেশ দেন, তোমার কবিতা দ্বারা কাফেলাকে উৎসাহিত করো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রাযি. উত্তরে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এসব ছেড়ে দিয়েছি। হযরত ওমর রাযি. তাঁর প্রতিবাদ করে বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো আদেশ করলে তা মানা উচিত। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রাযি. পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে নিম্নের কবিতাগুলো আবৃত্তি করেন–

يَا رَبِّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا   وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا   وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

اِنَّ الْكُفَّارَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا   وَإِنْ أَرَادُوْا فِتْنَةً أَبَيْنَا

'প্রভু হে! আপনি তাওফীক না দিলে আমরা সত্যপথপ্রাপ্ত হতাম না। আমরা আপনার পথে না সদকা করতে পারতাম, আর না নামায পড়তে সক্ষম হতাম। তাই আপনিই আমাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করুন এবং শত্রুর মুখে আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন। কাফেররা আমাদের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করছে। তারা বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চাইলে আমরা তা করতে দেবো না।'

ওমরাতুল কাযার সময় যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারামে প্রবেশ করেন এবং তাওয়াফের উদ্দেশ্যে সামনে অগ্রসর হন, তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রাযি. তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলেন এবং তাঁর জন্যে পথ করে দেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কয়েকটি যুদ্ধের আমীর নিযুক্ত করেন। সবশেষে তিনি মুতার যুদ্ধে সেনাপতি নিযুক্ত হন।[৯০]

---

৯০. জাহানে দীদাহ, পৃষ্ঠা: ২৪০ থেকে সংগৃহীত

হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযি.-এর ঘটনাবলী

হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযি. এমন একজন মর্যাদাশালী আনসারী সাহাবী ছিলেন, যাঁকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম أَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ (হালাল হারাম সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত সাহাবী) আখ্যা দিয়েছেন।[৯১]

তিনি পবিত্র মদীনার খাযরাজ গোত্রের লোক ছিলেন। হিজরতের পূর্বে মদীনার ৭০ জন আনসারী সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে আকাবাতে বাইআত হন, তাঁদের মধ্যে হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযি.-ও শামিল ছিলেন। তিনি তখন এতো অল্প বয়সের ছিলেন যে, তাঁর দাড়িও গজায়নি। বদর যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিলো ২০ বছর। প্রায় সব কটি গাযওয়াতে তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। তবে হুনাইনের যুদ্ধের সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মক্কাবাসীদের দ্বীন শেখানোর জন্যে মক্কায় রেখে যান।[৯২]

আমি তোমাকে মহব্বত করি

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয রাযি.-কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি এমন খোশ নসীব সাহাবী ছিলেন যে, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন, হে মুআয! আমি সত্য বলছি যে, আল্লাহর জন্যে আমি তোমাকে ভালোবাসি। একথা শুনে হযরত মুআয রাযি. উত্তরে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমিও আপনাকে আল্লাহর জন্যে ভালোবাসি। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কিছু কালেমা শেখাবো না, যা তুমি প্রত্যেক নামাযের পর পাঠ করবে। সেগুলো এই–

رَبِّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

'হে প্রভু! আপনাকে স্মরণ করা, আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং আপনার উত্তম ইবাদত করার ক্ষেত্রে আপনি আমাকে সাহায্য করুন।'[৯৩]

---

৯১. জামে' তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৭৯৩; সুনানে ইবনে মাজাহ, ভূমিকা

৯২. মুস্তাদরাকে হাকেম, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৭০; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবীকৃত, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৫৯

৩. সুনানে নাসায়ী, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং- ১৫২২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা ইরশাদ করেন,

نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكْرٍ. نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ. نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ.

'আবু বকর ভালো মানুষ, ওমর ভালো মানুষ, মুআয ইবনে জাবাল ভালো মানুষ।'[৯৪]

ইয়েমেনের গভর্নর পদে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের শেষ দিকে হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযি.-কে ইয়েমেনের গভর্নর বানিয়ে পাঠান। সে সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে শরীয়তের বিচারব্যবস্থা সম্পর্কিত কতগুলো প্রশ্ন করেন। তিনি তাঁকে প্রশ্ন করেন, কিসের ভিত্তিতে তুমি সমাধান দিবে? হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযি. বলেন, আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী সমাধান দিবো। কোনো সমস্যার সমাধান আল্লাহর কিতাবে না পেলে রাসূলের সুন্নাত মোতাবেক ফয়সালা দিবো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলের ফয়সালাতে না পেলে তখন কী করবে? হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযি. বলেন, নিজের বুদ্ধি দিয়ে ইজতিহাদ করবো এবং সত্যে উপনীত হতে চেষ্টার কমতি করবো না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁর বক্ষে হাত রেখে বললেন, আল্লাহর শোকর! যিনি রাসূলের দূতকে সে বিষয়ে তাওফীক দিয়েছেন, যা আল্লাহর রাসূলের মর্জি মোতাবেক হয়েছে।[৯৫]

বিদায় বেলায়

শুধু এতটুকুই নয়, বরং হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযি.-এর রওয়ানা করার সময় হলে তাঁকে বিদায় জানানোর জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তাঁর নিকট গমন করেন এবং নিজে সামনে থেকে তাকে উটে আরোহণ করান। এতটুকুতেই ক্ষান্ত করেননি; বরং তাঁর উট চলতে আরম্ভ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকক্ষণ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানা ছিলো যে, একজন উৎসর্গপ্রাণ প্রিয়জনের সঙ্গে এটি তাঁর শেষ মোলাকাত। আজ তাঁর এই প্রিয় লোকটি বহু দূরে চলে যাচ্ছে। উভয় জাহানের সরদার

৯৪. জামে' তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৭৯৭

৯৫. জামে' তিরমিযী, হাদীস নং- ১৩২৭, ১৩২৮

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ থেকে খুব কম সময়েই আবেগ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এ সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখে এমন কিছু কথা উচ্চারিত হয়, যা নিজের প্রিয়জনের বিচ্ছেদের মুহূর্তে তাঁর হৃদয়-আবেগের দর্পণ ছিলো। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

يَا مُعَاذُ! إِنَّكَ عَسٰى أَنْ لَا تَلْقَانِيْ بَعْدَ عَامِيْ هٰذَا. أَوْلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِيْ أَوْقَبْرِيْ.

'মুআয! হতে পারে এ বছরের পর আমার সঙ্গে তোমার আর সাক্ষাত হবে না। কিংবা তুমি আমার মসজিদ বা কবরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে।'

হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযি. কতদিন ধরেই না নিজ আবেগকে সংযমে রেখেছিলেন। কিন্তু রাসূলের মুখে এ কথা শুনতেই তিনি ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। পূর্বে হয়তো তিনি নিজেকে এ প্রবোধ দিয়েছিলেন যে, রাসূলের সঙ্গে তাঁর এ বিচ্ছেদ এক দেড় বছরের হবে। কিন্তু সরকারে দোআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখনিঃসৃত এ বাক্য শুনে তিনি নিশ্চিত হন যে, দুনিয়াবাসীর হিদায়াতের আলোকবর্তিকা এই প্রিয়জনকে জীবনে আর দেখতে পাবো না। এ বিচ্ছেদ অনুভূতিতে তাঁর ভিতর থেকে 'আহ' বের হয়ে আসে। নয়নযুগল হতে অশ্রু ঝরতে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'মুআয! কেঁদো না।' একথা বলে তিনি নিজেও তাঁর চেহারা মদীনা মুনাওওয়ারার দিকে ঘুরিয়ে নিলেন এবং বললেন,

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُوْنَ مَنْ كَانُوْا وَحَيْثُ كَانُوْا.

'মুত্তাকীরা আমার নিকটতম ব্যক্তি হবে; তারা যেই হোক আর যেখানেই থাকুক না কেন।'[৯৬]

তারপর হযরত মুআয রাযি. ইয়েমেনে চলে যান এবং যখন তিনি ফিরে আসেন, তখন সরকারে দোআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর 'মাহবুবে হাকীকী'-এর সান্নিধ্যে পৌছে গেছেন। পরে আর হযরত মুআয রাযি. পবিত্র মদীনায় থাকেননি। সম্ভবত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার অভিলাষে তিনি সিরিয়া যাওয়ার সংকল্প করেন, যাতে করে শাহাদতের মর্তুবা অর্জন

৯৬. মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ২৩৫, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবীকৃত, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৪৮

করতে সক্ষম হন। কথাটি হযরত ওমর রাযি. জানতে পেরে সিদ্দীকে আকবার রাযি.-এর সমীপে নিবেদন করেন যে, তাঁকে মদীনা মুনাওওয়ারাতেই রেখে দিন, তাঁকে মানুষের খুব দরকার। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. উত্তর দিলেন যে, তিনি একটি পথ মনোনীত করেছেন (শাহাদতের পথ), কাজেই আমি তাকে বাধা দিতে পারি না।[৯৭] সুতরাং হযরত মুআয রাযি. সিরিয়া গমন করেন। সেখানে তিনি জিহাদে অংশগ্রহণ করেন, তা'লীম ও তাবলীগের ধারাও চালু রাখেন এবং হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযি.-এর ডানহাতরূপে কাজ করতে থাকেন।

হযরত ওমর রাযি.-এরও হযরত মুআয রাযি.-এর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ছিলো। তিনি বলতেন,

عَجِزَتِ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَ مُعَاذٍ رض

'নারী জাতি মুআয-এর ন্যায় সন্তান প্রসব করতে অক্ষম হয়েছে।'[৯৮]

এরা উভয়জন ভাই ভাই

একবার হযরত ওমর রাযি. তাঁর এক ক্রীতদাসকে ৪০০ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বললেন, এগুলো আবু উবাইদার নিকট নিয়ে যাও। তারপর কিছু সময় সেখানে অবস্থান করে দেখবে, তিনি এগুলো কী করেন। ক্রীতদাসটি স্বর্ণমুদ্রাগুলো হযরত আবু উবাইদা রাযি.-এর নিকট নিয়ে যায়। হযরত আবু উবাইদা রাযি. স্বর্ণমুদ্রাগুলো গ্রহণ করে হযরত ওমর রাযি.-এর জন্যে দু'আ করেন যে,

'আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এর প্রতিদান দিন এবং তাঁর উপর অনুগ্রহ করুন।'[৯৯]

তারপর তাঁর দাসীকে বললেন, এ সাতটি স্বর্ণমুদ্রা অমুককে দিয়ে আসো। এ পাঁচটি অমুকের। এভাবে সবগুলো স্বর্ণমুদ্রা তখনই বিতরণ করে দেন। ক্রীতদাসটি হযরত ওমর রাযি.-এর নিকট ফিরে এলে হযরত ওমর রাযি. পুনরায় অতগুলো স্বর্ণমুদ্রা তাকে দিয়ে বললেন, এগুলো মুআয ইবনে জাবাল রাযি.-এর নিকট নিয়ে যাও এবং দেখো তিনি কী করেন। সে হযরত মুআয

---

৯৭. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবীকৃত, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৫২

৯৮. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবীকৃত, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৫২

৯৯. তাবাকাতে ইবনে সা'দ, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩০১, হিলইয়াতুল আউলিয়া, আবু নু'আইমকৃত, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৩৭, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবীকৃত, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৫৬

রাযি.-এর নিকট গেলে তিনিও একই কাজ করলেন। সব স্বর্ণমুদ্রা শেষ হওয়ার মুহূর্তে তাঁর স্ত্রী ভিতর থেকে আওয়াজ দিয়ে বললেন, 'আমিও অনাথা। আমাকেও কিছুদিন।' তখন থলেতে মাত্র দু'টি স্বর্ণমুদ্রা ছিলো। হযরত মুআয রাযি. স্বর্ণমুদ্রা দু'টি স্ত্রীর দিকে ছুড়ে দিলেন। ক্রীতদাসটি ফিরে এসে হযরত ওমর রাযি.-কে এ ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি আনন্দিত হয়ে বললেন, 'এরা পরস্পর ভাই ভাই এবং একই রূপ।'[১০০]

প্লেগে উভয়ের শাহাদাতবরণ

হযরত আবু উবাইদা রাযি. প্লেগে আক্রান্ত হলে তিনি হযরত মুআয রাযি.-কে সিরিয়ায় তাঁর পরবর্তী গভর্নর নির্ধারণ করেন। সে সময় প্লেগ অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিলো। তখন হযরত মুআয রাযি. লোকদের শোনান যে, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, তোমরা সিরিয়া অভিমুখে হিজরত করবে, তা তোমাদের হাতে জয় হবে এবং সেখানে এমন এক ব্যাধি প্রকাশ পাবে যা ফোঁড়া বা গুটি আকারে দেখা দিবে। সেই ব্যাধিতে তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা শাহাদত দান করবেন এবং তোমাদের আমলকে অনাবিল করবেন।

তারপর হযরত মুআয রাযি. দু'আ করেন যে, 'হে আল্লাহ! মুআয যদি আল্লাহর রাসূল থেকে একথা প্রকৃতই শুনে থাকে, তাহলে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের লোকদেরকে এ মর্যাদা প্রচুর পরিমাণে দান করুন।' সুতরাং তাঁর ঘরে এ ব্যাধি প্রবেশ করে, যার হাত থেকে তাঁর পরিবারের কোনো সদস্যই রক্ষা পাননি। হযরত মুআয রাযি.-এর তর্জনীতে প্লেগের ফোঁড়া বের হয়। তিনি তা দেখে বলতেন, 'কেউ যদি এর পরিবর্তে আমাকে লাল উটও উপহার দেয় তবুও তা আমার পছন্দ নয়।'[১০১]

হযরত মুআয রাযি.-কে প্লেগে আক্রান্ত দেখে এক ব্যক্তি কাঁদতে আরম্ভ করলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কাঁদছো কেন? সে উত্তর দিলো, 'আপনার কাছ থেকে আমি পার্থিব কোনো সম্পদ লাভ করতাম এজন্যে আমি কাঁদছি না; বরং সেই ইলমের জন্যে আমি কাঁদছি, যা আমি আপনার নিকট

---

১০০. তাবাকাতে ইবনে সা'দ, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩০১, হিলইয়াতুল আউলিয়া, আবু নু'আইমকৃত, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৩৭, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবীকৃত, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৫৬

১০১. মাজমাউয যওয়ায়েদ, হাইসামীকৃত, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩১১, ইমাম আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন, হাইসামী বলেন, ইসমা'ঈল ইবনে আব্দুল্লাহ মু'আয রাযি.-এর সাক্ষাত পাননি।

থেকে অর্জন করতাম।' হযরত মুআয রাযি. বললেন, 'ইলমের জন্যেও কান্না করো না। দেখো! হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এমন ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন, যেখানে কোনো ইলম ছিলো না। আল্লাহ পাক তাঁকেই ইলম দান করলেন। তাই আমার মৃত্যুর পর চার ব্যক্তির নিকট ইলম তালাশ করবে। তাঁরা হলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি., সালমান ফারসী রাযি., আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি. ও আবুদ দরদা রাযি.।'[১০২]

যাইহোক, তাঁর দু'আ কবুল হয় এবং সেই প্লেগেই (১৮ হিজরীতে) তিনি ইন্তিকাল করেন। সে সময় তাঁর বয়স ৩৩/৩৪ বছরের অধিক ছিলো না।

---

১০২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবীকৃত, খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ৪৫৯; আততারীখুস সাগীর, বুখারীকৃত, পৃষ্ঠাঃ ৭৩-৭৪; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং- ২০১৬৪

হযরত উওয়াইস করনী রহ.-এর ঘটনা

হযরত উওয়ায়স করনী রহ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানার লোক। তিনি একজন মুসলিম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করার প্রচণ্ড আগ্রহ তাঁরও ছিলো। তাঁর সাক্ষাত লাভ কতো বড়োই না সৌভাগ্যের ব্যাপার! এরচে' বড়ো সৌভাগ্য জগতে আর কি হতে পারে? তাঁর ইহলোক ত্যাগের পর এ সৌভাগ্য লাভের তো কোনো উপায় থাকে না। সুতরাং হযরত উওয়াইস করনী রহ. নববী দরবারে দরখাস্ত পাঠালেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার খেদমতে হাজির হতে চাই, কিন্তু আমার মা অসুস্থ। আমার খেদমত ছাড়া তার চলে না। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিষেধ করে দিলেন। বললেন, মায়ের সেবা করো। আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এখানে এসো না।[১০৩]

চিন্তা করুন, যে পর্যায়ের ঈমানদারই হোক না কেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাত করার আগ্রহে তো কারও কমতি থাকতে পারে না; বরং এ আগ্রহ একজন মুসলিমের অন্তরে কী মাত্রায় থাকে তা কারও পক্ষে ভাষায় প্রকাশ সম্ভব নয়। আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জীবিত, ইহলোকে বর্তমান, তখন একজন মুসলিমের অন্তরে তাঁকে দু'চোখে দেখার বাসনা কী পরিমাণ থাকতে পারে। আজ তিনি ইহলোকে নেই, কিন্তু তাঁর একজন সাধারণ উম্মতও তাঁর পবিত্র রওযায় হাজির হওয়ার প্রেরণা কী পরিমাণ বোধ করে? এজন্যে সে কেমন অস্থির উতলা হয়ে যায়? আহা! একবার যদি হাজির হতে পারতাম। একবারের জন্যেও যদি পবিত্র রওযার যিয়ারত নসীব হতো!

কিন্তু হযরত উওয়াইস রহ. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ ও উদ্দীপনাকে মাতৃসেবার জন্যে উৎসর্গ করেন। নবী

---

১০৩. মুসলিম, হাদীস নং- ৪৬১৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ২৫৭; সুনান দারিমী, হাদীস নং- ৪৪০

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে যখন হুকুম হয়েছে মায়ের খেদমত করো এবং আমার সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য ত্যাগ করো, তখন তিনি হুকুম পালনের স্বার্থে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাতের সৌভাগ্য কোরবানী করেন। এর ফলে সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলেন। সাহাবী হওয়ার মর্যাদা তো কেবল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত দ্বারাই লাভ করা যায়। কেউ যতো বড়ো ওলী ও বুযুর্গই হোক না কেন কোনো সাহাবীর মর্যাদার নাগালেও পৌছতে পারে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. একজন তাবয়ে তাবিঈন ছিলেন। খ্যাতনামা বুযুর্গ, ফকীহ ও মুহাদ্দিছ ছিলেন। একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁকে একটি আশ্চর্য প্রশ্ন করলো। জিজ্ঞাসা করলো, হযরত মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু শ্রেষ্ঠ, না হযরত ওমর ইবন আব্দুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহি? প্রশ্নকর্তা এমন একজন সাহাবীকেই বেছে নিয়েছেন, যাঁর সম্পর্কে লোকে নানা রকম কথা চাউর করে দিয়েছে। তাঁর ও হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছিলো। আহ্‌লুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের বিশ্বাস হলো, সে বিরোধে হযরত আলী রাযি.-ই হকের উপর ছিলেন। হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর ভুল ছিলো ইজতিহাদভিত্তিক। এটা উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠের মত।

তো সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সে এমন একজনকেই বেছে নিলো, যাঁর সম্পর্কে উম্মতের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে এবং বিরুদ্ধবাদীরা নানারকম গুজব তাঁর সম্পর্কে ছড়িয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে তাবিঈদের মধ্যে বেছে নিয়েছে এমন এক মহান ব্যক্তিত্বকে, যাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও তাকওয়া-পরহেযগারী ছিলো সকল বিতর্কের উর্ধ্বে। তাঁর উপাধিই হয়েছিলো 'দ্বিতীয় ওমর'।

তিনি হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর মুজাদ্দিদ। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অনেক উঁচু মর্যাদা দান করেছিলেন। যাইহোক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. প্রশ্নের উত্তরে বললেন, ভাই, তুমি জিজ্ঞাসা করছো, হযরত মুআবিয়া রাযি. শ্রেষ্ঠ, না হযরত ওমর ইবন আব্দুল আযীয রহ.? আরে, হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর ব্যক্তিত্ব তো অনেক দূরের কথা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে থেকে জিহাদকালে যেই ধুলোবালি তাঁর নাকে লেগেছিলো, সে মাটিও তো হাজারো হযরত ওমর ইবন আব্দুল আযীয রহ.-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের

বদৌলতে সাহাবী হওয়ার যেই মর্যাদা হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর নসীব হয়েছিলো, জীবনভর সাধনা করেও তো কারও পক্ষে সে মর্যাদার ধারেকাছেও পৌঁছা সম্ভব নয়।[১০৪]

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উওয়াইস করনী রহ.-কে হুকুম দিলেন, আমার যিয়ারত লাভের প্রয়োজন নেই, সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভের দরকার নেই; মায়ের সেবায় লেগে থাকো।

আমাদের মতো মূঢ় কেউ হলে বলতো, সাহাবী হওয়ার মর্যাদা তো পরে কখনও লাভ করা সম্ভব নয়। মা অসুস্থ তো কী হয়েছে। কোনও না কোনও প্রয়োজনে ঘরের বাইরে তো যাওয়া পড়েই। এটাও তো একটা প্রয়োজন। সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য তো হেলা করার মতো জিনিস নয়। এ প্রয়োজন পূরণার্থে ঘরের বাইরে যাওয়া যেতেই পারে। সুতরাং গিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভ করে আসি। কিন্তু হযরত উওয়াইস করনী রহ. তা করেননি, তাঁর তো লক্ষ নিজ আগ্রহ পূরণ করা ছিলো না। নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা পূরণের দিকে তাঁর নজর ছিলো না। উদ্দীপনা যা ছিলো, তা কেবল আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করার জন্যে ছিলো। সেই আনুগত্য ও অনুসরণের তাগিদে তিনি সাক্ষাত লাভের আগ্রহকে ত্যাগ করলেন এবং ঘরে মায়ের খেদমতে নিয়োজিত থাকলেন। পরিশেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হলো। হযরত উওয়াইস করনী রহ. আর তাঁর সাক্ষাত লাভ করতে পারলেন না।

হযরত উওয়ায়স করনী রহ. মাতৃসেবায় নিয়োজিত থাকার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এই মর্যাদা দান করেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর ফারূক রাযি. কে বলেন, হে ওমর! কোনও এক সময় 'করন' তথা ইয়েমেনের এলাকা হতে মদীনায় এক ব্যক্তি আসবে। তার গঠন-প্রকৃতি হবে এ রকম। হে ওমর! তার সাক্ষাত পেলে তুমি নিজের জন্যে তার দ্বারা দু'আ করিয়ে নিও। আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করবেন।

বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, অতঃপর ইয়েমেন থেকে যখনই কোনো কাফেলা আসতো, হযরত ওমর রাযি. খোঁজ নিতেন সে কাফেলায় করনের উওয়াইস নামক কোনো ব্যক্তি আছে কি না। পরিশেষে একবার একটি কাফেলা এলো

---

১০৪. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড: ১, ১৩৯

এবং খলীফা জানতে পারলেন, সে কাফেলায় উওয়াইস করনী রহ. আছেন। তিনি যারপরনাই খুশি হলেন। তারপর কাফেলার লোকদের কাছে গেলেন এবং তাঁর নামধাম জিজ্ঞাসা করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণিত হুলিয়াও (আকৃতিও) মিলিয়ে দেখলেন। শেষে তিনি আরয করলেন, আপনি আমার জন্যে দু'আ করুন। উওয়াইস করনী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আমার দ্বারা দু'আ করানোর জন্যে এসেছেন কেন?

খলীফা বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ওসিয়ত করেছিলেন, যখন 'করন' থেকে উওয়ায়স আসবে, তখন নিজের জন্যে তার দ্বারা দু'আ করিও। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দু'আ কবুল করবেন। এ কথা শুনতেই হযরত উওয়াইস করনী রহ.-এর চোখে এই আনন্দে অশ্রু প্রবাহিত হলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই মর্যাদা দান করেছেন।[১০৫]

---

১০৫. মুসলিম, হাদীস নং- ৪৬১৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ২৫৭

হযরত আবু মুসলিম খাওলানী রহ.-এর কাহিনী

হযরত আবু মুসলিম খাওলানী রহ.-এর নাম আব্দুল্লাহ ইবনে ছাওব রহ.। তিনি উম্মতে মুহাম্মাদিয়া আলাইহিস সালামের সেই মহান বুযুর্গ ব্যক্তি, যাঁর জন্যে আল্লাহ পাক আগুনকে এমনভাবে নিষ্ক্রিয় করে দেন, যেমনভাবে নমরুদের আগুনকে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের জন্যে নিষ্ক্রিয় করে উদ্যানে পরিণত করেন। তিনি ইয়েমেনে জন্মগ্রহণ করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশাতেই ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ হয়নি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ জীবনে ইয়েমেনে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদার আসওয়াদ আনাসীর উদ্ভব ঘটে। লোকদেরকে সে তার মিথ্যা নবুওয়াতের উপর ঈমান আনতে বাধ্য করে।

সে সময় হযরত আবু মুসলিম খাওলানী রহ.-কে সে সংবাদ পাঠিয়ে নিজের নিকট ডেকে নেয় এবং তার নবুওয়াতের উপর ঈমান আনার দাওয়াত দেয়। হযরত আবু মুসলিম খাওলানী রহ. তাঁর উপর ঈমান আনতে অস্বীকার করেন। তখন সে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের উপর ঈমান রাখো? হযরত আবু মুসলিম খাওলানী রহ. বলেন, হ্যাঁ।

একথা শুনে আসওয়াদ আনাসী একটি ভয়ঙ্কর অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করে হযরত আবু মুসলিম খাওলানী রহ.-কে সে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁর জন্যে আগুনকে নিষ্ক্রিয় করে দেন। তিনি তা থেকে সহীহ সালামতে বের হয়ে আসেন। এ ঘটনা এতো বিস্ময়কর ছিলো যে, আসওয়াদ আনাসী ও তার সাথীদের উপর ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। আসওয়াদের সঙ্গীরা তাকে পরামর্শ দেয় যে, একে দেশান্তর করা না হলে এর কারণে তোমার অনুসারীদের ঈমান নড়বড়ে হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সুতরাং তাঁকে ইয়েমেন থেকে দেশান্তর করা হয়।

ইয়েমেন থেকে বের হওয়ার পর একমাত্র মদীনাই ছিলো তার আশ্রয়স্থল। তাই তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হওয়ার

উদ্দেশ্যে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেন। মদীনায় পৌছে তিনি জানতে পারেন যে, রিসালাতের সূর্য অন্তরালে চলে গিয়েছে। অর্থাৎ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেছেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. খলীফা হয়েছেন। তিনি মসজিদে নববীর দরজার নিকটে তাঁর উট বসিয়ে মসজিদের ভিতরে একটি খুঁটির পিছনে নামায পড়তে আরম্ভ করেন। হযরত ওমর রাযি. সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভিনদেশী এক মুসাফিরকে নামায পড়েতে দেখে তাঁর নিকট এলেন। নামায শেষ হলে ওমর রাযি. তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,

আপনি কোথা থেকে এসেছেন?

'ইয়েমেন থেকে।' হযরত আবু মুসলিম উত্তর দিলেন।

হযরত ওমর রাযি. সাথে সাথে জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহর দুশমন (আসওয়াদ আনাসী) আমাদের এক বন্ধুকে আগুনে নিক্ষেপ করেছিলো, কিন্তু আগুন তাঁর উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করেনি। তাঁর সঙ্গে আসওয়াদ পরে কিরূপ ব্যবহার করে?

হযরত আবু মুসলিম বললেন, তার নাম আব্দুল্লাহ ইবনে সাওব।

ততক্ষণে হযরত ওমর রহ.-এর অন্তর্দৃষ্টি কাজ করে ফেলে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলেন, আমি আপনাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনিই কি সেই ব্যক্তি?

হযরত আবু মুসলিম খাওলানী রহ. উত্তর দিলেন, জ্বি হ্যাঁ।

হযরত ওমর রাযি. একথা শুনে আনন্দাতিশয্যে এবং গভীর ভালোবাসায় তার ললাটে চুম্বন করেন এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর দরবারে যান। হযরত ওমর রাযি তাঁকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. এবং নিজের মাঝখানে বসান এবং বলেন, আল্লাহ তা'আলার শোকর যে, তিনি আমাকে মৃত্যুর পূর্বে উম্মতে মুহাম্মাদিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ ব্যক্তিকে দেখালেন, যাঁর সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আলাইহিস সালামের মতো আচরণ করেছেন।[১০৬]

হযরত আবু মুসলিম খাওলানী রহ. ইবাদত-বন্দেগী এবং দুনিয়া বিমুখতায় অতুলনীয় ছিলেন। এটি তাঁর নিজেরই উক্তি যে, 'জান্নাতকে আমি খোলা চোখে দেখলেও আমার নিকট বাড়ানোর মতো কোনো আমল নাই। আর যদি জাহান্নামকে খোলা চোখে দেখি তবুও না।'[১০৭]

---

১০৬. হিলইয়াতুল আওলিয়া, আবূ নু'আইমকৃত, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১২৯, তাহযীবে তারীখে ইবনে আসাকের, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৩১৫

১০৭. তাহযীবে তারীখে ইবনে আসাকের, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৩১৫

জিহাদের প্রতিও তাঁর প্রচণ্ড আকর্ষণ ছিলো। জিহাদের সফরেও তিনি রোযা রাখতেন। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বললো, সফরে রোযা রাখার দ্বারা আপনি খুব দুর্বল হয় পড়বেন। উত্তরে তিনি বললেন, সেই ঘোড়াই গন্তব্যে পৌছতে সক্ষম হয়, যে হেঁটে হেঁটে দুর্বল হয়ে যায়।

একবার তিনি বলেন, আলহামদু লিল্লাহ! আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন এবং স্ত্রীর নিকট নির্জন হওয়া ছাড়া এমন কোনো কাজ করিনি, যে সম্পর্কে আমার দুঃশ্চিন্তা হবে যে, কেউ দেখে না ফেলে।

হযরত আবু মুসলিম খাওলানী রহ. খুব বেশি গোলাম আযাদ করতেন। শেষে তাঁর নিকট একটি মাত্র দাসী রয়ে যায়। একদিন তাকে কাঁদতে দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, আপনার ছেলে আমাকে মেরেছে।

তিনি তাঁর ছেলেকে ডাকলেন এবং দাসীকে বললেন, সে তোমাকে কীভাবে মেরেছে?

দাসী বললো, থাপ্পড় মেরেছে।

তিনি বললেন, তুমিও তাকে থাপ্পড় মারো।

দাসী বললো, আমি আমার মনিবকে মারতে পারি না।

হযরত আবু মুসলিম খাওলানী রহ. জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি তাকে মাফ করে দিয়েছো?

সে বললো, জ্বি হ্যাঁ। তিনি বললেন, দুনিয়া বা আখেরাতে কোথাও তোমার হক চাইবে না তো?

দাসী তাও স্বীকার করলো।

হযরত আবু মুসলিম খাওলানী রহ. বললেন, দু'জন সাক্ষীর সামনে স্বীকার করো। দু'জন সাক্ষীর সামনে দাসী স্বীকার করলে তিনি বললেন, আমিও এই সাক্ষীদের সামনে ঘোষণা করছি যে, এ দাসী আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আযাদ।

লোকেরা বললো, আপনি মাত্র একটি থাপ্পড়ের কারণে দাসীকে আযাদ করে দিলেন? অথচ আপনার নিকট খেদমতের আর কেউ নেই। তিনি বললেন, আরে ছাড়ো এসব কথা! আহা! যদি আমি সমান সমানে মুক্তি পেয়ে যাই। কারো হক আমার উপর রইলো না এবং আমার হকও কারো উপর রইলো না।[১০৮]

---

১০৮. তাহযীবে তারীখে ইবনে আসাকের, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৩১৯

শেষ জীবনে তিনি সিরিয়ার দারিয়া গ্রামে নিয়মিত বসবাস করেন। কিন্তু জামে মসজিদে নামায পড়ার ফযীলত লাভের জন্যে অধিকাংশ সময় তিনি দামেশকে নামায পড়তে যেতেন। হযরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর খেলাফতের যুগে তিনি অনেক সময় তাঁর কাছে যেতেন। তাঁকে উপদেশ দিতেন। অনেক সময় কঠোর ভাষায়ও তাঁকে সতর্ক করতেন। হযরত মুয়াবিয়া রাযি. তাঁর প্রত্যেক কথাকে সীমাহীন গুরুত্ব দিতেন। কাছের লোকদেরকে তিনি বলে রেখেছিলেন, সে যাই বলুক তোমরা তাঁকে বাধা দিও না।

দারিয়ায় তিনি বাস করতেন। তাঁর কবর এখানেই আছে বলে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। আরেকটি বর্ণনা এরূপ আছে যে, তিনি রোমানদের সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে চলে যান এবং রোমেই তাঁর মৃত্যু হয়।[১০৯] মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

---

১০৯. তাহযীবে তারীখে ইবনে আসাকের, খণ্ডঃ ৭, পৃষ্ঠাঃ ৩১৯, জাহানে দীদাহ, পৃষ্ঠাঃ ২৯৩ থেকে সংগৃহীত

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.-এর ঘটনা

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.-এর নাম পরিচয় দানের অপেক্ষা রাখে না। ইসলামী ইতিহাসের তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব, যাঁকে পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ বলা হয়। তিনি সে সময় রাষ্ট্রযন্ত্রের বল্গা হাতে নেন, যখন বনু উমাইয়ার খলীফাদের মধ্যে রাষ্ট্রনায়কদের রঙ চলে এসেছিলো। রাষ্ট্র পরিচালনায় শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলার প্রতি গুরুত্ব অবশিষ্ট ছিলো না। তাঁর পূর্বে সোলায়মান বিন আব্দুল মালিক নিজের খেলাফতকালে সংশোধনের কিছু অসম্পূর্ণ চেষ্টা করে ছিলেন। তবে সেগুলো ছিলো আংশিক সংশোধনের প্রচেষ্টা। সে যুগের বিদগ্ধ ওলামায়ে কেরাম এহেন পরিস্থিতিতে অসন্তুষ্ট ও পেরেশান ছিলেন। সে সময়েই যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম রজা ইবনে হাইওয়াহ অন্যতম তাবেঈ ছিলেন। তিনি অনেক সাহাবীর শাগরিদ ছিলেন। তাঁকে সে যুগে সিরিয়ার সবচেয়ে বড়ো আলেম মনে করা হতো।[১১০]

তিনি খলীফা সোলায়মান ইবনে আব্দুল মালিকের দরবারে বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করেন। এমনকি খলীফা তাঁর উপর আস্থা পোষণ করতে আরম্ভ করেন। সোলায়মান ইবনে আব্দুল মালিক অন্তিম রোগে আক্রান্ত হলে এবং তার পরবর্তী খলীফার নাম ঘোষণার সময় হলে তিনি নিজের ছেলে আইয়ুব বা দাউদের নাম ঘোষণা করতে চাচ্ছিলেন। 'কিন্তু রজা ইবনে হাইওয়াহ তাকে বললেন, 'আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করুন! আপনি আপনার প্রভুর নিকট যাচ্ছেন, তিনি আপনাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করবেন।'

সোলায়মান জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তাহলে কার বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন?

হযরত রজা ইবনে হাইওয়াহ রহ. বললেন, ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের নাম ঘোষণা করুন! সোলায়মান ইবনে আব্দুল মালিক খান্দানের লোকদের থেকে তীব্র বিরোধিতার আশঙ্কা করছিলেন। কিন্তু রজা ইবনে হাইওয়াহ তাকে সাহস যোগান। পরিশেষে তিনি হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.-এর নাম ঘোষণা করেন।[১১১]

---

১১০. তাযকিরাতুল হুফফায, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১১৮

১১১. তারীখুল ইসলাম, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ১৯২, যাহাবীকৃত

খেলাফতের পূর্বে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. ছিলেন একজন পরিপাটি ও সুপোশাকধারী তরুণ যুবক। তাঁর চালচলন ছিলো শাহজাদাদের মতো। কিন্তু খেলাফতের দায়িত্ব হাতে নিতেই তাঁর জীবনে বিপ্লব সাধিত হয়। খেলাফতের ঘোষণা এবং তাঁর প্রথম ভাষণের পর প্রত্যাবর্তনের জন্যে তাঁর নিকট শাহী সোয়ারী পেশ করা হয়। তিনি তা ফিরিয়ে দেন। নিজের ব্যক্তিগত খচ্চরে সোয়ার হয়ে ফিরে আসেন। সর্বপ্রথম তিনি যেই কাজটি করেন, তা হলো, নিজের এবং নিজের খান্দানের সমস্ত সম্পদ বাইতুল মালে জমা করিয়ে দেন। অতীত শাসকগণ মানুষের যে সব সম্পদ আত্মসাৎ করে ছিলো, এক এক করে তার সবগুলো তাদেরকে ফিরিয়ে দেন। অন্যায় ট্যাক্স বিলুপ্ত করেন। নিজে অত্যন্ত সাদামাটা জীবন যাপন করেন। অনেক সময় একজোড়া কাপড় সারা মাস তাঁর দেহে থাকতো। একজোড়া কাপড়ই ধুয়ে ধুয়ে পরিধান করতেন। আল্লাহ তা'আলার সামনে জবাবদেহীর চিন্তা সব সময় তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখতো। তাঁর স্ত্রী বলেন, সারাদিন হুকুমতের কাজে ব্যস্ত থাকার পর রাতে ঘরে ফিরে আসতেন। ইশার নামাযান্তে আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত কাঁদতে থাকতেন। সরকারী বাবুর্চি খানার চুলায় ওযুর পানি গরম করাও তিনি মেনে নিতেন না। ন্যায়নিষ্ঠা এবং মানুষের সুযোগ-সুবিধার জন্যে বড়ো থেকে বড়ো কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে তিনি কুণ্ঠিত হতেন না। তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে আড়াই বছরের চেয়েও কিছু কম সময় পেয়েছেন। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে। কিন্তু এই আড়াই বছর সময়ে তিনি দেশের চিত্রই পাল্টে দিয়েছেন। এই অল্প সময়ে তিনি খেলাফতে রাশেদার পরিপূর্ণ নমুনা দেখিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।[১১২]

---

১১২. সিরিয়ার দ্বিতীয় সফর থেকে সংগৃহীত, আলবালাগ, পৃষ্ঠাঃ ২১-২২, সংখ্যাঃ সেপ্টেম্বর, ২০০৬

হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর ঘটনাবলী

হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. যখন কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন, তখন এ নগরী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল ছিলো। তার প্রতিটি কোণে বড়ো বড়ো মুহাদ্দিস ও ফকীহের শিক্ষার আসর সজ্জিত ছিলো। তৎকালে ইলমে হাদীসের কোনো ছাত্র কুফার আলেমগণ থেকে অমুখাপেক্ষী থাকতে পারতো না। হযরত ইমাম ছাহেবের শ্রদ্ধেয় পিতার নাম 'ছাবেত'। ইমাম ছাহেবের বাল্যকালেই তিনি ইন্তিকাল করেন। এক বর্ণনামতে তাঁর মা পরে হযরত জা'ফর ছাদেক রহ.-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং ইমাম ছাহেব তাঁর প্রতিপালনে বড়ো হন।[১১৩]

ইলম অর্জনে আত্মনিয়োগ

হযরত ইমাম ছাহেব রহ. প্রথম দিকে বেশির ভাগ সময় ব্যবসায় লিপ্ত থাকেন। সাথে ইলমে আকায়েদ ও ইলমে কালামেরও চর্চা করতেন। হযরত আমের ইবনে শুরাহীল শা'বী রহ. তাঁর মধ্যে মেধা ও প্রতিভার লক্ষণ প্রত্যক্ষ করে তাঁকে ইলম অর্জনে মনোযোগী হওয়ার জন্যে উপদেশ দেন। উপদেশ কার্যকর হয়। তিনি ব্যবসার কাজ পরিহার করে ইলম অর্জন করাকে নিজের একমাত্র কাজ রূপে গ্রহণ করেন।[১১৪] তৎকালীন বড়ো বড়ো শায়েখের নিকট থেকে তিনি জ্ঞান অর্জন করেন। এমনকি কেউ কেউ ইমাম ছাহেবের ওস্তাদের সংখ্যা চার হাজারও বলেছেন।

পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইমাম ছাহেবের মাধ্যমে দ্বীন ও ইলমের যেই খেদমত নিয়েছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর তারই ফলে বিশ্বের অর্ধেকের বেশি মুসলিম কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা ও বিবরণে তাঁকেই নিজেদের ইমাম ও অনুসরণীয় রূপে বরণ করে নিয়েছেন।

মক্কায় গমন এবং বিচারপদ গ্রহণে অস্বীকৃতি

হযরত ইমাম ছাহেব রহ. প্রথম দিকে কুফাতেই অবস্থান করেন। কিন্তু কুফার শাসক ইবনে হুবায়রা কিছু রাজনৈতিক কারণে তাঁকে বন্দী করেই শুধু

---

১১৩. হাদায়েকুল হানাফিয়্যাহ, পৃষ্ঠা: ৪৩, মিফতাহুস সাআদাহ-এর উদ্ধৃতিতে
১১৪. মানাকিবুল ইমামিল আ'যাম, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫৯, মাক্কীকৃত

ক্ষান্ত হননি, বরং অনেক প্রকার নির্যাতন ও নিপীড়নও করেছেন। অবশেষে তিনি বন্দী জীবন থেকে মুক্তি লাভ করার পর তার অত্যাচার ও উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার জন্যে মক্কা শরীফে গমন করেন। কয়েক বৎসর তিনি সেখানে অবস্থান করেন। পরবর্তীতে ইরাকের অবস্থা অনুকূল হলে পুনরায় সেখানে চলে আসেন। সে সময় আব্বাসী খেলাফতের সূচনা হচ্ছিলো। প্রথম দিকে তিনি এই আশায় আব্বাসী খেলাফতকে স্বাগত জানান যে, তারা ধর্মীয় দিক থেকে বনী উমাইয়ার তুলনায় উৎকৃষ্ট প্রমাণিত হবে। কিন্তু যখন এ আশা ফলপ্রসূ হলো না, তখন আব্বাসী খলীফাদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ শুরু হয়। খলীফা মনসূর তার শাসনামলে চাইতেন, ইমাম ছাহেব সরকারী কোনো পদ গ্রহণ করুন। এতে করে তিনি জনগণের উপর তাঁর সমর্থন ও সহযোগিতার প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবেন। কিন্তু হযরত ইমাম ছাহেব রহ. মনসূরের দেওয়া কোনো পদ গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ, তাতে করে শরীয়তপরিপন্থী কিছু বিষয়ে সরকারী নির্দেশ পালন করতে হবে। পরিশেষে যখন এ বিষয়ে অধিক পীড়াপীড়ি চলতে থাকে তখন তিনি বাগদাদের রাজমিস্ত্রীদের তত্ত্বাবধান ও ইট গণনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে মনসূরের পক্ষ থেকে তাঁকে বিচারপতির পদ গ্রহণ করার জন্যে পীড়াপীড়ি করা হয়। কিন্তু হযরত ইমাম ছাহেব রহ. কোনোভাবেই তাতে রাজী হননি। এ অসম্মতির প্রতিশোধ নিতে গিয়ে মনসূর তাঁকে কয়েদ করার সাথে সাথে ১১০টি বেত্রাঘাতও করেন। উপরন্তু কোনো কোনো বর্ণনায় একথাও জানা যায় যে, সেই বন্দী অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। আর কোনো কোনো বর্ণনা মতে, তাঁর মুক্তি হয়েছিলো ঠিকই তবে ফতওয়া প্রদান করা এবং বাড়ির বাহিরে লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করা সরকারের পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ করা হয়। এ অবস্থাতেই মৃত্যুর নির্ধারিত সময় চলে আসে এবং তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। এমনিভাবে বাগদাদের এ ভূখণ্ড তাঁর 'আরামকেন্দ্র' হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে।[১১৫]

হাদীসের উপর আমলের জন্য

হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. অনেক বড়ো ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি কাপড়ের ব্যবসা করতেন। এই হাদীসের উপর আমল করতে গিয়ে (হাদীসটি এই "ক্রেতা এবং বিক্রেতা যদি নিজ নিজ পণ্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেয় তাহলে আল্লাহপাক তাদের ব্যবসায় বরকত দান করেন"।) তিনি অনেক বড়ো অংকের মুনাফা কুরবান করে দিতেন। একবার তাঁর কাছে

১১৫. জাহানে দীদাহ, পৃষ্ঠা: ৪১ থেকে সংগৃহীত

কাপড়ের একটি থান এলো, যাতে কিছু ক্রটি ছিলো। তিনি কর্মচারীদের বলে রাখলেন, এই থানটি বিক্রি করার সময় ক্রেতাকে বলে দেবে, এর মধ্যে এই দোষ আছে।

কিছুদিন পর এক কর্মচারী উক্ত থানটি বিক্রি করলো; কিন্তু ক্রটির কথা বলতে ভুলে গেলো। পরে ইমাম ছাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কাপড়ের সেই থানটার কী হলো? কর্মচারী উত্তর দিলো, সেটি তো বিক্রি করেছি।

অন্য কোনো মালিক হলে তো তাকে বাহবা দিতো যে, ভালো করেছো, তুমি দোষযুক্ত কাপড়গুলো বিক্রি করে ফেলেছো। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা রহ. জিজ্ঞাসা করলেন, ক্রেতাকে দোষের কথা বলেছিলে? কর্মচারী বললো, না, সে কথা বলতে আমার মনে ছিলো না।

এবার ইমাম ছাহেব কী করলেন? সারা শহর ঘুরে-ঘুরে উক্ত ক্রেতাকে খুঁজতে শুরু করলেন। অবশেষে পেলেন। তাকে বললেন, আপনি আমার দোকান থেকে কাপড়ের যেই থানটি ক্রয় করেছেন, তাতে কিছু ক্রটি ছিলো। বিক্রির সময় আমার কর্মচারী আপনাকে সে সম্পর্কে অবহিত করতে ভুলে গিয়েছিলো। সেজন্যে আমি আপনার কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি। এখন ইচ্ছা হলে আপনি সেটি রাখতেও পারেন, আবার ইচ্ছে হলে ফেরতও দিতে পারেন।

ইশার ওযু দিয়ে ফজর

হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. সম্পর্কে আপনারা শুনেছেন, তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। একবার তিনি এক জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলেন, এক বুড়ি তাঁর সম্পর্কে বললো, ইনি এমন ব্যক্তি, যিনি ইশার ওযু দ্বারা ফজরের নামায পড়েন। বাস্তবে তখন ইমাম ছাহেব রহ. ইশার ওযু দ্বারা ফজরের নামায পড়তেন না। কিন্তু ঐ বুড়ির মুখে এ কথা শুনে তাঁর আত্মমর্যাদা বোধ জেগে উঠলো। তিনি চিন্তা করলেন যে, আল্লাহর এ বান্দী আমার সম্পর্কে ধারণা পোষণ করে যে, আমি ইশার ওযু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করি, অথচ আমি তা করি না। সেদিন থেকেই তিনি সংকল্প করলেন, আমি ইশার ওযু দ্বারা ফজরের নামায পড়বো। তারপর সারাজীবন তিনি এ নিয়ম মেনে চলেন।[১১৬]

---

১. ইসলাহী মাওয়ায়েয, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৩-২৪, আল খাইরাতুল হিসান ফী মানাকিবিল ইমাম আবী হানীফাতিন নু'মান: ৮৩,

বেহুদা প্রশ্নকারীর উচিত সংশোধন

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর নিকট এক লোক এসে বললো, একটি মাসআলা জানতে চাই। জিজ্ঞাসা করলেন কী সে মাসআলা? লোকটি বললো, আমার বাড়ির নিকট একটি নদী আছে। আমি সেখানে গোসল করি। প্রশ্ন হলো, যখন আমি নদীতে নামবো, তখন কি পশ্চিম দিকে মুখ করে নামতে হবে, না পূর্বমুখী হয়ে নামলেও চলবে?

হযরত উত্তর দিলেন, তুমি তোমার কাপড়ের দিকে মুখ করে নামবে, যাতে কেউ কাপড় না নিয়ে যায়।

তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, শরীয়ত যখন তোমাকে এখানে বিশেষ কোনো নির্দেশনা দেয়নি, তো অযথা বিধান চেয়ে নিজেকে সঙ্কীর্ণতায় ফেলার কোনো মানে হয় না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.-এর ঘটনাবলী

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুবারক রহ. মুসলিম জাতির সেই ক্ষণজন্মা মহামনীষীগণের একজন, যাঁদের নাম শুনলেই অন্তরে ভক্তি-শ্রদ্ধার ফোয়ারা ছোটে। এর আগেও এ মজলিসে তাঁর বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি হিজরী দ্বিতীয় শতকের এক শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ। খুব সম্ভব দ্বিতীয় শতকের শুরুর দিকে তাঁর জন্ম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইহলোক ত্যাগের মাত্র শত বছরের মাথায়। তিনি সিহাহ সিত্তা নামে হাদীসশাস্ত্রের যেই প্রসিদ্ধ ছয়খানি কিতাব আছে, সেগুলোর রচয়িতাগণের আগের লোক এবং তাদের সকলেরই অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ। তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর সমসাময়িক এবং ছাত্রও বটে। বয়সে তার সামান্য ছোট। তিনি এমন এক সময়ের মহান ব্যক্তিত্ব, যখন মুসলিম জাহানের চতুর্দিক বড়ো বড়ো জ্ঞান-তারকাদের দ্যুতিতে ঝলমল করছিলো। সে কালের ইসলামী দুনিয়ার যে-দিকেই তাকাবেন, নজীরবিহীন সব ব্যক্তিত্বের দৃপ্ত উপস্থিতি দেখতে পাবেন।

খোরাসানের 'মারূব' শহরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুবারক রহ. জন্ম গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি ইরাক চলে যান এবং স্থায়ীভাবে বাগদাদে বসবাস করেন।

জীবনের মোড় যেভাবে পবিবর্তন হলো

তার জীবন বৃত্তান্ত বড়ো বিস্ময়কর। এ সকল বুযুর্গানে দ্বীনের আলোচনাতেও অনেক নূর ও বরকত রয়েছে। তাঁদের একেকটি ঘটনায় এমন তাছীর থাকে যে, তার বরকতে হৃদয়-জগত বদলে যায় ও আলোকিত হয়। তাঁর সম্পর্কে হয়ত এর আগেও আপনাদের শুনিয়েছি যে, তিনি এক আমীর পরিবারের সদস্য ছিলেন। পুরুষানুক্রমেই তিনি রইস খান্দানের লোক।

হযরত শাহ আব্দুল আযীয রহ. 'বুসতানুল-মুহাদ্দিসীন' কিতাবে লেখেন, তার একটি বিশাল আপেল বাগান ছিলো। আমীর শ্রেণীর লোকেরা যেমন একটু স্বাধীন প্রকৃতির লোক হয়ে থাকে, তিনিও প্রথমদিকে সেরকমই ছিলেন। ইলম ও ইলমে দ্বীনের সাথে তাঁর কোনও সম্পর্ক ছিলো না। দলবল

নিয়েই হইচই করতেন এবং শরাব-কাবাব ও নাচগানে পয়সা উড়াতেন। একবার আপেলের মওসুমে তিনি পরিবার-পরিজন নিয়ে বাগানের ভেতর চলে গেলেন। উদ্দেশ্য আপেল খাবেন এবং শহরের বাইরে কিছুদিন আনন্দ-ফুর্তিতে কাটাবেন। তাঁর বন্ধু-বান্ধবও ছিলো প্রচুর। তাদেরকেও বাগানে দাওয়াত করলেন। রাতের বেলা গানের আসর জমে উঠলো। বেশ পান-ভোজনও চললো। তিনি নিজেও বাদ্যযন্ত্র বাজাতে দক্ষ ছিলেন। তাকে প্রথম শ্রেণীর বাদ্যকার গণ্য করা হতো। তো একদিকে সুরার নেশা এবং অন্যদিকে সূরের মাদকতা– এই মত্ততার ভেতর তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। বাদ্যযন্ত্র তখনও কোলের উপর। ঘুম ভাঙার পর যখন দেখলেন, বাদ্যযন্ত্রটি কোলেই পড়ে রয়েছে। ফের নেশা চাঁড়া দিয়ে উঠলো, তিনি বাদ্যযন্ত্রটি নিয়ে আংগুল-সঞ্চালন করলেন। কিন্তু একি! যন্ত্র যে আওয়াজ তুলছে না। অনেক কসরত করলেন। নানাভাবে বিদ্যা পরখ করলেন, তার ওলট-পালট করে দেখলেন, কিন্তু না, কোনও অবস্থাতেই তা ঝঙ্কার তুলছে না। পরিশেষে আওয়াজ আসলো বটে, কিন্তু তা সংগীতের সূর নয়, তা ছিলো কুরআন মাজীদের একটি আয়াতের তিলাওয়াতের ধ্বনি। আয়াতটি হলো,

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

'মুমিনদের জন্যে কি এখনও সেই সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর বিগলিত হবে আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য (কুরআন) নাযিল হয়েছে সে জন্যে?'[১১৭]

এক বর্ণনায় আছে, এ আওয়াজ আসছিলো সেই বাদ্যযন্ত্র থেকে। আরেক বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি যেখানে বসা ছিলেন তার কাছেই একটা গাছের ডালে একটা পাখি বসা ছিলো। সেই পাখির ডাক থেকেই উল্লেখিত আয়াতের ধ্বনি শোনা যাচ্ছিলো। সে যাই হোক না কেন, মূলত এটা ছিলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এক গায়েবী হাতছানি। আল্লাহ তা'আলা হয়তো খেয়ালপ্রবণ আব্দুল্লাহর চৈতন্যোদয় ঘটাতে চাচ্ছিলেন। সুতরাং এ আওয়াজ তার মনের বীণায় ঝঙ্কার তুললো। জেগে উঠলো তাঁর চেতনা। চিন্তা করতে বাধ্য হলেন আমি আমার জীবন কোথায় খুইয়েছি? কোন কাজের ভেতর বরবাদ করেছি? এভাবে তো চলতে পারে না! জীবনকে তো এভাবে ধ্বংস হতে দেওয়া যায় না। এখন ফেরা উচিত এবং তা এখনই। তিনি চিৎকার করে উঠলেন–

---

১১৭. হাদীদ : ১৬

بَلٰى يَارَبِّ قَدْ اٰنَ بَلٰى يَارَبِّ قَدْ اٰنَ

'অবশ্যই হে আমার মালিক! সময় এসে গেছে! অবশ্যই হে আমার মালিক! সময় এসে গেছে! আমি আমার এসব অন্যায়-অপরাধ ছেড়ে দিচ্ছি। আমি তোমার পথে ফিরে আসছি। সুতরাং তিনি জীবনের মোড় ঘুরিয়ে সম্পূর্ণরূপে দ্বীনমুখী হয়ে গেলেন।'[১১৮]

কোথায় সেই গান-বাদ্য ও শরাব-সুরাহীর জমজমাট আসর, আর কোথায় আধ্যাত্মিক জগতের এই মহাবিপ্লব! কতো গ্রন্থের রচয়িতা হয়ে তিনি দুনিয়া ছেড়ে যান। তার বহুমুখী দ্বীনী খেদমতের কারণে গোটা মুসলিম উম্মাহ আজ তাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে।

হাদীসশাস্ত্রে তাঁর অবস্থান

হাদীসশাস্ত্রে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অগাধ পাণ্ডিত্য ও উঁচু মাকাম দান করেছিলেন। হাদীসশাস্ত্রে অনেক বড়ো বড়ো আলেমও সমালোচনার শিকার হয়েছেন। ইমাম বুখারী রহ., ইমাম আবু হানীফা রহ. ও ইমাম শাফেয়ী রহ.-ও সমালোচনা থেকে রেহাই পাননি। প্রশ্ন তোলা হয়েছে বড়ো বড়ো ইমামগণের উপরেও। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে আজ পর্যন্ত এমন কোনও লোক গত হয়নি, যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.-এর সমালোচনা করেছে বা তার প্রতি কোনও আপত্তি উত্থাপন করেছে। এর দ্বারাই অনুমান করা যায় তিনি কত উঁচু স্তরের মুহাদ্দিস ছিলেন।

দুনিয়াবিমুখতা

বহুমুখী গুণবান এই ইমামের দুনিয়া-বিমুখতাও ছিলো প্রবাদতুল্য। বংশগতভাবে একজন আমীর ও বিত্তবান লোক হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়া থেকে এমন পাশ কাটিয়ে চলেছেন এবং এমন দুনিয়াত্যাগী রূপে বিদায় নিয়েছেন যে, দুনিয়ার কোনো মোহ-মলিনতা তাকে স্পর্শই করতে পারেনি। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো যে, তাঁর জীবনের গতি পরিবর্তনের পরও তাঁর দস্তরখানে আগের মতোই যখন দশ-পনের পদের খাবার পরিবেশিত হতো এবং বিপুল সংখ্যক লোক তাতে অংশগ্রহণ করতো, তখন অতিথিগণ তো পানাহারে মশগুল থাকতেন, কিন্তু তিনি নিজে থাকতেন রোযাদার। এভাবে রোযাদার মেজবান অতিথিদের ডেকে ডেকে খাওয়াতেন আর নিজেকে সেই রকমারি খাদ্যের আস্বাদ থেকে দূরে রেখে ইবাদতের আস্বাদে নিমজ্জিত রাখতেন।

---

১১৮. বুসতানুল-মুহাদ্দিছীন, পৃষ্ঠা: ১৫৫

এ জীবন আমার বড় প্রিয়

খুরাসানের অন্তর্গত 'মারব' নগরস্থ তাঁর বাড়ি সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ লেখেন যে, বাড়িটির চত্বর দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ছিলো পঞ্চাশ গজ করে। এই সম্পূর্ণ চত্বরটি সর্বক্ষণ দর্শনার্থীদের দ্বারা জনাকীর্ণ থাকতো। কেউ আসতো মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে, কেউ আসতো ইলমে দ্বীন শেখার উদ্দেশ্যে, কেউ বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে। অতঃপর তিনি যখন সেখান থেকে বাগদাদে চলে যান, তখন জীবনের ধারা বদলে ফেলেন। সেখানে একটা ছোট বাড়ি কিনে নিভৃতে জীবন-যাপন করতে থাকেন। এ সময় কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলো, হযরত! মারবের সেই আলিশান বাড়ি ছেড়ে এখানে এই ছোট্ট কুটিরে কীভাবে বসবাস করছেন? এতে আপনার মন টিকছে কি করে? তিনি উত্তরে বলেন, আল হামদুলিল্লাহ, এখানে আমি আরও বেশি স্বস্তি বোধ করছি। সেখানে আমার কাছে দর্শনার্থীদের ভিড় লেগে থাকতো। এখানে নিভৃতে জীবন-যাপন করতে পারছি। ব্যস মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করি, তারপর আবার এখানে চলে আসি। এখানে কেবল আমি থাকি, আর থাকেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অর্থাৎ দিনমান হাদীস চর্চায় মশগুল থাকি। এ জীবন আমার বড়ো প্রিয়।[১১৯]

প্রকৃত বাদশাহি

বাগদাদের নিকটবর্তী একটি শহরের নাম ছিলো 'রাক্কা'। এখন সেটি বাগদাদের অংশ হয়ে গেছে। খলীফা হারুনুর রশীদের আমলের কথা। রাক্কা নগরে ছিলো তাঁর রাজপ্রাসাদ। একবার তিনি নিজ মা' অথবা স্ত্রীর সাথে প্রাসাদে বসা ছিলেন। সহসা লক্ষ করলেন, নগর-প্রাচীরের বাইরে কিসের শোরগোল এবং ক্রমেই তা তীব্রতর হচ্ছে। খলীফা হারুনুর রশীদ শংকা বোধ করলেন, কোনও শত্রুদল হয়তো হামলা চালিয়েছে! বিষয়টা জেনে আসার জন্যে তখনই লোক পাঠালেন। জানা গেলো, কোনও শত্রুদলের আক্রমন নয়, বরং বিখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. রাক্কা শহরে তাশরীফ আনছেন এবং দলেদলে লোকজন তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে ছুটছে। তারই শোরগোল এখান থেকে শোনা যাচ্ছে।

আমি আমার ওয়ালেদ মাজেদের কাছে শুনেছি যে, অভ্যর্থনাকালে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.-এর হাঁচি এসেছিলো। তাতে তিনি আলহামদু লিল্লাহ বললে উপস্থিত জনতা সমস্বরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে ওঠে। সেই

১১৯. তারীখে বাগদাদ, খণ্ড: ১০, ১৫৪

ধ্বনিই রাজপ্রাসাদ থেকে শোনা যাচ্ছিলো। এ অবস্থা থেকে খলীফা-পত্নী মন্তব্য করেছিলেন, খলীফা! অর্ধজাহান ব্যাপী আপনার রাজত্ব আর তাই হয়ত ভাবছেন কতো বড়ো বাদশাহই না আপনি হয়ে গেছেন। কিন্তু সত্যিকারের বাদশাহ তো এঁরাই। মানুষের অন্তর্জগতে এঁরা বাদশাহী করছেন। নগরে আসছেন শুনেই সারাটা নগর তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে ভেঙে পড়েছে। কোনও পেয়াদা-পুলিশ দিয়ে মানুষ নামানো হয়নি। কেবল আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.-এর প্রতি ভক্তি-ভালোবাসা, আর কিছুই নয়। সেই ভক্তি-ভালোবাসাই নগরবাসীদেরকে ঘর-বাড়ি থেকে টেনে নামিয়েছে। এমনই মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দান করেছিলেন।

যে উদারতার দৃষ্টান্ত হয় না

আল্লাহ তা'আলা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.-কে বিপুল অর্থ-সম্পদ দান করেছিলেন, কিন্তু সেই অর্থ-সম্পদ তাঁর হৃদয়-রাজ্যকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। এই যে বলা হয়ে থাকে, 'দুনিয়া থাকবে হাতের মুঠোয়, অন্তরের ভেতর নয়', হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের জন্যে এ কথা শতভাগ প্রযোজ্য। এমনই এক নির্মোহ বিত্তবান আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বানিয়েছিলেন, যার তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার।

খোরাসানে অবস্থানকালে একবার তাঁর হজে যাওয়ার ইচ্ছা হলো। এলাকার লোকজন যখন সে কথা জানতে পারলো, তখন তাদেরও তাঁর সহযাত্রী হওয়ার আগ্রহ দেখা দিলো। তারা তাঁর কাছে এক প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে জানালো যে, হযরত! আমরাও আপনার সাথে হজে যেতে চাই, যাতে হজের পবিত্র সফরে আপনার সাহচর্য দ্বারা ধন্য হতে পারি। তিনি বললেন, ঠিক আছে, তাহলে তোমরা সকলে তোমাদের পথ খরচা আমার কাছে জমা দাও, যাতে তোমাদের সকলের পক্ষ থেকে আমার একার হাতে তা খরচ হয়। সুতরাং হজ গমনেচ্ছুদের সকলে আপন-আপন পথ খরচা একেকটি থলিতে করে তাঁর কাছে এনে জমা দিলো। তিনি সমস্ত থলি একটা সিন্দুকের মধ্যে তালাবদ্ধ করে রাখলেন। তারপর হজের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়লেন।

পথে সকলের যানবাহন ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে থাকলেন এবং হজ সমাপ্তি পর্যন্ত যতো রকমের খরচার প্রয়োজন হলো সবই তিনি স্বাচ্ছন্দ্যে ঞ্জাম দিলেন। তারপর যথারীতি মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছলেন। সেখানে ছার পর তিনি প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই! তোমার বাড়ির লোকজন া মুনাওয়ারা থেকে কী কী জিনিস নিয়ে যাওয়ার জন্যে বলেছে?

উত্তরে যে যা-কিছু বলেছে, তাকে সঙ্গে নিয়ে বাজার থেকে সব কিনে দিয়েছেন। এভাবে প্রত্যেকের চাহিদামতো কেনাকাটা শেষ করেন। তারপর ফের মক্কা মোকাররমায় চলে আসেন। এখানেও প্রত্যেককে একই প্রশ্ন করেন এবং প্রত্যেককে সঙ্গে নিয়ে চাহিদামতো সবকিছু মক্কা মোকাররমার বাজার থেকে কিনে দেন। পরিশেষে কাফেলা নিয়ে দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন এবং আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় নিরাপদে খোরাসানে ফিরে আসেন।

দেশে ফেরার পর তিনি সকল সাথীকে দাওয়াত করেন এবং অত্যন্ত আলিশান খাবার দ্বারা তাদের আপ্যায়ন করেন। তারপর প্রত্যেককে উপহারও প্রদান করেন। তারপর তিনি তালাবদ্ধ সেই সিন্দুকটি খুলে প্রত্যেককে নিজ নিজ থলি বুঝিয়ে দিলেন। এমনই ছিলো তাঁর দানশীলতা ও বদান্যতা। ঠিক যেন দান-দক্ষিণার এক খরস্রোতা নদী।[১২০]

এ বছর আর হজ্জ করছি না

আরেকবারের হজের সফরের ঘটনা। সঙ্গে একটি কাফেলা ছিলো। পথে কাফেলার কারও একটি মুরগি মারা গেলে তারা সেটি রাস্তার পাশে আবর্জনার মধ্যে ফেলে দেয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. ছিলেন কাফেলার পিছনে। তিনি দেখলেন, কাফেলার লোকে মরা মুরগিটিকে ফেলে দেওয়া মাত্র কাছের বাড়ি থেকে একটি মেয়ে বের হয়ে এলো এবং মুরগিটি দ্রুত কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে ফেললো। তারপর দ্রুত বাড়ির দিকে ছুটে গেলো। এ দৃশ্য দেখে তিনি হয়রান হয়ে গেলেন। ভেবে পাচ্ছিলেন না যে, এতো আগ্রহের সাথে সে মরা মুরগিটি কেন নিয়ে গেলো? কে এই মেয়ে? সে এর দ্বারা কী করবে? তিনি তার পিছন পিছন সেই বাড়িতে চলে গেলেন এবং মেয়েটাকে ডেকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন, সেই সঙ্গে জানতে চাইলেন সে মরা মুরগিটি দিয়ে কী করবে? মেয়েটি অনেকক্ষণ যাবতই কোনও কথা বলছিলো না। তাঁর পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত বললো, আমার বাবার ইন্তিকাল হয়ে গেছে। আমাদের পরিবারে একা তিনিই উপার্জন করতেন। এখন বাড়িতে আমি ও আমার মা আছি। বেশ ক'দিন উপোস আছি। আমরা এমন এক অবস্থায় পৌঁছে গেছি, যে অবস্থায় শরীআত মৃত প্রাণী খাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। সে জন্যেই কেউ যখন কোনও মরা জন্তু ওই আবর্জনার মধ্যে ফেলে দেয়, আমি সেটি কুঁড়িয়ে আনি। এভাবেই আমাদের দিন কাটছে।

---

১২০. সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৩৮৫

মেয়েটির কথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তিনি ভাবলেন, আল্লাহর এই বান্দারা মরা খেয়ে দিন কাটাচ্ছে আর আমি হজে যাচ্ছি! আল্লাহর কাছে আমি কীভাবে মুখ দেখাবো? তিনি খাজাঞ্চিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে কতো টাকা আছে? সে জানালো দু' হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা)। তিনি বললেন, এখান থেকে আমাদের বাড়ি ফিরতে কতো দীনার লাগবে? সে বললো, প্রায় বিশ দীনার। তিনি বললেন, ঠিক আছে, সেই বিশ দীনার রেখে বাকি সব এই মেয়েটিকে দিয়ে দাও। আমরা এ বছর হজ করবো না। এই দীনার দ্বারা এই পরিবারটির যে উপকার হবে, তাতে আশা করি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হজের চেয়েও বেশি সওয়াব দান করবেন। এই বলে তিনি বাড়ির পথ ধরলেন।

এক-দু'টি নয়, তার দানশীলতার এরূপ অজস্র ঘটনা আছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে যে জ্ঞান-গরিমা ও অসামান্য গুণরাজির অধিকারী করেছিলেন, আমরা তা কল্পনাও করতে পারবো না।

আমার নাম বলবেন না

আরেকটি ঘটনা মনে পড়েছে। তিনি যখনই রাক্কা নগরে যেতেন এক যুবক তাঁর সাথে সাক্ষাত করতো। কখনও মাসআলা জিজ্ঞাসা করতো, কখনও অন্য কোনও বিষয়ে কথা বলতো। মোটকথা, উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন সাক্ষাত অবশ্যই করতো। কিন্তু একবার ব্যতিক্রম দেখা গেলো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. রাক্কায় এসেছেন, অথচ যুবকটির কোনও দেখা নেই। এবার সে সাক্ষাত করতে এলো না। তিনি লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কী? এক যুবক সব সময়ই এসে দেখা-সাক্ষাত করতো, কিন্তু এবার যে তাকে দেখছি না? সে কোথায়? তার খবর কী? লোকে জানালো, যুবকটি বিপুল পরিমাণে দেনায় পড়ে গিয়েছিলো, যা সে আদায় করতে পারছিলো না। শেষ পর্যন্ত পাওনাদার তাকে দেনার দায়ে গ্রেপ্তার করিয়ে দিয়েছে। এখন সে জেলে আছে। একথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. খুবই ব্যথিত হলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তার দেনার পরিমাণ কতো? জানা গেলো, দশ হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা)। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, তার পাওনাদার কে? লোকে তার নাম-ঠিকানা বলে দিলো। সবকিছু জানার পর তিনি সেই পাওনাদারের খোঁজে বের হয়ে পড়লেন। মানুষের কাছে জিজ্ঞাসা করে করে তার বাড়িতে পৌছলেন এবং তাকে পেয়েও গেলেন। তিনি তাকে বললেন, ভাই, আমার এক বন্ধু আছে। আপনার কাছে

তার অনেক দেনা এবং সেই দেনার দায়ে সে এখন জেলে আছে। আমি তাঁর সবটা দেনা পরিশোধ করে দিচ্ছি। তবে একটা শর্ত হলো, আমার জীবদ্দশায় আপনি তাকে জানাতে পারবেন না কে তার দেনা শোধ করে দিয়েছে। আপনি এ মর্মে আমার সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ হোন এবং কসম করে একথা স্বীকার করুন। লোকটি কসম করে বললো, আমি তাকে জানাবো না। সুতরাং তিনি তার দশ হাজার দীনার আদায় করে দিলেন। তারপর অনুরোধ করলেন, এখন তাকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনুন। সে গিয়ে তাকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনলো।

কারামুক্তির পর যুবকটি শহরে এসে জানতে পারলো, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. কিছুদিন রাক্কায় অবস্থান করেছিলেন এবং কিছু পূর্বে তিনি বিদায় নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেছেন। এ কথা জানামাত্র সে তাঁর পিছনে পিছনে ছুটলো এবং কিছুদূর যাওয়ার পর রাস্তায় তাকে ধরে ফেললো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. বললেন, আমি তো শুনেছিলাম তুমি জেলে আছো! সে বললো, হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এই মাত্র আমাকে মুক্ত করিয়ে দিয়েছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কীভাবে মুক্তি পেলে? সে বললো, ব্যস আল্লাহ তা'আলা গায়েব থেকে ফেরেশতা পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে আমার দেনা শোধ করে দিয়েছে। ফলে আমি মুক্তি পেয়ে গেছি। তিনি বললেন, খুব ভালো, এখন আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করো। আমিও তোমার জন্যে দু'আ করছিলাম। খুব ভালো লাগছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে মুক্তি দান করেছেন।

পরবর্তীকালে সেই যুবক বলতো, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.-এর জীবদ্দশায় আমি জানতে পারিনি যে, তিনিই আমার এতো বড়ো দেনা পরিশোধ করে দিয়েছিলেন। কারণ আমার পাওনাদার তাঁর সামনে কসম করে বলেছিলো যে, তাঁর জীবদ্দশায় সে একথা কাউকে জানাবে না। পরিশেষে যখন হযরত ইবনুল মুবারক রহ.-এর ইন্তিকাল হয়ে যায়, তখন সে আমাকে জানায় যে, মূলত ইবনুল মুবারক রহ.-এর কারণেই আমি মুক্তি লাভ করেছিলাম এবং আমার এতো বড়ো দেনা তিনিই পরিশোধ করে দিয়েছিলেন।[১২১]

দরজা তো বন্ধ করবে, কিন্তু বাইরে গিয়ে!

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক অনেক উঁচু স্তরের সূফি, মুহাদ্দিস এবং ফকীহ ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অনেক গুণ ও যোগ্যতা দান

---

১২১. তারীখে বাগদাদ, খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ১৫৯

করেছিলেন। এ সব গুণ ও যোগ্যতার কারণে তাঁকে মহব্বতকারী লোকের সংখ্যাও ছিলো অনেক। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে দেখার জন্যে মানুষের ভিড় লেগেই থাকতো। মানুষ আসছে আর কুশল জেনে চলে যাচ্ছে। কিন্তু এক ব্যক্তি এসে বসেছে তো আর ওঠার নাম নেই। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. চাচ্ছিলেন যে, লোকটি উঠে গেলে আমি নিঃসংকোচে আমার প্রয়োজন সারবো। আমার পরিবারের লোকরেদরকে আমার নিকট ডেকে আনবো। কিন্তু লোকটি এদিক সেদিকের কথা বলেই চলছে। যখন অনেক সময় পার হলো, তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. বললেন, ভাই! রোগ তো আপন জায়গায় কষ্টকর আছেই, কিন্তু যারা দেখতে আসছে, তারা পৃথক এক বিড়ম্বনার কারণ হয়েছে। তারা না উপযুক্ত সময়ের প্রতি লক্ষ রাখে, আর না বিরাম-বিশ্রামের প্রতি লক্ষ রাখে। সময়ে অসময়ে তারা চলে আসে। লোকটি বললো, হযরত নিঃসন্দেহে আগন্তুকদের কারণে আপনার কষ্ট হচ্ছে। আপনি অনুমতি দিলে আমি দরোজা বন্ধ করে দেই? যাতে আর কেউ আসতে না পারে। আল্লাহর এই বান্দা তারপরেও বুঝছিলো না যে, তার কারণেই হযরতের কষ্ট হচ্ছে। পরিশেষে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক তাকে বললেন, হ্যাঁ, দরোজা বন্ধ তো করবে, তবে তুমি বাইরে গিয়ে বন্ধ করবে। কিছু মানুষ এমন থাকে, যারা বুঝতেই পারে না যে, আমি কষ্ট দিচ্ছি। বরং তারা মনে করে যে, আমি তো খেদমত করছি।

প্রতিবেশী কামারের আক্ষেপ ও উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্তি

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. বড়ো মাপের একজন আল্লাহর ওলী ছিলেন। তিনি অনেক বড়ো ফকীহ ও মুহাদ্দিছ ছিলেন। আল্লাহপাক তাঁকে অনেক উঁচু মর্যাদা দান করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখলো। জিজ্ঞাসা করলো, আল্লাহ আপনার সঙ্গে কীরূপ আচরণ করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, মহান আল্লাহ আমার সঙ্গে অনেক সদয় আচরণ করেছেন, আমার প্রতি খুব করুণা প্রদর্শন করেছেন এবং আমাকে অনেক নেয়ামত দান করেছেন। কিন্তু আমার বাড়ির পাশে এক কর্মকার বাস করতো। আল্লাহপাক তাকে যেই মর্যাদা দান করেছেন, তা আমার লাভ হয়নি।

লোকটি সজাগ হয়ে সকালবেলা চিন্তা করতে শুরু করলো, কে সেই কর্মকার, যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের মতো আল্লাহর ওলীর চেয়ে বেশি মর্যাদা লাভ করলো। আর ব্যাপারটা আসলে কী। বিষয়টা তার মনে

কৌতূহল জাগালো। জানতে ইচ্ছে হলো, সে এমন কী আমল করতো, যার বদৌলতে সে এতো বড়ো মর্যাদা পেলো!

লোকটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের এলাকায় গেলো। খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলো, ঠিকই তাঁর বাড়ির পাশে এক কর্মকার বাস করতো এবং সে মৃত্যুবরণ করেছে। তার ঘরে গিয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বললো। জিজ্ঞাসা করলো, আপনার স্বামী এমন কী আমল করতেন যে, আল্লাহপাক তাকে এতো বড়ো মর্যাদা দান করলেন? স্ত্রী বললো, আমার স্বামী একজন সহজ সরল সাধারণ মানুষ ছিলেন। সারা দিন লোহা পেটাতেন। কারণ, তিনি একজন কর্মকার ছিলেন। তবে তার মধ্যে একটি বিষয় ছিলো যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. আমাদের ঘরের সামনের ওই বাড়িটিতে বাস করতেন। রাতে যখন তাহাজ্জুদের জন্যে জাগ্রত হতেন, তখন বাড়ির ছাদে নামাযে এমনভাবে দাঁড়িয়ে যেতেন, যেন একটি কাঠ দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। একটুও নড়াচড়া করতেন না। আমার স্বামী যখন এই দৃশ্য দেখতেন, তখন বলতেন, আল্লাহ লোকটিকে সময়-সুযোগ দান করেছেন। তিনি রাতভর নামায পড়েন। ইবাদত করেন। তাঁকে দেখে আমার ঈর্ষা লাগে। আল্লাহ যদি আমাকেও এমন অবসর দান করতেন, তা হলে আমিও তাঁর মতো এভাবে ইবাদত করে রাত কাটাতাম। তিনি এর জন্যে আক্ষেপ করতেন যে, আমি একজন কর্মকার মানুষ; সারা দিন লোহা পিটিয়ে ক্লান্ত হয়ে যাই আর রাত হলেই ঘুমের ঘোরে তলিয়ে যাই। ফলে তাহাজ্জুদ পড়ার সুযোগ আমার ঘটে না।

তার মধ্যে আরও একটা গুণ ছিলো যে, তিনি কর্মকারের কাজ করতেন। সারা দিন লোহা পেটাতেন। আর আযান হয়ে গেলে যে অবস্থায়ই থাকতেন না কেন, আর কাজ করা সমীচীন মনে করতেন না। লোহায় বাড়ি দেওয়ার জন্যে হাতুড়িটা মাথার উপর তুলে ধরেছেন। ঠিক এই অবস্থায় যদি আযানের শব্দ কানে আসতো অমনি তিনি কাজ বন্ধ করে দিতেন। সেই বাড়িটাও আর লোহার গায়ে দেওয়া সঙ্গত মনে করতেন না। হাতুড়িটা পিছনে ফেলে দিয়ে নামায আদায়ের জন্যে মসজিদে চলে যেতেন। তিনি বলতেন, আযান শোনার পর আর কাজ করা আমার জন্যে জায়েয মনে করি না।

শুনে লোকটি বললো, ব্যস, এই দুটি কারণেই আল্লাহপাক তাঁকে এতো উঁচু মর্যাদা দান করেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকেরও আগে চলে গিয়েছেন।

হযরত মূসা কাযেম রহ.-এর ঘটনা

হযরত মূসা কাযেম রহ. হযরত জা'ফর সাদেক রহ.-এর পুত্র। তিনি তাকওয়া, পরহেযগারী এবং জ্ঞান ও গুণে নবী পরিবারের গুণাবলীর ধারক বাহক এবং স্বীয় যুগে মুসলমানদের অভিভাবক ও ইমাম ছিলেন। হাদীসশাস্ত্রেও তিনি ছিলেন উচ্চস্তরের অধিকারী। ইমাম তিরমিযী রহ. এবং ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১২২]

তিনি মদীনায় বসবাস করতেন। তৎকালীন খলীফা মাহদীর মধ্যে এই ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয় যে, সম্ভবত তিনি হুকুমতের বিপক্ষে বিদ্রোহ করবেন। ফলে খলীফা তাঁকে গ্রেফতার করেন। তাঁর গ্রেফতারী অবস্থায় হযরত আলী রাযি.-এর সঙ্গে স্বপ্নযোগে খলীফার সাক্ষাত হয়। খলীফা মাহদী স্বপ্নে দেখেন, হযরত আলী রাযি. মাহদীকে সম্বোধন করে এই আয়াত তেলাওয়াত করছেন–

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ

'তোমাদের থেকে কি এরূপ প্রত্যাশা করবো, তোমরা হুকুমতের অধিকারী হলে পৃথিবীর বুকে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে।'[১২৩]

মাহদীর যখন ঘুম ভাঙলো তখনও রাতের কিছু অংশ অবশিষ্ট ছিলো। কিন্তু ভোর হওয়া পর্যন্ত তার অপেক্ষা করার সাহস হলো না। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীকে ডেকে নির্দেশ দিলেন, এখনই হযরত মূসা কাযেমকে এখানে নিয়ে আসো। তিনি আগমন করলে মাহদী সসম্মানে তাঁর সঙ্গে কোলাকুলি করলেন এবং পাশে উপবেশন করালেন। তারপর স্বপ্নের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে বললেন, আপনি কি এ বিষয়ে আমাকে নিশ্চয়তা দিতে পারেন যে, আমি আপনাকে মুক্ত করে দিলে আমার বা আমার সন্তানদের বিরুদ্ধে আপনি বিদ্রোহ করবেন না! হযরত জবাব দিলেন, আল্লাহর কসম! আমি কখনো এমন করিনি এবং

---

১২২. আল খুলাসা, পৃষ্ঠা: ৩৯০, খাযরাজীকৃত,
১২৩. সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ২২

তা আমার স্বভাবও নয়। একথা শুনে মাহদী তাঁকে তিন হাজার দীনার হাদিয়া পেশ করলেন এবং মুক্ত করে দিলেন। খলীফা মাহদীর উজির রবী' বলেন, আমি রাতারাতি তার এ নির্দেশ পালন করি এবং অন্য কোথাও কোনো বাধার সৃষ্টি হতে পারে এ আশঙ্কায় ভোরের আলো ফোটার পূর্বেই তাঁকে মদীনার পথে পাঠিয়ে দেই।[১২৪]

পরবর্তীকালে যখন হারুনুর রশীদ খলীফা হন, তখন তারও এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়। ফলে তিনি যখন হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে হিজায যাত্রা করেন তখন সেখান থেকে হযরত মূসা কাযেমকে সঙ্গে নিয়ে আসেন এবং দ্বিতীয়বার তাঁকে বাগদাদে বন্দী করে রাখেন। এই বন্দী অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়বার বন্দীকালীন সময়ে তিনি হারুনুর রশীদকে সংক্ষিপ্ত যে পত্রটি লেখেন, তা সাহিত্যালঙ্কার এবং পাঠকের মনে গভীর প্রভাব সৃষ্টিতে এক শ্রেষ্ঠ কর্ম হিসাবে বিবেচিত। যতবারই পাঠ করা হয়, ততবারই তার মধ্যে প্রজ্ঞা ও উপদেশের পূর্ণ এক জগত দৃষ্টিগোচর হয়। ভাবের সাগরকে তিনি কলসে ভরে দিয়েছেন। তাঁর এ পত্রের প্রকৃত ভাব ও প্রভাব তো আরবী ভাষাতেই নিহিত, তবে বাংলায় তার ভাবার্থ নিম্নরূপ। তিনি বলেন,

> 'আমার এই পরীক্ষার প্রত্যেকটি দিন তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের একটি করে দিন সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত আমরা উভয়ে এমন এক দিনে উপনীত হবো, যা কখনই আর শেষ হবে না। সেদিন সেসব লোকের জন্যে ধ্বংস অনিবার্য, যারা ভ্রান্তির উপর আছে।'[১২৫]

হযরত মূসা কাযেম রহ. ছিলেন কাশফ ও কারামতের অধিকারী বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব। অধিক ইবাদত করার কারণে 'আল আব্দুস সালেহ' তথা 'পুণ্যবানপুরুষ' তাঁর উপাধি হয়। দানশীলতার দিক দিয়েও এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। যখন কারো সম্পর্কে তিনি অবগত হতেন যে, সে তার গীবত করে, তখন তার নিকট হাদিয়াস্বরূপ কিছু অর্থ পাঠিয়ে দিতেন। হারুনুর রশীদ কর্তৃক বন্দী অবস্থায় ৫ই রজব ১৬৩ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১২৬]

---

১২৪. সিফাতুস সাফওয়া, ইবনুল জাউযীকৃত, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১০৪
১২৫. সিফাতুস সাফওয়া, ইবনুল জাউযীকৃত, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১০৫
১২৬. আততাবাকাতুল কুবরা, শা'রানীকৃত, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৩, জাহানে দীদাহ, পৃষ্ঠা: ৪১ থেকে সংগৃহীত

হযরত লাইস ইবনে সা'দ রহ.-এর ঘটনা

হযরত লাইস ইবনে সা'দ রহ.-ও উঁচু স্তরের মুজতাহিদ ইমামদের অন্যতম। তাঁর সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেছেন,

'লাইস ইবনে সা'দ রহ. ইমাম মালেক রহ. অপেক্ষা বড় ফকীহ ছিলেন। তবে তাঁর শাগরিদগণ তাঁর ফিক্‌হ সংরক্ষণে ব্রতী হয়নি।'[১২৭]

হাদীস বর্ণনাতেও তিনি ইমাম ছিলেন। এমন প্রখর স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন যে, তাঁর জনৈক শাগরিদ একবার তাঁকে বললো, কখনও আপনার মুখে এমন হাদীসও শুনতে পাই, যা আপনার কিতাবসমূহে নেই। তখন হযরত লাইস ইবনে সা'দ রহ. বলেন, 'তোমরা কি মনে করেছো, আমার বক্ষে ধারণকৃত সকল হাদীস আমার কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি। বাস্তব হলো, আমার সিনায় রক্ষিত সকল হাদীস গ্রন্থাকারে লিখলে সে সকল গ্রন্থ বহনের জন্যে এই সওয়ারী যথেষ্ট হবে না।'[১২৮]

ইলম ও আমলের সঙ্গে ধনদৌলতেও আল্লাহপাক তাঁকে ভূষিত করেছিলেন। কথিত আছে, তার বার্ষিক আয় ছিলো ২০ হাজার থেকে ২৫ হাজার স্বর্ণমুদ্রা। কিন্তু দয়া-দাক্ষিণ্য, বদান্যতা ও আল্লাহর পথে ব্যয়ের ক্ষেত্রে তিনি এতো বেশি অগ্রণী ছিলেন যে, তাঁর সমগ্র জীবনে কখনো যাকাত ফরয হয়নি। বরং তাঁর পুত্র বলেন, বছর শেষে কখনো কখনো তিনি ঋণী হয়ে পড়তেন।[১২৯] কুতায়বা বলেন, তিনি প্রত্যহ তিনশ' মিসকিনকে দান করতেন।[১৩০]

একবার কয়েকজন লোক হযরত লাইস ইবনে সা'দ রহ. থেকে কিছু ফল ক্রয় করে। ক্রয় শেষে তাদের নিকট মূল্য বেশি মনে হওয়ায় তারা তা ফিরিয়ে দিতে আসে। হযরত লাইস ইবনে সা'দ রহ. ফল ফেরত নিয়ে তাদের টাকা দিয়ে দেন। তারপর তাদের প্রস্থানকালে তিনি নিজের

---

১২৭. তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৪৬২
১২৮. তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৪৬২
১২৯. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবীকৃত, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ১৫২
১৩০. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবীকৃত, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ১৫২

লোকদেরকে বলেন, তাদেরকে পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা অধিক দিয়ে দাও। তখন তাঁর পুত্র এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, আল্লাহ আমাকে মাফ করুন। ফল ক্রয় করার মধ্যে তাদের একটি আশা ছিলো (যা পূর্ণ হয়নি), তাই আমি তাদের আশার কিছু প্রতিদান দিতে চাই।

একদা এক মহিলা তাঁর নিকট এসে নিজের সন্তানের রোগের কথা জানায় এবং তার জন্যে অল্প মধুর প্রয়োজনের কথা বলে। হযরত লাইস ইবনে সা'দ রহ. একটি মশক (চামড়ার তৈরী পানির পাত্র) ভর্তি মধু দিয়ে দেন। তাতে ১২০ রিতিল (প্রায় ৬০ সের) মধু ছিলো। সে মহিলা তা নিতে বারবার অস্বীকার করছিলো এবং বলছিলো, আমার তো সামান্য মধু দরকার। কিন্তু হযরত লাইস ইবনে সা'দ রহ. তার কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে মশক তার বাড়িতে পৌছিয়ে দেন।

সর্বশ্রেণির লোকের মধ্যে তাঁর প্রতি সম্মানবোধ এতো বেশি ছিলো যে, তৎকালীন শাসকগণও তাঁর কথা নতশিরে মেনে নিতেন এবং তাঁর পরামর্শ নিয়ে কাজ করাকে নিজেদের সৌভাগ্য মনে করতেন। একবার খলীফা মনসূর তাঁকে মিসরের গভর্নরের পদ পেশ করেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান।

দৈনিক তাঁর চারটি মজলিস হতো। একটি আমীর ও শাসকদের জন্যে। তখন তারা এসে রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতো। দ্বিতীয়টি ছিলো হাদীসের ছাত্রদের জন্যে। তৃতীয় মজলিস ছিলো ফতওয়া প্রদানের জন্যে। চতুর্থ মজলিস হতো জনসাধারণের প্রয়োজন পূরণ করার লক্ষ্যে ও তাদের সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে। সে সময় লোকেরা নিজ নিজ প্রয়োজনের কথা বলতো এবং তিনি তা পূরণ করার চেষ্টা করতেন।

হযরত লাইস ইবনে সা'দ রহ. ১৫ই শাবান ১৭৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর জানাযা নামাযে এতো বেশি লোকের সমাগম হয় যে, খালেদ ইবনে আব্দুস সালাম বলেন, আমি এমন জানাযা অন্য কারো দেখিনি।[১৩১]

---

১৩১. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবীকৃত, খণ্ডঃ ৮, পৃষ্ঠাঃ ১৫০, পূর্বোক্ত ঘটনাসমূহও এ কিতাব থেকেই সংগৃহীত

হযরত ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর ঘটনাবলী

হযরত ইমাম আবু ইউসুফ রহ. মুসলিম উম্মাহর সে সকল মহান কৃপাশীলদের অন্যতম, যাঁদের দয়া ও অনুগ্রহের বোঝায় এ উম্মতের গর্দান চিরদিন অবনত থাকবে। বিশেষভাবে হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের জন্যে তাঁর খেদমত অবিস্মরণীয়। তিনি একজন ফকীহ হিসেবে তাঁর শায়েখ হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর জ্ঞানধারা উম্মতের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন শুধু তাই নয়, বরং প্রধান বিচারপতি হিসেবে এই ফিক্হকে নিরেট মতবাদের অবস্থান থেকে বের করে বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

হযরত ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর পিতা ইবরাহীম তাঁর বাল্যকালেই ইন্তিকাল করেন। তাঁর আম্মা জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে তাঁকে এক ধোপার হাতে অর্পণ করেন। কিন্তু তাঁর লেখাপড়া করার প্রবল আগ্রহ থাকায় তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর দরসে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। তাঁর মা একথা জানতে পেরে তাঁকে দরসে আসতে বারণ করেন, ফলে কয়েকদিন তিনি দরসে অনুপস্থিত থাকেন। মেধাবী ও আগ্রহী ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের সুদৃষ্টি থাকা একটি সহজাত বিষয়। কয়েকদিন পর তিনি দরসে উপস্থিত হলে ইমাম ছাহেব তাঁর অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি পূর্ণ বৃত্তান্ত তুলে ধরেন। দরস শেষ হওয়ার পর হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. তাঁকে নিকটে ডেকে নিয়ে একশ' দিরহামে পূর্ণ একটি থলে হাতে দিয়ে বলেন, এগুলো দিয়ে কাজ চালাও। শেষ হয়ে গেলে আমাকে জানাবে। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ রহ. নিজেই বলেন, এরপর কখনো থলে শেষ হওয়ার কথা ইমাম ছাহেবকে বলতে হয়নি। সর্বদা এমন হতো, টাকা শেষ হয়ে গেলেই ইমাম ছাহেব নিজে অতিরিক্ত টাকা দান করতেন। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, আমার টাকা শেষ হওয়ার ব্যাপারে তাঁর নিকট ইলহাম হতো।

তাঁর মাতা সম্ভবত একথা ভেবে যে, এ ধারা কতদিন চলতে পারে, উপার্জনের ভিন্ন কোনো ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। একবার তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ.-কে বললেন, আমার এ সন্তান একটি এতীম বালক। আমি চাই সে কোনো কাজ শিখে উপার্জন করার যোগ্য হোক। অতএব আপনি তাকে

আপনার দরসে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখুন। তখন হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেন, আপনার সন্তান তো পেস্তা ও ঘিয়ে তৈরি ফালুদা ভক্ষণ করার শিক্ষা অর্জন করছে। কথাটিকে রসিকতা ভেবে তাঁর মাতা চলে যান।

তবে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. নিজেই বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই ইলমের বদৌলতে প্রধান বিচারপতির মর্যাদাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করেন। তৎকালীন খলীফা হারুনুর রশীদের দস্তরখানে মাঝে মধ্যেই আমার আতিথ্য গ্রহণের সুযোগ হতো। একদিন আমি খলীফা হারুনুর রশীদের সঙ্গে বসা ছিলাম। তখন তিনি আমাকে একটি বাটি দিয়ে বললেন, এটি বিশেষ মূল্যবান একটি খাবার, যা আমার জন্যেও কদাচিৎ তৈরি করা হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমিরুল মুমিনীন! এটি কী জিনিস? তিনি বললেন, এটি পেস্তা ও ঘি সহযোগে তৈরি ফালুদা। একথা শুনে আমি বিস্মিত হলাম এবং আমার হাসি পেলো। খলীফা হারুনুর রশীদ আমার হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলে, আমি পূর্ণ ঘটনা খুলে বললাম। তখন তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন। তিনি স্বীয় অন্তর্চক্ষু দ্বারা এমন কিছু দেখতেন, যা বাহ্যিক চোখ দ্বারা দেখা সম্ভব নয়।'[১৩২]

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-কে হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর সোহবতের বরকতে ইলম ও ফিক্‌হশাস্ত্রে এমন উঁচু মর্যাদা দান করেছিলেন, যা খুব কম লোকই পেয়ে থাকে। ইলমে ফিক্‌হ ছাড়া ইলমে হাদীসেও তাঁর উচ্চ অবস্থান সর্বজন স্বীকৃত। এমনকি যারা ভুল বোঝাবুঝির কারণে হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. এবং ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর উপর ইলমে হাদীস বিষয়ে আপত্তি করে থাকে, তারাও হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-কে নির্ভরযোগ্য (ثقة) বলে স্বীকৃতি দেন। বরং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, আমি যখন ইলমে হাদীস শিক্ষা করতে ইচ্ছা করি, তখন সর্বপ্রথম কাজী আবু ইউসুফ রহ.-এর নিকট গমন করি। তারপর অন্যান্য শাইখের নিকট থেকে ইলম হাসিল করি।[১৩৩]

হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মৃত্যুর পর তিনি প্রায় সতের বছর বিচারপতির গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ইসলামের ইতিহাসে 'কাযিউল কুযাত' (চিফ জাস্টিস) উপাধি সর্বপ্রথম তাঁর জন্যেই ব্যবহার করা হয়। হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. থেকে বর্ণিত আছে, প্রধান

---

১৩২. তারীখে বাগদাদ, খতীবকৃত, খণ্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ২৪৫
১৩৩. তারীখে বাগদাদ, খতীবকৃত, খণ্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ২৫৫

বিচারপতির দায়িত্বে ভীষণ ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রতিদিন সুচারুরূপে দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে দিনে-রাতে প্রত্যহ দুইশ' রাকাআত নফল নামায আদায় করতেন।[১৩৪]

হযরত ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-কে সর্বপ্রথম খলীফা মূসা ইবনে মাহদী বিচারপতি নিযুক্ত করেন। ঘটনাচক্রে একজন সাধারণ নগরবাসীর সঙ্গে একটি বাগান নিয়ে স্বয়ং খলীফারই বিবাদ সৃষ্টি হয়। তখন এ ব্যাপারে কাজী আবু ইউসুফ রহ.-এর নিকট মোকদ্দমা দায়ের করা হয়। খলীফা মূসার পক্ষ থেকে বাগানের উপর তাঁর মালিকানার সাক্ষ্য পেশ করা হয়। সাক্ষ্য অনুযায়ী বাহ্যত খলীফার পক্ষেই রায় হওয়ার কথা ছিলো, কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর কিছুটা সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, সাক্ষ্য দ্বারা যেমনটি প্রকাশ পাচ্ছে, প্রকৃত সত্য হয়তো তার বিপরীত। তাই তিনি মূসা ইবনে মাহদীকে আদালতে তলব করে বলেন, আমিরুল মুমিনীন! আপনার প্রতিপক্ষের দাবি হলো, আপনার সাক্ষীদের বক্তব্য সত্য কিনা সে বিষয়ে আপনার নিকট থেকে শপথ নেওয়া হোক।

আদালতের সাধারণ আইনানুসারে বাদী তার দাবির পক্ষে নির্ভরযোগ্য সাক্ষী পেশ করলে তাকে আর শপথ করতে বাধ্য করা যায় না, তাই খলীফা মূসা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার মতে বাদীর নিকট থেকে এভাবে শপথ নেওয়া চলে কি? ইমাম আবু ইউসুফ রহ. উত্তর দিলেন, কাজী ইবনে আবী লায়লা বাদীর নিকট থেকে শপথ নেওয়া জায়েয মনে করতেন। খলীফা এমন বৈষয়িক বিষয়ে শপথ করা পছন্দ করলেন না। তিনি বললেন, আমি বাগানের ব্যাপারে আমার দাবি প্রত্যাহার করে নিলাম।

সুতরাং বিবাদীকে সে বাগান দিয়ে দেওয়া হয়।[১৩৫]

সতের বছর প্রধান বিচারপতির কঠিন দায়িত্ব পালন করার পর যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, তখন ইমাম আবু ইউসুফ রহ. একবার বলেন, আমি সজ্ঞানে কোনো মোকদ্দমায় অন্যায় বিচার করিনি। সর্বদা কুরআন ও হাদীসের আলোকে রায় প্রদানের চেষ্টা করেছি। কখনো কোনো মাসআলায় জটিলতা দেখা দিলে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর কথার উপর নির্ভর করেছি, কেননা আমার জানা মতে তিনি আল্লাহ তা'আলার বিধানের শ্রেষ্ঠতম ভাষ্যকার ছিলেন।

---

১৩৪. মিরআতুল জিনান, ইয়াফে'য়ীকৃত, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৮২
১৩৫. তারীখে বাগদাদ, খতীবকৃত, খণ্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ২৪৯

হযরত মা'রূফ কারখী রহ. ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর সমসাময়িক ছিলেন। একদিন তিনি তাঁর জনৈক মুরীদকে বললেন, ইমাম আবু ইউসুফ রহ. অসুস্থ। যদি তিনি মারা যান, তাহলে আমাকে অবশ্যই অবহিত করবে। তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ উদ্দেশ্য ছিলো।

উক্ত মুরীদ ব্যক্তি বলেন, আমি ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর পরিস্থিতি জানার জন্যে তাঁর বাড়ি গেলে সেখান থেকে তাঁর জানাযা বের হতে দেখি। তখন আমি চিন্তা করলাম, হযরত মা'রুফ কারখীকে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ জানাবো এবং তিনি জানাযায় অংশগ্রহণ করবেন, এতো সময় আমার হাতে নেই। তাই আমি নিজে তাঁর জানাযা নামাযে শরীক হই এবং পরে হযরত মা'রুফ কারখী রহ.-কে সব ঘটনা খুলে বলি। হযরত মা'রুফ কারখী রহ. বারবার ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়তে থাকেন এবং জানাযায় অংশগ্রহণ করতে না পারায় অত্যন্ত আক্ষেপ করতে থাকেন।

একজন আলেম ব্যক্তি যিনি দীর্ঘ সতের বছর প্রধান বিচারপতির গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে সমসাময়িক লোকদের খারাপ ধারণা সৃষ্টি না হলেও অন্ততপক্ষে তাঁর বুযুর্গী ও পরহেযগারী সম্পর্কে এমন মনোভাব অবশিষ্ট থাকে না যে, হযরত মা'রুফ কারখী রহ.-এর মতো মহান বুযুর্গ তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করতে না পেরে ব্যথিত হবেন। তাই বোধ হয়, মুরীদ লোকটি হযরত মা'রুফ কারখী রহ.-কে জিজ্ঞাসা করে, তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করতে না পেরে আপনার এতো আফসোস হচ্ছে কেন? হযরত মা'রুফ কারখী রহ. বললেন, আমি দেখি, (হয়তো স্বপ্নযোগে) আমি যেন জান্নাতে গিয়েছি। সেখানে একটি মহল তৈরি করা হয়েছে, যার দরজায় পর্দা ঝুলানো রয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ মহলটি কার? আমাকে উত্তর দেওয়া হলো, এটি কাজী আবু ইউসুফ রহ.-এর মহল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোন আমলের বদৌলতে তিনি এমন মর্যাদা পেলেন? উত্তর দেওয়া হলো, তিনি মানুষকে সৎকাজ করার শিক্ষা দিতেন এবং নিজেও সৎকাজ করতে লালায়িত ছিলেন। মানুষ তাঁকে অনেক কষ্ট দিয়েছে।[১৩৬]

---

১৩৬. তারীখে বাগদাদ, খতীবকৃত, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২৬১

হযরত ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর ঘটনা

ইয়েমেনের এক সাইয়্যেদ পরিবারে হযরত ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর জন্ম। আর্থিক দিক থেকে তিনি ছিলেন অসচ্ছল। বাল্যকালেই পিতৃস্নেহ মাথার উপর থেকে উঠে যায় এবং তখনই তাঁর মাতা তাঁকে মক্কা মুকাররমায় নিয়ে আসেন। সেখানেই তিনি বড়ো হন। ইলম হাসিল করেন। মদীনা তয়্যিবাতে ইমাম মালেক রহ.-এর নিকট গমন করে তাঁর নিকট থেকে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন। তারপর তিনি নাজরানে এক সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হন। সেখানে তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত পূর্ণ সততা ও আমানতদারীর সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। কিন্তু বড়োদের পরীক্ষাও হয়ে থাকে বড়ো। তৎকালীন খলীফা (হারুনুর রশীদ) আলী রাযি.-এর বংশের ইয়েমেনের কিছু অধিবাসী সম্পর্কে সংবাদ পান যে, তারা কেন্দ্রের বিপক্ষে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছে। নাজরানের গভর্নর শত্রুতা পোষণ করে ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর সম্পর্কেও প্রপাগাণ্ডা ছড়ায় যে, আলী বংশের সেই লোকদের সঙ্গে তাঁরও গভীর সম্পর্ক রয়েছে। খলীফা তাঁর উপর সন্দিহান হন এবং সে সব লোকের সঙ্গে ইমাম শাফেয়ী রহ.-কেও গ্রেফতার করে বাগদাদে নিয়ে আসেন।

সে সময় হারুনুর রশীদের দরবারে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর শাগরিদ হযরত ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান শাইবানী রহ.-এর বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিলো। ইমাম শাফেয়ী রহ. হারুনুর রশীদের দরবারে পৌঁছে নিজের উপর আরোপিত অভিযোগ প্রত্যাহারের বিষয়ে ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তিনি আমার সম্পর্কে অবগত আছেন। হারুনুর রশীদ ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর নিকট তাঁর সম্পর্কে জানতে চাইলে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, আমি তাঁর সম্পর্কে অবগত আছি। তিনি একজন বড়ো আলেম। তাঁর সম্পর্কে যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে, তাঁর মতো ব্যক্তি দ্বারা একাজ হতে পারে না। তখন হারুনুর রশীদ ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-কে বললেন, আপনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যান। আমি তাঁর সম্পর্কে ভেবে দেখছি। এভাবে বিদ্রোহের অভিযোগে ইয়েমেন থেকে গ্রেফতারকৃত লোকদের মধ্য থেকে একমাত্র ইমাম শাফেয়ী রহ.-ই রক্ষা পান।

এটি ১৮৪ হিজরীর ঘটনা। তখন ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর বয়স ৩৪ বছর। এই পরীক্ষা গ্রহণের পিছনে আল্লাহ তা'আলার অনেক হিকমতও ছিলো। ইমাম শাফেয়ী রহ. নাজরানের সরকারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। এ পরীক্ষার ফলে পুনরায় তাঁর নিখাঁদ ইলমের দিকে মনোযোগী হওয়ার সুযোগ ঘটে। তাছাড়া ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর সঙ্গে এ পর্যন্ত তাঁর শুধুমাত্র জানাশোনাই ছিলো। এখন তিনি যথানিয়মে তাঁর নিকট পাঠ গ্রহণে ব্রতী হন। তাঁর মাধ্যমে ইরাকবাসীর ইলম তাঁর মধ্যেও স্থানান্তর হয়। ফলে ইমাম শাফেয়ী রহ. হেজায ও ইরাক উভয় দেশের ইলম অর্জন করতে সক্ষম হন।

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. ইমাম শাফেয়ী রহ.-কে খুব সম্মান করতেন। একবার ইমাম মুহাম্মাদ রহ. অশ্বারোহণ করে খলীফার দরবারে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ইমাম শাফেয়ী রহ.-কে তাঁর সাক্ষাতে আসতে দেখেন। ইমাম মুহাম্মদ রহ. তাঁকে দেখে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করেন এবং তাঁর গোলামকে খলীফার নিকট গিয়ে তাঁর পক্ষ থেকে ওযর পেশ করতে বলেন। ইমাম শাফেয়ী রহ. একথাও বলেছিলেন যে, আমি অন্য কোনো সময় আসবো। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ রহ. তাতে রাজি হননি, বরং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে নিজ গৃহে ফিরে আসেন।

এভাবে প্রায় দু' বছর তিনি বাগদাদে অবস্থান করেন এবং ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর নিকট ইলম হাসিল করে পুনরায় মক্কায় ফিরে যান। ৯ বছর সেখানেই অবস্থান করেন। সে সময় তিনি উসূলে ফিক্হ সংকলনের চিন্তা শুরু করেন। ১৯৫ হিজরীতে পুনরায় তিনি বাগদাদ চলে আসেন এবং সেখানে 'আর রিসালা' গ্রন্থ সংকলন করেন। শেষ বয়সে মিসরের গভর্নরের দাওয়াতে তিনি মিসর গমন করেন। পরিশেষে ২০৪ হিজরীর রজব মাসে তিনি সেখানেই ইন্তিকাল করেন।

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইমাম শাফেয়ী রহ.-কে বিশেষ বিশেষ নেয়ামতে ধন্য করেন। তিনি সাত বছর বয়সে পূর্ণ কুরআন শরীফ হিফয করেন। দশ বছর বয়সে 'মুআত্তায়ে ইমাম মালেক রহ.' পূর্ণ মুখস্থ করেন।[১৩৭] তীর নিক্ষেপে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। নিজেই বলতেন, 'আমি দশটি তীর নিক্ষেপ করলে দশটি তীরই তার সঠিক নিশানায় গিয়ে বিদ্ধ হবে।' এমন যাদুময় ভঙ্গিতে তিনি কুরআন পাঠ করতেন যে, শ্রোতাদের কান্না এসে যেতো। খতীবে বাগদাদী রহ. ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর সমসাময়িক জনৈক ব্যক্তির

১৩৭. তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ২৭

উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, 'আমরা কখনো কাঁদতে চাইলে একে অপরকে বলতাম, চলো, মুত্তালিবী বংশের সেই যুবকের নিকট গিয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুনি। আমরা তাঁর নিকট গেলে তিনি নিজে কুরআন তিলাওয়াত আরম্ভ করতেন। মানুষ তাঁর সম্মুখে মাটিতে গড়াগড়ি খেতো। কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করতে থাকতো। তখন তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করে দিতেন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইলমের সঙ্গে সঙ্গে বাগ্মীতাও দান করেছিলেন। তাই তিনি সে যুগের বড়ো বড়ো আলেমের সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক করেন। কোনো কোনো বিতর্কের ঘটনা তিনি স্বীয় প্রণীত 'কিতাবুল উম্ম' গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। এতদসত্ত্বেও তাঁর ইখলাছ এমন নিখাঁদ ছিলো যে, তিনি বলেন,

'আমি যখন যার সঙ্গেই বিতর্কে লিপ্ত হয়েছি, আমার মনে কখনও বিপক্ষের ভুল প্রমাণিত হোক এ অভিলাষ জাগেনি।'[১৩৮]

ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর রচিত গ্রন্থসমূহ ইলমে ফিক্হ এবং ইলমে হাদীসের ভিত্তি। তাঁকে উসূলশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। অথচ তিনি বলেন,

'আমার ইচ্ছে হয়, মানুষ এ সকল গ্রন্থ পাঠ করে উপকৃত হোক, কিন্তু এগুলোকে আমার দিকে সম্পৃক্ত না করুক।'[১৩৯]

যাঁর ইখলাছ ছিলো এমন নিখাঁদ, তাঁর ইলমে বরকত কেন হবে না? কেনই বা সমগ্র বিশ্বে তাঁর ইলম বিস্তার লাভ করবে না? অনেকে তো তাঁকে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আখ্যা দিয়েছেন।[১৪০]

---

১৩৮. আদাবুশ শাফেয়ী' রহ. ওয়া মানাকিবুহু, ইবনে আবী হাতেমকৃত, পৃষ্ঠাঃ ৩২৬
১৩৯. আদাবুশ শাফেয়ী' রহ. ওয়া মানাকিবুহু, ইবনে আবী হাতেমকৃত, পৃষ্ঠাঃ ৩২৬
১৪০. তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ডঃ ৯, পৃষ্ঠাঃ ২৭

হযরত আলী রেযা রহ.-এর ঘটনা

হযরত আলী রেযা রহ. হযরত মূসা কাযেম রহ.-এর ছাহেবজাদা। তিনি হযরত হুসাইন রাযি.-এর ষষ্ঠ অধঃস্তন পুরুষ। ১৫১ হিজরীতে মদীনা শরীফে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধর হওয়ার মর্যাদা লাভের সাথে সাথে অনেক বড়ো আলেম এবং বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। সুনানে ইবনে মাজাতে তাঁর রেওয়াতও আছে। হাফেয ইবনে হাজার রহ. লিখেছেন যে, তাঁর বয়স যখন মাত্র একুশ বছর তখন তিনি মসজিদে নববীতে ফতওয়া দিতে আরম্ভ করেন। তবে হাদীস বর্ণনার কাজে তিনি বেশি মশগুল থাকেননি। তাঁর থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের বেশির ভাগ যয়ীফ রাবী।[১৪১]

খলীফা মামুনুর রশীদ তাঁর খুব ভক্ত ছিলেন। একবার হযরত আলী রেযার ভাই যায়েদ বিন মূসা খলীফা মামুনুর রশীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসরাতে অনেক রক্তপাত করে। খলীফা মামুন আলী রেযাকে সেখানে পাঠান। তিনি তাঁর ভাইকে তিরস্কার করেন এবং বলেন যে, মুসলমানদের রক্তপাত করার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। মামুনুর রশীদ বিষয়টি জানতে পেরে কাঁদলেন এবং বললেন, আহলে বাইত এতো উঁচু আখলাকের হয়ে থাকে। মামুনুর রশীদ তাঁকে খোরাসান আসার জন্যে দাওয়াত দেন। ২০২ হিজরীতে নিজকন্যা উম্মে হাবীবকে তাঁর সঙ্গে বিবাহ দেন। তাঁকে নিজের যুবরাজ নির্ধারণ করেন।

ঘটনা এভাবে ঘটে যে, সে সময় বনু আব্বাসের মধ্যে খেলাফত চলে আসছিলো। তিনি মার্ভ শহরে বনু আব্বাসের সকল লোককে সমবেত করেন। সেখানে আলী রেযাকেও দাওয়াত করেন। তাদের মাঝে তিনি ঘোষণা করেন যে, আমি বর্তমানের সকলের বিষয় চিন্তা-ভাবনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, বর্তমান সময়ে খেলাফতের জন্যে আলী রেযার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো ব্যক্তি নেই। সুতরাং তাঁর হাতে সকলে বাইআত হয় এবং এ কারণে তাঁর উপাধি হয় 'আর রেযা'। মামুন বনু আব্বাসের প্রতীক কালো পোশাক ও

---

১৪১. তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৩৮৭

কালো পতাকা পরিবর্তন করে সবুজ পাগড়ি এবং সবুজ পতাকা ধারণ করেন। বনু আব্বাস মামুনের এ পদক্ষেপে চরম অসন্তুষ্ট হয়। তারা মামুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করে, কিন্তু মামুন নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তবে মামুনের জীবদ্দশাতেই এবং হযরত আলী রেযা রহ.-এর খলীফা হওয়ার সুযোগ না আসতেই ২০৩ হিজরীতে তাঁর ইন্তিকাল হয়ে যায়।

তাঁর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন যে, অধিক পরিমাণে আঙ্গুর খাওয়ার কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পরিশেষে এটাই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়। আর কারো কারো ধারণা বনু আব্বাসের লোকেরা বিষ পান করিয়ে তাঁকে হত্যা করে। তাঁর ইন্তিকালে মামুনুর রশীদ অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি নিজ পিতা হারুনুর রশীদের কবরের পাশে একটি বাগানে তাঁকে সমাহিত করেন।[১৪২]

পরবর্তীতে হারুনুর রশীদের কবরের চিহ্ন পর্যন্ত মুছে যায়। এখন কারও জানা নেই যে, তাঁর কবর কোথায় ছিলো? তবে হযরত আলী রেযা রহ.-এর কবর সর্ব শ্রেণীর মানুষের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। হাফেয ইবনে হাজার রহ. আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে মুয়াম্মালের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে,

'আমি আহলে হাদীসের ইমাম আবু বকর ইবনে খুযাইমা এবং তাঁর সমপর্যায়ের মুহাদ্দিস আবু আলী সাকাফী এবং আমাদের এক দল মাশায়েখের সঙ্গে (যাঁরা সে সময় প্রচুর পরিমাণে জীবিত ছিলেন) তূসে হযরত আলী বিন মূসা আর রেযার কবর যিয়ারতে যাই। সেখানে আমি হযরত ইবনে খুযাইমা রহ.-কে এতো অধিক পরিমাণে সম্মান করতে এবং বিনয় ও কাকুতি প্রকাশ করতে দেখি যে, আমি হতভম্ব হয়ে যাই।'[১৪৩]

এখানে এ বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য যে, হযরত আলী রেযা রহ.-এর দিকে সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন বর্ণনা আহলে সুন্নাত মুহাদ্দিসীনে কেরামও নিজেদের কিতাবের মধ্যে এমন উদ্ধৃত করেছেন, যেগুলোকে 'মুনকারাত'-এর মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। হাফেয যাহাবী রহ. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা কিতাবে এবং হাফেয ইবনে হাজার রহ. তাহযীবুত তাহযীব কিতাবে সে সব বর্ণনা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।[১৪৪]

---

১৪২. ওয়াফইয়াতুল আ'য়ান, পৃষ্ঠা: ২৬৯-২৭০, ইবনে খালকানকৃত, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ৩৮৭, যাহাবীকৃত

১৪৩. তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৩৮৮

১৪৪. আলবালাগ, শাওয়ালুল মোকাররাম, ১৪২৭ হিজরী, ২৪ শে নভেম্বর, ২০০৬ থেকে সংগৃহীত

হযরত ইমাম বোখারী রহ.-এর ঘটনাবলী

বাল্যকাল থেকেই অসাধারণ যোগ্যতা

আল্লাহ জাল্লা জালালুহূ হযরত ইমাম বোখারী রহ.-কে বাল্যকাল থেকেই অসাধারণ সব যোগ্যতা দান করেছিলেন। তাঁর মাতা প্রথমে তাঁকে কুরআন মাজীদ হিফয করার জন্যে মক্তবে বসিয়ে দেন। ইমাম বোখারী রহ. নিজেই বলেন যে, আমি যখন মক্তবে কুরআন মাজীদ পড়তাম, তখন আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরে হাদীস শরীফ মুখস্থ করার বিষয়টি ঢেলে দেন (ইলকা করেন)। সুতরাং মক্তবের পড়াশোনা শেষ হলে বোখারার বিখ্যাত মুহাদ্দিস দাখেলী রহ.-এর দরসে বসে তিনি হাদীস পড়তে আরম্ভ করেন। ক্রমান্বয়ে আল্লাহ তা'আলা মুহাদ্দিস দাখেলীর দরসে বসার দ্বারা হাদীস ও সনদের সাথে তাঁকে এমন মুনাসাবাত দান করেন যে, ইমাম বোখারী রহ. নিজেই একবারের ঘটনা বর্ণনা করেন যে, আমার ওস্তাদ মুহাদ্দিস দাখেলী রহ. একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। তিনি হাদীসটির সনদ এভাবে বললেন,

سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ

তখন ইমাম বোখারী রহ. ওস্তাদকে বললেন,

أَبُو الزُّبَيْرِ لَمْ يَرَ إِبْرَاهِيْمَ

যার উদ্দেশ্য হলো, আবুয যুবাইর ইবরাহীম থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করেননি। ইমাম বোখারী তখন ছোট এক শিশু, আর মুহাদ্দিস দাখেলী হলেন হাদীস শাস্ত্রের পোক্ত ও অভিজ্ঞ ওস্তাদ। তিনি ইমাম বোখারীকে ধমক দিলেন, আর তিনি চুপ হয়ে গেলেন।

ইমাম বোখারী রহ. বললেন, হযরত আপনার নিকট হাদীসটির মূল কপি থাকলে মেহেরবানি করে তা একটু দেখুন। শায়েখ ভিতরে গেলেন। হাদীসটির লিখিত কপি দেখলেন। ফিরে এসে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বলো তো এ হাদীস কার থেকে বর্ণিত হয়েছে? ইমাম বোখারী রহ. বললেন, হাদীসটি যুবাইর ইবনে আদী থেকে বর্ণিত। মূল সনদ হবে سُفْيَانُ عَنْ زُبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ তখন ইমাম দাখেলী রহ. তাঁর সত্যায়ন

করলেন এবং বললেন, হ্যাঁ, আমার ভুল হয়েছে। আবুয যুবাইর নয়, বরং যুবাইর ইবনে আদী হবে।[১৪৫]

ইমাম বোখারী রহ. ঘটনাটি বর্ণনা করলে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, তখন আপনার বয়স কতো ছিলো? তিনি বললেন, আমার বয়স তখন এগারো বছর ছিলো। মাত্র এগারো বছর বয়সে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে হাদীস এবং সনদের এমন ইলম দান করে ছিলেন যে, তিনি নিজের ওস্তাদের একটি বিচ্যুতির বিষয়ে তাঁকে সতর্ক করেন।[১৪৬]

আল্লাহ তা'আলা কারো দ্বারা কাজ নিতে চাইলে বাল্যকাল থেকেই তার মধ্যে এমন নিদর্শন প্রকাশিত হতে থাকে। এরপর তিনি ষোল বছর বয়সে অন্যান্য মুহাদ্দিসের নিকট ইলম অর্জন করতে আরম্ভ করেন। এ উদ্দেশে তিনি বিভিন্ন জায়গা সফর করেন।

হাদীস অর্জনে দেশ-দেশান্তরে সফর

ইমাম বোখারী রহ. বুখারাতে ইলম অর্জন করছিলেন, এমন সময় তাঁর মাতা হজে যাওয়ার ইচ্ছা করেন। তিনি ছিলেন ছোট। তাঁর একজন বড়ো ভাই ছিলেন, তাঁর নাম ছিলো, আহমাদ ইবনে ইসমাঈল। মা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হজে যান। ইমাম বোখারীও শিশু হওয়ার কারণে সঙ্গে যান। হজ শেষে তাঁর মা এবং বড়ো ভাই আহমাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারায় ফিরে আসেন। ইমাম বোখারী রহ. সেখানেই থেকে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। কারণ, হিজাযভূমি ইলমে হাদীসের মারকায। এখানে হাদীসের বড়ো বড়ো মাশায়েখ আছেন, তাঁদের থেকে তিনি ইলমে হাদীস শিক্ষা করবেন। সুতরাং ইমাম বোখারী সেখানে থেকে যান। হিজাযের মাশায়েখ থেকে তিনি ইলম অর্জন করলেন। শুধু হিজাযই নয়, বরং সে যুগের ইলমে হাদীসের বড়ো বড়ো মারকায শাম, মিসর, জাযীরা, বোসরা, কুফা, বাগদাদ ইত্যাদি অঞ্চল তিনি সফর করেন।

ইমাম বোখারী রহ. নিজেই বলেন যে, আমি হাদীসের মাশায়েখগণ থেকে ইলম অর্জন করার জন্যে শাম, মিসর ও জাযীরায় দুইবার সফর করেছি। বোসরায় চারবার গিয়েছি। আর কুফা ও বাগদাদে তো এতোবার গিয়েছি যে, তার সংখ্যা আমার স্মরণ নেই। যখনই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে বা কোনো শাইখের ব্যাপারে জানতে পেরেছি যে, তিনি কুফা এবং বাগদাদে আছেন, তখন তাঁর থেকে ইলম হাসেল করার জন্যে সেখানে চলে গিয়েছি।

---

১৪৫. হাদইয়ুস সারী, পৃষ্ঠা : ৪৭৮
১৪৬. ইনআমুল বারী, পৃষ্ঠা : ৬৩

যে কোনো জায়গা সম্পর্কে তিনি জানতে পারতেন যে, সেখানে একজন শায়েখ রয়েছেন এবং তাঁর কাছে এমন একটি হাদীস রয়েছে, যা ইমাম বোখারী রহ. পূর্ব থেকে জানেন না তা নয়, বরং ইমাম বোখারী রহ. আগে থেকেই হাদীসটি জানেন, কিন্তু ঐ শায়েখের নিকট হাদীসটি কম ওয়াসেতায় রয়েছে, অর্থাৎ তার সনদ আলী (উচ্চাঙ্গের) তাহলে ইমাম বোখারী রহ শুধু আলী সনদের জন্যে সফর করে তাঁর কাছে যেতেন এবং তাঁর থেকে হাদীস অর্জন করে ওয়াসেতা ও মাধ্যম কমাতেন।

সুতরাং ইমাম বোখারী রহ. যখন জানতে পারলেন যে, হাদীসের বিখ্যাত কিতাব 'মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক'-এর লেখক ইয়েমেনে বসবাসকারী হাদীসের বড়ো ইমাম আব্দুর রাযযাক ইবনে হুমাম রহ.-এর নিকট অনেক আলী সনদ রয়েছে। তখন তিনি সফর করে ইয়েমেন গিয়ে তাঁর নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করার ইচ্ছা করেন। কারণ, ইতিপূর্বে তিনি ইয়েমেনের সফর করেননি। কিন্তু কেউ একজন জানায় যে, তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গিয়েছে। তাই আপনার সফর বেকার হবে। (সে যুগে তো টেলিফোন, রেডিও ইত্যাদি কোনো সংবাদ মাধ্যম ছিলো না, মানুষের মাধ্যমেই সংবাদ পৌছতো।), তখন ইমাম বোখারী রহ. সফর বাতিল করেন। কিছুদিন পর তিনি জানতে পারেন যে, সংবাদটি ভুল ছিলো। আব্দুর রাযযাক এখনো জীবিত আছেন। তখন সফর বাতিল করার কারণে ইমাম বোখারী রহ. অনেক আফসোস করেন। কিন্তু পরবর্তীতে আর সফর করার সুযোগ তাঁর হয়নি। এ কারণেই ইমাম বোখারী রহ. ইমাম আব্দুর রাযযাকের সমকালীন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেন না, বরং মাধ্যম দিয়ে বর্ণনা করেন।[১৪৭]

আত্তারীখুল কাবীর রচনার ইতিবৃত্ত

আল্লাহ তাবারাকাওয়াতা'আলা ইমাম বোখারী রহ.-কে এ সকল মাশায়েখ থেকে ইলম অর্জন করার পরিণতিতে ইলমে হাদীসের একটি স্তম্ভে পরিণত করেন। মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি তাঁর প্রথম কিতাব 'কাযায়াস সাহাবা ওয়াত তাবিয়ীন' গ্রন্থবদ্ধ করেন। একই সঙ্গে দ্বিতীয় বড়ো কিতাব 'আততারীখুল কাবীর' সংকলন করেন। এটি রিজাল শাস্ত্রের কিতাব। এতে ইমাম বোখারী রহ. হাদীস বর্ণনাকারীগণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরেছেন। তাঁদের বর্ণিত হাদীসসমূহ গ্রহণযোগ্য কি না? বর্ণনাকারীগণ সেকাহ তথা নির্ভরযোগ্য কিনা? নির্ভরযোগ্য হলে কোন পর্যায়ের

১৪৭. ইনআমুল বারী, পৃষ্ঠা: ৬৬

নির্ভরযোগ্য? যয়ীফ হলে কোন স্তরের যয়ীফ? এ সব বিষয় বর্ণনা করার প্রয়াস পেয়েছেন। অন্য ভাষায় এটি 'জারাহ ও তা'দীল'-এর কিতাব।

কিতাবটি ইমাম বোখারী রহ. মদীনা শরীফে লিখেছেন। তিনি বলেন, আমি কিতাবটি মদীনা শরীফে চাঁদনী রাতে লিখেছি। সম্ভবত এর অর্থ হলো, নিজের বিভিন্ন কাজের জন্যে তিনি দিন ও সময় ভাগ করে নিয়ে ছিলেন। সেই সূত্রে তিনি তারীখে কাবীর সংকলনের জন্যে সেই দিনগুলো নির্ধারণ করে ছিলেন, যেগুলোতে চাঁদের রাত ছিলো। এই কিতাবে হাজার হাজার বর্ণনাকারীর আলোচনা রয়েছে। ইমাম বোখারী রহ. বলেন যে, আমি তারীখে কাবীরে যতো জন বর্ণনাকারী সম্পর্কে আলোচনা করেছি, তাদের প্রত্যেকের কোনো না কোনো ঘটনা আমার স্মরণ আছে। কিন্তু সেগুলো আমি এ জন্যে উল্লেখ করিনি যে, সে সব ঘটনা এ কিতাবে উল্লেখ করলে কিতাবটি অস্বাভাবিক বড়ো হয়ে যাবে।

প্রখর স্মৃতিশক্তি

ইমাম বোখারী রহ.-এর ইলম ও ইতকান, হাদীসের সনদের উপর তাঁর গভীর দৃষ্টি, ইল্লতে হাদীসের ব্যাপারে তাঁর জ্ঞানের বিস্তৃতি তৎকালীন মুহাদ্দিসগণের মধ্যে বিখ্যাত ও প্রবাদতুল্য ছিলো। এমন স্মরণশক্তি ছিলো যে, শুরুর দিকে যখন তিনি হাদীস পড়ছিলেন, তখনই তাঁর ওস্তায সাক্ষ্য দেন যে, তাঁর সত্তর হাজার হাদীস মুখস্থ রয়েছে।

স্মর্তব্য যে, সে যুগে হাদীস মুখস্থ হওয়ার অর্থ শুধু হাদীসের মতন মুখস্থ হওয়া নয়, বরং সনদ সহ হাদীস মুখস্থ হওয়া উদ্দেশ্য হতো।

তাঁর সহপাঠীগণ বলেন যে, তিনি যখন বোসরা আসেন এবং কোনো ওস্তাযের মজলিসে হাদীস শেখার জন্যে বসেন, তখন ওস্তায হাদীস বর্ণনা করতেন আর ছাত্ররা তা লিপিবদ্ধ করতেন। কিন্তু একমাত্র তিনি লিখতেন না। তাঁর এক হিতাকাঙ্খী সঙ্গী বলেন, আমি তাঁকে বললাম, তুমি তো অদ্ভুত মানুষ! ইলম অর্জনের জন্যে এতো দূর দেশ থেকে এসেছো, অথচ সময় নষ্ট করছো! হাদীসগুলো লিখছো না! না লিখলে এগুলো স্মরণও থাকবে না, তাই তোমার এই দীর্ঘ সফর ও কষ্ট বৃথা যাবে।

ইমাম বোখারী রহ. তাঁকে বললেন, আচ্ছা বলুন তো এ পর্যন্ত আপনি কতগুলো সহীফা লিখেছেন? তিনি বললেন, এতগুলো। ইমাম বোখারী রহ. বললেন, সেগুলো নিয়ে আসুন! তাঁর সহপাঠী বলেন যে, আমি সেগুলো নিয়ে এলাম। ঐ সব সহীফাতে ওস্তায থেকে শুনে এতো দিনে যতোগুলো হাদীস

লিপিবদ্ধ করেছিলাম, তার সবগুলো একটি একটি করে তিনি সনদ ও মতন সহ আমাদেরকে শুনিয়ে দেন।

স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা

আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতা'আলা তাঁকে শুরু থেকেই এমন অসাধারণ স্মরণশক্তি দান করে ছিলেন। শুধু হাদীসই তাঁর মুখস্থ ছিলো না, বরং সহীহ ও সাকীম সনদ এবং তার ইল্লতসমূহের উপরেও তাঁর এমন গভীর দৃষ্টি ছিলো যে, তাঁর দৃষ্টান্ত পাওয়া কঠিন।

ইমাম বোখারী রহ.-এর এ ঘটনাটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ যে, তিনি বাগদাদ গমন করলে সেখানকার ওলামায়ে কেরাম তাঁর স্মরণশক্তির খ্যাতির কারণে তাঁকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। বাগদাদের হাদীসের বড়ো বড়ো দশজন আলেম বসে পরামর্শ করলেন যে, তাঁরা প্রত্যেকে দশটি করে হাদীস নির্বাচন করবেন। তাঁরা ঐ হাদীসগুলোর সনদ এবং মতনের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন করবেন। কোথাও সনদের মধ্যে আর কোথাও মতনের মধ্যে আগ-পাছ করবেন। এক হাদীসের সনদকে অন্য হাদীসের মতনের সঙ্গে সংযুক্ত করবেন। প্রত্যেকে দশটি করে হাদীস পরিবর্তন করবেন। এভাবে দশজনে দশটি করে মোট একশটি হাদীস তৈয়ার করে আনবেন।

ইমাম বোখারী রহ. তাশরীফ আনলেন। তিনি উপবেশন করলেন। মজলিস জমতে আরম্ভ করলো। বিভিন্ন দিক থেকে মানুষ ইমাম ছাহেবের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আসতে আরম্ভ করলো। মজলিস ভরে গেলো। তখন তাদের মধ্য থেকে দশজন ব্যক্তি বললেন যে, আমরা আপনার সামনে কিছু হাদীস পেশ করে আপনার দ্বারা সেগুলোর নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করতে চাই। ইমাম ছাহেব বললেন, ঠিক আছে।

তখন তাঁরা তাঁদের পরিবর্তনকৃত হাদীসগুলো পাঠ করতে আরম্ভ করলেন। প্রথম হাদীসটি পাঠ করে ইমাম ছাহেবকে বললেন, আপনি কি এ হাদীসটিকে নির্ভযোগ্য মনে করনে?

ইমাম বোখারী রহ. বললেন, لَاأَعْرِفُهُ 'এ হাদীস আমি জানি না।'

দ্বিতীয় হাদীসটি পড়লেন, ইমাম ছাহেব বললেন, لَا أَعْرِفُهُ 'এ হাদীস আমি জানি না।'

তৃতীয় হাদীস পড়লেন, তখনও তিনি বললেন, لَاأَعْرِفُهُ 'এ হাদীস আমি জানি না।'

এমনিভাবে দশটি হাদীস তিনি পাঠ করলেন আর ইমাম ছাহেব প্রত্যেকটির বিষয়ে বললেন, لَاأَعْرِفُهُ 'এ হাদীস আমি জানি না।'

এরপর দ্বিতীয়জন একইভাবে দশটি হাদীস পাঠ করলেন। তারপর তৃতীয়জন, তারপর চতুর্থজন, এভাবে সকলে পরপর একশটি হাদীস শোনালেন, আর ইমাম বোখারী রহ. প্রত্যেকটির ব্যাপারে বললেন, لَا أَعْرِفُهُ 'এ হাদীস আমি জানি না।'

জ্ঞানীজনেরা তো বুঝে ফেললেন যে, ইমাম বোখারী রহ. যে, বলছেন لَا أَعْرِفُهُ 'এ হাদীস আমি জানি না।' তা এ কারণে বলছেন যে, যেভাবে তিনি হাদীসটি শোনাচ্ছেন সেভাবে আমি জানি না।

কিন্তু সাধারণ মানুষ মনে করছিলো যে, এতো বড়ো আলেম , এতো তার খ্যাতি, অথচ আমাদের এখানের আলেমগণ একশটি হাদীস তাঁকে শোনালেন, এর একটি হাদীসও তাঁর জানা নেই। কিন্তু যখন একশ হাদীসের সবগুলো শেষ হলো, তখন ইমাম বোখারী রহ. প্রথম ব্যক্তির দিকে মনোযোগী হলেন এবং বললেন, আপনি যে হাদীসগুলো শুনিয়েছেন তার মধ্যে প্রথম হাদীসটি এরূপ শুনিয়েছেন, কিন্তু হাদীসটি হবে এরূপ। হাদীসের সনদের মধ্যে এই পরিবর্তন রয়েছে এবং মতনের মধ্যে এই পরিবর্তন রয়েছে। আপনি দ্বিতীয় যে হাদীসটি শুনিয়েছেন তা এই ছিলো, কিন্তু আসলে তা হবে এই। পুরো একশ হাদীসের মধ্যে যতো পরিবর্তন করা হয়েছিলো, তার সবগুলো চিহ্নিত করে ঐ ক্রম অনুপাতেই সেগুলোর সঠিক রূপ বর্ণনা করলেন।[১৪৮]

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফাতহুল বারীর মুকাদ্দামা হাদইয়ুস সারীর মধ্যে এ ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেন যে, ইমাম বোখারী রহ.-এর এ সব হাদীসের মধ্যে সংঘটিত ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করা এতো বেশি তাজ্জবের বিষয় ছিলো না। কারণ, তিনি তো ছিলেন হাদীসের ইমাম, তাই তিনি এগুলোর ত্রুটি ধরে ফেলেছেন। বরং অত্যাধিক তাজ্জবের বিষয় হলো, যেই ক্রমে ঐ একশটি হাদীস শোনানো হয়েছিলো, ইমাম বোখারী রহ. সেই ক্রমানুসারেই সেগুলোর উত্তর দেন যে, তুমি প্রথম হাদীস এই পড়েছিলে, দ্বিতীয় হাদীস এই পড়েছিলে, তৃতীয় হাদীস এই পড়েছিলে এভাবে ক্রমানুসারে প্রত্যেকটি হাদীসের তিনি উত্তর দেন।

আল্লাহ তা'আলা এ সকল মহামনীষীকে সৃষ্টিই করেছিলেন এজন্যে যে, তাঁরা দুধ আর পানি আলাদা করে দিবেন। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে অসাধারণ যোগ্যতা, বিস্ময়কর স্মরণশক্তি এবং অতুলনীয় বোধশক্তি দান করে ছিলেন, যার ফলে এভাবে হাদীসের ইল্লত ও সূক্ষ্ম জটিলতা ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

---

১৪৮. ইনআমুল বারী, পৃষ্ঠাঃ ৬৮-৬৯

এ ঘটনাটি ঘটেছিলো বাগদাদে, একইরূপ আরেকটি ঘটনা ঘটে খোরাসান বা নিশাপুরে। সেখানেও ওলামায়ে কেরাম এ ধরনের পরীক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করেন এবং ইমাম বোখারী রহ. তাতেও কৃতকার্য হন।[১৪৯]

বসরায় হাদীস শোনানোর ঘটনা

হযরত ইমাম বোখারী রহ. বোসরা তাশরীফ নিয়ে যান, সেখানে তিনি দরসের হালকায় বলেন যে, আপনারা আমার নিকট হাদীস শোনার জন্যে সমবেত হয়েছেন, আমি আজ আপনাদেরকে আপনাদের শহরেরই ঐ সকল মাশায়েখের হাদীস শোনাবো, যেগুলো আপনারা শোনেননি। হাদীস তো তাঁরা শুনেছিলেন, তাই বাহ্যিকভাবে তাঁদের সন্দেহ হলো যে, হাদীস তো আমরা শুনেছি, কিন্তু তিনি বলছেন, আমি এমন হাদীস শোনাবো, যা আপনাদের শহরের কিন্তু আপনারা শোনেননি। তখন ইমাম বোখারী রহ. তাঁদের এ বিস্ময় দূর করার জন্যে বললেন,

لَيْسَ عِنْدَكُمْ عَنْ مَنْصُوْرٍ. إِنَّمَا هُوَ عِنْدَكُمْ عَنْ غَيْرِ مَنْصُوْرٍ

'আপনারা এ হাদীস মানসূর ইবনুল মু'তামিরের মধ্যস্থতায় শোনেননি, আপনারা শুনেছেন অন্যান্য বর্ণনকারীর মধ্যস্থতায়।'

আপনারা বলুন, আপনারা কি এ হাদীস মানসূরের মধ্যস্থতায় শুনেছেন? তখন লোকেরা বললো, হাদীস তো শুনেছি, কিন্তু মনসূরের মধ্যস্থতায় এই সনদে শুনিনি। তারপর এ ধরনের অনেকগুলো হাদীস ইমাম বোখারী রহ. তাদেরকে শোনান। যার অর্থ হলো, ইমাম বোখারী রহ.-এর এ কথাও জানা ছিলো যে, বোসরাবাসীর নিকট পরিচিত হাদীসসমূহ কোন কোন রাবীর মাধ্যমে এসেছে এবং তাঁর নিকট হাদীস অন্য কোনো রাবীর মধ্যস্থতায় এসেছে। তাও আবার এতো নিশ্চিতভাবে বলা যে, তোমরা শোনোনি, এমন ব্যক্তিই বলতে পারেন, যিনি পুরো শহরবাসীর সমস্ত ইলম পুরোপুরি আয়ত্ত করেছেন। এ ছাড়া এভাবে বলা সম্ভব নয়। পরে লোকেরা স্বীকার করে যে, বাস্তবেই আমরা এ সব হাদীস এভাবে শুনিনি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে হাদীসের পরিচয় এমন দান করেছিলেন।

হাদীসের বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান

ইমাম বোখারী রহ. একবার ইমাম ফিরইয়াবী রহ.-এর মজলিসে বসা ছিলেন। ইমাম ফিরইয়াবী রহ.-ও অনেক বড়ো মুহাদ্দিস। তিনি সুফিয়ান সাওরীর উদ্ধৃতিতে হাদীস শোনান যে,

---

১৪৯. ইনআমুল বারী, পৃষ্ঠাঃ ৬৯

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ.

হাদীসটি তো প্রসিদ্ধ। সব জায়গায় লেখা আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম একবার সকল বিবির নিকট গমন করেন এবং পরিশেষে একবারই গোসল করেন। কিন্তু তিনি এই হাদীসের যেই সনদ পাঠ করেন, তা ছিলো বিরল-বিস্ময়কর। ইমাম ফিরইয়াবী রহ. যখন হাদীসটি পাঠ করেন, তখন মজলিস ভর্তি লোক ছিলো। তাঁরা সকলেই ছিলেন হাদীসশাস্ত্রের বিজ্ঞ আলেম। সকলেই মুখ চাওয়া চাওয়ি করছিলেন যে, এই হাদীস এই সনদের সঙ্গে তো কখনো শুনিনি।

মূলত: ইমাম ফিরইয়াবী রহ. এখানে সুফিয়ান সাওরী রহ.-এর একটি অভ্যাস উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কখনো কখনো মানুষের পরীক্ষা নেওয়ার জন্যে এমনভাবে সনদ বর্ণনা করতেন যে, মানুষ বুঝতে পারতো না যে, কী হলো? এ হাদীসটিও তিনি এভাবেই বর্ণনা করে ছিলেন।

ইমাম বোখারী রহ. দেখলেন যে, মানুষ বিস্মিত হচ্ছে। তখন তিনি বললেন, এখানে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। আবূ উরওয়া হলো মা'মার ইবনে রাশেদের উপনাম, আবুল খাত্তাব হলো কাতাদা ইবনে দিআমা-এর উপনাম এবং আবূ হামযাহ হযরত আনাস রাযি.-এর উপনাম। আসল সনদ ছিলো এরূপ-

حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ. قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

সুফিয়ান সাওরী রহ. মানুষের পরীক্ষা নেওয়ার জন্যে রাবীগণের নাম উল্লেখ না করে তাঁদের উপনাম ব্যবহার করে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ফলে মানুষ দিশাহারা হয়ে পড়েছে। কিন্তু ইমাম বোখারী প্রথম নজরেই চিনে ফেলেছেন।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ইমাম বোখারী রহ.-কে এমন স্মরণশক্তি এবং হাদীসের সনদ ও ইল্লত চেনার এমন যোগ্যতা দান করেছিলেন যে, সারা দুনিয়া থেকে তিনি স্বীকৃতি আদায় করেছেন।[১৫০]

কষ্টের জীবনগুজরান

হযরত ইমাম বোখারী রহ.-এর ওয়ালেদ ছাহেব ইন্তিকালের সময় অনেক সম্পদ রেখে যান। তার মধ্য থেকে পঁচিশ হাজার দিরহাম ইমাম বোখারী

১৫০. ইনআমুল বারী, পৃষ্ঠা: ৭০-৭১

রহ.-এর ভাগে আসে। সে যুগে এটা ছিলো অনেক বড়ো অঙ্ক। ইমাম বোখারী রহ. চিন্তা করলেন, তিনি নিজে যদি ব্যবসা-বানিজ্য ও জীবিকা উপার্জনে লেগে যান, তাহলে ইলম থেকে তাঁর দূরে সরে পড়ার ভীষণ আশঙ্কা রয়েছে। এ জন্যে তিনি তাঁর এ টাকাগুলো কারো নিকট মুযারাবাতের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করতে চাইলেন। তিনি এক ব্যক্তিকে মুযারাবাতের ভিত্তিতে টাকাগুলো দিয়ে দিলেন যে, ভাই! আপনি এগুলো ব্যবসাতে লাগাবেন, আমাকে সেখান থেকে লভ্যাংশ দিবেন। লোকটি টাকাগুলো নেওয়ার পর না লাভ দেওয়ার নাম নিলো, আর না মূল ধন ফিরিয়ে দেওয়ার নাম নিলো। তাঁর সব পুঁজি দখল করে বসে রইলো। যে শহরে লোকটি থাকতো, সেখানের শাসক ইমাম বোখারীকে খুব সম্মান করতো। এক ব্যক্তি ইমাম বোখারীকে বললো, আপনি ঐ শহরের শাসকের নিকট চিঠি লিখে পাঠান। সে তাকে ডাকিয়ে এনে চাপ সৃষ্টি করে আপনার টাকা উসুল করে দিবে। কমপক্ষে আপনার মূল ধন তো ফিরে পাবেন।

শাসকের সহযোগিতা নেওয়া তাঁর জন্যে বৈধ ছিলো। এর মধ্যে খারাপ কিছু ছিলো না। কিন্তু ইমাম বোখারী রহ. বললেন, আসল কথা হলো, আজ যদি আমি নিজের জায়েয হক উসুল করার জন্যে ঐ শাসকের সাহায্য গ্রহণ করি, তাহলে আমার ঘাড়ে তার একটা দয়ার বোঝা থাকবে। শাসকরা কারো উপর মুফতে অনুগ্রহ করে না। কারো উপর অনুগ্রহ করলে কোনো না কোনো সময় তার থেকে এর মূল্য উসুল করে। তাই আমার আশঙ্কা হয় যে, আমি যদি আজ তার সহযোগিতা নেই, তাহলে সে এক সময় আমার থেকে কোনো অবৈধ সুযোগ গ্রহণের জন্যে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে। এ কারণে আমি তার সহযোগিতা নিতে চাই না।

এখন কী উপায় হবে? তিনি লোকটিকে বললেন, ভাই তুমি যদি এক সঙ্গে দিতে না পারো, তাহলে কিস্তিওয়ারী দাও! অনেক কষাকষির পর সে রাজি হলো যে, মাসে দশ দিরহাম করে দিবো। কোথায় পঁচিশ হাজার দিরহাম, আর কোথায় মাসে দশ দিরহাম! মাসে দশ দিরহাম দিলে বছরে একশ বিশ দিরহাম হবে। এক সঙ্গে দিলে তাও কিছুটা কাজে আসতো! ভেঙ্গে ভেঙ্গে মাসে দশ দিরহাম করে দিলে কী লাভ হবে! কিন্তু ইমাম বোখারী রহ. বললেন, ঠিক আছে ভাই তাই দিও, কে তোমার সাথে ঝগড়া করতে যাবে? কতক বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, লোকটি পরবর্তীতে সেই মাসিক দশ দিরহাম করেও দেয়নি। এভাবে সব টাকা হাতছাড়া হয়ে যায়। কিন্তু কোনো শাসকের অনুগ্রহের বোঝা মাথা পেতে নেননি। একটু ইশারা করলেও টাকা পেয়ে

যেতেন, কিন্তু নিজের অমুখাপেক্ষিতায় আঁচ লাগতে দেননি। এখন তো আর আমদানির কোনো পথ থাকলো না; এখন খাবেন কোত্থেকে?[১৫১]

আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. অনেক বলতেন যে, দেখো ভাই! আয় বৃদ্ধি করা নিজের ক্ষমতাভুক্ত নয়। আয় বৃদ্ধি করার জন্যে তো উপকরণ অবলম্বন করতে হয়। উপকরণও নিজের ক্ষমতাভুক্ত নয়। কখনও তা কাজে আসে আর কখনও আসে না। কিন্তু ব্যয় কমানো নিজের ক্ষমতাভুক্ত। নিজের প্রয়োজন এবং কামনা-বাসনা কমিয়ে ব্যয় যতো কমাবে, ইনশা আল্লাহ ততো বেশি শান্তিতে থাকবে। ইমাম বোখারী রহ. এই মূলনীতির উপরই আমল করেন। তিনি অতি অল্প খাবারের অভ্যাস করেন। কখনও একবেলায় শুধু চারটি বাদাম খেয়েছেন, কখনও বা সালুন ছাড়া রুটি খেয়েছেন। তিনি বলতেন যে, পেটভরাই তো উদ্দেশ্য। যাতে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। সে পরিমাণ পেট শুধু রুটি দিয়েও ভরে যায়। সালুনের কী প্রয়োজন? মানুষ জানতো না যে, ইমাম বোখারী রহ. সালুন খান না। বিষয়টি এভাবে প্রকাশ পায় যে, একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসকের নিকট যেতে হয়। চিকিৎসক রোগ নির্ণয়ের জন্যে পেশাব-পায়খানা পরীক্ষা করে বলেন যে, এটা কোনো রাহেবের পেশাব-পায়খানা। যিনি কখনও ব্যঞ্জন আস্বাদন করেননি। খ্রিস্টানরা দুনিয়াবিরাগীকে 'রাহেব' বলে। চিকিৎসক বললেন যে, আপনার রোগের চিকিৎসা হলো, আপনাকে সালুন খেতে হবে। তিনি বললেন, আমি তো সালুন খাবো না। এরপর বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের পীড়াপীড়িতে সামান্য চিনি বা অন্য কোনো বস্তু খেতে আরম্ভ করেন। এভাবে তিনি জীবন যাপন করেন।

ইমাম বোখারী রহ.-এর সঙ্গী (ওমর ইবনে হাফস আশতর) বলেন, একবার ইমাম বোখারী রহ. বোসরার মাশায়েখের নিকট থেকে ইলমে হাদীস অর্জন করতে আসেন। হঠাৎ দেখি তিনি দরসে অনুপস্থিত। আমরা তো অবাক হলাম। একদিন নেই, দুই দিন নেই, তখন আমাদের চিন্তা হলো যে, হয়তো তিনি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কারণ অসুস্থ না হলে তিনি অনুপস্থিত থাকবেন না। তাই আমরা তাঁর খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্যে তাঁর বাড়িতে গেলাম। গিয়ে জানতে পারলাম যে, তিনি একজোড়া কাপড় পরে এসেছিলেন। প্রয়োজনে সেটিই ধুয়ে আবার পরতেন। কিন্তু তা ধুতে ধুতে এতো বেশি ফেটে গিয়েছে যে, এখন তা দিয়ে সতরও ঢাকছে না। এ জন্যে

---

১৫১. হাদইয়ুস সারী মুকাদ্দামায়ে ফাতহুল বারী, পৃষ্ঠা: ৪৭৯, ইনআমুল বারী, পৃষ্ঠা: ৭২

ঘর থেকে বের হতে পারছেন না। তিনি বলেন, আমরা কিছু কাপড়ের ব্যবস্থা করে দিলাম, তাপর তিনি দরসে আসতে আরম্ভ করেন।[১৫২]

ইবাদতের জীবন

ইমাম বোখারী রহ.-এর পুরো জীবনটাই ইবাদত ছিলো। যেই ব্যক্তি কেবল জনাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের খেদমত করার জন্যে নিজের ঘরবাড়ি, কায়কারবার এবং দুনিয়ার সবকিছু পরিত্যাগ করেছে, তার প্রতিটি মুহূর্তই ইবাদত। হাদীস শোনা, শোনানো, তা সংরক্ষণ করা, সংকলন ও গ্রন্থনা এ সবই ইবাদত ছিলো। এতদসত্ত্বেও তাঁর জীবনীতে ফযীলতের আমল, নফল নামায ও যিকির ও তিলাওয়াতের প্রতি গুরুত্ব পরিদৃষ্ট হয়।

বর্ণিত আছে যে, ইমাম বোখারী রহ. রমাযান মাসে একেতো তারাবীহের নামাযে কুরআনে পাক খতম করতেন। তিনি প্রতি রাকাতে একশ বিশ আয়াত করে তেলাওয়াত করতেন। এছাড়া প্রতিদিন এ পরিমাণ কুরআনে পাক তেলাওয়াত করতেন যে, প্রতি তিন দিন পর পর কুরআন খতম করতেন।[১৫৩]

ইমাম বোখারীর রাত

ইমাম বোখারী রহ.-এর একজন বিশিষ্ট শাগরিদ ও খাদেম ছিলেন মুহাম্মাদ বিন আবি হাতেম আল ওয়াররাক। 'ওয়াররাক' শব্দটি 'ওয়ারাক' শব্দ থেকে উদ্ভূত। অর্থ কাগজ। অতীতে 'ওয়াররাক' শব্দটি তিন শ্রেণীর মানুষের জন্যে ব্যবহার করা হতো।

এক. যারা কিতাব বিক্রি করে।

দুই. যারা পুরাতন জিনিস বিক্রি করে, বিশেষ করে পুরাতন কিতাব।

তিন. ঐ ব্যক্তির জন্যে শব্দটি ব্যবহার করা হতো, যিনি বড়ো কোনো লেখকের সঙ্গে লেগে থাকেন। লেখক তাকে কিছু লিখিয়ে দেন, আর তিনি তার কপি তৈরি করে মানুষের কাছে বিক্রি করে।

মুহাম্মাদ বিন আবি হাতেম আল ওয়াররাক ইমাম বোখারী রহ.-এর 'ওয়াররাক' ছিলেন। দীর্ঘ সময় তিনি তাঁর সোহবত উঠিয়েছেন। যার ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইমাম বোখারী রহ.-এর অনেক কিছু জানার সুযোগ দিয়েছেন। তিনি কীভাবে রাত অতিবাহিত করতেন। সে সম্পর্কে তিনি বলেন, আমি ইমাম বোখারী রহ.-এর নিকট অতিবাহিত করার ইচ্ছা করে

---

১৫২. ইনআমুল বারী, পৃষ্ঠা: ৭৩
১৫৩. হাদইয়ুস সারী, পৃষ্ঠা: ৪৮১

একরাতে তাঁর নিকট শুয়ে পড়ি। আমি দেখলাম, তিনি ঘুমানোর জন্যে শুয়ে পড়লেন। অল্পক্ষণ পর হঠাৎ দেখি তিনি উঠলেন এবং পাথর ঘষে নিকটবর্তী প্রদীপটি জ্বালালেন। তারপর খাতা এনে তাতে কিছু হাদীস লিখলেন। সেগুলো পাঠ করলেন। কিছু চিহ্ন দিলেন। তারপর রেখে দিলেন। এরপর বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়লেন। তার আধা ঘন্টা পৌণে এক ঘন্টা পর হঠাৎ আবার উঠলেন। বাতি জ্বালালেন। সেই খাতাটি বের করলেন। কিছু পাঠ করলেন। কিছু চিহ্ন দিলেন। তারপর তা রেখে দিয়ে ঘুমালেন। সারা রাত এমনটি হলো। কিছুক্ষণ পর পর উঠতেন, বাতি জ্বালাতেন, চিহ্ন দিতেন তারপর ঘুমিয়ে পড়তেন। অবশেষে ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে উঠে তোরো রাকাত নামায পড়লেন। বারো রাকাত তাহাজ্জুদের নামায এবং এক রাকাত বিতিরের নামায। এতে জানা গেলো যে, একদিকে ইলমের মাশগালা অব্যাহত রয়েছে, অপরদিকে রাতে ঘুমানোর সময়ও মস্তিষ্কে ইলমের বিষয়ই আচ্ছন্ন হয়ে আছে। যে বিষয় স্মরণ হচ্ছে উঠে তা লিখে রাখছেন।[১৫৪]

ইমাম বোখারী রহ. নফল ইবাদতের চেয়ে অধিক গুরুত্বারোপ করতেন গোনাহ থেকে বাঁচার ব্যাপারে। সর্বোচ্চ পর্যায়ের তাকওয়া, পরহেযগারী ও সতর্কতা অবলম্বন করতেন, যাতে কোনো প্রকার গোনাহ তাঁর দ্বারা সংঘটিত না হয়, বরং গোনাহের নিকটেও না যান।

নিয়ত পরিবর্তন ভালো লাগে না

ইমাম বোখারী রহ. একবার একটি বাড়ি বা অন্য কিছু বিক্রি করতে চাচ্ছিলেন। এক ব্যক্তি এসে তা ক্রয় করতে চাইলো। বললো, আমি আপনাকে পাঁচ হাজার দিরহাম লাভ দিবো।

ইমাম ছাহেব বললেন, আমি একটু চিন্তা করে দেখি। কাল তোমাকে জানাবো। কাল হওয়ার পূর্বে আরেক ক্রেতা এসে দশ হাজার দিরহাম লাভ দিতে চাইলো। লোকেরা বললো, এটা খুব উত্তম সুযোগ। ইমাম ছাহেব বললেন, আমি তো যে ব্যক্তি পাঁচ হাজার দিরহাম দিতে চেয়েছে, তার সঙ্গে প্রাথমিক কথা বলেছি। লোকেরা বললো, তার সাথে তো বিক্রি চূড়ান্ত হয়নি। আপনি তো বলেছেন, কালকে জানাবেন। তিনি বললেন, তাতো বলেছিলাম, কিন্তু আমার মনের মধ্যে এ ধরনের ইচ্ছা জেগে ছিলো যে, তাকেই দিয়ে দেই। তাই পাঁচ হাজার দিরহামের জন্যে নিজের নিয়ত খারাপ করা ভালো লাগে না। সুতরাং তিনি তাকে ফিরিয়ে দিয়ে প্রথম ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে দেন।[১৫৫]

---

১৫৪. ইনআমুল বারী, পৃষ্ঠা: ৭৫

১৫৫. হাদইয়ুস সারী, পৃষ্ঠা: ৪৮০

হযরত ইমাম তিরমিযী রহ.-এর ঘটনাবলী

ইমাম তিরমিযী রহ. প্রথমে নিজদেশে ইলম অর্জন করেন। এরপর ইলমের সন্ধানে হিজায, মিসর, শাম, কুফা বোসরা, খোরাসান, বাগদাদ ইত্যাদি দেশেও সফর করেন। তিনি সে যুগের ইলমে হাদীসের বড়ো বড়ো শায়েখের নিকট থেকে ইলম অর্জন করেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ সাজিস্তানী, আহমাদ ইবনে মুনী', মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না, মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার, হান্নাদ ইবনুস সারী, কুতাইবা ইবনে সাঈদ, মাহমূদ ইবনে গাইলান, ইসহাক ইবনে মূসা আল আনসারীর ন্যায় মুহাদ্দিসীনে কেরাম অন্তর্ভুক্ত। এ সকল মহামনীষী ছাড়া আরো শত শত মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট থেকে তিনি ইলম অর্জন করেন।

সকল ওস্তায ইমাম তিরমিযীকে মূল্যায়ন করতেন। বিশেষ করে ইমাম বোখারীর তো তাঁর সঙ্গে অনেক বেশি সম্পর্ক ছিলো। কতক বর্ণনায় আছে যে, ইমাম বোখারী রহ. একবার ইমাম তিরমিযী রহ.-কে বলেন,

اِنْتَفَعْتُ بِكَ اَكْثَرَ مِمَّا انْتَفَعْتَ بِيْ

'তুমি আমার দ্বারা যতো উপকৃত হয়েছো, আমি তোমার দ্বারা তার চেয়ে অধিক উপকৃত হয়েছি।'

হযরত শাহ ছাহেব রহ.-এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, এ কথার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ছাত্র মেধাবী ও যেগ্যতাসম্পন্ন হলে ওস্তাদ তাকে পড়ানোর জন্যে অধিক মেহনত করে থাকেন, যার দ্বারা খোদ ওস্তাদের অনেক উপকার হয়।

এ ছাড়া ইমাম তিরমিযী রহ.-এর এই গর্বও লাভ হয়েছে যে, কতিপয় হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি নিজ ওস্তাদ ইমাম বোখারী রহ.-এর ওস্তায হওয়ারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন। অর্থাৎ, কিছু হাদীস ইমাম বোখারী রহ. তাঁর থেকে শুনেছেন। ইমাম তিরমিযী রহ. তাঁর জামে'-এর মধ্যে দুটি হাদীস সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদীস দুটি ইমাম বোখারী রহ. আমার থেকে শুনেছেন।

অসাধারণ স্মরণশক্তি

ইমাম তিরমিযী রহ. অসাধারণ স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে। হযরত শাহ আব্দুল আযীয ছাহেব মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন কিতাবে তাঁর এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একজন শাইখ থেকে 'ইজাযত'-এর ভিত্তিতে দুটি সহীফা লাভ করেন। একবার তিনি সফরে কোনো এক মনজিলে ঐ শাইখের মোলাকাত লাভ করেন। ইমাম তিরমিযী রহ. চাইলেন, যেই সহীফাগুলো 'ইজাযত'-এর ভিত্তি লাভ করেছেন, তা শাইখ থেকে 'কিরাআত'-এর ভিত্তিতে অর্জন করবেন। সুতরাং তিনি শাইখের নিকট ঐ জুযগুলোর 'কিরাআত'-এর আবেদন করলেন। শাইখ তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলেন। তিনি বললেন, জুযগুলো নিয়ে আসো। ইমাম তিরমিযী রহ. নিজ বাহনের নিকট গিয়ে সামানাপত্রের মধ্যে জুযগুলো খুঁজে পেলেন না। বুঝতে পারলেন সেগুলো বাড়িতে রয়ে গেছে। সেগুলোর পরিবর্তে সাদা কাগজ চলে এসেছে। তিনি খুব পেরেশান হলেন। পরে ঐ সাদা কাগজ নিয়েই শাইখের নিকট চলে এলেন। শাইখ হাদীস পড়তে আরম্ভ করলেন, আর ইমাম তিরমিযী রহ. সাদা কাগজের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে প্রকাশ করছিলেন যে, তিনি লিখিত জুযগুলো শাইখের কিরাআতের সঙ্গে মিলাচ্ছেন। হঠাৎ সাদা কাগজের উপর শাইখের নজর পড়ে যায়। তখন শাইখ নারাজ হয়ে বলেন, তোমার শরম করলো না!

তখন ইমাম তিরমিযী রহ. পুরো ঘটনা শুনিয়ে বললেন যে, আপনি যতো হাদীস শুনিয়েছেন, তার সবগুলো আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। শাইখ শোনাতে বললে তিনি সবগুলো হাদীস আদি-অন্ত শুনিয়ে দিলেন। শাইখ বললেন, হয়তো তুমি আগে থেকে মুখস্থ করে রেখেছো। ইমাম তিরমিযী রহ. বললেন, আপনি এগুলোর বাইরে আমাকে কিছু হাদীস শোনান। শাইখ আরো চল্লিশটি হাদীস শোনালেন। ইমাম তিরমিযী রহ. সেগুলো আদ্যপান্ত শুনিয়ে দিলেন। শাইখ এটা দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন এবং বললেন, আমি তোমার মতো লোক আর দেখিনি।

প্রখর স্মৃতিশক্তির আরেকটি ঘটনা

ইমাম তিরমিযী রহ.-এর আরেকটি ঘটনা অত্যাধিক প্রসিদ্ধ রয়েছে। যা এখনও পর্যন্ত কোনও কিতাবে চোখে পড়েনি। কিন্তু অনেক শাইখের নিকট থেকে শুনেছি। ঘটনাটি হলো, ইমাম তিরমিযী রহ. অন্ধ হওয়ার পর একবার

উটে সোয়ার হয়ে হজে যাচ্ছিলেন। পথ চলতে চলতে এক জায়গায় তিনি মাথা নিচু করে ফেললেন। সাথীদেরকেও মাথা নিচু করতে বললেন। সাথীরা অবাক হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে ইমাম তিরিমিযী রহ. বললেন, এখানে কোনো গাছ নেই? সাথীরা বললেন, না নেই। ইমাম তিরমিযী রহ. ঘাবড়ে গিয়ে কাফেলাকে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিলেন। বললেন, বিষয়টি যাচাই করো। আমার স্মরণ আছে যে, অনেক দিন আগে এখান দিয়ে আমি যখন যাই, তখন এখানে একটি গাছ ছিলো। তার ডাল অনেক নিচু ছিলো, যে কারণে পথিকদের খুব সমস্যা হতো। মাথা না ঝুঁকিয়ে এখান দিয়ে যাওয়া যেতো না। এখন হয়তো সে গাছটি কেউ কেটে ফেলেছে। বাস্তবে যদি এমনটি না হয়ে থাকে এবং প্রমাণ হয়ে যায় যে, এখানে কোনো গাছ ছিলো না, তার অর্থ দাঁড়াবে আমার স্মরণশক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছে। তাহলে আমি হাদীস বর্ণনা করা ছেড়ে দিবো। সাথীরা আশেপাশের লোকদের নিকট বিষয়টি যাচাই করলো। লোকেরা বললো, বাস্তবেই এখানে একটি গাছ ছিলো। পথিকদের কষ্ট হয় বলে গাছটি কেটে ফেলা হয়েছে।

হযরত মা'রূফ কারখী রহ.-এর ঘটনাবলী

মা'রূফ কারখী রহ. বড়ো মাপের আল্লাহর ওলী ছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত জুনায়দ বাগদাদী রহ.-এর দাদা পীর। হযরত জুনায়দ বাগদাদী রহ. ছিলেন হযরত সিররী সাকতী রহ.-এর খলীফা। আর হযরত সিররী সাকতী ছিলেন হযরত মা'রূফ কারখী রহ.-এর খলীফা। হযরত মা'রূফ কারখী রহ. সর্বদা যিকিরে নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর একটি মুহূর্তও আল্লাহর যিকির ব্যতীত কাটতো না। এমনকি একবার নাপিত তাঁর চুল-গোঁফ কাটছিলো। গোঁফ কাটার সময় নাপিত দেখলো যে, তাঁর জিহ্বা ও ঠোঁট দু'টি নড়ছে। নাপিত বললো, হযরত, সামান্য সময় মুখ বন্ধ করুন, যাতে আমি গোঁফ কাটতে পারি। হযরত মা'রূফ কারখী জবাবে বললেন, তুমি তোমার কাজ করছো, আমি কি আমার কাজ করবো না? তাঁর অবস্থা ছিলো এরূপ। মুখে সর্বদা যিকির চালু থাকতো।

সর্বদা আল্লাহর দাসত্বের অনুভূতি

হযরত মারূফ কারখী রহ.-কে কেউ দাওয়াত দিলে সুন্নাত মোতাবেক তিনি তা গ্রহণ করতেন। একবার এক ওলীমার দাওয়াতে গেলেন। সেখানে নানা রকমের ভালো ও উন্নত খাবারের আয়োজন ছিলো। সেখানে আরেকজন বুযুর্গ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তিনি এতো আয়োজন দেখে হযরত মারূফ কারখী রহ.-কে বললেন, দেখছেন, এগুলো কী! তিনি বোঝাচ্ছিলেন যে, এতো আড়ম্বরপূর্ণ খাবারের আয়োজন ঠিক নয়। হযরত বললেন, আমি এগুলো আয়োজন করতে বলিনি। আরো যতো বেশি নতুন নতুন খাবার আসছিলো, লোকটি একই অভিযোগ করে যাচ্ছিলো। পরিশেষে হযরত মারূফ কারখী রহ. বললেন-

'আমি তো একজন গোলাম, আমার মনিব যা খাওয়ান, আমি তাই খাই, আর যেখানে নিয়ে যান, সেখানে চলে যাই।'[১৫৬]

দু'আ পাওয়ার জন্যে

তাঁর একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি হাঁটছিলেন। পথে দেখলেন, একজন ভিস্তিওয়ালা লোকদেরকে পানি পান করাচ্ছে এবং

---

১৫৬. হিলইয়াতুল আওলিয়া, খণ্ডঃ ৮, পৃষ্ঠাঃ ৩৬৪, আবূ নুয়াইমকৃত

বলছে, আল্লাহ ঐ বান্দার উপর রহম করুন, যে আমার নিকট হতে পানি পান করবে। হযরত মা'রূফ কারখী রহ. ভিস্তিওয়ালার নিকট গেলেন এবং বললেন, এক গ্লাস পানি আমাকেও দাও। ভিস্তিওয়ালা তাঁকে পানি দিলো। তিনি পানি নিয়ে পান করলেন। তখন তাঁর এক সঙ্গী বললো, হযরত, আপনি তো আজ রোযা ছিলেন, পানি পান করে রোযা ভেঙে দিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি চিন্তা করলাম, তার দু'আ আমার জন্যে কবুল হতে পারে। (আর নফল রোযা ভেঙে ফেললে পরে কাযা করে নিতে পারবো)

বদদু'আর বদলে দু'আ

একবার তিনি দজলা নদীর তীরে বসা ছিলেন। সামনে দিয়ে একটি নৌকা যাচ্ছিলো। তার মধ্যে কিছু উশৃঙ্খল যুবক গানবাদ্য করছিলো। একব্যক্তি হযরত মা'রূফ কারখী রহ. কে বললো, দেখুন, এরা নদীর মধ্যেও আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত থাকছে না। এদের জন্যে বদদু'আ করুন। তখন হযরত মা'রূফ কারখী রহ. হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন,

'হে আল্লাহ! হে আমার মনীব! আমি আপনার কাছে আবেদন করছি, যেভাবে আপনি এ যুবকদেরকে দুনিয়াতে আনন্দ দান করছেন, সেভাবে তাদেরকে জান্নাতেও আনন্দ দান করুন।'

উপস্থিত লোকেরা বললো, আমরা তো আপনাকে বদদু'আ করতে বলেছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা যদি তাদেরকে আখেরাতে আনন্দ দান করেন, তাহলে দুনিয়ার বদ আমল থেকে তাদের তাওবা কবুল করবেন। এতে তো তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই।[১৫৭]

তাঁর মাযারে দু'আ

হযরত মা'রূফ কারখী রহ.-এর ইন্তিকাল হয় দুইশত হিজরীতে। বাগদাদ বাসীর মধ্যে এ কথা প্রসিদ্ধ ছিলো যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাযারে দু'আ কবুল করে থাকেন। বিশেষ করে দুর্ভিক্ষের সময় বৃষ্টির দু'আ কবুল করে থাকেন।[১৫৮]

আবু আব্দুল্লাহ ইবনে হামেলী বলেন, আমি মা'রূফ কারখী রহ.-এর কবর সম্পর্কে ৭০ বছর ধরে জানি যে, কোনো পেরেশান লোক সেখানে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা নিকট দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করে থাকেন।[১৫৯]

---

১৫৭. সিফাতুস সফওয়া, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৮১

১৫৮. তবাকাতে কুবরা, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৬১, শা'রানীকৃত

১৫৯. তারীখে বাদদাদ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১২৩ খতীবকৃত

হযরত সিররী সাক্‌তী রহ.-এর ঘটনাবলী

হযরত সিররী ইবনে মুফলিস সাক্‌তী রহ. (মৃত্যু ২১৫ হিজরী) হযরত মা'রুফ কারখী রহ.-এর বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন। তিনি সে যুগের তাসাওউফ ও আকায়েদ শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। ইমাম শা'রানী রহ. লিখেন, বাগদাদে ইলমে তাওহীদ সম্পর্কে সর্বপ্রথম তিনিই কথা বলেন।[১৬০]

ইমাম আবু নু'আইম রহ. তাঁর এ স্বর্ণবাণী বর্ণনা করেন যে,

> **'কেউ যদি এমন বাতেনী ইলমের দাবি করে, যা শরীয়তের কোনো যাহেরী হুকুমের পরিপন্থী, তাহলে বুঝতে হবে সে ভ্রান্ত।'[১৬১]**

হযরত সিররী সাক্‌তী রহ. এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতেন যে, ধর্মীয় কোনো কাজের বিনিময়ে দুনিয়া উপার্জনের কোনো গন্ধও যেন আসতে না পারে। তাই তিনি তাঁর ভক্তদের নিকট থেকে কোনোরূপ হাদিয়া কবুল করতেন না। এমনকি একবার তাঁর কাশি হলে তাঁর এক ভক্ত স্বীয় পুত্রের হাতে কাশির ঔষধ হিসেবে একটি বড়ি পাঠিয়ে দেয়। বড়ি এনে তাঁকে দিলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এর মূল্য কতো? ছেলেটি উত্তরে বলে, আমার আব্বা আমাকে মূল্য বলেননি। হযরত বলেন, তোমার আব্বাকে আমার সালাম বলবে এবং বলবে, আমি পঞ্চাশ বছর যাবত লোকদেরকে এ শিক্ষা দিয়ে আসছি যে, নিজের দ্বীনকে দুনিয়া উপার্জনের মাধ্যম বানিও না। আজ আমি নিজে আমার দ্বীনের বিনিময়ে কী করে দুনিয়া ভক্ষণ করবো?[১৬২]

আল্লাহ তোমার অন্তরকে ধনী করুন

হযরত সিররী সাক্‌তী রহ. বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে যেই ভালো অবস্থা দান করেছেন, তা সবই হযরত মা'রুফ কারখী রহ.-এর বরকত।

---

১৬০. আততাবাকাতুল কুবরা, শা'রানীকৃত, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৬৩০
১৬১. হিলইয়াতুল আওলিয়া, আবু নুআইমকৃত, খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ১২১
১৬২. হিলইয়াতুল আওলিয়া, আবু নুআইমকৃত, খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ১১৭

একদিন আমি ঈদের নামায পড়ে ফিরছিলাম। তখন হযরত মা'রুফ কারখী রহ.-কে অবিন্যস্ত কেশধারী একটি শিশুকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও যেতে দেখি। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটি কে? তিনি বললেন, আমি পথে দেখতে পেলাম, কিছু বালক খেলা করছে, আর এ বালকটি তাদের থেকে দূরে বিষণ্ন মনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি খেলছো না কেন? সে উত্তর দিলো, আমি এতীম। হযরত সিররী সাক্তী রহ. বলেন, আমি হযরত মা'রুফ কারখী রহ.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি এ বালককে সঙ্গে নিয়ে কী করবেন? তিনি বললেন, কোথাও থেকে কিছু বীচি সংগ্রহ করে তাকে দেবো। সেগুলোর বিনিময়ে ছেলেটি আখরোট ক্রয় করে আনন্দিত হবে। আমি তখন বললাম, ছেলেটি আমাকে দিয়ে দিন। আমি তার দেখাশোনা করবো। তিনি আমার নিকট হতে অঙ্গীকার নিলেন, সত্যি দেখাশোনা করবো কি না? আমি ওয়াদা করলাম। তিনি বললেন, নিয়ে যাও। আল্লাহ তা'আলা তোমার অন্তরকে ধনী করে দিন।

হযরত সিররী সাক্তী রহ. বলেন, হযরত মা'রুফ কারখী রহ.-এর এ দু'আর বদৌলতে আমার অন্তরের অবস্থা এই হয়েছে যে, আজ দুনিয়াকে আমার নিকট একটি অতি তুচ্ছ বস্তুর তুলনায়ও অধিক তুচ্ছ মনে হয়।[১৬৩]

রোগী দেখার আদব

হযরত সিররী সাক্তী রহ.-এর একটি ঘটনা। একবার তিনি অসুস্থ হলে কিছু লোক তাঁকে দেখতে আসে। হাদীসের দৃষ্টিতে রোগী দেখার সুন্নাত তরীকা হলো, রোগীর সঙ্গে যার খোলামেলা সম্পর্ক নেই, সে রোগীর নিকট অধিক সময় অবস্থান না করে সংক্ষেপে রোগী দেখে চলে যাবে। যেন রোগীর কষ্ট না হয়। কিন্তু হযরত সিররী সাক্তী রহ.-কে দেখতে আসা লোকগুলো দীর্ঘসময় তাঁর নিকট বসে থাকে। যাদের সঙ্গে খোলামেলা সম্পর্ক নেই, এমন লোক রোগীর নিকট দীর্ঘ সময় বসে থাকলে স্বভাবতই রোগীর কষ্ট হয়। আগন্তুকদের দীর্ঘক্ষণ বসে থাকায় হযরতেরও কষ্ট হচ্ছিলো। বিদায়ের সময় তারা হযরতকে বললো, আমাদের জন্যে দু'আ করুন! হযরত সাক্তী রহ., দু'আর জন্যে হাত উঠিয়ে বললেন,

হে আল্লাহ! আমাদেরকে রোগী দেখার আদব শিক্ষা দিন।[১৬৪]

---

১৬৩. হিলইয়াতুল আওলিয়া, আবু নুআইমকৃত, খণ্ডঃ ১০, পৃষ্ঠাঃ ১২৩
১৬৪. হিলইয়াতুল আওলিয়া, আবু নুআইমকৃত, খণ্ডঃ ১০, পৃষ্ঠাঃ ১২২

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ.-এর ঘটনাবলী

আখেরাতেও যেন এমন আনন্দ নসীব হয়

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ. দজলা নদীর তীরে পায়চারি করছিলেন। তাঁর কাছ দিয়ে একটি নৌকা যাচ্ছিলো। ঐ নৌকায় বখাটে ধরনের কিছু যুবক গান-বাজনা করছিলো। আর এ জাতীয় আড্ডার পাশ দিয়ে যখন কোনো মোল্লা মানুষ অতিক্রম করে তখন তাকে নিয়ে বিদ্রূপ করাও তাদের আড্ডা-আনন্দের একটা যুৎসই অংশ হিসাবে গণ্য হয়। তাই তারাও হযরতকে দেখে কিছু বিদ্রূপাত্মক কথাবার্তা বললো। হযরতের সঙ্গে আরেকজন লোক ছিলেন। তিনি এ অবস্থা দেখে বললেন, হযরত আপনি ওদের জন্য বদ দু'আ করুন। কারণ, এরা এতোই বেয়াদব যে, একে তো নিজেরা পাপাচারে লিপ্ত, অপরদিকে আল্লাহওয়ালাদেরকে নিয়ে বিদ্রূপ করে। হযরত সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে দু'আ করলেন– 'হে আল্লাহ আপনি যেভাবে এই যুবকদেরকে এ দুনিয়ায় আনন্দ দান করেছেন, তাদের আমলকে এমন করে দিন, যেন আখেরাতেও তাদের এমন আনন্দ নসীব হয়।' দেখুন! তিনি ঐ যুবকদেরকে ঘৃণা করেননি। তিনি ভেবেছেন, তারা তো আমার আল্লাহরই সৃষ্টি।

সেজদারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ

আবু বকর আত্তার রহ. বলেন, হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ.-এর ইন্তিকালের সময় আমি তাঁর পাশে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি বসে নামায পড়ছিলেন। সিজদা দেওয়ার সময় তিনি পা ভাজ করে নিতেন। অবশেষে এ অবস্থায় তাঁর পা থেকে জান বেরিয়ে যায়। তা আর নাড়ানো সম্ভব হচ্ছিলো না। কিন্তু এরপরেও তিনি ইবাদতে মশগুল থাকেন। একজন বললো, আপনি শুয়ে পড়লে ভালো হতো। তিনি বললেন, এখন তো আল্লাহর তরফ থেকে অনুগ্রহ করার সময়। অতঃপর এ অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হলো। ২৯৭ হিজরীতে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

চোর থেকে শিক্ষা

আমি আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ.-এর নিকট হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ.-এর ঘটনা শুনেছি যে, হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ. কোথাও যাচ্ছিলেন। এক জায়গায় দেখলেন যে, এক ব্যক্তিকে শূলীতে চড়ানো হয়েছে, তার এক হাত ও এক পা কাটা। তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন– কি হয়েছে? লোকেরা বললো, এ ব্যক্তি দাগী চোর। প্রথমবার ধরা পড়লে তার এক হাত কাটা হয়, দ্বিতীয়বার ধরা পড়লে এক পা কাটা হয়, এবার তৃতীয়বার ধরা পড়লে তাকে শূলীতে চড়ানো হয়। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ. সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তার পা চুম্বন করলেন। লোকেরা বললো, হযরত এ ব্যক্তি এতো বড়ো দাগী চোর, আর আপনি তার পা চুম্বন করছেন! উত্তরে তিনি বললেন, যদিও এ ব্যক্তি মারাত্মক অপরাধ করেছে, গোনাহের কাজ করেছে, যে কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে একটি অত্যাধিক উত্তম গুণ রয়েছে, তা হলো ইস্তিকামাত (অবিচলতা)। যদিও সে এ গুণকে ভুল জায়গায় ব্যবহার করেছে। সে যে কাজকে নিজের পেশা বানিয়েছে তার উপর সে অটল ছিলো, তার হাত কেটে দেওয়া হয়েছে, তারপরেও সে ঐ কাজ ছাড়েনি। পা কেটে দেওয়া হয়েছে তবুও তা ছাড়েনি। এমনকি তার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে, কিন্তু সে তার কাজে অটল ছিলো। এর দ্বারা জানা গেলো যে, তার মধ্যে ইস্তিকামাতের গুণ ছিলো। এই গুণের কারণে আমি তার পা চুম্বন করেছি। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে তাঁর ইবাদত ও বন্দেগীর কাজে এ গুণ দান করেন।

হযরত বাকী বিন মাখলাদ রহ.-এর ঘটনা

হযরত বাকী বিন মাখলাদ (মৃত ২৭৬ হিজরী) স্পেনের বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থটি ওলামায়ে কেরামের মধ্যে বিখ্যাত। তিনি উঁচু স্তরের মুহাদ্দিস হওয়ার সাথে সাথে অত্যন্ত আবেদ, যাহেদ ও মুসতাজাবুদ দাওয়াত বুযুর্গ ছিলেন। একবার তাঁর নিকট এক মহিলা এসে বললো, আমার ছেলেকে ফেরেঙ্গীরা বন্দি করে রেখেছে। সে কারণে আমার রাতের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছে। আমার মনের প্রশান্তি ও রাতের বিশ্রাম বিদায় নিয়েছে। আমার ছোট একটি ঘর রয়েছে। তা বিক্রি করে আমি আমার ছেলের মুক্তি পণ আদায় করে তাকে বন্দি দসা থেকে মুক্ত করতে চাই। আপনি কাউকে বলুন, সে যেন আমার ঘরটি ক্রয় করে।

হযরত বাকী বিন মাখলাদ রহ. তার আবেদন শুনলেন। তাকে বললেন, তুমি যাও আমি তোমার বিষয়টি ভেবে দেখবো। এর পরেই তিনি মাথা ঝুঁকিয়ে বসে পড়লেন এবং তার মুক্তির জন্যে দু'আ করতে আরম্ভ করলেন। এ ঘটনার অল্প দিন পরে সেই মহিলা তাঁর কাছে আবার এলো। এবার তার সঙ্গে তার ছেলেও ছিলো। সে বললো, তার সঙ্গে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। হযরত বাকী জিজ্ঞাসা করলেন, কী সেই ঘটনা? তার ছেলে বললো, ফেরেঙ্গী বাদশাহ আমাকে সেসব বন্দীদের মধ্যে রেখেছিলো, যারা পায়ে শিকল পরা অবস্থায় বাদশাহর খেদমত করতো। একদিন আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছিলাম। পায়ে শিকল বাঁধা ছিলো। যেতে যেতে অকস্মাৎ আমার পায়ের শিকল খুলে পড়ে গেলো। আমার পাহারাদার সিপাহী আমাকে গালি দিয়ে বললো, পায়ের শিকল কেন খুলেছো? আমি বললাম, আল্লাহর কসম আমি নিজেও জানি না আমার পা থেকে শিকল কীভাবে খুললো। তখন তারা কর্মকার ডেকে এনে পুনরায় আমার পায়ে শিকল পরিয়ে দিলো। এবার তার পেরেকগুলো খুব ভালো করে শক্তভাবে বসিয়ে দিলো। এরপর আমি উঠে হাঁটা দিলে আবারও শিকল খুলে পড়ে গেলো। তারা আবারও বাঁধলো।

আবার হাঁটা দিলে আবারও পড়ে গেলো। তারা খুব অবাক হলো। তাদের পদ্রীকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তার মা কী বেঁচে আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, মনে হচ্ছে তার মা দু'আ করেছেন এবং সেই দু'আ কবুল হয়েছে। পাদ্রী সংশ্লিষ্ট লোকদেরকে পরামর্শ দিলো, একে ছেড়ে দাও! তো তারা আমাকে ছেড়ে দিলো। তখন আমি ইসলামী রাষ্ট্রে চলে এলাম। হযরত বাকী বিন মুখাল্লাদ রহ. শিকল খুলে পড়ার সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তা ঠিক ঐ সময় ছিলো, যখন তিনি তার মুক্তির জন্যে দু'আ করছিলেন।[১৬৫]

১৬৫. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৫৭, 'তারাশে' থেকে সংগৃহীত

সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ রহ.-এর ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা কন্সট্যান্টিনোপল বিজয়ের সৌভাগ্য লিখেছিলেন ওসমানী খান্দানের সপ্তম তরুণ খলীফা সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহের ভাগ্যে। তরুণ এই শাহজাদা বাইশ বছর বয়সে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতার ফলে অতি দ্রুত তার পূর্বসূরীদের ছাড়িয়ে যান। কন্সট্যান্টিনোপল জয়ের প্রতিবন্ধক বিষয়গুলো তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ করেন। সুনিপুণ কৌশল, অপূর্ব বীরত্ব ও দৃঢ় সংকল্প দ্বারা তিনি যুদ্ধের এমন নকশা তৈরি করেন, যা শেষ পর্যন্ত বিজয়ের রূপ লাভ করে।

কন্সট্যান্টিনোপলের অধিবাসীরা যুদ্ধের সময় সাধারণত অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট থেকে যে সাহায্য পেতো, তা কৃষ্ণ সাগর থেকে বসফরাস প্রণালীতে প্রবেশ করে কন্সট্যান্টিনোপলে পৌঁছতো। তাই কন্সট্যান্টিনোপলকে তার মিত্রদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে বসফরাসের উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করা জরুরী ছিলো। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে বায়জিদ ইয়ালদারূম বসফরাসের (এশিয়ান) পূর্ব উপকূলে একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। 'আনাযুল দুর্গ' নামে তা প্রসিদ্ধ। দুর্গটি আজও বিদ্যমান রয়েছে। সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ উপলব্ধি করেন যে, শুধুমাত্র এক তীরের এই দুর্গ বসফরাসকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে যথেষ্ট নয়। তাই তিনি এই দুর্গের বিপরীত দিকে ইউরোপিয়ান উপকূলে বিশাল এক দুর্গ নির্মাণ করেন। তাকে 'রুমেলী দুর্গ' বলা হয়। এই দুর্গ নির্মাণের পর বসফরাস প্রণালী হয়ে অতিক্রমকারী প্রতিটি জাহাজকে ওসমানীদের উভয়মুখী তোপের আওতায় পড়তে হতো।

কন্সট্যান্টিনোপলের প্রাচীরসমূহ বিধ্বস্ত করার জন্যে সাধারণ কামান যথেষ্ট ছিলো না। তাই মুহাম্মাদ ফাতেহ পিতল দ্বারা এমন এক কামান তৈরি করেন, যার সমকক্ষ কোনো কামান তৎকালীন যুগে পৃথিবীর বুকে ছিলো না। এর দ্বারা আড়াই ফুট ব্যাসের আটমন ওজনের গোলা ১ মাইল দূর পর্যন্ত নিক্ষেপ করা যেতো। এই কামান যখন প্রথম ব্যবহার করা হয়, তখন তার গোলা ১ মাইল দূরে পতিত হয়ে ছয় ফুট মাটির গভীরে ঢুকে যায়।[১৬৬]

১৬৬. তারীখে খান্দানে ওসমানী, পৃষ্ঠা: ৩৩, তারীখে দৌলতে ওসমানী, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১০৭, মুহাম্মাদ আযীযকৃত

কন্সট্যান্টিনোপল বসফরাস প্রণালী, মরমরা উপসাগর ও গোল্ডেন হর্ন (সোনালী শিং) নামীয় সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত। শুধুমাত্র তার পূর্ব দিকটি ভূমিবেষ্টিত। তাই এর উপর সফল আক্রমণ করার জন্যে একটি শক্তিশালী নৌবহর আবশ্যক ছিলো। সুতরাং সুলতান ফাতেহ একশ' চল্লিশটি যুদ্ধ জাহাজের একটি নৌবহর গড়ে তোলেন।

এই বিশাল প্রস্তুতির পর সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ কন্সট্যান্টিনোপল অবরোধ করেন। তার স্থলবাহিনী শহরের পূর্ব প্রাচীরের সম্মুখে অবস্থান নেয়। নৌবহর বসফরাস প্রণালীতে ছড়িয়ে পড়ে। বসফরাসের ছোট একটি শাখা শিং-এর আকৃতিতে শহরের পূর্ব দিকে চলে গিয়েছে। একে গোল্ডেন হর্ন (সোনালী শিং) বলা হয়। কন্সট্যান্টিনোপলের নৌবন্দর গোল্ডেন হর্নে অবস্থিত। এ কারণে বসফরাস থেকে বন্দর অঞ্চল বা শহরের দক্ষিণে যেতে হলে গোল্ডেন হর্ন হয়ে যেতে হয়। কিন্তু কন্সট্যান্টিনোপলের লোকেরা গোল্ডেন হর্নের বসফরাস সংলগ্ন মাথায় লোহার বড়ো একটি শিকল বেঁধে রেখেছিলো, যে কারণে কোনো জাহাজ বসফরাস থেকে গোল্ডেন হর্নে প্রবেশ করতে পারতো না। সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহের জাহাজ বসফরাসের বুকেই আটকে যায়। জাহাজ দ্বারা বন্দর অঞ্চল অবরোধ করার কোনো সুযোগ ছিলো না। যার ফলে শুধু পূর্বের স্থলপথেই প্রাচীরের উপর আক্রমণ করা সম্ভব ছিলো। আর শহরের লোকেরা সমুদ্রের দিককে সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত মনে করে তাদের সম্পূর্ণ শক্তি পূর্বের প্রাচীরে নিয়োগ করতো।

সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ বন্দরের দিক থেকে আক্রমণ করার জন্যে যে কোনোভাবে কিছু জাহাজ গোল্ডেন হর্নের ভিতর প্রবেশ করানোর চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু গোল্ডেন হর্নের মুখে লোহার শিকল তো ছিলোই, তাছাড়া তার আশেপাশে গোলা নিক্ষেপ করার জন্যে শত্রুপক্ষের কামানও বসানো ছিলো। উপরন্তু লোহার শিকল সংরক্ষণের জন্যে গোল্ডেন হর্নের মধ্যে বড়ো বড়ো বাইজেন্টাইন জাহাজও দাঁড়ানো ছিলো। ফলে অনেকদিন অতিবাহিত হলেও গোল্ডেন হর্নে প্রবেশ করার কোনো চেষ্টাই সফল হয় না। যে কারণে এ পথে সফলতা লাভের কোনো সম্ভাবনা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না।

অবশেষে একদিন সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ এমন একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যা পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে বিরল ও বিস্ময়কর একমাত্র স্মৃতি হয়ে আছে। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তার জাহাজগুলোকে ১০ মাইল স্থলপথ অতিক্রম করিয়ে গোল্ডেন হর্নে প্রবেশ করাবেন। বসফরাসের পশ্চিম তীর থেকে জাহাজ স্থলে তুলে একটি ঘুরতি পথে গোল্ডেন হর্নের দক্ষিণ তীরে

নিয়ে সেখানে নামিয়ে দেবেন (এ স্থানটিকে বর্তমানে 'কাসেম পাশা' বলা হয়)। ঐতিহাসিক গিবনের বর্ণনামতে সেই দীর্ঘ দশ মাইল স্থলপথটি ছিলো পাহাড়ী, বন্ধুর ও অসমতল। মুহাম্মাদ ফাতেহের দৃঢ় সংকল্প এবং অকল্পনীয় বিস্ময়কর কর্মশক্তি মাত্র এক রাতে তা বাস্তবায়ন করে দেখায়। প্রথমে তিনি সেই স্থলপথে কাঠের তক্তা বিছিয়ে দেন। চর্বি দ্বারা ঘসে ঘসে তক্তাগুলোকে পিচ্ছিল করেন। তারপর জাহাজ সদৃশ সত্তরটি নৌকা পর পর বসফরাস থেকে উপরে তুলে সেই তক্তার উপর উঠিয়ে দেন। প্রতিটি নৌকায় দুজন করে মাল্লা ছিলো। বাতাসের সাহায্য পাওয়ার জন্যে পাল উড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর বলদ ও মানুষ মিলে জাহাজগুলোকে টেনে নিয়ে দশ মাইল দীর্ঘ এই পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে গোল্ডেন হর্নে নামিয়ে দেয়।

সত্তরটি জাহাজের এই মিছিল সারারাত মশালের আলোতে ভ্রমণ করতে থাকে। বাইজেন্টাইনের সৈন্যরা কন্সট্যান্টিনোপলের প্রাচীর থেকে বসফরাসের পশ্চিম তীরে মশালের দৌড়াদৌড়ি লক্ষ করে। কিন্তু অন্ধকারের কারণে কী হচ্ছে তার কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। ভোরের আলো রহস্যের পর্দা উন্মোচন করার পূর্বেই মুহাম্মাদ ফাতেহের সত্তরটি নৌকা এবং ভারী তোপখানা গোল্ডেন হর্নের উপরাংশে পৌছে যায়।

স্থলপথে জাহাজ চালানোর অভূতপূর্ব এই কৃতিত্ব– যা ইতোপূর্বে কারো কল্পনাতেও আসেনি– এতো চরম বিস্ময়কর ব্যাপার ছিলো যে, পাশ্চাত্যের কট্টর ঐতিহাসিকরা পর্যন্ত এ ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ না করে পারেনি। এ্যাডওয়ার্ড গিবনের মতো ঐতিহাসিকও একে একটি মু'জেযা (Miracle) বলে উল্লেখ করেছেন।

ওসমানী বাহিনীর নৌকাসমূহ গোল্ডেন হর্নে পৌছার ফলে একটি লাভ এই হয় যে, গোল্ডেন হর্নের পানি কম থাকায় বাইজেন্টাইনের বড়ো বড়ো জাহাজ তাতে অবাধে চলাফেরা করতে পারছিলো না, পক্ষান্তরে ওসমানী জাহাজগুলো তুলনামূলক ছোট হওয়ায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে কোনো বাধা ছিলো না। ফলে এখানকার নৌযুদ্ধে ওসমানী বাহিনীর নৌকাসমূহের জয়লাভ করতে কোনোরূপ সমস্যা হয়নি। এভাবে বন্দরের দিক থেকেও শহর পরিপূর্ণরূপে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। মুহাম্মাদ ফাতেহ একই সঙ্গে গোল্ডেন হর্নের উপর একটি পুল নির্মাণ করে তার উপর ভারী কামান বসিয়ে দেন।

পূর্ব ও দক্ষিণ দিক থেকে অবরোধ মজবুত হওয়ার পর ওসমানী বাহিনীর কামান উভয় দিক থেকে নগররক্ষা প্রাচীরের উপর প্রচণ্ডভাবে গোলা নিক্ষেপ

আরম্ভ করে। সাত সপ্তাহকাল অবিরাম গোলা বর্ষণের পর প্রাচীরের তিন স্থানে বড়ো বড়ো ফাটল দেখা দেয়। গিবনের ভাষায়–

'বহু শতাব্দী ধরে যেই প্রাচীরগুলো শত্রুপক্ষের আক্রমণের মোকাবেলা করে আসছিলো, ওসমানী বাহিনীর কামান সবদিক থেকে তার আকৃতি বিগড়ে দেয়। তাতে অনেক ফাটল সৃষ্টি হয়। সেন্ট রোমান্স ফটকের (ফটকটি পরে 'তোপ দরজা' বা 'তোপকাপে' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে) নিকটবর্তী চারটি মিনার মাটিতে মিশে যায়।'

সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ তখন চূড়ান্ত হামলার সাফল্যের ব্যাপারে নিশ্চিত হন। কিন্তু তিনি আক্রমণ করার পূর্বে ১৫ জুমাদাল উলা ৮৫৭ হিজরী মোতাবেক ২৪ মে ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে বাইজেন্টাইন সম্রাট কন্সট্যান্টিনের নিকট এই মর্মে পয়গাম পাঠান যে, তারা অস্ত্র সমর্পণ করে শহর হস্তান্তর করলে প্রজাদের জানমালের কোনো ক্ষতি করা হবে না। সাথে সাথে মুরিয়া অঞ্চল তাকে দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু কন্সট্যান্টিন তার এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন না। তাই পাঁচ দিন পর সুলতান মুহাম্মাদ সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

২০ জুমাদাল উলা ৮৫৭ হিজরীর রাতটি ওসমানী সেনাবাহিনী যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল এবং দু'আর মধ্যে অতিবাহিত করেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এও এসেছে যে, সুলতান মুহাম্মাদ বলেছিলেন, ইনশা আল্লাহ! আমরা আয়া সুফিয়ার গীর্জায় যোহর নামায আদায় করবো। বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ চলতে থাকে। তবে সেন্ট রোমান্স ফটকে (বর্তমানে তাকে 'তোপকাপে' বলা হয়) বেশি শক্তি প্রয়োগ করা হয়। কারণ এখানকার প্রাচীর অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। পরিখা অতিক্রম করার জন্যে তার উপর সিঁড়ি ও জাল ফেলা হয়। দুপুর পর্যন্ত উভয়পক্ষে ভীষণ অগ্নিঝরা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলতে থাকে। বাইজেন্টাইন বাহিনীও সেদিন অসাধারণ বীরত্বের সাথে লড়তে থাকে। দুপুর পর্যন্ত একজন সৈন্যও শহরে প্রবেশ করতে পারেনি। অবশেষে সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ তাঁর বিশেষ 'ইয়ানিচারী' বাহিনীকে সঙ্গে করে সেন্ট রোমান্স ফটকের দিকে অগ্রসর হন। ইয়ানিচারী বাহিনীর প্রধান আগা হাসান তার ত্রিশজন বীর সেনানীকে সাথে করে প্রাচীরের উপর আরোহণ করেন। হাসান ও তার আঠারো জন সঙ্গীকে তৎক্ষণাৎ প্রাচীর থেকে নীচে ফেলে দেওয়া হয়। তারা শাহাদতের অমীয় সুধা পান করেন। অবশিষ্ট বারো জন প্রাচীরের উপর দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করতে সক্ষম হন। তারপর

ওসমানী বাহিনীর অন্যান্য দলও একের পর এক প্রাচীরে আরোহণ করতে থাকে। এমনিভাবে কন্সট্যান্টিনোপলের প্রাচীরে চন্দ্রখচিত লাল পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হয়।

বাইজেন্টাইন সম্রাট কন্সট্যান্টিন এতক্ষণ বীরত্বের সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করছিলেন। কিন্তু তার কিছু অসাধারণ বীর যোদ্ধা সাহস হারানোর পর তিনি নিরাশ হয়ে পড়েন এবং তিনি উচ্চস্বরে বলে ওঠেন-

'এমন কোনো খ্রিস্টান নেই কি, যে আমাকে খুন করবে?'

কিন্তু এই আহ্বানের কোনো উত্তর না পেয়ে তিনি রোম সম্রাটদের (কায়সারদের) রাজ-পোশাক খুলে দূরে নিক্ষেপ করেন। অতঃপর ওসমানী সেনাবাহিনীর উন্মত্ত তরঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করে সত্যিকারের সৈনিকের মতো বীরত্বের সাথে লড়তে লড়তে নিহত হন। তার মৃত্যুতে ১১০০ বছরের বাইজেন্টাইনের সেই রোম সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে, যার সূচনাও হয়েছিলো প্রথম কন্সট্যান্টিনের হাতে এবং বিলুপ্তিও হলো আরেক কন্সট্যান্টিনের হাতে। তারপর থেকে কায়সার উপাধিই ইতিহাসের উপাখ্যানে পরিণত হয়ে যায়। এভাবে ইহ-পরকালের সরদার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী সত্য প্রমাণিত হয়–

إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ

'কায়সারের ধ্বংসের পর আর কোনো কায়সার জন্ম নিবে না।'

যোহরের সময় সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ তার উজির ও সেনা নায়কদের সমভিব্যাহারে সেন্ট রোমান্স ফটক দিয়ে শহরে প্রবেশ করেন। তিনি সর্বাগ্রে কন্সট্যান্টিনোপলের জগতবিখ্যাত গীর্জা আয়া সুফিয়ার দুর্গে পৌছে অশ্ব থেকে অবতরণ করেন। গীর্জার প্রাচীরে ছবির কারুকার্য ছিলো। সুলতানের নির্দেশে সেগুলো মুছে ফেলে ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়। তখন সুলতানের নির্বাচিত মুয়াযযিন সেখানে আযান দেন। শিরক ও কুফরের এই কেন্দ্রে প্রথমবার 'আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'-এর প্রাণবন্ত ধ্বনি উচ্চকিত হয়। সুলতান এখানে যোহরের নামায আদায় করেন। তখন থেকে এই গীর্জা মসজিদে রূপান্তরিত হয়।

তারপর সুলতান শাহী মহলে প্রবেশ করেন। জাঁকজমকপূর্ণ এসব মহল, যা বহু শতাব্দী ধরে কায়সারদের দোর্দণ্ড প্রতাপ ও শান-শওকতের লীলাকেন্দ্র ছিলো, আজ তা বিরান পড়ে আছে।[১৬৭]

---

১৬৭. জাহানে দীদা থেকে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা: ৩২৩

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ.-এর আলোচনা

আল্লামা শামীর নাম মুহাম্মাদ আমীন ইবনে আবেদীন রহ.। ১১৯৮ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি বাল্যকালে পবিত্র কুরআন হিফয করেন। হিফয শেষ করার পর তাঁর পিতা তাকে ব্যবসা শেখানোর জন্যে দোকানে বসাতে আরম্ভ করেন। তিনি সেখানে বসে উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। একদিন কুরআন তিলাওয়াত করার সময় সেখান দিয়ে একজন অপরিচিত লোক যাচ্ছিলো। লোকটি তাঁকে কুরআন পড়তে দেখে বলে, এভাবে কুরআন পড়া দুই কারণে তোমার জন্যে জায়েয নেই। প্রথম কারণ এই যে, এটা বাজার। এখানে লোকেরা তোমার তিলাওয়াত শুনবে না, ফলে তোমার কারণে তারা গোনাহগার হবে। যার গোনাহ তোমারও হবে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, তোমার তিলাওয়াতে অনেক ভুল রয়েছে।

তখনই আল্লামা শামী রহ. দোকান থেকে উঠে পড়েন এবং সে যুগের শাইখুল কুররা শাইখ সাঈদ আল হামবী রহ.-এর নিকট কিরাত ও তাজবীদ শেখার জন্যে দরখাস্ত করেন। তিনি দরখাস্ত মঞ্জুর করেন। আল্লামা শামী রহ. নাবালেগ অবস্থাতেই কিরাত ও তাজবীদের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'মায়দানিয়া' 'জাযারিয়া' ও 'শাতেবিয়া' মুখস্থ করেন এবং কিরাত ও তাজবীদ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন।[১৬৮]

---

১৬৮. আল আ'লাম, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ১৫২, যিরিক্‌লীকৃত

আল্লামা আহমাদ দারদের মালেকী রহ.-এর ঘটনা

মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ আল্লামা আহমাদ দারদের মালেকী রহ. সেই মহান ব্যক্তি, যাঁর প্রণীত 'মুখতাসারু খলীল' গ্রন্থের ভাষ্যগ্রন্থ বর্তমানে মালেকী ফিক্হের মেরুদণ্ডের মর্যাদা রাখে। তিনি দ্বাদশ হিজরী শতাব্দীর একজন বুযুর্গ। আল আযহার জামে মসজিদে ইলম হাসিল করেন। ফিক্হ এবং তাসাওউফ শাস্ত্রে তাঁকে ইমাম মনে করা হয়। এমনকি তাঁকে 'মালেকুস সাগীর' (ছোট ইমাম মালেক) বলা হতে থাকে।

তৎকালীন মরক্কোর বাদশাহ আল আযহারের আলেমদের জন্যে হাদিয়া পাঠাতেন। (১১৯৮ হিজরীতে) একবার তিনি কিছু হাদিয়া আল্লামা দারদের রহ.-এর খেদমতে পাঠান। ঘটনাচক্রে সে বছরই বাদশাহর ছেলে হজ্বে যায়। ফেরার পথে মিসরে পৌছে তার সফরের খরচের অর্থ শেষ হয়ে যায়। আল্লামা দারদের রহ. বিষয়টি অবগত হতে পেরে তাঁর প্রাপ্ত হাদিয়ার অর্থ শাহজাদার নিকট পাঠিয়ে দেন। পরবর্তী বছর বাদশাহ এর দশগুণ বেশি হাদিয়া পাঠান। শায়েখ সেই অর্থ দিয়ে হজ্ব করেন এবং অবশিষ্ট টাকা দিয়ে তাঁর মসজিদ ও খানকা নির্মাণ করেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি তাতেই অধ্যাপনা ও গ্রন্থ রচনার কাজ করে যান। পরিশেষে ১২০১ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[১৬৯]

---

১৬৯. জাহানে দীদা থেকে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা: ৩২৩

শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর ঘটনা

হযরত শাইখ আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী রহ. অনেক উঁচু স্তরের আল্লাহর ওলী ছিলেন। তিনি হযরত শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. সম্পর্কে একটি ঘটনা লিখেছেন। একবার হযরত শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. তাহাজ্জুদের নামায পড়ছিলেন। এমন সময় তিনি দেখলেন যে, একটি নূর চমকালো। পুরো পরিবেশ আলোকিত হয়ে উঠলো। সেই আলোর মধ্যে থেকে আওয়াজ এলো, হে আব্দুল কাদের! তুমি আমার ইবাদতের হক আদায় করেছো। এ পর্যন্ত তুমি যতো ইবাদত করেছো, তাই যথেষ্ট। আজকের পর আর তোমার উপর নামায ফরয নয়, রোযা ফরয নয়, সমস্ত ইবাদতের কষ্ট তোমার থেকে তুলে নেওয়া হলো।

আলোর মধ্যে থেকে এই আওয়াজ এলো। যেন আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, তোমার ইবাদত এ পর্যায়ে কবুল হয়েছে যে, ভবিষ্যতে তোমার আর ইবাদত করতে হবে না। হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহ. যখন এ নূর দেখলেন এবং এ আওয়াজ শুনলেন, তখন সাথে সাথে তিনি উত্তরে বললেন,

'হতভাগা! দূর হ, আমাকে ধোঁকা দিচ্ছিস। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামা থেকে তো ইবাদত মাফ হয়নি, তাঁর উপর থেকে ইবাদতের দায়িত্ব রহিত হয়নি, আর আমার থেকে রহিত হচ্ছে। তুই আমাকে ধোঁকা দিতে চাস।'

দেখুন, শয়তান কতো বড়ো আক্রমণ করেছে! তার অন্তরে যদি ইবাদতের অহঙ্কার চলে আসতো, তাহলে সেখানেই পদস্খলন ঘটতো। যেসব লোক অনেক বেশি কাশফ ও কারামতের পিছনে লেগে থাকে, তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে তো শয়তানের এটা উত্তম আক্রমণ ছিলো। কিন্তু তিনি তো ছিলেন শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী রহ.। অবিলম্বে তিনি বুঝে ফেললেন যে, এ কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে হতে পারে না। কারণ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর থেকে ইবাদতের দায়িত্ব রহিত হয়নি। তাহলে আমার উপর থেকে কি করে রহিত হয়?

অল্পক্ষণ পর আরেকটা নূর ভেসে উঠলো। দিগন্ত আলোকিত হয়ে উঠলো। সেই নূরের মধ্যে থেকে আওয়াজ এলো-

হে আব্দুল কাদের! তোমার ইলম আজ তোমাকে রক্ষা করেছে। অন্যথায় কতো আবেদকে যে আমি এই আক্রমণ দ্বারা ধ্বংস করেছি, তার হিসাব নেই।

হযরত শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. পুনরায় বললেন,

'হতভাগা আবারও আমাকে ধোঁকা দিচ্ছিস। আমার ইলম আমাকে রক্ষা করেনি, আল্লাহর অনুগ্রহ আমাকে রক্ষা করেছে।'

এই দ্বিতীয় আক্রমণ ছিলো প্রথম আক্রমণের চেয়ে বিপদজনক ও মারাত্মক। কারণ, এর মাধ্যমে তার মধ্যে ইলমের অহমিকা ও গর্ব সৃষ্টি করতে চেয়েছিলো।

হযরত শাইখ আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী রহ. এ ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেন যে, প্রথম আক্রমণ অধিক মরাত্মক ছিলো না। কারণ, যার কাছে সামান্য শরীয়তের ইলম থাকবে, সেও এ কথা বুঝতে পারবে যে, জীবনে যতোক্ষণ হুঁশ-জ্ঞান ঠিক আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো মানুষের ইবাদত মাফ হতে পারে না। কিন্তু দ্বিতীয় আক্রমণটি ছিলো অতি মারাত্মক। কতো মানুষ যে, এই আক্রমণে বিপথগামী হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। কারণ, এর মাধ্যমে ইলমের অহঙ্কার সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য ছিলো, যা একটি সূক্ষ্ম বিষয়।

হযরত শো'বা বিন হাজ্জাজ রহ.-এর ঘটনা

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা কা'নাবী রহ. বড়ো মাপের একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। সুনানে আবু দাউদে তাঁর অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। একবার তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। রাস্তায় শো'বা নামের এক লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ। যিনি পরবর্তীতে অনেক বড়ো মুহাদ্দিস হয়েছিলেন। কিন্তু শুরুতে ছিলেন বখাটে টাইপের একজন লোক। তাঁর জীবন ছিলো পাপ-পঙ্কিলতায় ভরা।

শো'বা দেখলেন, একজন মুহাদ্দিস (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আসছেন। আল্লাহ মালুম, তার মনে কি ভাবাবেগের উদয় হলো। সামনে অগ্রসর হয়ে বেয়াদবের মতো ঘোড়ার লাগাম ধরে বলতে লাগলেন, এই শায়েখ! আমাকে একটি হাদীস শুনিয়ে যাও! তিনি উত্তর দিলেন, এটা হাদীস শোনার পন্থা নয়; অন্য সময় শুনে নিও। তিনি বললেন, না, আমি এখনই শুনবো এবং একটি হাদীস হলেও আমাকে শোনাতে হবে।

মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা অনেক রাগ করলেন। কিন্তু চিন্তা করলেন, সে যখন না-ছোড় বান্দা, তো তার বর্তমান অবস্থার সঙ্গে মিল রেখে একটি হাদীস অন্তত শুনিয়ে দেই। এরপর তিনি শোনালেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ

'যখন তোমার লজ্জা চলে যাবে, তখন তুমি যা ইচ্ছা তাই করো।'[১৭০]

শো'বা রহ. বলেন, হাদীসটি কানে পড়ামাত্র আমার দিলে এমন প্রভাব বিস্তার করলো, মনে হলো যেন এ হাদীসটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্যেই বলেছেন। দিলে এমন আঘাত লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে অতীত জীবনের সকল কর্মকাণ্ড থেকে তাওবা করলাম।

এরপর আল্লাহ তা'আলা হযরত শো'বা রহ.-কে এমন সুউচ্চ মাকাম ও মর্যাদা দান করলেন যে, আজ তাঁকে 'আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস' উপাধীতে স্মরণ করা হয়। বোঝা গেলো, কোনো কোনো সময় একটি বাক্যও মানুষের পুরো জীবন এবং জীবনের গতি ও গন্তব্য পরিবর্তন করে দিতে পারে।

---

১৭০. সহীহ বোখারী, হাদীস নং- ৩২২৪

হযরত সাইয়্যেদ আহমাদ কাবীর রেফায়ী রহ.-এর ঘটনা

হযরত সাইয়্যেদ আহমাদ কাবীর রেফায়ী রহ.-এর নাম আপনারা শুনে থাকবেন। অনেক উঁচু মাপের আল্লাহর ওলী ছিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে এমন এক ঘটনা ঘটে, দুনিয়াতে অন্য কারো সাথে যা ঘটেনি।

তা হলো, তিনি সারা জীবন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা শরীফে হাজির হওয়ার বাসনা অন্তরে লালন করেন। দীর্ঘ দিনের আশা-আকাঙ্ক্ষার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে হজের সৌভাগ্য দান করেন। তিনি হজ করতে যান। হজ শেষে মদীনা শরীফে তাশরীফ নিয়ে যান। যখন তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা শরীফে হাজির হন। তখন মনের আবেগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আরবীতে এই শের দু'টি পাঠ করেন,

فِيْ حَالَةِ الْبُعْدِ رُوْحِيْ كُنْتُ أُرْسِلُهَا

تُقَبِّلُ الْأَرْضَ عَنِّيْ وَهِيَ نَائِبَتِيْ

وَهٰذِهٖ دَوْلَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ

فَامْدُدْ يَمِيْنَكَ كَيْ تَحْظٰى بِهَا شَفَتِيْ

'হে আল্লাহর রাসূল! যখন আমি দূরে ছিলাম তখন রওযা শরীফে আমার রূহকে পাঠাতাম। সে আমার প্রতিনিধি হিসেবে এখানের মাটি চুম্বন করতো। আজ যেহেতু আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে আমাকে দৈহিকভাবে এখানে হাজির হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন, তাই আপনি আপনার পবিত্র হাত প্রসারিত করুন। যাতে আমার ঠোঁট তাতে চুম্বন করে সৌভাগ্য লাভ করতে পারে।'

এই কবিতা পাঠ করতেই রওযা শরীফ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাত বের হয়ে আসে। উপস্থিত সকলে পবিত্র হাতের যিয়ারত লাভ করে। হযরত সাইয়্যেদ আহমাদ কাবীর রেফায়ী রহ. পবিত্র হাতে চুম্বন করে চলে যান। এর হাকীকত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। কিন্তু ইতিহাসে এ ঘটনা লিখিত আছে।[১৭১]

---

১৭১. আসনাল মাতালিব, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৫৭

এই ঘটনা ঘটার পর সাইয়্যেদ আহমাদ কাবীর রেফায়ী রহ.-এর অন্তরে চিন্তা জাগলো, আজ আল্লাহ তা'আলা আমাকে এতো বড়ো মর্যাদা দান করলেন, যা আজ পর্যন্ত কারো ভাগ্যে জোটেনি। এর ফলে আমার অন্তরে অহঙ্কার ও আত্মশ্লাঘার ভাব সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং তিনি মসজিদে নববীর দরজায় এসে শুয়ে পড়েন এবং উপস্থিত লোকজনকে বলেন, আমি সকলকে কসম দিয়ে বলছি, আপনারা আমার উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বের হয়ে যান। যাতে আমার অহমিকার এই ভাবও অন্তর থেকে বের হয়ে যায়। এভাবেই তিনি অহঙ্কার ও আত্মশ্লাঘার চিকিৎসা করেন।

এ ঘটনা তো মাঝখানে তাঁর পরিচয়ের জন্যে তুলে ধরলাম। মূলত আমি যে ঘটনা বলতে চাই তা হলো, একবার সাইয়্যেদ আহমাদ কাবীর রেফায়ী রহ. বাজারে তাশরীফ নিয়ে যান। সড়কে একটি চুলকানি ওয়ালা কুকুর দেখতে পান। চুলকানি এবং রোগের কারণে কুকুরটি চলতে পারছিলো না।

আল্লাহর নেক বান্দাগণের অন্তরে আল্লাহর মাখলুকের প্রতি সীমাহীন মমতা ও ভালোবাসা থাকে। তাদের এই ভালোবাসা ও মমতা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কের আলামত। এ কথাটিই মাওলানা রুমী রহ. বলেন,

ز تسبیح و سجادہ و دلق نیست

طریقت بجز خدمت خلق نیست

অর্থাৎ, তাসবীহ, জায়নামায আর মোটা কাপড়ের নাম তরীকত নয়। মাখলুকের খেদমত করাই হলো তরীকত।

আমার শায়েখ হযরত ডা. আব্দুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন, যখন কোনো মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ তা'আলারও তার সঙ্গে মহব্বত পয়দা হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে মাখলুকের মহব্বত ঢেলে দেন। যার ফলে আল্লাহওয়ালাগণের মানুষ বরং পশুর সাথেও এ পরিমাণ ভালোবাসা থাকে, যা আমরা কল্পনাও করতে পারবো না।

যাইহোক, সাইয়্যেদ আহমাদ কাবীর রহ. যখন কুকুরটিকে এ অবস্থায় দেখলেন, তখন তার খুব মায়া হলো, দয়া হলো। তিনি কুকুরটিকে উঠিয়ে ঘরে আনলেন। তারপর ডাক্তার এনে চিকিৎসা করালেন। ঔষধের ব্যবস্থা করলেন। প্রতিদিন পট্টি লাগাতেন। কয়েক মাস পর্যন্ত চিকিৎসা করতে থাকেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা কুকুরটিকে সুস্থ করে দিলে তিনি তার সাথীদেরকে বললেন, কোনো ব্যক্তি যদি কুকুরটির পানাহারের দায়িত্ব নেয়

তাহলে সে যেন একে নিয়ে যায়। অন্যথায় আমিই কুকুরটিকে রেখে দিবো, তাকে খাওয়াবো। এভাবে তিনি ঐ কুকুরটির প্রতিপালন করেন।

এ ঘটনার পর একদিন সাইয়্যেদ আহমাদ কাবীর রেফায়ী রহ. এক জায়গায় তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। বৃষ্টির মৌসুম ছিলো। ক্ষেতের মাঝখানের আইলের উপর দিয়ে তিনি অতিক্রম করছিলেন। উভয় দিকে পানি, কাদা। চলতে চলতে সামনে থেকে ঐ আইলের উপর দিয়ে একটি কুকুর আসে। তিনিও থেমে যান, কুকুরটিও তাকে দেখে থেমে যায়। আইলটি এতো ছোট ছিলো যে, একজন মানুষই তার উপর দিয়ে অতিক্রম করতে পারবে। দু'জন অতিক্রম করার সুযোগ ছিলো না। এখন হয় কুকুরকে নীচে কাদার মধ্যে নামতে হবে, আর ইনি উপর দিয়ে অতিক্রম করবেন। অথবা তাঁকে কাদার মধ্যে নামতে হবে আর কুকুর উপর দিয়ে অতিক্রম করবে। দিলের মধ্যে খটকা সৃষ্টি হলো, কী করবো? কে নীচে নামবে? আমি নামবো, না কুকুর নামবে?

তখন সাইয়্যেদ আহমাদ কাবীর রেফায়ী রহ.-এর কুকুরের সঙ্গে কথাবার্তা হলো। আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন, এ কথাবার্তা কীভাবে হয়েছিলো। হতে পারে আল্লাহ তা'আলা কারামত হিসাবে কিছু সময়ের জন্যে ঐ কুকুরকে কথা বলার শক্তি দিয়েছিলেন। তাই বাস্তবেই কথা হয়েছে। অথবা এটাও হতে পারে যে, তিনি মনে মনে এ কথা বলেছেন। যাইহোক, হযরত সাইয়্যেদ আহমাদ কাবীর রহ. কুকুরকে বললেন, তুই নীচে নেমে যা, আমি উপর দিয়ে যাই।

উত্তরে কুকুর বললো, আমি নীচে কেন নামবো? আপনি অনেক বড়ো দরবেশ, আর আল্লাহর ওলী হয়ে ঘুরছেন। আল্লাহর ওলীদের অবস্থা তো এই হয়ে থাকে যে, তারা অন্যের জন্যে ছাড় দেয়, ত্যাগ স্বীকার করে। আপনি কেমন আল্লাহর ওলী যে, আমাকে নীচে নামার হুকুম দিচ্ছেন। নিজে নীচে নামছেন না কেন?

হযরত শায়েখ রহ. উত্তরে বললেন, আসল কথা হলো, আমার আর তোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তা হলো, আমার উপর আল্লাহর আদেশ রয়েছে, কিন্তু তোর উপর আল্লাহর আদেশ নেই। আমাকে নামায পড়তে হয়, তোকে নামায পড়তে হয় না। নীচে নামার কারণে তোর শরীর নাপাক হলে তোর গোসল এবং পবিত্রতার প্রয়োজন হয় না। আমি নীচে নামলে আমার

কাপড় নাপাক হয়ে যাবে। আমার নামাযে সমস্যা হবে। এজন্যে আমি তোকে নীচে নামতে বলছি।

উত্তরে কুকুর বললো, বাহ! আপনি বড়ো বিস্ময়কর কথা বললেন, কাপড় নাপাক হয়ে যাবে! আপনার কাপড় যদি নাপাক হয়ে যায় তাহলে সেটা খুলে ধুয়ে ফেললেই পাক হয়ে যাবে। কিন্তু আমি যদি নীচে নামি তাহলে আপনার অন্তর নাপাক হয়ে যাবে এবং আপনার অন্তরে এ কথা জাগবে যে, আমি কুকুর থেকে উত্তম। আমি মানুষ আর এ হলো কুকুর। এই চিন্তার কারণে আপনার অন্তর এমন নাপাক হবে যে, তা পাক করার কোনো পথ থাকবে না। এজন্যে এটাই উত্তম যে, অন্তর নাপাক না হয়ে কাপড় নাপাক হোক। আপনি নীচে নেমে যান।

কুকুরের এই উত্তর শুনে হযরত শায়েখ রহ. আত্মসমর্পণ করলেন। তিনি বললেন, তুমি ঠিক বলেছো। কাপড় তো আবার ধোয়া যাবে, কিন্তু অন্তর তো ধোয়া যাবে না। একথা বলে তিনি কাদার মধ্যে নেমে পড়লেন এবং কুকুরকে রাস্তা দিয়ে দিলেন।

যখন এই কথাবার্তা হলো, তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত সাইয়্যেদ আহমাদ কাবীর রেফায়ী রহ.-কে এলহাম করা হলো। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেন, হে আহমাদ কাবীর! আজ আমি তোমাকে এমন এক ইলমের দৌলত দান করলাম যে, সমস্ত ইলম একদিকে আর এই ইলম একদিকে। এটা মূলত তোমার সেই আমলের পুরষ্কার। তুমি কিছুদিন পূর্বে একটি কুকুরের প্রতি দয়া দেখিয়েছিলে। তার চিকিৎসা করেছিলে। পরিচর্যা করেছিলে। সেই আমলের বদৌলতে আমি তোমাকে এই কুকুরের মাধ্যমে এমন এক ইলম দান করলাম, যার উপর সমস্ত ইলম কোরবান। আর সেই ইলম হলো, মানুষ নিজেকে নিজে কুকুরের চেয়ে উত্তম মনে করবে না এবং কুকুরকে নিজের তুলনায় তুচ্ছ জ্ঞান করবে না।

হযরত বাহলুল মাজযুব রহ.-এর ঘটনা

হযরত বাহলুল মাজযুব রহ. নামে একজন বুযুর্গ অতিবাহিত হয়েছেন। তিনি মাজযুব (আত্মভোলা) কিসিমের বুযুর্গ ছিলেন। বাদশা হারুনুর রশীদের জামানার লোক ছিলেন। বাদশা হারুনুর রশীদ তাঁর সঙ্গে হাসি-মজাক করতেন। মাজযুব হলেও তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলতেন। হারুনুর রশীদ দারোয়ানদেরকে বলে রেখে ছিলেন, এই মাজযুব আমার সাথে দেখা করতে এলে তাঁকে ভিতরে আসতে দিবে, বাধা দিবে না। এ কারণে তিনি অবাধে দরবারে আসতেন।

একদিন তিনি দরবারে আসলেন। তখন হারুনুর রশীদের হাতে একটি ছড়ি ছিলো। হারুনুর রশীদ কৌতুক করার জন্যে তাকে বললেন, বাহলুল ছাহেব, আপনার কাছে আমার একটি নিবেদন আছে।

বাহলুল জিজ্ঞাসা করলেন, কী সেটা?

হারুনুর রশীদ বললেন, আমি এই ছড়ি আমানত স্বরূপ আপনার কাছে রাখছি। এ দুনিয়াতে আপনার চেয়ে অধিক নির্বোধ কাউকে পেলে আমার পক্ষ থেকে তাকে এটা হাদিয়া দিবেন।

বাহলুল বললেন, খুব ভালো। এ কথা বলে ছড়িটি রেখে দিলেন।

বাদশাহ তো ঠাট্টা করে এ কথা বলেছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিলো এ কথা বোঝানো যে, দুনিয়াতে তুমি সবচাইতে নির্বোধ। তোমার চাইতে অধিক নির্বোধ কেউ নেই। যাই হোক বাহলুল ছড়ি নিয়ে চলে গেলেন।

এরপরে কয়েক বছর চলে গেলো। একদিন বাহলুল জানতে পারলেন, হারুনুর রশীদ মারাত্মক অসুস্থ। সয্যাশায়ী। চিকিৎসা চলছে কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না। বাহলুল মাজযুব বাদশাহকে দেখতে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আমিরুল মু'মিনীন কী অবস্থা?

বাদশাহ উত্তর দিলেন, অবস্থা আর কী জিজ্ঞাসা করছো, সামনে তো সফর চলে এসেছে!

বাহলুল জিজ্ঞাসা করলেন, কোথাকার সফর সামনে এসেছে?

বাদশাহ উত্তর দিলেন, আখেরাতের সফর সামনে চলে এসেছে। এখন দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছি।

বাহলুল জিজ্ঞাসা করলেন, কতদিন পরে ফিরে আসবেন?

হারুনুর রশীদ বললেন, ভাই এটা তো আখেরাতের সফর! এখান থেকে কেউ ফিরে আসে না।

বাহলুল বললেন, আচ্ছা আপনি তাহলে ফিরে আসবেন না। তো আপনি সফরের আরাম-বিশ্রাম ও ব্যবস্থাপনার জন্যে কতজন সৈন্য আগে পাঠিয়েছেন?

বাদশাহ উত্তর দিলেন, তুমি আবার নির্বোধের মতো কথা বলছো! আখেরাতের সফরে কেউ সাথে যায় না। বডি গার্ড যায় না, সেনা-সামন্ত যায় না, সিপাই-সৈন্য যায় না। সেখানে তো মানুষ একাই যায়।

বাহলুল বললেন, এতো দীর্ঘ সফর, সেখান থেকে ফিরেও আসবেন না, অথচ আপনি কোনো সেনা-সামন্ত পাঠাননি! ইতিপূর্বে আপনি যতো সফর করেছেন, সবগুলোর ব্যবস্থাপনার জন্যে সফরের সাজসরঞ্জাম ও সেনা-সামন্ত আগে পাঠানো হতো। এই সফরে কেনো পাঠালেন না?

বাদশাহ বললেন, এটা এমন এক সফর, যেখানে কোনো সেনা-সামন্ত ও সিপাই-সৈনিক পাঠানো হয় না।

বাহলুল বললেন, বাদশাহ সালামত! অনেকদিন পূর্বে আপনি একটি আমানত আমার কাছে রেখেছিলেন। সেটি ছিলো একটি ছড়ি! আপনি বলেছিলেন আমার চেয়ে অধিক কোনো নির্বোধ লোক পেলে তাকে দিয়ে দিয়ো। আমি অনেক তালাশ করলাম। কিন্তু আমার চেয়ে অধিক নির্বোধ আপনাকে ছাড়া কাউকেই পাইনি। কারণ, আমি ইতিপূর্বে দেখে এসেছি যে, আপনার ছোট একটি সফর হলেও কয়েক মাস আগে থেকে তার প্রস্তুতি চলতো। পানাহার সামগ্রী, তাবু, সেনা-সামন্ত, বডি গার্ড সব আগে পাঠানো হতো। আর এখন এতো দীর্ঘ সফরে যাচ্ছেন। যেখান থেকে আপনি ফিরেও আসবেন না। এর জন্যে কোনো প্রস্তুতি নেই! আপনার চেয়ে অধিক নির্বোধ দুনিয়াতে কাউকে পাইনি। এজন্যে আপনার এই আমানত আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি।

এ কথা শুনে হারুনুর রশীদ কেঁদে ফেললেন। বললেন, বাহলুল তুমি সত্য কথা বলেছো। সারা জীবন আমি তোমাকে নির্বোধ মনে করেছি, কিন্তু

বাস্তবে প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা তুমিই বলেছো। বাস্তবেই আমি আমার জীবন বরবাদ করেছি। আখেরাতের এই সফরের কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি।

হযরত বাহলুল রহ. যে কথা বলেছেন, তা মূলত হাদীসেরই কথা। হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ

'বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করলো এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্যে আমল করলো।'[১৭২]

এই হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, বুদ্ধিমান কে? বর্তমান বিশ্বে বুদ্ধিমান কাকে বলা হয়? যে খুব মাল কামাইতে পারে। সম্পদ বাড়ানো এবং পয়সা থেকে পয়সা বানানো খুব ভালো জানে। দুনিয়াবাসীকে খুব ধোঁকা দিতে পারে। কিন্তু এ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি, যে নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার পিছনে ছোটে না, বরং প্রবৃত্তিকেই আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুগামী বানায়। মৃত্যুর পরের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে, এমন ব্যক্তি হলো বুদ্ধিমান। যে এমনটি করে না সে নির্বোধ। সারাটা জীবন অহেতুক কাজে পার করে দিলো। যেখানে সর্বদা অবস্থান করতে হবে সেখানের কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ করলো না।

বাহলুল রহ. হারুনুর রশীদকে যে কথা বলেছেন, চিন্তা করে দেখলে সে কথা আমাদের সকলের জন্য প্রযোজ্য। কারণ আমাদের প্রত্যেকে দুনিয়াতে বসবাস করার জন্যে সবসময় চিন্তা করি যে, বাড়ি কোথায় বানাবো? কীভাবে বানাবো? সেখানো আরাম আয়েসের কী কী সামগ্রী জমা করবো? দুনিয়াতে কোথাও সফরে গেলে কয়েকদিন আগে থেকে বুকিং করায়। পরবর্তীতে যদি সিট পাওয়া না যায়। কয়েকদিন আগে থেকে সফরের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। যেখানে যাওয়া হবে, আগে থেকে সেখানে খবর দেওয়া হয়। হোটেল বুকিং করানো হয়। এসব প্রস্তুতি পূর্বেই গ্রহণ করা হয়। অথচ সফর মাত্র তিন দিনের। কিন্তু যেখানে সর্বদা থাকতে হবে। যেই জীবনের কোনো শেষ নেই। সেখানের বাড়ি কীভাবে বানাবো এবং সেখানে কীভাবে বুকিং করাবো সেই চিন্তা নেই![১৭৩]

---

১৭২. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৩৮৩

১৭৩. ইসলাহী খুতুবাৎ, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ২৬৯-২৭০

পুরো সম্রাজ্যের মূল্য

হারুনুর রশীদ একবার রাজদরবারে উপবিষ্ট ছিলেন। পান করার জন্যে পানি চাইলেন। কাছেই মাজযুব বুযুর্গ হযরত বাহলুল রহ. উপবিষ্ট ছিলেন। হারুনুর রশীদ পানি পান করতে আরম্ভ করলে তিনি বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! এক মিনিটের জন্যে থামুন। তিনি থামলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার?

তিনি বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই। তা এই যে, আপনার এখন পিপাসা লেগেছে। পানির গ্লাসও আপনার হাতে রয়েছে। আপনি বলুন, আপনার যদি এমনই তীব্র পিপাসা লাগে, আর আপনি তখন এমন ময়দান বা বনের মধ্যে অবস্থান করেন, যেখানে পানি নেই। ওদিকে আপনার পিপাসা তীব্রতর হচ্ছে। তখন আপনি এক গ্লাস পানি পাওয়ার জন্যে কী পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করবেন?

হারুনুর রশীদ উত্তর দিলেন, প্রচণ্ড পিপাসার অবস্থায় পানি না পেলে তো মৃত্যু অনিবার্য। তাই নিজের প্রাণ রক্ষার জন্যে আমার কাছে যতো সম্পদ থাকবে সবই ব্যয় করবো। এ উত্তর শুনে হযরত বাহলুল রহ. বললেন, এবার আপনি 'বিসমিল্লাহ' বলে পানি পান করুন।

বাদশাহ পানি পান করলে হযরত বাহলুল মাজযুব রহ. বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আমি আপনাকে আরেকটি প্রশ্ন করতে চাই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী সেই প্রশ্ন?

বাহলুল মাজযুব বললেন, প্রশ্ন হলো, এখন আপনি যে পানি পান করলেন, তা যদি আপনার দেহেই থেকে যায়। বাইরে বের না হয়। পেশাব বন্ধ হয়ে যায়। মূত্রাশয়ে পেশাব জমে আছে, বের হওয়ার কোনো উপায় নেই, সে অবস্থায় এটা বের করার জন্যে কী পরিমাণ সম্পদ আপনি ব্যয় করবেন?

হারুনুর রশীদ উত্তর দিলেন, পেশাব যদি বন্ধ হয়ে যায় এবং মূত্রনালী ফুলে যায়, সে তো অসহনীয় এক অবস্থা। এর চিকিৎসার জন্যে চিকিৎসক যতো সম্পদ চাইবে, আমি তাই দেবো। এমনকি পুরো সাম্রাজ্য চাইলে তাও দেবো।

বাহলুল বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! এর মাধ্যমে আমি এ হাকীকত তুলে ধরতে চাই যে, আপনার পুরো সাম্রাজ্যের মূল্য এক গ্লাস পানি পান করা এবং তা বাইরে বের করার সমানও নয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এ

পুরো ব্যবস্থাপনা বিনামূল্যে দিয়ে রেখেছেন। বিনামূল্যে পানি লাভ হচ্ছে এবং বিনামূল্যেই তা বের হচ্ছে। তা বের করার জন্যে কোনো মূল্য দিতে হচ্ছে না। কোনো পেরেশানী উঠাতে হচ্ছে না।

দুনিয়ার সব কাজ আমার মর্জি মতে হয়

হযরত বাহলুল মাজযুব রহ.-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, কেমন আছেন?

তিনি বললেন, খুব ভালো আছি, খুব মজা লাগছে।

লোকটি জিজ্ঞাসা করলো, কিসের মজা লাগছে?

তিনি বললেন, আরে মিয়াঁ! ঐ ব্যক্তির মজার কথা কী জিজ্ঞাসা করো, দুনিয়ার কোনো কাজ যার মর্জির বিপরীতে হয়ই না? দুনিয়াতে যতো কাজ হচ্ছে, সব আমার মর্জি মোতাবেক হচ্ছে।

লোকটি বললো, হযরত আজ পর্যন্ত দুনিয়াতে এমন কোনো ব্যক্তি আসে নাই, যার মর্জির বিপরীতে কোনো কাজ হয়নি। নবীগণের মর্জির বিরুদ্ধেও কাজ হয়েছে। আপনি এমন উঁচু মাকাম কীভাবে পেলেন যে, আপনার মর্জির বিপরীত কোনো কাজ হয় না?

তিনি বললেন, আসল কথা হলো, আমি আমার মর্জিকে মিটিয়ে মাওলার মর্জির অনুগামী বানিয়েছি। তাঁর যা মর্জি তাই আমার মর্জি। তিনি যা চান, আমিও তাই চাই। পৃথিবীর কোনো কিছু যেহেতু তাঁর মর্জির খেলাফ হয় না, তাই আমার মর্জির খেলাফও হয় না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অপার অনুগ্রহে আমাকে এই প্রশান্তিপূর্ণ অবস্থা দান করেছেন।

হযরত ইসমাঈল শহীদ রহ.-এর ঘটনা

হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ. ছিলেন শাহী খান্দানের লোক। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরে দ্বীনের তড়প ও অস্থিরতা দান করেছিলেন। মানুষের নিকট দ্বীনের কথা পৌছানোর জন্যে তাঁর অন্তরে আগুন লেগে ছিলো। তিনি শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। মানুষ এধরনের লোকের দুশমনে পরিণত হয়।

হযরত ইসমাঈল শহীদ রহ. ঐ সমস্ত বুযুর্গের অন্যতম ছিলেন, যাঁরা এর উপর আমল করে দেখিয়েছেন। তাঁর একটি ঘটনা। একবার তিনি দিল্লীর জামে মসজিদে ওয়ায করছিলেন। ওয়াযের মধ্যে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বললো– মাওলানা! আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দিন। হযরত ইসমাঈল শহীদ রহ. বললেন– কী সে প্রশ্ন? সে বললো– আমি শুনেছি, আপনি হারামজাদা। নাউযু বিল্লাহ! ঠিক ওয়াযের মাঝে ভরা মজমায় এ কথা সে এমন এক ব্যক্তিকে বলছে, যিনি শুধু বড়ো আলেমই ছিলেন না, বরং শাহী খান্দানের শাহজাদা ছিলেন। আমাদের মতো কেউ হলে সাথে সাথে রাগ চলে আসতো। জানা নেই, তার কী পরিণতি করতাম। আমরা না করলে আমাদের ভক্তবৃন্দ তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলতো। বলতো, সে আমাদের শায়েখকে এমন বললো কেন? কিন্তু হযরত ইসমাঈল শহীদ রহ. উত্তরে বললেন– ভাই! আপনি ভুল খবর পেয়েছেন। আমার মায়ের বিয়ের সাক্ষী তো এখনো দিল্লীতে বর্তমান রয়েছে। এভাবে তার গালির উত্তর দিলেন। এটাকে ঝগড়ার কোনো বিষয়ই বানালেন না।

এটা হলো নবীসুলভ আখলাক ও নবীসুলভ জীবনপদ্ধতি যে, গালির জবাবেও গালি দেওয়া হচ্ছে না।

একদিনের কথা। হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ. দিল্লীর জামে মসজিদে দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা ওয়ায করলেন। ওয়ায শেষে যখন চলে যাচ্ছিলেন এক ব্যক্তিকে দেখলেন, দ্রুত বেগে মসজিদের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে। ঘেমে নেয়ে উঠেছে। সে উপরে উঠে এসে দেখলো লোকজন চলে যাচ্ছে।

তার খুব আফসোস হলো। ঘটনাক্রমে হযরত ইসমাঈল শহীদ রহ.-ই তার সামনে পড়লেন। সে তাঁকে ভালোভাবে চিনতো না। তাই জিজ্ঞাসা করলো মওলবী ইসমাঈলের ওয়ায কি শেষ হয়ে গেছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, শেষ হয়ে গেছে। সে ইন্নালিল্লাহ পড়ে বললো, আমি তো অনেক দূর থেকে তার ওয়ায শুনতে এসেছিলাম। এভাবে সে খুব আক্ষেপ করতে লাগলো। হযরত ইসমাঈল শহীদ রহ. তার হাত ধরে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আফসোস করার দরকার নেই। আমারই নাম ইসমাঈল। আপনি বসুন। এতক্ষণ যে ওয়ায করেছি তা পুনরায় আপনাকে শুনিয়ে দিচ্ছি।

এই বলে তিনি সিঁড়িতে বসে পড়লেন এবং দীর্ঘ সময়ের সেই ওয়ায সেই একজন মাত্র শ্রোতাকে শুনিয়ে দিলেন। পরে কোনও একজন তাকে বললো, হযরত! আশ্চর্য কথা, মাত্র একজন লোকের খাতিরে কয়েক ঘণ্টার ওয়ায পুনরায় শুনিয়ে দিলেন? তিনি বললেন, এতে আশ্চর্যের কী আছে। প্রথমবারও তো একজনের জন্যেই ওয়ায করেছিলাম, পরের বারও একজনের জন্যেই করেছি। লোক সমাগম ও তাদের পছন্দ-অপছন্দের কোনো তোয়াক্কা আমি করি না। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করা।

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.-এর ঘটনাবলী

আদব ও আদর্শের সমন্বয়

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. দারুল উলূম দেওবন্দের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সুন্নাত ও বিদআতের ভেদরেখা প্রতিষ্ঠিত করেন। একবার তিনি ওয়ায করছিলেন, ওয়াযের মধ্যে কাওয়ালীর বিরুদ্ধে বয়ান করছিলেন। জোরেশোরে বয়ান হচ্ছিলো। ওয়াযের মাঝে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, আপনি বলছেন কাওয়ালী নাজায়েয হারাম, কিন্তু হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ. তো কাওয়ালী শুনতেন। উত্তরে হযরত গাঙ্গুহী রহ. বললেন, হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ.-এর দলীল জানা থাকবে, আমাদের জানা নেই। আমরা যেটা জানি সেটার জন্যে আমরা আদিষ্ট। লক্ষ্য করুন! একদিকে কাওয়ালীর বিরুদ্ধে এমন আবেগময় বক্তব্য দিচ্ছেন, অপরদিকে তারই মাঝে যখন একজন বড়ো বুযুর্গের বিষয় এসেছে তখন এভাবে উত্তর দিয়েছেন।

এটা আমার অস্ত্র

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে আজাদী আন্দোলনে ইংরেজ বিরোধী জিহাদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছাড়া হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম ছাহেব নানুতুবী রহ. হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মাক্কী রহ. প্রমুখ হযরতগণ এই জিহাদে বড়ো মাপের ভূমিকা পালন করেন। যারা এই জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন, ইংরেজ সরকার তাদেরকে ধরতে আরম্ভ করে। বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে ও চৌরাস্তায় ফাঁসি কাষ্ঠ বানিয়ে তাতে লোকদেরকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এভাবে ব্যাপকহারে ফাঁসি দিতে থাকে। মহল্লায় মহল্লায় ম্যাজিস্ট্রেটদের লোক দেখানো আদালত বসানো হয়। সামান্য কারো বিষয়ে সন্দেহ হলেই ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হয়। তিনি হুকুম জারি করে দেন, একে ফাঁসিতে চড়াও। তাকে ফাঁসিতে চড়ানো হয়। সে সময় মিরাঠে হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর বিরুদ্ধেও

একটি মোকদ্দমা দায়ের করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তাঁকে পেশ করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার কাছে অস্ত্র আছে? মূলত ম্যাজিস্ট্রেট সংবাদ পেয়েছিলেন যে, তাঁর কাছে বন্দুক আছে এবং বাস্তবেও হযরতের নিকট বন্দুক ছিলো। ম্যাজিস্ট্রেট যখন এই প্রশ্ন করে, তখন হযরতের হাতে তাসবীহ ছিলো। তিনি সেই তাসবীহ দেখিয়ে বলেন, এটা আমার অস্ত্র। এ কথা বলেননি যে, আমার কাছে অস্ত্র নেই। তাহলে মিথ্যা হয়ে যেতো। তাঁর চেহারা দেখেও একেবারে দরবেশ মনে হতো।

আল্লাহ তা'তালা তাঁর বান্দাদেরকে সাহায্যও করে থাকেন। এই প্রশ্নোত্তর হওয়ার মাঝেই এক গ্রাম্য ব্যক্তি সেখানে চলে আসে। সে যখন দেখলো, হযরতের সঙ্গে এভাবে প্রশ্নোত্তর হচ্ছে, তখন সে বললো, আরে একে কোত্থেকে ধরে এনেছেন। এতো আমাদের মহল্লার মুয়াজ্জিন। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মুক্তি দান করেন।

হযরত হাজী ছাহেবের হাতে বায়আতের ঘটনা

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. যখন নতুন নতুন দরসে নেযামী থেকে ফারেগ হয়ে আলেম হন। আমি পূর্বে আরয করেছি যে, ইলম অহঙ্কার সৃষ্টির অনেক বড়ো মাধ্যম হয়ে থাকে। আলেম হওয়ার পর মস্তিষ্কে এই ভাব জন্ম নেয় যে, আমি অনেক কিছু শিখে ফেলেছি। একটা কিছু হয়ে গিয়েছি। যাইহোক, হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. আমাদের মতো আলেম ছিলেন না যে, কাঁচা-পাকা কিছু পড়ে আলেম হয়ে গেছেন। তৎকালে থানাভবন খানকায় তিনজন বুযুর্গ থাকতেন। একজন হলেন, হযরত শায়েখ মুহাম্মাদ থানবী রহ., দ্বিতীয় হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী রহ., আর তৃতীয় জন হলেন, হযরত হাফেয যামেন শহীদ রহ.। এঁদেরকে 'আকতাবে সালাসা' (তিন কুতুব) বলা হতো। এঁদের মধ্যে হযরত মাওলানা শায়েখ মুহাম্মাদ থানবী রহ. ছাহেব আলেম ছিলেন। তাঁর একখানি পুস্তিকা সদ্য শিক্ষা সমাপণকারী হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর হাতে পড়ে। সেই পুস্তিকার একটি বিষয় হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর দৃষ্টিতে সঠিক মনে হচ্ছিলো না। তিনি এ বিষয়ে হযরত মাওলানা শায়েখ মুহাম্মাদ থানবী রহ.-এর সঙ্গে মুনাযারা করার ইচ্ছায় থানাভবনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

থানাভবনে হযরত হাজী ছাহেব রহ.-এর কামরা ছিলো আগে। তাঁর সঙ্গে হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.-এর আগে থেকেই কিছুটা পরিচয় ছিলো। কাজেই সাক্ষাত করার জন্যে প্রথমেই তাঁর কক্ষে গেলেন।

হাজী ছাহেব রহ. জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছো?

বললেন, শায়েখ মুহাম্মাদ থানবী রহ.-এর কাছে।

জিজ্ঞাসা করলেন, কেন যাচ্ছো?

বললেন, তাঁর সঙ্গে মোনাযারা করবো।

এ কথা শুনে হাজী ছাহেব রহ. বললেন, তাওবা! তাওবা! তিনি এতো বড়ো আলেম, আর তুমি সদ্য পাস করা মওলবী। এমন একজন বড়ো ব্যক্তির সাথে মোনাযারা করতে যাচছো, যিনি আল্লাহওয়ালাও বটে!

হযরত গাঙ্গুহী রহ. বললেন, হযরত! তিনি তাঁর এক পুস্তিকায় এমন একটা কথা লিখেছেন, যা সঠিক নয়। হাজী ছাহেব রহ. তাঁকে শান্ত করলেন। আর এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ধাঁচই পাল্টে দিলেন। তাঁর প্রতি হযরত হাজী ছাহেব রহ.-এর এমন দৃষ্টি পড়লো যে, তিনি মোনাযারা করার ইচ্ছা ত্যাগ করলেন এবং হযরত হাজী ছাহেব রহ.-এর হাতে বায়আত হলেন।

তারপর চল্লিশ দিন সেখানে অবস্থান করলেন। অথচ গাঙ্গুহ থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন অল্প সময় পর ফিরে আসার ইচ্ছা নিয়ে। যে কারণে কাপড়-চোপড় কিছুই সঙ্গে নেননি। কেবল পরিধানের কাপড় নিয়েই বের হয়ে পড়েছিলেন। ময়লা হয়ে গেলে সে কাপড়ই ধুয়ে পরে নিতেন। এভাবে পূর্ণ চল্লিশ দিন সেখানে কাটালেন। এই অবস্থানকালে হাজী ছাহেব রহ. তাঁকে খুব ভালোভাবে ঘর্ষণ-পেষণ করেছেন। যার ফলে চল্লিশ দিন পর যখন বিদায় গ্রহণ করছিলেন, তখন হাজী ছাহেব রহ. তাঁকে লক্ষ করে বললেন,

'মিয়াঁ রশীদ আহমাদ! আমার কাছে যা কিছু আমানত ছিলো তার সবটা তোমাকে দিয়ে দিলাম।'

এটা কী সাধারণ কোনো ব্যাপার যে, শায়েখ বলছেন, আমার কাছে যাকিছু আমানত ছিলো সব তোমাকে চল্লিশ দিনে দিয়ে দিলাম! আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমন উঁচু মাকাম দান করেছিলেন।

গাঙ্গুহ ফেরার পর দীর্ঘদিন তাঁর মধ্যে বিস্ময়কর আত্মসমাহিত অবস্থা বিরাজ করে। অনেক দিন পর্যন্ত হযরত হাজী ছাহেব রহ.-এর কাছে চিঠিও লেখেননি। শেষে হযরত হাজী ছাহেব রহ. নিজেই তাঁর উদ্দেশ্যে চিঠি লেখেন যে,

'প্রিয়, বহুদিন তোমার খবরাখবর পাই না। কী অবস্থায় আছো, পত্র মারফত জানিও'।

এভাবে শায়েখ নিজেই প্রিয় মুরীদের খবর নিচ্ছেন। উত্তরে হযরত গাঙ্গুহী রহ. লেখেন,

'হযরত! বহুদিন চিঠি লিখতে পারিনি। ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু কীভাবে লিখবো! নিজের অবস্থা লিখতে বড়ো লজ্জাবোধ হচ্ছে। আপনার সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও নিজের সেই দুরবস্থাই রয়ে গেছে। তাই লিখতে লজ্জা লাগছিলো। অবশ্য আপনার দু'আ ও সুদৃষ্টির কারণে যেই পার্থক্য অনুভূত হচ্ছে তা নিম্নরূপ,

এক. শরীয়ত তবীয়ত বনে গেছে।

অর্থাৎ, মানুষের ভেতর যেমন ক্ষুধা, পিপাসা ইত্যাদি স্বভাবগত চাহিদা দেখা দেয়, এবং সে চাহিদা পূরণ না করা পর্যন্ত মানুষ শান্তি লাভ করে না, তেমনিভাবে শরীয়তের চাহিদাসমূহ পুরা না করা পর্যন্ত আমি শান্তি পাই না।

দুই. প্রশংসাকারী ও নিন্দুকের মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখি না।

অর্থাৎ, কেউ প্রশংসা করলে যেমন বিশেষ আনন্দবোধ হয় না, তেমনি কেউ নিন্দা করলেও খারাপ লাগে না। আমার কাছে এখন উভয়ে সমান।

তিন. শরীয়তের কোনও মাসআলায় কোনও খটকা অনুভব হয় না।

এই চিঠি যখন হযরত হাজী ছাহেব রহ.-এর হাতে পৌছলো, তখন তিনি চিঠিখানি মাথার উপর রাখলেন এবং বললেন,

'তিনি যা লিখেছেন, সে রকম হাল তো আমারও অর্জিত হয়নি।'

এই হলেন শায়েখ আর এই হলেন মুরীদ! এমনটা এমনিতেই হয় না। এর জন্যে পেষণের প্রয়োজন পড়ে।

সেই চল্লিশদিনের অবস্থানকালের ঘটনা। হযরত হাজী ছাহেব রহ. প্রিয় মুরীদকে ডেকে বললেন, আজ তুমি আমার সাথে খানা খাবে। আদেশ মতো খাওয়ার সময় হলে তিনি উপস্থিত হলেন। দস্তরখানে তরকারির দুটি বাটি ছিলো। একটিতে কোপ্তা, অন্যটিতে ডাল। হযরত হাজী ছাহেব রহ. কোপ্তার বাটি নিজের সামনে রাখলেন আর ডালের বাটি মুরীদের সামনে দিলেন। ইশারা ছিলো, তুমি ডাল খাও, আমি কোপ্তা খাবো। খাবার মাঝখানে হযরত হাফেয যামেন শহীদ রহ. সেখানে উপস্থিত হন। তিনি বললেন,

'হযরত! আপনি এটা কী করছেন? কোপ্তা নিজে খাচ্ছেন আর তাকে ডাল খাওয়াচ্ছেন?'

হযরত হাজী ছাহেব রহ. বললেন,

'আরে এটা তো আমার করুণা যে, তাকে আমার সাথে বসিয়ে খাওয়াচ্ছি। উচিত কাজ তো ছিলো রুটিতে ডাল রেখে তার হাতে দেওয়া আর বলা বাইরে সিঁড়িতে বসে খাও।'

এ কথা বলে প্রিয় মুরীদের দিকে লক্ষ করলেন, চেহারায় কোনো ভাবান্তর ঘটছে কি না। দেখলেন কোনো ভাবান্তর নেই। বোঝা গেলো, আলহামদু লিল্লাহ কিবির ও অহঙ্কারের রোগ বের হয়ে গেছে।

মুরীদকে এভাবে পেষাই করার পরেই যথার্থ চিকিৎসা হয়। কাজেই সকলের পক্ষে সম্ভব নয় যে, সে নিজেই স্থির করবে যে, তার উপযুক্ত দাওয়াই কী হতে পারে।

অহঙ্কারের চিকিৎসা

'আরওয়াহে ছালাছা' গ্রন্থে হযরত থানবী রহ. লিখেন, হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. যখন কোনো ছাত্রকে দেখতেন যে, তার মধ্যে অহঙ্কার আছে, যার চিকিৎসা জরুরি, তখন তাকে হুকুম করতেন, তুমি রোজ ছাত্রদের জুতা সোজা করবে। আবার নিজেও কেমন ছিলেন দেখুন, যখন কোনও ছাত্রকে দেখতেন, তার মধ্যে মন্দ কিছু নেই, তখন নিজে তার জুতা সোজা করে দিতেন।

হযরত থানবী রহ. আরওয়াহে ছালাছা কিতাবে হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর ঘটনা লিখেছেন যে, একবার তিনি সবক পড়াচ্ছিলেন। বৃষ্টি আরম্ভ হলো। ছাত্রদেরকে বললেন, ভিতরে চলো। ছাত্ররা নিজ নিজ কিতাব নিয়ে ভিতরে যেতে আরম্ভ করলো। আর হযরত সকল ছাত্রের জুতা জড়ো করে ভিতরে নিতে আরম্ভ করলেন, যাতে বৃষ্টিতে ভিজে সেগুলো নষ্ট না হয়।

তিনি দু' কারণে ছাত্রদের জুতা উঠাচ্ছিলেন। এক. নিজের আত্মিক চিকিৎসার উদ্দেশ্যে। যেন নিজের মধ্যে অহঙ্কারের ভাব চলে না আসে। দ্বিতীয় কারণ এই ছিলো যে, মানুষ যখন আত্মশুদ্ধি করে, তখন তার নফস পরিশুদ্ধ ও জ্যোর্তিময় হয়ে যায়। যখন আল্লাহ ওয়ালাদের নফস পরিশুদ্ধ ও জ্যোর্তিময় হয়, তখন তাদের কাছে বিষয়টি অস্বাভাবিক মনে হয় না যে, আমি ছাত্রদের জুতা উঠাচ্ছি। বরং এটাও তাদের স্বাভাবিক কাজের অংশ হয়ে যায়।

তাবিজ লেখার দুটি চমকপ্রদ ঘটনা

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.-এর নিকট একজন গ্রাম্য লোক এলো। তার মাথায় বদ্ধমূল ছিলো যে, মওলবী যদি তাবিজ কবজ না জানে, তাহলে সে একেবারেই মূর্খ, সে কিছুই পারে না। সুতরাং লোকটি একজন বড়ো আলেম মনে করে তাঁর নিকট আসে এবং বলে যে, আমাকে তাবিজ দিন। মাওলানা বললেন, আমি তো তাবিজ পারি না। লোকটি বললো, না আমাকে দিন। হযরত বললেন, আমি তো পরি না কী দিবো? কিন্তু সে নাছোড় হয়ে বলতে লাগলো, আমাকে তাবিজ দিন। হযরত বলেন, আমার কিছুই বুঝে আসছিলো না যে, কী লিখবো? তো আমি তাবিজে লিখলাম, 'হে আল্লাহ! এ মানে না, আর আমি জানি না। আপনি অনুগ্রহ করে তার কাজ করে দিন।' এ কথা লিখে আমি তাকে দিলাম যে, এটা ঝুলিয়ে রেখো। সে ঝুলালো। আল্লাহ তা'আলা এটা দিয়েই তার উদ্দেশ্য পুরা করে দিলেন।[১৭৪]

হযরতেরই আরেকটি ঘটনা। এক মহিলা এসে বললো, আমি চুল আঁচড়ালে সিঁথি বাঁকা হয়। সোজা হয় না। এর জন্যে একটি তাবিজ দিন। হযরত বললেন, আমি তাবিজ পারি না। সিঁথি সোজা হয় না, এর আবার কী তাবিজ আছে! কিন্তু ঐ মহিলা নাছোড় হয়ে ধরলো। হযরত বলেন, সে বেশি পীড়াপীড়ি করলে আমি একটা কাগজে লিখে দিলাম,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

বললাম, এটা তাবিজরূপে ব্যবহার করো। হয়তো তোমার সিঁথি সোজা হয়ে যাবে। আশা করি, আল্লাহ তা'আলা সোজা করে দিয়েছেন।

কতক সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেক বান্দাদের সঙ্গে এই মোআমালা করেন যে, তাদের মুখ দিয়ে যেই কথা বের হয়, আল্লাহ তা'আলা তা সত্য করে দেন। বিভিন্ন বুযুর্গের জীবনীতে যে লেখা আছে, অমুক বুযুর্গ এটা লিখে দিয়েছেন আর তার দ্বারা ফায়দা হয়েছে। এটা এ ধরনেরই ঘটনা। আল্লাহ তা'আলার কোনো নেক বান্দার কাছে একটা দরখাস্ত করা হয়েছে, আর তার অন্তরে এসেছে যে, একথাগুলো লিখে দেই, তাহলে হয়তো ফায়দা হবে। তো আল্লাহ তা'আলা তার দ্বারা ফায়দা দিয়ে দেন।

---

১৭৪. ইসলাহী খুতুবাৎ, খণ্ড: ১৫, পৃষ্ঠা: ৩১-৩২

শাইখুল হিন্দ

হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান রহ.-এর ঘটনাবলী

হযরত শাইখুল হিন্দের মজলিসে আব্বাজানের উপস্থিতি

হযরত ওয়ালেদ মাজেদ মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ.-এর যে সকল বুযুর্গের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ছিলো, তার শীর্ষ তালিকায় হলেন, হযরত শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান রহ.। দেওবন্দ ও থানাভবনের সফরনামায় তিনি হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের আলোচনা এই ভাষায় করেছেন,

'অধম হযরত (শাইখুল হিন্দ)-এর জামানা পেয়েছি। সেসময় আমি মধ্যম শ্রেণির কিতাবসমূহ পড়তাম, তাই তাঁর নিয়মিত ছাত্র হতে পারিনি। হযরতের সঙ্গে আমার আত্মিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ আমাকে তাঁর বোখারীর দরসে নিয়ে যেতো। মাল্টায় বন্দী হওয়ার পূর্বে দুই বছর পর্যন্ত পবিত্র রমাযান মাসে হযরতের সঙ্গে সারারাত তারাবীহের নামাযে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য আল্লাহ তা'আলা আমাকে দান করেন। মাল্টা থেকে ফেরার পর হযরতের সঙ্গেই বাইআতের সম্পর্ক কায়েম করার সৌভাগ্য লাভ হয়। তখন অধম দারুল উলূমে প্রাথমিক মুদাররিস হিসেবে তালিমী খেদমতে মশগুল ছিলাম। পবিত্র মাযারে উপস্থিতির সময় হযরতের অসংখ্য অনুগ্রহ ও স্নেহ-মমতার এক বিশাল ময়দান চোখের সামনে ভাসতে থাকে।'[১৭৫]

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. যদিও তাঁর নিয়মিত ছাত্র হতে পারেননি, তবে প্রথমত সুযোগ হলেই তিনি হযরতের বোখারী শরীফের দরসে গিয়ে বসতেন। সেখানে বসা কেবল প্রথাগত ভক্তি প্রকাশের বিষয়ই ছিলো না, বরং হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর বোখারী শরীফের দরসের অনেক কথাই তাঁর স্মরণ ছিলো, যেগুলো তিনি শাগরেদ ও খাদেমদের সামনে বর্ণনা করতেন। তাছাড়া আসরের নামাযের পর যখন অন্য ছাত্ররা নিজ নিজ দরস থেকে ফারেগ হয়ে খেলাধুলা ও বিনোদনে লেগে যেতো, তখন তিনি হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর মজলিসে অংশগ্রহণ করতেন এবং প্রতিদিন মাগরিব পর্যন্ত

---

১৭৫. আকাবেরে দেওবন্দ কেয়া থে, পৃষ্ঠাঃ ১০

বরকতময় এই মজলিস থেকে ফয়েয লাভ করতেন। বলকান ও ত্রিপলির যুদ্ধের সময় হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর ইঙ্গিতে দারুল উলূম দেওবন্দ লম্বা সময়ের জন্যে ছুটি দেওয়া হয়। ওস্তাদ ও ছাত্রগণ সেই যুদ্ধের জন্যে চাঁদা সংগ্রহে নেমে পড়েন। এ সময় হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর নির্দেশনা মোতাবেক হযরত ওয়ালেদ ছাহেবও গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাঁদা সংগ্রহ করেন।

হযরত শাইখুল হিন্দ থেকে শোনা কয়েকটি হাদীসের মনকাড়া ব্যাখ্যা

হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর সে সকল দরস ও মজলিসে তিনি যেসব কথা শুনেছেন, সেগুলো বিভিন্ন সময় আমাদেরকে শোনাতেন। তার কিছু কথা এখনও অধমের স্মরণ হচ্ছে।

এক. হাদীসের প্রায় সবগুলো কিতাবে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযু শেষে ওযুর বাঁচা পানি পান করতেন। এ কথাও বর্ণিত আছে যে, তিনি ওযু করার পর নিজের লুঙ্গির উপর পানির ছিঁটা দিতেন। ওলামায়ে কেরাম এই দুই সুন্নাতের হিকমত বর্ণনা করতে গিয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলতেন, এসব বর্ণনার যেই ব্যাখ্যা অধম হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. থেকে শুনেছে, রুচিগত দিক থেকে তা সবচেয়ে সূক্ষ্ম। তার সারকথা হলো, ওযু বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জনের একটি প্রতীক। যেভাবে বাহ্যিক পবিত্রতা কাম্য, একইভাবে বরং তার চেয়ে অধিক আত্মিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাও কাম্য। সুতরাং ওযুর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুটি কাজকে সুন্নাত সাব্যস্ত করেছেন, যার দ্বারা উদ্দেশ্য আত্মিক পবিত্রতা লাভ করা। এই দুই কাজের মাধ্যমে আত্মিক পবিত্রতা এভাবে লাভ হয় যে, সমস্ত আত্মিক মন্দ চরিত্র ও গোনাহের উৎস হলো মানুষের দুটি অঙ্গ। একটি মুখ বা জিহ্বা, অপরটি লজ্জাস্থান। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ يَّضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

'যে ব্যক্তি দুটি জিনিসকে (গোনাহ থেকে হেফাজত করার) দায়িত্ব আমার জন্যে নিবে, আমি তার জন্যে জান্নাতের দায়িত্ব নিবো। এক ঐ জিনিস, যা তার দুই চোয়ালের মাঝে রয়েছে (অর্থাৎ, জিহ্বা), আর দুই ঐ জিনিস, যা তার দুই রানের মাঝে রয়েছে (অর্থা, লজ্জাস্থান)।'

সুতরাং ওযুর পর বাঁচা পানি পান করে এবং লুঙ্গিতে পানি ছিঁটিয়ে দিয়ে গোনাহের এই দুই উৎসকে পবিত্র করার দিকে মনোযোগী করা উদ্দেশ্য।

দুই. ২৯ শাবান চাঁদ দেখা না গেলে ৩০ শাবানের দিনটিকে ফোকাহায়ে কেরামের পরিভাষায় 'ইয়াওমুশ শক' বলা হয়। হানাফী ফকীহগণের মতে সাধারণ মানুষের জন্যে 'ইয়াওমুশ শকে' রোযা রাখা মাকরূহ। তবে বিশিষ্ট আলেমগণ, যারা কেবল নফলের নিয়তে রোযা রাখেন এবং তাদের অন্তরে সতর্কতামূলক রমযানের রোযা রাখার কোনো চিন্তাও থাকে না, তাদের জন্যে ইয়াওমুশ শকে রোযা রাখারও অনুমতি রয়েছে। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. ঘটনা শোনান যে, এক ইয়াওমুশ শকে হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. বাহিরের মজলিসে তাশরীফ আনেন। তখন তিনি পান খেয়ে এসেছিলেন। উপস্থিত এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা কলো, হযরত আজ তো ইয়াওমুক শক, বিশিষ্ট আলেমগণের তো এ দিনে রোযা রাখায় কোনো সমস্যা নেই। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. উত্তরে প্রথমে তো বললেন, হ্যাঁ, এই হুকুম তো বিশিষ্ট আলেমগণের জন্যে, কিন্তু আমি তো বিশিষ্ট আলেমগণের মধ্যে নই। এর একটু পরে নিজেই বললেন, হাদীসের

فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'সে আবুল কাসেম তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী (বিরুদ্ধাচরণ) করলো'

শব্দের কারণে ভয় লাগে। তিনি এ কথা বলে এই দিকে ইশারা করেছেন যে, হাদীসে হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে,

وَمَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'যে ব্যক্তি ইয়াওমুক শকে রোযা রাখলো, সে আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করলো।'

তাঁর এ কথার উদ্দেশ্য হলো, হানাফী আলেমগণ যদিও এই হাদীসকে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেছেন এবং বিশিষ্ট আলেমগণকে এ থেকে ব্যতিক্রম ধরেছেন, কিন্তু হাদীসের বাহ্যিক শব্দ ব্যাপক। তাই এর বিরুদ্ধাচরণে ভয় লাগে।

তিন. একবার এক ব্যক্তি হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-কে জিজ্ঞাসা করলো, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে গলি দিয়ে হযরত ওমর রাযি. যেতেন, শয়তান সেখান দিয়ে যেতো না। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. সম্পর্কে বর্ণিত হয়নি যে, শয়তান

তাঁদের পথ দিয়ে যেতো না। এখন প্রশ্ন হলো, শয়তান কেন হযরত ওমর রাযি.-কে ভয় করতো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. নিশ্চিতভাবেই তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাই তাঁদেরকে বেশি ভয় করার কথা ছিলো।

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলেন, হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর অভ্যাস ছিলো, কোনো ব্যক্তি তাঁর কাছে কোনো ইলমী প্রশ্ন করলে প্রথমে তিনি রসিকতা করে তাকে নিরোত্তর করার মতো উত্তর দিতেন। তারপর প্রকৃত উত্তর দিতেন। সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি প্রথমে বলেন যে, এটা শয়তানের নির্বুদ্ধিতা। তাকেই জিজ্ঞাসা করো, সে হযরত ওমর রাযি.-কে কেন এতো ভয় করতো। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-কে কেন এতো ভয় করতো না।

এরপর প্রকৃত উত্তর দেন যে, মূলত কোনো ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হওয়া এক জিনিস, আর মানুষের অন্তরে তার প্রভাব ও ভীতি সঞ্চার হওয়া আরেক জিনিস। কোনো ব্যক্তি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হলে অন্য সকলের উপর তার প্রভাব ও ভীতি অধিক হওয়া জরুরী নয়। হযরত ওমর রাযি.-এর মধ্যে তেজস্বী ভাব প্রবল ছিলো, যে কারণে তাঁর প্রভাব ও ভীতি অন্যদের অন্তরে অধিক হতো। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর মধ্যে কোমলতার ভাব প্রবল ছিলো। এ কারণে কেউ হযরত ওমর রাযি.-কে অধিক ভয় পেলে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

চার. ইমাম বোখারী রহ. সহীহ বোখারী শরীফের শেষ অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন,

بَابُ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِيْ آدَمَ تُوْزَنُ

যার সারকথা হলো, কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের দণ্ড প্রতিষ্ঠিত হবে। সব মানুষের আমল ওজন করা হবে। এখানে বিখ্যাত আলোচনার বিষয় হলো, আমল অশরীরি বস্তু। ওজন করা যায় কেবল দেহবিশিষ্ট বস্তুকে। তাই মানুষের আমল কীভাবে ওজন করা হবে? এর উত্তরে ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন জন বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কেউ বলেছেন আমলনামা ওজন করা হবে। কেউ বলেছেন, আমলের মান যাচাই করাকে রূপক অর্থে ওজন আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কেউ বলেছেন, আমলকে দেহবিশিষ্ট করে তা ওজন করা হবে।

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বোখারী শরীফের খতমের সময় বলতেন যে, প্রতি বছর দেওবন্দে যখন হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. বোখারী শরীফ

খতম করতেন, তখন আমি ঐ দরসে শামিল হতাম। এই প্রশ্নের উত্তরে হযরত যেই ব্যাখ্যা দিতেন তা সবচেয়ে বেশি তৃপ্তিদায়ক। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. বলতেন, আগের জামানায় এ প্রশ্নটা কিছুটা গুরুত্ব রাখলেও বর্তমান জামানায় এই প্রশ্নের আর সুযোগই নেই। বর্তমান যুগে কেবল দেহবিশিষ্ট জিনিসই পরিমাপ করা হয় না, বরং দেহহীন জিনিসেরও ওজন করা হয়। প্রত্যেক বস্তুর জন্যে পৃথক মানদণ্ড রয়েছে। যেমন থার্মোমিটারের মাধ্যমে তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়। বাতাসের আদ্রতা পরিমাপ করা হয়। তাই মানুষ যদি তার সীমিত বুদ্ধি দিয়ে এসব দেহহীন জিনিস পরিমাপ করতে পারে, তাহলে মহা ক্ষমতাধর রাজাধিরাজ আল্লাহ এসব আমল ওজন করার জন্যে যদি বিশেষ কোনো ন্যায়দণ্ড (মানদণ্ড) স্থাপন করেন, তাহলে তা অবাক হওয়ার বা অসম্ভব হওয়ার কী হলো!

পাঁচ. হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. থেকে শোনা একটি সোনালী মূলনীতি বর্ণনা করতেন। যা দ্বারা অধমের অনেক মাসআলার ক্ষেত্রে অনেক উপকার হয়েছে। সেই মূলনীতিটি হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেসব আমল বর্ণিত হয়েছে সেগুলো দুই প্রকার। কতক আমল তো এমন, হাদীসের বর্ণনা দ্বারা যেগুলো সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি সেগুলোকে নিয়মিত আমল বানিয়ে নিয়েছিলেন, বা সেগুলো অধিক পরিমাণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত, বা তিনি সেগুলো অন্যকে করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু কিছু আমল আছে এমন, যেগুলো তিনি কদাচিৎ করেছেন। সেগুলোকে নিয়মিত আমল বানানো আবশ্যক করা বা অন্যদেরকে তা করার জন্যে উৎসাহ প্রদান করা প্রমাণিত নেই। এই দুই প্রকার আমলের মধ্য থেকে প্রত্যেকটিকে নিজ নিজ অবস্থানে রাখা উচিত। প্রথম প্রকারের আমল মেনে চলার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা যথার্থ এবং সুন্নাতের অনুকূল। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের আমলকে তার উপযুক্ত স্থানে রাখার দাবি হলো, এগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন হঠাৎ কখনো করেছেন, নিয়মিত আমলে পরিণত করেন নি, তেমনিভাবে এগুলোকে কখনো কখনো করবে। এগুলোকে নিয়মিত আমলে পরিণত করা কাম্য নয়।

হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেন যে, রুকু থেকে ওঠার সময় رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত এবং সুন্নাত। কিন্তু হাদীস শরীফে এসেছে যে, একবার তিনি রুকু থেকে ওঠার সময় যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বললেন, তখন এক সাহাবী কিছুটা উঁচু স্বরে বললেন,

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى

নামায শেষ হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, এই কালেমা কে বলেছে? ঐ সাহাবী সামনে এলে তিনি বললেন, (তোমার এই কালেমা ফেরেশতাদের এতো পছন্দ হয়েছে যে,) একে আসমানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সত্তরের অধিক ফেরেশতা ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. বলেন, যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কালেমার এতো ফযীলত বর্ণনা করেছেন, কিন্তু কোথাও এটা বর্ণিত হয়নি যে, এরপরে তিনি বা অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম রাযি. رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ-এর সঙ্গে অতিরিক্ত কালেমাসমূহ বলাকে নিয়ম বানিয়েছিলেন। এর দ্বারা জানা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিলো এই কালেমার ফযীলত বর্ণনা করা। নামাযের মধ্যে এটা পাঠ করাকে আবশ্যক করা উদ্দেশ্য ছিলো না। তবে যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীর এ আমলকে নিষেধ করেননি, তাই কোনো ব্যক্তি যদি মাঝে মধ্যে এই কালেমা পড়ে, তাহলে তা জায়েয আছে। কিন্তু এই ঘটনার ভিত্তিতে এই কালেমাকে নামাযের নিয়মিত অংশ বানিয়ে নেওয়া দুরস্ত নয়।

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর বর্ণনা করা এই মূলনীতিকে আরো অনেক জায়গায় বসাতেন। উদাহরণস্বরূপ, শবে বরাতের সময় হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত বিখ্যাত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাকী' কবরস্থানে যাওয়া এবং মৃতদের জন্যে দু'আ করা প্রমাণিত আছে। এই হাদীসের ভিত্তিতে সাধারণত মনে করা হয় যে, শবে বরাতে কবরস্থানে যাওয়া সুন্নাত। কিন্তু এ বিষয়ে হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-এর রুচি ছিলো এই যে, শবে বরাতে নিয়মিত কবরস্থানে যাওয়া সুন্নাত নয় (যদিও জায়েয আছে); তবে মাঝে মধ্যে যাওয়া সুন্নাত। এর কারণ এটাই যে, পুরো হাদীসভাণ্ডারে শুধু একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরস্থানে যাওয়া প্রমাণিত। এটা প্রমাণিত নেই যে, তিনি এটাকে নিয়মিত আমল বানিয়েছিলেন। এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-ও এটা নিয়মিত করতেন বলে প্রমাণিত নেই। তাই প্রত্যেক আমলকে যথাস্থানে রাখা উচিত।

ছয়. এমনিভাবে হাদীস শরীফে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি কবরের নিকট দিয়ে অতিক্রম কালে বলেন যে, এগুলোতে আযাব হচ্ছে। এরপর একটি ডাল কবর দু'টির উপর গেড়ে বলেন,

হতে পারে আল্লাহ তা'আলা এই ডাল শুকানো পর্যন্ত তাদের আযাব হালকা করে দিবেন।

এই হাদীসের অধীনে এ মাসআলাটি ওলামায়ে কেরাম আলোচনায় এনেছেন যে, এই ডাল গাড়ার দ্বারা আযাব হালকা হওয়ার যেই আশা রয়েছে, তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নির্ধারিত, নাকি অন্যেরাও এরূপ করতে পারে।

এ বিষয়ে একবার অধম হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-কে জিজ্ঞাসা করে। তখন তিনি এই উত্তরই দেন যে, হাদীসের পুরো ভাণ্ডারে এ বিষয়ে এই একটি ঘটনাই রয়েছে। এর আগে বা পরে না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ আমল বর্ণিত আছে, আর না সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতেন। এটা যদি কোনো স্থায়ী বিধান হতো, তাহলে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. প্রত্যেক মুসলমানের কবরে ডাল গাড়াকে আবশ্যক করতেন। কিন্তু এ ধরনের এক-দুটি ঘটনা ছাড়া সাহাবায়ে কেরাম থেকেও এ আমল প্রমাণিত নয়। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে একটি ঘটনা প্রমাণিত তাও তাঁর বৈশিষ্ট্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণে এটাকে নিয়ম বানিয়ে নেওয়া এবং সব সময়ের জন্যে এটাকে আযাব হালকাকারী মনে করা ঠিক নয়। তবে যদি কোনো ব্যক্তি নিয়ম বানানো ছাড়া এই পর্যায়ে এর উপর আমল করে, যে পর্যায়ে তা প্রমাণিত আছে। অর্থাৎ, কোনো কোনো সময় এই নিয়তে ডাল গেড়ে দেয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের বরকতে হতে পারে আল্লাহ তা'আলা মৃত ব্যক্তির আযাব হালকা করে দিবেন, তাহলে এটাও তিরস্কারযোগ্য নয়।

মাল্টার বন্দীজীবনের শিক্ষা

হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর একটি বাণী হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বারবার বর্ণনা করতেন এবং তিনি তার বিভিন্ন লেখায় তা উদ্ধৃতও করেছেন। বাণীটি আমি হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-এর ভাষাতেই তুলে ধরছি।

শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান রহ. মাল্টার চার বছরের বন্দী জীবন থেকে মুক্তি লাভের পর দারুল উলুম দেওবন্দ তাশরীফ আনেন। তখন ওলামায়ে কেরামের এক মজমায় তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন। সেই কথাটি এই-

'যারা হযরত সম্পর্কে অবগত তাদের অজানা নয় যে, তাঁর এই বন্দিত্ব সাধারণ রাজনৈতিক নেতাদের বন্দিত্বের মতো নয়। আজাদী আন্দোলনে এই দরবেশ ব্যক্তিত্বের সমস্ত কর্মকাণ্ড কেবল মাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যে উম্মতের ইসলাহ ও ফিকিরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। মুসাফির অবস্থায় এবং নিতান্ত অসহায় পরিস্থিতিতে বন্দী হওয়ার সময় তাঁর মুখে যেই কথা উচ্চারিত হয়েছিলো তা তাঁর লক্ষ্য ও সংকল্প সম্পর্কে অবহিত করে। তিনি বলে ছিলেন, 'আলহামদু লিল্লাহ বিপদে আক্রান্ত হয়েছি, গোনাহে লিপ্ত হয়নি।' জেলখানার একাকিত্বের জীবনে একদিন অত্যন্ত দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখে জনৈক সাথী কিছু সান্ত্বনা বাক্য উচ্চারণ করেন। তখন তিনি বলেন, এই কষ্টের জন্যে কিসের দুঃখ, যা একদিন শেষ হয়ে যাবে! দুঃশ্চিন্তা তো এটা নিয়ে যে, এই কষ্ট ও মেহনত আল্লাহ তা'আলার নিকট কবুল হচ্ছে কি না!'

মাল্টার বন্দী জবীন থেকে ফিরে আসার পর এক রাতে ইশার নামাযের পর দারুল উলুমে অবস্থান করছিলেন। আলেমগণের বড়ো এক মজমা সামনে উপবিষ্ট ছিলো। তখন তিনি বলেন, আমি তো মাল্টার জীবনে দুটি শিক্ষা অর্জন করেছি। একথা শুনে মজমার সকলে আপদমস্তক মনোযোগী হলো যে, এই ওস্তাযুল ওলামা দরবেশ ব্যক্তিত্ব আশি বছর আলেমদেরকে পাঠ দান করার পর শেষ বয়সে এসে যে দুটি শিক্ষা লাভ কলেছেন, সেগুলো কী? তিনি বলেন,

'আমি বন্দী জীবনের একাকিত্বে এ বিষয়ে যতোটুকু গভীরভাবে চিন্তা করেছি যে, সমগ্র বিশ্বে মুসলমানগণ দ্বীনী ও দুনিয়াবি সব দিক থেকে ধ্বংস হচ্ছে কেন? তো এর দুটি কারণ আমি জানতে পেরেছি।

এক. তাদের কুরআনে কারীম ছেড়ে দেওয়া।

দুই. পারস্পরিক মতোবিরোধ ও গৃহ যুদ্ধ। এজন্যে আমি সেখান থেকেই সংকল্প করে এসেছি যে, আমার অবশিষ্ট জীবন এ কাজে ব্যয় করবো যে, শব্দ ও অর্থ উভয়দিক থেকে কুরআনকে ব্যাপক করবো। শিশুদের জন্যে বস্তিতে বস্তিতে কুরআন শিক্ষার মক্তব প্রতিষ্ঠা করবো। বড়োদেরকে

সাধারণ মজলিসে কুরআনের অর্থের সঙ্গে পরিচিত করবো এবং কুরআনের উপর আমল করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করবো। মুসলমানদের পারস্পরিক ঝগড়া ও সঙ্ঘাত কোনো মূল্যেই মেনে নেবো না।'

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. এরপর বলেন,

'উম্মতের বিদগ্ধ এই চিকিৎসক মুসলিম মিল্লাতের যেই রোগ নির্ণয় ও তার প্রতিকার নির্ধারণ করেছেন, অবশিষ্ট জীবনে দুর্বলতা, অসুস্থতা ও চরম ব্যস্ততা স্বত্বেও তিনি এর জন্যে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা করে গিয়েছেন। নিজে দরসে কুরআন আরম্ভ করেছেন। সেখানে শহরের সকল আলেম, বিশেষত হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ হোসাইন আহমাদ মাদানী রহ. ও হযরত মাওলানা শাব্বির আহমাদ ওসমানী রহ.-এর মতো ওলামায়ে কেরাম এবং সাধারণ জনগণ অংশগ্রহণ করতেন। এই অধমেরও সেই দরসে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। কিন্তু এ ঘটনার পর হযরত অল্প কিছুদিনই বেঁচে ছিলেন।'

آں قدح بشکست وآں ساقی نہ ماند

পানপাত্র ভেঙ্গে গিয়েছে,
আর সাকী তিরোহীত হয়েছে।[১৭৬]

তিনি যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে...

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলেন, একবার হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. বোখারী শরীফের দরসে ইমামের পিছনে মুক্তাদির কেরাত পাঠের বিষয়ে দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাতে তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মাযহাবের দলীলসমূহ এতো জোরদারভাবে উপস্থাপন করেন যে, সকল শ্রোতা সিক্ত ও পরিতৃপ্ত হয়। দরসের পর এক তালিবে ইলম হযরতকে বলে, হযরত! আজ তো আপনি এই মাসআলাটি এমন দলীলসমৃদ্ধভাবে আলোকপাত করলেন যে, ইমাম শাফী রহ. যদি উপস্থিত থাকতেন, তাহলে হয়তো তিনি নিজের মত থেকে ফিরে আসতেন। এ কথা শুনে হযরতের ক্রোধের উদ্রেক হলো। তিনি বললেন, ইমাম শাফী রহ.-কে তুমি কী মনে করেছো! তিনি যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে হয়তো তাঁর তাকলীদ করা ছাড়া আমার উপায় থাকতো না।

---

১৭৬. ওহদাতে উম্মাত, পৃষ্ঠা: ৫০-৫১

ইংরেজদের শরীরের কাবাব বড় সুস্বাদু হবে!

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলতেন, ইংরেজদের জুলুম-অন্যায় ও বর্বরতার কারণে হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. তাদেরকে যে পরিমাণ ঘৃণা করতেন, অন্য কাউকে এ রকম ঘৃণা করতেন না। একবার কেউ একজন হযরতকে বললো, হযরত! আপনি সব সময় ইংরেজদের খারাপ দিকগুলোই কেন বলেন? আখের তাদের মধ্যেও তো কিছু ভালো জিনিস থাকবে। হযরত সঙ্গে সঙ্গে রসিকতাপূর্ণ উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, ভাই! তাদের শরীরের গোশ্তের কাবাব বড় সুস্বাদু হবে।

হযরতের দুঃখ-দুশ্চিন্তা

হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-কে আল্লাহ তা'আলা জিহাদের যেই জযবা দান করেছিলেন, সে সম্পর্কে হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. অনেকবার অশ্রুসিক্ত অবস্থায় ভরাট কণ্ঠে এ ঘটনা শোনান যে, একবার অন্তিম রোগে হযরতের একজন খাদেম তাঁকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখে মনে করে যে, জীবন শেষ লগ্নে উপনীত তাই তিনি পেরেশান। এ কথা মনে করে তিনি কিছু সান্ত্বনা বাক্য বলেন। তখন হযরত বলেন,

> 'আরে মৃত্যুর জন্যে কিসের দুশ্চিন্তা! দুশ্চিন্তা তো এজন্যে যে, বিছানায় পড়ে মৃত্যু বরণ করছি। মনের কামনা তো ছিলো, কোনো জিহাদের ময়দানে নিহত হবো। মাথা একদিকে ছিটকে পড়ে থাকত, আর হাত-পা আরেক দিকে।'

উদারতাপ্রকাশ নিজের দ্বীন ও আদর্শ বিসর্জন দিয়ে নয়

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. অনেক বলতেন যে, খেলাফত আন্দোলনে সাধারণ মানুষের যেই আবেগ-উদ্দীপনা আমরা দেখেছি, তা পরবর্তীতে কোনো আন্দোলনে চোখে পড়েনি। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. এ আন্দোলনের প্রাণসত্তা ছিলেন। তাঁর ইখলাস, লিল্লাহিয়াত ও চেষ্টা-মেহনতের বরকতে এ আন্দোলন হিন্দুস্থানের কোণায় কোণায় ছড়িয়ে পড়ে। এ আন্দোলনের পতাকাবাহী যদিও মুসলমানরাই ছিলো, কিন্তু ইংরেজদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হিন্দুরাও মুসলমানদের পিছনে আন্দোলনে নামে। আন্দোলনের বৃহত্তর অংশ যেহেতু মুসলমানদের ছিলো, তাই হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. হিন্দুদের সঙ্গে এ সমন্বয়কে মেনে নেন। কিন্তু হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-কে সবসময় এই চিন্তা আচ্ছন্ন করে রাখতো যে, হিন্দুদের সঙ্গে এই সমন্বয় মুসলমানদের

জীবনাচারের স্বকীয়তা এবং ইসলামী প্রতীকসমূহের উপর প্রভাব ফেলবে না তো! এরই মধ্যে একজায়গায় মুসলমান ও হিন্দুদের সমন্বিত এক সমাবেশে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, হিন্দুদের সঙ্গে উদার আচরণ প্রকাশকল্পে এ বছর ঈদুল আযহাতে মুসলমানগণ গরু কোরবানী করবে না। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. এই সংবাদ জানতে পেরে অস্থির হয়ে পড়েন। তিনি এই প্রস্তাবের শুধু মৌখিক বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত হন নি, বরং কার্যত প্রকাশ্যে তা খণ্ডন করেন। হযরত সাধারণত বকরী কোরবানী করতেন। কিন্তু এ বছর তিনি বিশেষভাবে গুরুত্বের সাথে গরু আনিয়ে সর্বজন সম্মুখে তা কোরবানী করেন।

হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর বিশিষ্ট ও গর্বের ছাত্র হযরত থানবী রহ. যেহেতু এ ধরনের আন্দোলনকে মুসলমানদের জন্যে উপকারী মনে করতেন না, এজন্যে তিনি এ আন্দোলন থেকে পৃথক থাকেন। ওস্তাদ শাগরীদ উভয়ে নিজ নিজ মতে পুরোপুরি অটল থাকা সত্ত্বেও তাঁদের এ বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাস ছিলো যে, এ মতবিরোধের ভিত্তি দ্বীনদারী। সুতরাং একবার আন্দোলনের কিছু কর্মী থানাভবনে সমাবেশ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর সামনে এ প্রস্তাব পেশ করা হলে তিনি কঠোরভাবে তা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, আমার দ্বারা এটা সম্ভব নয়। আমি থানাভবনে সমাবেশ করলে তা মওলবী আশরাফ আলীর জন্যে মারাত্মক কষ্টের কারণ হবে। এটা তার জন্যে সহ্য হবে না যে, আমি থানাভবনে বক্তব্য দেবো, আর সে সেখানে উপস্থিত থাকবে না। আর যদি সে অংশগ্রহণ করে, তাহলে দ্বীনদারীর ভিত্তিতে তার যেই অবস্থান, তার বিরুদ্ধ অংশগ্রহণ করা হবে। এজন্যে এ কাজ আমি করবো না।

সুতরাং এমনটিই হলো। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. খেলাফত আন্দোলনের কাজে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন স্থানে তাশরীফ নিয়ে গেলেও থানাভবনে তিনি সমাবেশ করেননি।

হযরত শাইখুল হিন্দের ইখলাস

শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান ছাহেব রহ. হযরত থানবী রহ.-এর ওস্তাদ ছিলেন। উঁচু মাপের বুযুর্গ ছিলেন। হযরত থানবী রহ. দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে লেখাপড়া শেষ করে কানপুরের মাদরাসায় পড়াতে আরম্ভ করলেন। কানপুরের লোকদের মধ্যে খুব জোরেশোরে বিদআত চালু ছিলো। মানুষের মনোযোগ কুরআন হাদীসের দিকে কম, মানতেক ও ফালসাফার দিকে ছিলো বেশি। পক্ষান্তরে ওলামায়ে দেওবন্দের

কুরআন-সুন্নাহর দিকে মনোযোগ ছিলো অধিক। এজন্যে তারা ওলামায়ে দেওবন্দকে ছোট মনে করতো। হযরত থানবী রহ. একবার চিন্তা করলেন, আমি হযরত শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান রহ.-কে কানপুর আনবো। তাঁর দ্বারা এখানে ওয়ায করাবো। যাতে মানুষ দ্বীনের হাকীকত জানতে পারে এবং এটাও জানতে পারে যে, ওলামায়ে দেওবন্দ সব শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। সুতরাং জলসা করা হলো। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-কে দাওয়াত দেওয়া হলো। সমাবেশ চলাকালে হযরত থানবী রহ. হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-কে ইঙ্গিতে বলেছিলেন যে, হযরত অমুক মাসআলার বিষয়ে একটু বিশেষভাবে আলোচনা করবেন। কারণ, এখানে ঐ বিষয়ে অনেক ভুল বোঝাবুঝি ছড়িয়ে আছে। মাসআলার সম্পর্ক ছিলো মানতেক ও ফালসাফার সঙ্গে। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. যখন বয়ান আরম্ভ করেন, তখন ঐ সব লোক সেখানে এসে পৌছেনি, যাদেরকে ওয়ায শোনানো উদ্দেশ্য ছিলো। কিছুক্ষণ পরেই তারা সেখানে এসে পৌছে। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. ঐ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন। সে সম্পর্কে খুব উচ্চাঙ্গের আলোচনা তুলে ধরলেন। বয়ান চলছিলো হঠাৎ তিনি বললেন, আমি আর আলোচনা করতে ক্ষমা চাচ্ছি এবং وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলে বসে পড়লেন।

হযরত থানবী রহ. বলেন, আমি খুব বিচলিত হলাম, যখন আলোচনার মূল সময় এসেছে, তখন হযরত বসে পড়লেন। আমি হযরতকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখন তো আলোচনার আসল সময় ছিলো, কিন্তু আপনি আলোচনা শেষ করে দিলেন কেন? হযরত বললেন, মূলত আমার চিন্তা জাগে যে, আমি তাদের সামনে নিজের ইলম জাহির করছি। তখন যদি আমি আলোচনা অব্যাহত রাখতাম, তাহলে তা আল্লাহ তা'আলার জন্যে হতো না, বরং তা নিজের যোগ্যতা দেখানো ও ইলম প্রকাশ করার জন্যে হতো। এমন ওয়ায বৃথা, যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য নয়, বরং নিজের ইলম জাহির করা উদ্দেশ্য।

এটা কোনো মামুলি বিষয় নয় যে, মানুষ সমাবেশে আলোচনা করতে করতে এ কথা চিন্তা করে বসে পড়বে যে, এতক্ষণ পর্যন্ত যা বলছিলাম তা ছিলো আল্লাহর জন্যে, কিন্তু এখন যা বলবো তা নিজের ইলম জাহির করার জন্যে হবে। মূলত পদলিপ্সা থেকে বাঁচার জন্যে এমনটি করতে হয়। যে কোনো পদ ও পদবী নিজের প্রভাব সৃষ্টির জন্যে অর্জন করা খারাপ। তবে মানুষের আরামের জন্যে পদ হাসিল করার অনুমতি রয়েছে।

হযরত শাইখুল হিন্দের বিনয়

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মুগীছ ছাহেব রহ. থেকে আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এ ঘটনা শোনেন যে, শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান ছাহেব রহ.– যিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারত স্বাধীনতার জন্যে এমন আন্দোলন গড়ে তোলেন, যা পুরো হিন্দুস্থান, আফগানিস্থান ও তুরস্কে আলোড়ন সৃষ্টি করে। পুরো হিন্দুস্তান জুড়ে ছিলো তাঁর খ্যাতি। আজমীরে একজন আলেম ছিলেন মাওলানা মঈনুদ্দীন আজমিরী। তিনি চিন্তা করলেন, দেওবন্দ গিয়ে হযরত শাইখুল হিন্দের সাথে সাক্ষাৎ করবেন এবং তাঁর দর্শন লাভ করবেন। তিনি রেলগাড়ি যোগে দেওবন্দ পৌছেন। সেখানে পৌছে এক ঘোড়াগাড়িওয়ালাকে বলেন, আমি শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান ছাহেবের সাথে মোলাকাত করতে যাবো। তিনি তো সারা দুনিয়ায় 'শাইখুল হিন্দ' নামেই বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু দেওবন্দে 'বড়ো মওলবী ছাহেব' নামে পরিচিত ছিলেন। ঘোড়াগাড়িওয়ালা জিজ্ঞাসা করলেন, বড়ো মৌলভী ছাহেবের বাড়িতে যেতে চান? তিনি বললেন, হ্যাঁ বড়ো মৌলভী ছাহেবের নিকটে যেতে চাই। সুতরাং ঘোড়াগাড়িওয়ালা হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর বাড়ির গেটে তাকে নামিয়ে দিলো। গ্রীষ্মকাল ছিলো। তিনি দরজায় করাঘাত করলে গেঞ্জি ও লুঙ্গি পরা এক ব্যক্তি বের হয়ে আসে। তিনি বলেন, আমি হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান ছাহেবের সাথে সাক্ষাত করার জন্যে আজমীর থেকে এসেছি। আমার নাম মঈনুদ্দীন। লোকটি বললো, হযরত তাশরীফ আনুন। ভিতরে এসে বসুন। তিনি বসে বললেন, আপনি হযরত মাওলানাকে বলুন মঈনুদ্দীন আজমিরী আপনার সাথে দেখা করতে এসেছে। লোকটি বললো, হযরত আপনি গরমের মধ্যে এসেছেন, তাশরীফ রাখুন। এরপরে পাখা দিয়ে বাতাস করতে আরম্ভ করলো। কিছু সময় অতিবাহিত হলে মাওলানা আজমিরী আবারো বললেন, আমি তোমাকে বললাম, মাওলানাকে অবহিত করো যে, আজমীর থেকে এক ব্যক্তি দেখা করতে এসেছে। লোকটি বললো, ঠিক আছে আমি এখনই অবহিত করছি। এরপর সে ভিতরে চলে গেলো এবং খানা নিয়ে এলো। মাওলানা বললেন, ভাই! আমি তো এখানে খানা খেতে আসিনি। আমি তো মাওলানা মাহমুদ হাসান ছাহেবের সাথে সাক্ষাত করতে এসেছি। তাঁর সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করো। লোকটি বললো, হযরত আপনি খানা খান। এখনই তাঁর সাথে সাক্ষাত হবে। সুতরাং তিনি পানাহার করলেন। অবশেষে

মাওলানা মঈনুদ্দীন ছাহেব অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, আমি তোমাকে বারবার বলছি, কিন্তু তুমি তাকে অবহিত করছো না। তখন লোকটি বললো, হযরত! আসল কথা হলো, এখানে তো কোনো 'শাইখুল হিন্দ' থাকে না, তবে এ অধমেরই নাম 'বান্দা মাহমুদ'। তখন মাওলানা মঈনুদ্দীন ছাহেব বুঝতে পারলেন 'শাইখুল হিন্দ' নামে খ্যাত মাহমুদ হাসান ইনিই। যার সাথে এতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষোভের সাথে কথা বলছি। এই ছিলো আমাদের বুযুর্গদের নিরালা রং। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিছু রং আমাদেরকেও দান করুন। আমীন।

ছাত্রের জন্য চৌকি বহন করে নিয়ে আসেন

দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তাইয়্যেব ছাহেব রহ.-এর শ্রদ্ধেয় শশুর জনাব মাওলানা মাহমুদ ছাহেব রামপুরী রামপুরের এমন এক খান্দানের সন্তান, যেই খান্দান তাদের দ্বীনদারী ও জাগতিক প্রভাব প্রতিপত্তি ও মানমর্যাদা উভয়দিক থেকে বিশিষ্ট ছিলো। আকাবেরে দেওবন্দের সকলের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিলো। তিনি যখন ইলম শিখতে এলেন, তখন তার অবস্থান দেওবন্দের ছোট একটি মসজিদের কক্ষে হয়। যেটি ছোট মসজিদ নামে পরিচিত ছিলো। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. দারুল উলুম থেকে এপথেই আসা যাওয়া করতেন। একদিন সেখান দিয়ে যাওয়ার পথে দেখেন যে, সেখানে মাওলানা মাহমুদ ছাহেব রামপুরী দাঁড়িয়ে আছেন। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. তার দেওবন্দ আসা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। এজন্যে জিজ্ঞাসা করলেন, কী উদ্দেশ্যে আসা হয়েছে?

তিনি সবিস্তারে বললেন এবং একথাও বললেন যে, এই মসজিদের হুজরায় আমি অবস্থান করি। হযরত হুজরার ভিতরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তার থাকার জায়গা দেখলেন। সেখানে শোয়ার জন্যে মাটিতে একটি বিছানা বিছানো ছিলো। হযরত তখনকার মতো এটা দেখে চলে গেলেন। কিন্তু মনে মনে চিন্তা করছিলেন, মাওলানা মাহমুদ ছাহেব রামপুরের আমীরজাদা। মাটিতে শোয়ার অভ্যাস তার নেই, এখানে তার কষ্ট হচ্ছে। তাই তিনি বাড়িতে গিয়ে একটি চৌকি নিজে বহন করে ছোট মসজিদের নিকট নিয়ে আসেন। অনেক দূরত্ব ছিলো কিন্তু হযরত এ অবস্থাতেই গলী ও বাজার অতিক্রম করে ছোট মসজিদের নিকট এলেন। তখন মাওলানা মাহমুদ ছাহেব মসজিদ থেকে বাইরে বের হচ্ছিলেন। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. চিন্তা করলেন আমাকে চৌকি বহন করতে দেখলে সে একথা ভেবে লজ্জিত হবে

যে, আমার খাতিরে শাইখুল হিন্দ রহ. এতো কষ্ট করছেন। সুতরাং তাকে দেখতেই তিনি চৌকিটি নীচে রাখলেন এবং বললেন,

'নাও মিয়াঁ তোমার চৌকি তুমি নিজে ভিতরে নিয়ে যাও। আমিও শায়েখজাদা, কারো চাকর নই।'

সূক্ষ্ম আক্রমণের বিস্ময়কর ঘটনা

হযরত ওয়ালেদ মাজেদ মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. থেকে অধম শুনেছি যে, শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান রহ.-এর জনৈক মুরীদ বিদআতীদের (বিদ'আতী কর্ম-কাণ্ডের খণ্ডনে) খণ্ডনে একটি পুস্তিকা লেখে। বিদআতীরা তার খণ্ডন করতে গিয়ে তাকে কাফের আখ্যা দেয়। প্রতি উত্তরে সে ব্যক্তি দু'টি চরণ রচনা করে। যা সাহিত্যের মানে বর্তমান যুগের রসাত্মক আক্রমণের উঁচু পর্যায়ের কবিতা ছিলো। সেই চরণ দু'টি হলো-

مرا کافر اگر گفتی غمے نیست

چراغ کذب را نبود فروغ

مسلمانت بخوانم در جوابش

دروغے را جزا باشد دروغ

অর্থাৎ, তুমি আমাকে কাফের বলে থাকলে এতে আমার কোনো দুঃখ নেই, কারণ মিথ্যার বাতি জ্বলে না। তুমি আমাকে কাফের বলেছো, তার উত্তরে আমি তোমাকে মুসলমান বলছি, কারণ মিথ্যার বদলা মিথ্যাই হয়ে থাকে।

অর্থাৎ, তুমি আমাকে কাফের বলে মিথ্যা বলেছো, এর উত্তরে আমি তোমাকে মুসলমান বলে মিথ্যা বলছি। অর্থাৎ, বাস্তবে তুমি মুসলমান নও। এ উত্তর কোনো সাহিত্যিক ও ভাষারুচিসম্পন্ন কবিকে শোনানো হলে সে খুব সাধুবাদ জানাবে এবং পছন্দ করবে। উত্তরটি অন্তরে গেঁথে যাওয়ার মতো। যাই হোক, এ কবিতা লিখে হযরতের ভক্ত হযরতের খেদমতে নিয়ে এলো। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. কবিতা শুনে বললেন, তুমি তো মারাত্মক কবিতা রচনা করেছো। (অন্তরে) বিদ্ধ হওয়ার মতো উত্তর দিয়েছো। কিন্তু তুমি তো ঘুরিয়ে তাকে কাফেরই বললে। অথচ ফতওয়ার মানদণ্ডে সে কাফের নয়।

তারপর হযরত বললেন, কবিতাটি এভাবে সংশোধন করে নাও!

مرا کافر اگر گفتی غمے نیست
چراغے کذب را نبود فروغے
مسلمانت بخوانم در جوابش
دہم شکر بجائے تلخ دوغے
اگر تو مؤمنی فبہا والا
دروغے را جزا باشد دروغے

অর্থাৎ, তুমি আমাকে কাফের বলেছো, এতে আমার কোনো দুঃখ নেই। কারণ মিথ্যার বাতি জ্বলে না। এর উত্তরে আমি তোমাকে মুসলমান বলছি এবং তিতা ঔষধের বিনিময়ে মিষ্টি খাওয়াচ্ছি। তুমি যদি ঈমানদার হয়ে থাকো তাহলে তো খুবই ভালো, আর যদি তা না হয়ে থাকো, তাহলে মিথ্যার বদলা মিথ্যাই হয়ে থাকে।

দেখুন, যেই বিরুদ্ধবাদী তাঁকে কাফির হওয়ার এবং জাহান্নামী হওয়ার ফতওয়া দিচ্ছে, তার বিরুদ্ধেও তিনি সীমালঙ্ঘনমূলক কথা বলা পছন্দ করেননি। কারণ এই সীমালঙ্ঘনমূলক উচ্চারণ দুনিয়াতেই থেকে যাবে, কিন্তু মুখ দিয়ে যে শব্দ বের হচ্ছে, তা আল্লাহ তা'আলার ওখানে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। কিয়ামতের দিন এর জবাব দিতে হবে যে, অমুক সম্পর্কে তুমি এ শব্দ কীভাবে ব্যবহার করলে?

অতএব খোঁচা দিয়ে এরকম সীমালঙ্ঘনমূলক কথা বলা কোনোভাবেই পছন্দনীয় নয়। কাউকে কোনো কথা বলতে হলে সহজ ও সোজা কথা বলা চাই। ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে একদম না বলা চাই।

বিনয়ের আরেকটি ঘটনা

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. এঘটনাও শোনান যে, দেওবন্দে এক বাড়ীতে বিবাহের বড়ো একটি অনুষ্ঠান হচ্ছিলো। সেখানে দারুল উলুমের ওস্তাদগণকেও দাওয়াত করা হয়েছিলো। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. এবং দারুল উলুমের মুহতামিম হযরত মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ আহমাদ ছাহেব প্রমুখও সেখানে তাশরীফ নিয়ে যান। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. অভ্যাস মতো সাধারণ লোকদের সঙ্গে গিয়ে বসেন। ঘটনাচক্রে ঐ অনুষ্ঠানে শরীয়তবিরোধী

কিছু কর্মকাণ্ড দেখা দেয়। দারুল উলুমের কোনো ওস্তাদ হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর কাছে নিবেদন করেন যে, হযরত আপনি বাড়িওয়ালাকে বোঝান, তিনি যেন এসব অসিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকেন। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. স্বতঃস্ফুর্তভাবে বিস্ময়ের সাথে হযরত মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ আহমাদের দিকে ইশারা করে বলেন, একি আকাবেরদের বর্তমানে আপনারা আমার কাছে এসেছেন! তার উপস্থিতিতে আমার কিছু বলা বেয়াদবি।

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলেন, হযরত হাফেয মুহাম্মাদ আহমাদ ছাহেব রহ. হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর প্রায় সমবয়সী ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-কে প্রকৃত বিনয়ের যেই উঁচু মাকাম দান করেছিলেন, তার ভিত্তিতে তিনি নিজের মাকাম সম্পর্কে অবগতই ছিলেন না। তিনি তার সমবয়সীদেরকেও নিজের চেয়ে বড়ো মনে করতেন।

সাদামাঠা জীবনযাপন

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. অনেকবার বলেছেন যে, যেই পরিবেশে আমরা বেড়ে উঠি সেখানে হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর ইলমী ও আমলী শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের অন্তরে বদ্ধমুল ছিলো। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সে যুগে লম্বা চওড়া সম্মানসূচক উপাধী যোগ করার রেওয়াজ ছিলো না। শাইখুল হিন্দ উপাধিটিও পরবর্তীতে বিখ্যাত হয়। সেসময় সাধারণত মানুষ হযরতকে 'বড়ো মওলবী ছাহেব' বলতো। হযরতের সরলতা ও বিনয় এ পর্যায়ের ছিলো যে, তিনি তাঁর ভাব-ভঙ্গি দিয়ে বোঝাতেন, তাকে এ নামেও যেন ডাকা না হয়।

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব বলেন যে, আমার সম্মানিত পিতা (হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াসিন ছাহেব রহ.) হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর শাগরিদ ছিলেন। কিন্তু কখনো সামান্য প্রয়োজন দেখা দিলেও হযরত নিজে আমাদের বাড়িতে আসতেন। দরজায় করাঘাত করতেন। ভিতর থেকে প্রশ্ন করা হতো, কে? উত্তরে তিনি বলতেন, বান্দা মাহমুদ এসেছে।

রেশমী রুমাল আন্দোলন ও দারুল উলূম দেওবন্দ

হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. দারুল উলুম দেওবন্দের চাটাইয়ের উপর বসে বিখ্যাত রেশমী রুমাল আন্দোলন চালিয়েছিলেন। ঐ আন্দোলনের বিষয়ে দারুল উলুম দেওবন্দের আকাবিরদের মাঝে কিছুটা দৃষ্টিভঙ্গিগত মতবিরোধ ছিলো। দারুল উলুমের দায়িত্বশীল হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আহমাদ ছাহেব রহ. এবং হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান ছাহেব রহ.-এর ব্যক্তিগত

দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো এই যে, দারুল উলুম এমন এক নীরব খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে, বর্তমান সময়ে যা মুসলিম উম্মাহর জন্যে নিতান্ত প্রয়োজন। এজন্যে দারুল উলুমের বেষ্টনির মধ্যে এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়তো সমীচিন হবে না, যার ফলে মুসলিম উম্মাহর এই বিরাট দ্বীনী কেন্দ্রের কোনো প্রকার ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

অপরদিকে হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর উপর জিহাদের জযবা ও ভারত স্বাধীনতার চিন্তা সবসময় প্রবল ছিলো। সুতরাং এ সকল আকাবিরের মাঝে নির্জনে এ বিষয়ে আলোচনা ও বিতর্কও হতো। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলেন, একবার এঁরা একটি কক্ষে গোপনে মাশওয়ারা করছিলেন। তখন কারো ভিতরে যাওয়ার অনুমতি ছিলো না। আমি কম বয়সি ছিলাম এজন্যে কীভাবে যেনো ভিতরে চলে যাই। আমি ছোট হওয়ার কারণে আমার ভিতরে আসার বিষয়টিকে কেউ অনুভবও করেনি। আমি সেখানে দেখলাম, এ সকল বুযুর্গের মাঝে খুব জোরে শোরে কোনো বিষয়ে বিতর্ক হচ্ছে। শিশুকাল হওয়ার কারণে পুরো আলোচনাটি তো আমার স্মরণ নেই, তবে এতোটুকু প্রতিক্রিয়া এখনো মাথায় রয়েছে যে, আলোচনার বিষয়বস্তু ছিলো আজাদি আন্দোলনের কোন পর্যায় পর্যন্ত মাদরাসাকে শরীক করা হবে। অনেকক্ষণ পর তারা বাইরে আসেন।

দৃষ্টিভঙ্গির এই ভিন্নতা সত্ত্বেও মুহতামিম ছাহেবগণ হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর সঙ্গে পুরো পুরি সহযোগিতার আচরণ করতেন। এবং হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. পদে পদে তাঁদের সম্মানের প্রতি লক্ষ রাখতেন। হযরত যখন হজ্বের সফরে গেলেন এবং পরিশেষে মাল্টায় বন্দী হলেন, তখন কতক অকল্যাণকামী এই উড়ো কথা ছড়িয়ে দেয় যে, হযরত মাদরাসা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। পরিচালকমণ্ডলীর সঙ্গে হযরতের মতবিরোধ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।

মাল্টা থেকে মুক্তি লাভের পর হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. যখন জানতে পারলেন যে, এ ধরনের কথা ছড়ানো হয়েছে, তখন হযরত অত্যন্ত কষ্ট পান। যখন তিনি দেওবন্দ তাশরীফ আনেন, তখন শুধু দারুল উলুম দেওবন্দের লোকই নয়, বরং শহরের অর্ধেক মানুষ হযরতকে স্বাগত জানানোর জন্যে স্টেশনে যায়। অভ্যাস মোতাবেক এটাই ধারণা করা হচ্ছিলো যে, হযরত সোজা নিজের বাড়িতে চলে যাবেন। এজন্যে সেভাবেই ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। কিন্তু হযরত স্টেশনে পৌছে বললেন, বাড়িতে নয়, আমি সোজা

মাদরাসায় যাবো এবং সেখানেই মানুষের সঙ্গে মোলাকাত করবো। তিনি তাই করলেন। হযরতের এই আচরণে সব উড়ো কথা মাটিতে মিশে গেলো।

দ্বীনী মাদরাসার বরকত

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সাহূল রহ. দারুল উলূম দেওবন্দের একজন স্বনামধন্য উসতায ছিলেন। হযরত শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান রহ.-এর অন্যতম বিশিষ্ট শাগরিদ ছিলেন। হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রে একই সঙ্গে যোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.বলতেন যে, একবার তাঁর খেয়াল হলো, এই যে আমরা মাদরাসায় পড়িয়ে বেতন নিচ্ছি, এটা তো মজদুরি হয়ে গেলো, দ্বীনের খেদমত হলো না। দ্বীনের খেদমত তো হবে সেটাই, যা বিনা বেতনে হবে। এভাবে বেতন নিয়ে পড়ালে আদৌ সওয়াব পাওয়া যাবে কি না আল্লাহ তা'আলাই জানেন। কাজেই জীবন নির্বাহের জন্যে কোনও একটা কাজ খুঁজে নেওয়া চাই। তা দিয়ে ঘর-সংসার চলবে। আর অবসর সময়ে দ্বীনের খেদমত করা যাবে। কোথাও ওয়ায করবো বা ফতওয়া লিখব ইত্যাদি। ঠিক এসময়ে তাঁর কাছে এক সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রস্তাব এলো যে, আপনি আমাদের এখানে এসে শিক্ষকতা করুন, আপনাকে এ পরিমাণ বেতন দেওয়া হবে (আপনারা তো জানেনই যে, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষকের কাজ খুব হালকা হয়ে থাকে। সারা দিনে এক-দুই ঘণ্টা পড়াতে হয়। পড়ানোর বিষয়ও এমন কিছু তথ্যবহুল হয় না যে, তার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যে অনেক পড়াশোনা করতে হবে। এটা তো দ্বীনী মাদরাসার বৈশিষ্ট্য যে, একজন মওলবী ছাহেব চার-পাঁচ ঘণ্টা পাঠদান করেন আর সেজন্যে যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়, তাতে আট-দশ ঘণ্টা ব্যয় হয়। এরূপ টানা মেহনত তাদেরকে করতে হয়। কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে এর বালাই নেই)। যাইহোক, হযরত মাওলানা রহ. ভাবলেন, দ্বীনের কাজ করার জন্যে এটা একটা ভালো সুযোগ। সেখানে দু' ঘণ্টা পড়াবো। বাকি সময় বিনা পারিশ্রমিকে দ্বীনের কাজ করবো। এই জযবা নিয়ে তিনি হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর খেদমতে হাজির হলেন এবং জানালেন যে, হযরত! আমার কাছে এই প্রস্তাব এসেছে। আমার ইচ্ছা সেখানে যাই। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. বললেন, আচ্ছা ভাই, তোমার মনে যখন এই জযবা চেপেছে, তখন গিয়ে দেখো। হযরত রহ. হয়ত চিন্তা করেছিলেন, তার যে তীব্র জযবা, তাতে এখন বাধা দেওয়া সমীচীন নয়। তাই অনুমতি দিয়ে দিলেন এবং তিনি চলে গেলেন। ছয় মাস পর ছুটি হলে তিনি দেওবন্দ এলেন। প্রথম সাক্ষাতেই

হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. বললেন, মাওলানা সাহূল ছাহেব! আপনি তো এই চিন্তা করে চলে গিয়েছেন যে, সরকারি মাদরাসায় পড়ানোর পর যে সময় থাকবে তাতে দ্বীনী খেদমত আঞ্জাম দেবেন। আচ্ছা বলুন তো এ সময়কালে কী কী খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন? দ্বীনী বিষয়ে কী কী কিতাব রচনা করেছেন? কতটা ফতওয়া লিখেছেন? কতবার ওয়ায করেছেন? একটা হিসাব দিন। প্রশ্নের কী উত্তর দেবেন, তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বললেন, হযরত! এটা শয়তানের ধোঁকা ছিলো। দারুল উলুম দেওবন্দে থাকাকালে আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের যেই খেদমত করার তাওফীক দিয়েছিলেন, সেখানে যাওয়ার পর তার অর্ধেকও সম্ভব হয়নি। অথচ অবসর সময় ছিলো কয়েক গুণ বেশি।

এ ঘটনা শোনানোর পর হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলতেন, আল্লাহ তা'আলা এসব মাদরাসার পরিবেশে বিশেষ বরকত ও নূর রেখেছেন। এখানে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা দ্বীনী খেদমতের যেই তাওফীক দান করেন, অন্য পরিবেশে তা পাওয়া যায় না।

পাকড়াও না হলেই গনীমত

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সাহুল ছাহেব ওসমানী রহ. হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর বিশিষ্ট শাগরিদ এবং দারুল উলুম দেওবন্দের সেই সকল মাকবুল ওস্তাদগণের অন্যতম, যাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা একই সঙ্গে হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রে উৎকর্ষতা দান করেছিলেন। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলতেন, একবার তিনি হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-কে প্রশ্ন করলেন, হযরত আমরা দ্বীনী ইলম পড়াই এবং সেজন্যে বেতনও নেই। এভাবে পড়ালে কি সওয়াব পাওয়া যাবে?

হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. বললেন, মওলবী ছাহেব সওয়াবের কথা বলছো! পড়াতে গিয়ে আমাদের দ্বারা যেসব ত্রুটি হয় সেজন্যে পাকড়াও করা না হলে তাই গণীমত মনে করো।

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. এ ঘটনা বর্ণনা করার পর ব্যাখ্যা করে বলতেন যে, হযরতের উদ্দেশ্য এটা ছিলো না যে, বেতন নেওয়ার কারণে সওয়াবের আর কোনো আশা নেই। কারণ, নিয়ত ভালো হলে ইনশা আল্লাহ এতেও সওয়াবের আশা রয়েছে। তবে তা তখন, যখন বেতনের হক পুরোপুরি আদায় করা হবে। যদি নির্ধারিত সময়ের চেয়ে কম পড়ায়, অনুপস্থিত থাকে, পড়ানোর জন্যে যে মেহনত ও মুতালাআর প্রয়োজন, তাতে

ত্রুটি করে, তাহলে বেতন হালাল হওয়াতেও সন্দেহ রয়েছে। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

এখনো সে সময় আসেনি

একটি বিখ্যাত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন চারটি আলামত পাওয়া যাবে, তখন শুধু নিজের নফসের ইসলাহের চিন্তা করো। সাধারণ মানুষের ইসলাহের চিন্তা ত্যাগ করো। সেই আলামত চারটি এই,

إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِيْ رَأْيٍ بِرَأْيِهٖ

'যখন দেখবে যে, কার্পণ্যের আনুগত্য করা হচ্ছে, প্রবৃত্তির চাহিদার অনুগমন করা হচ্ছে, দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, প্রত্যেকে নিজ নিজ মতকে সেরা জ্ঞান করছে।'

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. শুনিয়েছেন যে, এক ব্যক্তি হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, হযরত! আমাদের জামানায় বাহ্যত এই চার আলামতই পুরোপুরি পাওয়া যায়, তাহলে কি তাবলীগের দায়িত্ব আর অবশিষ্ট নেই?

হযরত উত্তর দিলেন, না এখনো সে সময় হয়নি।

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর শুধু এতোটুকু উত্তর বর্ণনা করতেন। এই উত্তরের কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা দলীল-প্রমাণ বর্ণনা করতেন না। তবে অধম হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-কে জিজ্ঞাসা করে যে, বাহ্যত এই চারটি শর্ত তো বিদ্যমান রয়েছে। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর যুগে না হলেও আমাদের যুগে তো বিদ্যমান রয়েছে। তাহলে তাবলীগের ফরয অবশিষ্ট থাকার কারণ কী?

অধমের প্রশ্নের উত্তরে হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. প্রথমে তো বলেন যে, সে সময় এসেছে কি না, এ ফয়সালা করার জন্যে মূলত একজন মুজতাহিদের অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন। এ ফয়সালা আমরা কীভাবে করবো?

এরপর অধমের পীড়াপীড়িতে হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. এ বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। হুবহু শব্দে বিস্তারিতভাবে তো তা স্মরণ নেই, তবে তার সারকথা যা স্মরণ রয়েছে তা এই যে, এই চার শর্তের সারকথা হলো, যদি এমন সময় চলে আসে যে, তাবলীগের কোনো প্রভাব দেখা দেয়

না এবং সাধারণ মানুষের ইসলাহের ফিকিরে মানুষের নিজের দ্বীনী হালত খারাপ হওয়ার আশঙ্কা হয়, তখন তাবলীগ ছেড়ে দিয়ে নিজের ইসলাহের ফিকিরে মগ্ন থাকবে। আল্লাহর অনুগ্রহে এখনো অবস্থা এতো খারাপ হয়নি। ইখলাস, সমবেদনা এবং সঠিক পদ্ধতিতে তাবলীগ করা হলে এখনো তা কার্যকরী হয়। আমরা যে খারাপ অবস্থা দেখছি তা এমন নয় যে, তাবলীগের দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করা সত্ত্বেও পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে। বরং অবস্থার অবনতির কারণই এই যে, আমরা হয় তাবলীগের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছি, না হয় সঠিক পদ্ধতিতে দায়িত্ব পালন করছি না। আমরা যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করি, তাহলে পরিস্থিতির সংশোধনের আশা এখনো শেষ হয়নি।[১৭৭]

আমার বেতন বাড়ানোর পরিবর্তে কমানো দরকার!

শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান ছাহেব রহ.– আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন– দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম তালিবে ইলম ছিলেন। তারপর তিনি সেখানকার ওস্তাদ হন এবং পরবর্তীতে শাইখুল হাদীস হন। বোখারী শরীফ পড়াতে পড়াতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলে মজলিসে শূরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, হযরতের বেতন বাড়ানো উচিত। কারণ, তিনি দীর্ঘ দিন ধরে পড়াচ্ছেন। সে সময় তাঁর বেতন ছিলো মাসিক দশ টাকা। এ জন্যে মাসিক বেতন করা হয় পনের টাকা। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. বিষয়টি জানতে পেরে মজলিসে শূরা বরাবর যথানিয়মে একটি দরখাস্ত লেখেন। তাতে তিনি লেখেন,

'আমি জানতে পেরেছি যে, মজলিসে শূরা আমার বেতন বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু আমি এর কোনো বৈধতা দেখছি না। কারণ, পূর্বে আমার শারীরিক শক্তি বেশি ছিলো, সময়ও দিতাম বেশি। এখন আমার শক্তি কমে গিয়েছে এবং সময়ও বেশি দিতে পারি না। এজন্যে আমার বেতন না বাড়িয়ে কমানো হোক।'

বর্তমানে আমরা যেই পরিবেশে চলছি, এখন যদি কোনো কর্মচারী ব্যবস্থাপকগণ বরাবর এ ধরনের কোনো আবেদনপত্র লেখে, তাহলে প্রবল ধারণা এটাই হবে যে, এই আবেদনের মাধ্যমে কর্মচারীটি ব্যবস্থাপকদেরকে তীব্রভাবে তিরস্কার করেছে। সে তার বর্ধিত বেতনে খুশি নয় শুধু তাই নয়,

---

১৭৭. আকাবীরে দেওবন্দ কেয়া থে, পৃষ্ঠাঃ ১০-২৯

বরং তার উল্টা তীব্র আপত্তি যে, সামান্য বেতন বৃদ্ধি করে তাকে অপমান করা হয়েছে। এ কারণে তীর্যক ভাষায় তিরস্কার করে পত্র লিখেছে।

অন্যের আরামের প্রতি লক্ষ রাখা

হযরত শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান ছাহেব রহ.-এর পবিত্র রমাযান মাসে নিয়ম ছিলো যে, ইশার নামাযের পর তারাবীহ আরম্ভ হয়ে ফজরের নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সারারাত তারাবীহ হতো। প্রতি তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে কুরআন শরীফ খতম হতো। একজন হাফেয ছাহেব তারাবীহ পড়াতেন। হযরত তার পিছনে দাঁড়িয়ে কুরআন শুনতেন। তিনি নিজে হাফেয ছিলেন না। তারাবীহের নামাযের পর হাফেয ছাহেব সেখানেই হযরতের নিকট অল্প সময়ের জন্যে ঘুমাতেন। হাফেয ছাহেব বলেন যে, একদিন আমার ঘুম ভাঙ্গলে দেখি যে, এক ব্যক্তি আমার পা টিপে দিচ্ছে। আমি মনে করলাম, কোনো তালেব ইলম হবে। তাই লক্ষ্য করলাম না যে, কে টিপে দিচ্ছে? বেশ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ঘুরে দেখি হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. আমার পা টিপে দিচ্ছেন। আমি মুহূর্তে উঠে বসি। বলি হযরত আপনি এ কি গযব করছেন। হযরত বললেন, গযব কি করলাম? তুমি সারারাত তারাবীহ্তে দাঁড়িয়ে থাকো। চিন্তা করলাম, পা টিপে দিলে তোমার আরাম হবে। এজন্যে টিপে দিতে এসেছি।

হাকীমুল উম্মত
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর ঘটনাবলী

জীবনে লিখতে বারণ

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. এমন এক ক্ষণজন্মা ব্যক্তি ছিলেন, যার দৃষ্টান্ত যুগের ইতিহাসে বিরল হয়ে থাকে। তাঁর জীবনচরিত লেখা কারও জন্যে সহজ বিষয় ছিলো না। বিশেষত যখন তিনি চরম সতর্কতা, পরম পরহেযগারী এবং ভক্তমুরীদানের অতিরঞ্জন থেকে বাঁচার জন্যে এ ওসিয়ত ছাপিয়ে দিয়েছিলেন যে, আমার জীবনী যেন লেখা না হয়। এই ওসিয়ত তামিল করলে নিঃসন্দেহে মুসলিম জাতি একটি অত্যন্ত কল্যাণকর, বরকতময় এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী বিষয় থেকে বঞ্চিত হতো। এজন্যে হযরতের ভক্তগণ তাঁর নিকট নিবেদন করেন যে, আপনার উপস্থিতিতে কোনো ব্যক্তি সতর্কতার সাথে আপনার জীবনী লিখলে এবং আপনি নিজে তা পরিমার্জন করে দিলে ওসিয়তের উদ্দেশ্যও পুরা হবে এবং জীবনচরিত দ্বারা সাধারণ মুসলমানের ব্যাপকভাবে এবং ভক্তবৃন্দের বিশেষভাবে যেই উপকার হতো, সে পথও বন্ধ হবে না।

চূড়ান্ত বিনয়ের কারণে হযরতের যেমন এটা পছন্দ ছিলো না যে, তাঁর জীবনী প্রকাশিত হোক। একইভাবে তিনি মানুষের উপকারের জন্যেও একান্ত আগ্রহী ছিলেন। যা নবীর ওয়ারিস হিসেবে তিনি লাভ করেছিলেন। তাই তিন এর অনুমতি দান করেন।

জন্ম, শৈশব ও কৈশর

৫ই রবিউস সানী ১২৮০ হিজরী বুধবার দিন সুবেহ সাদীকের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি প্রকৃত প্রভাত উদিত হয় এবং হযরত হাকীমুল উম্মত এই পৃথিবীতে উদ্ভাসিত হন। کرم عظیم (করমে আযীম) (বিশাল অনুগ্রহ) শব্দের বর্ণমান দ্বারা এই সন বড়ো চমৎকারভাবে নির্ণিত হয়েছে। সবদিক থেকেই তার জন্ম 'করমে আযীম' (বিশাল অনুগ্রহ) ছিলো।

তার বয়স মাত্র ১৪ মাস হলে তার ছোট ভাই আকবর আলীর জন্ম হয়। এজন্যে তাকে দুধ পান করানোর জন্যে ধাত্রী রাখা হয়। এরপর থেকে তার

দুধ পান করেই তিনি প্রতিপালিত হন। জীবনের মাত্র পাঁচটি মনজিল অতিক্রম করতেই মমতাময়ী মাতার স্নেহের ছায়া উঠে যায়। এরপর তিনি চাচীর নিকট থাকতে আরম্ভ করেন। তার প্রতি মাতার চেয়ে পিতার অধিক ভালোবাসা ছিলো। যে কারণে খুব নাজ নেয়ামতের মধ্যে তিনি তাকে প্রতিপালন করেন। তালীম তারবিয়াতের প্রতি সবিশেষ লক্ষ রাখেন। এমনভাবে তার তারবিয়াত করেন যে, হযরত রহ. নিজে বলতেন,

'তারাবীহের নামাযে কুরআন খতমের পর যেই মিষ্টি মসজিদে বিতরণ করা হতো, তাতে কখনোই অংশগ্রহণ করতে দিতেন না। বরং নিজে বাজার থেকে মিষ্টি আনিয়ে তার চেয়ে অধিক খাওয়াতেন এবং বলতেন, মিষ্টি খাওয়ার নিয়তে মসজিদে যাওয়া আত্মমর্যাদাহীনতার বিষয়। খুবই চমৎকারভাবে তিনি আমাদেরকে লোভলালসার শিকার হওয়া থেকে বাঁচাতেন এবং আত্মমর্যাদাবোধের শিক্ষা দিতেন।[১৭৮]

শৈশবের খেলা

হযরতের স্বভাব এমনই ছিলো যে, সাধারণ বালকদের সঙ্গে কখনো খেলাধুলা করেননি। বাল্যকাল থেকেই নামাযের প্রতি এই পরিমাণ আগ্রহ ছিলো যে, কতক খেলায়ও নামাযেরই নকল করতেন। বাজারে যাওয়ার পথে কোনো মসজিদ পড়লে মসজিদের মিম্বরের উপর গিয়ে বসতেন এবং খুৎবার মতো কিছু পাঠ করে ফিরে আসতেন।

দুষ্টুমী যাকে শিশুকালের আবশ্যকীয় চরিত্র মনে করা হয়। হযরতের মধ্যে শিশুকালের শিশুসুলভ দুষ্টুমীরও অভাব ছিলো না। হযরত নিজেই বলতেন,

শিশুকালে অনেক দুষ্টুমী করতাম। কিন্তু বর্তমান যুগের ছেলেদের মতো নোংরা দুষ্টুমি করতাম না। যার ফলে সকলের নিকট তা খারাপ না লেগে বরং ভালোই লাগতো।[১৭৯]

শেষ রাতের তাহাজ্জুদ

বারো তেরো বছর এমন কিইবা বয়স, কিন্তু সেই বয়সেই তিনি মাওলানা ফাতাহ মুহাম্মাদ রহ.-এর মহব্বতের ফয়েযের কারণে শেষ রাতের ইবাদতের অপার্থিব স্বাদ উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ ও ওযীফায় মশগুল হতেন। চাচী মা বলতেন, বেটা! তোমার এখনো তাহাজ্জুদের বয়স হয়নি। কিন্তু হযরতের মধ্যে এই আমলের রুচি এতো

---

১৭৮. আশরাফুস সাওয়ানেহ, খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ১৯
১৭৯. আশরাফুস সাওয়ানেহ, খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ২০

গভীর হয়েছিলো যে, তিনি চাচী মার কথা শুনে না শোনার ভান করতেন এবং তাহাজ্জুদ অব্যাহত রাখতেন।

স্বভাবের পবিত্রতা ও নাজুকতা

স্বভাবের মধ্যে এমন সূক্ষ্মদর্শীতা ও পরিচ্ছন্নতা ছিলো যে, কারো খালি পেট দেখে সহ্য করতে পারতেন না বোমি হয়ে যেতো। শিশুরা তাকে বিরক্ত করার জন্যে পেট খুলে দেখাতো। আর তিনি বোমি করতে করতে অস্থির হয়ে পড়তেন। দুর্গন্ধের তো প্রশ্নই আসে না তীব্র সুগন্ধীও সহ্য হতো না।

হিফয ও প্রাথমিক শিক্ষা

হযরত থানবী রহ. মীরাঠে হাফেয হুসাইন আলী ছাহেবের নিকট কুরআনে কারীম হিফয করেন। প্রাথমিক আরবী কিতাবসমূহ থানাভবন এসে মাওলানা ফাতাহ মুহাম্মাদ ছাহেব রহ.-এর নিকট পড়েন। নিজের মামার নিকট আবুল ফযল ইত্যাদি ফার্সি ভাষার উপরের কিতাবসমূহ এমনভাবে পড়েন যে, ফার্সি ভাষা পুরোপুরি তার আয়ত্তে চলে আসে। মাত্র আঠারো বছর বয়সে তালেবে ইলম অবস্থাতেই মারাত্মক চুলকানি হলে মাতৃভূমিতে চলে আসেন এবং 'মসনবীয়ে যির ও বাম' রচনা করেন। যা হযরতের প্রথম রচনা।

দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি

১২৯৫ হিজরীর যিলকদ মাসের শেষে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন এবং ১৩০১ হিজরীর শুরুতে যখন চতুর্দশ হিজরীর সূচনা হচ্ছিলো, তখন মাত্র ১৯/২০ বছর বয়সে লেখাপড়া শেষ করে মাখলুকের খেদমতের জন্যে তৈরি হন। ছাত্র অবস্থায় অন্যান্য ছাত্র এমনকি আত্মীয়-স্বজন থেকেও পৃথক থাকতেন। তবে সবক ও মুতালাআর পর সামান্য অবসর লাভ হলে স্বীয় ওস্তাদ হযরত মাওলানা ইয়াকুব ছাহেব নানুতুবী রহ.-এর খেদমতে গিয়ে বসতেন। তিনি মাদরাসার বাইরে দেওবন্দের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গেও দেখা করতে যেতেন না। তারা অনেক সময় হযরতকে পীড়াপীড়ি করে বলতেন যে, মাদরাসায় কেন খাবার খাও, আমাদের এখানে খানা খাবে। কিন্তু হযরত তা মঞ্জুর করেননি। তারা বেশি পীড়াপীড়ি করলে স্বীয় পিতার নিকট পত্র লেখেন যে, এমতাবস্থায় কী করবো? পিতা ধমকের ভাষায় উত্তর দেন যে, তুমি সেখানে আত্মীয়তা দেখাতে গিয়েছো নাকি লেখাপড়া করতে গিয়েছো। তখন তিনি একেবারে দেখা সাক্ষাতই ছেড়ে দেন।

প্রখর মেধা ও বিনয়

হযরত মাওলানা গাঙ্গুহী রহ. যখন ছাত্রদের পরীক্ষা নেওয়ার জন্যে এবং পাগড়ী পরানোর জন্যে তাশরীফ আনেন, তখন হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. তার এই সম্ভাবনাময় শাগরিদের মেধা ও প্রতিভার বিশেষভাবে প্রশংসা করেন। সুতরাং হযরত গাঙ্গুহী রহ. তাঁকে কঠিন কঠিন প্রশ্ন করেন এবং তাঁর সঠিক উত্তর শুনে পুলকিত হন। সারকথা হলো, একজন ছাত্র হিসেবেও হযরত সহপাঠীদের মধ্যে সর্বাধিক বিশিষ্ট ছিলেন। সে সময়েও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, মেধা, প্রতিভা, দর্শন ও যুক্তিশাস্ত্রে দক্ষতা এমন হয়েছিলো যে, দেওবন্দে যেখানেই কোনো বিধর্মী বিতর্ক করতে আসতো, হযরত অবিলম্বে সেখানে চলে যেতেন এবং তাকে পরাস্ত করতেন। তাঁর ওস্তাদ মাওলানা সাইয়্যেদ আহমাদ ছাহেব 'সেকান্দার নামা'-এর পরীক্ষা নেন। তিনি একটি শেরের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেন। শেরটির যেই ব্যাখ্যা ওস্তাদ বলেছিলেন, তা স্মরণ ছিলো না বিধায় তিনি নিজের থেকে একটি ব্যাখ্যা দেন। মাওলানা জিজ্ঞাসা করেন, এর আর কোনো ব্যাখ্যা হতে পারে কি? হযরত আরেকটি ব্যাখ্যা দেন। মাওলানা আবারও জিজ্ঞাসা করেন, এর আরো কোনো ব্যাখ্যা হতে পারে কি। তখন হযরত তৃতীয় ব্যাখ্যা দেন। তখন মাওলানা বলেন, এগুলোর একটি ব্যাখ্যাও সঠিক নয়, কিন্তু তোমার মেধার কারণে নম্বর দিচ্ছি। যোগ্যতা ও মেধার কারণে গর্ব অহঙ্কার তো দূরের কথা তার বিনয় এমন ছিলো যে, হযরত খাজা আযীযুল হাসান মাজযুব রহ. লেখেন,

'১৩০১ হিজরীতে হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.-এর পবিত্র হাতে হযরত থানবী রহ.-কে পাগড়ী পরানো হয়। সে বছর দেওবন্দে দস্তারবন্দীর বিরাট জলসা করা হয়। হযরত যখন শুনতে পান যে, দস্তারবন্দী করা হবে, তখন তিনি সহপাঠীদের নিয়ে হযতর মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব ছাহেব রহ.-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করেন যে, হযরত আমারা শুনেছি আমাদেরকে পাগড়ী পরানো হবে এবং সনদ দেওয়া হবে; অথচ আমরা মোটেই এর যোগ্য নই। এজন্যে এই সিদ্ধান্ত রহিত করা হোক, অন্যথায় মাদরাসার মারাত্মক বদনাম হবে যে, এমন অযোগ্যদেরকে সনদ দেওয়া হয়েছে। এ কথা শুনে মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব রহ. উত্তেজিত হন এবং বলেন যে, তোমার এ চিন্তা একেবারেই ভুল। এখানে তোমাদের ওস্তাদগণ উপস্থিত আছেন বিধায় তোমাদের নিজেদের অস্তিত্ব চোখে পড়ছে না এবং এমনটাই হওয়া উচিত। বাইরে গেলে তখন তোমরা তোমাদের মূল্য

বুঝতে পারবে। যেখানেই যাবে শুধু তোমরাই থাকবে। পুরো ময়দান খালি থাকবে। নিশ্চিন্ত থাকো।[১৮০]

পরবর্তী বাস্তব অবস্থা প্রমাণ করেছে যে, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকূব রহ.-এর এই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ভবিষ্যদ্বাণী কতো যথার্থ ও বাস্তবসম্মত ছিলো।

এর বড়ো একটা কারণ এটাও ছিলো যে, হযরত থানবী রহ. সকল ওস্তাদ এমন পেয়েছিলেন যে, তাঁদের সকলেই একেকজন সূর্য চন্দ্রের ন্যায় ছিলেন। হযরত শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান ছাহেব রহ., হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ দেহলভী রহ., হযরত মাওলানা শায়েখ মুহাম্মাদ থানবী রহ., হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকূব রহ. এঁদের প্রত্যেকে ইলমের বহমান নদী এবং জ্ঞানের আকশের উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন।

কানপুরে শিক্ষকতাজীবন শুরু

লেখাপড়া শেষ করার পর তিনি দারুল উলূমের বরকতময় পরিবেশ থেকে যেই ফয়েয লাভ করেছিলেন তা ছড়িয়ে দেওয়ার সময় ও প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো। আল্লাহ তা'আলাও এর উপযুক্ত পরিবেশ ও উপকরণ প্রস্তুত করে দেন। 'ফয়যে আম' ছিলো কানপুরের সবচেয়ে প্রাচীন দ্বীনী মাদরাসা। তার প্রধান শিক্ষক ছিলেন জনাব মাওলানা আহমদ হাসান ছাহেব রহ.। তিনি সে যুগের অন্যতম বিখ্যাত আলেম ছিলেন। কোনো এক কারণে তিনি ইস্তফা দিয়ে সেখান থেকে চলে যান এবং পৃথক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁর জ্ঞান-গভীরতার কারণে কেউ তাঁর জায়গায় বসার সাহস করছিলো না। হযরত থানবী রহ. এ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। সেখান থেকে একজন শিক্ষক চাওয়া হলে ওস্তাদগণের নির্দেশে এবং ওয়ালেদ মাজেদের অনুমতিক্রমে নিশ্চিন্তে তিনি সেখানে চলে যান এবং দরস দিতে আরম্ভ করেন। মাসিক বেতন ২৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়। যুগ অনুপাতে এ বেতন একেবারে কম না হলেও হযরতের যোগ্যতা এবং পৈত্রিক ধনাঢ্যতার সামনে তা কিছুই ছিলো না। কিন্তু হযরত এটাকে অনেক মনে করতেন। তিনি বলতেন, আমি ছাত্র জামানায় যখনই শিক্ষকতা নিয়ে চিন্তা করতাম, তখন দশ টাকার অধিক বেতনের প্রতি নজর যেতো না এবং নিজেকে এর চেয়ে অধিকের হকদার মনে হতো না। সে সময় তিনি বয়সে একেবারেই তরুণ ছিলেন। কিন্তু কানপুর যাওয়ার পর সেখানের সকল মুদাররিস ও আলেমদের মধ্যে অতি দ্রুত খ্যাতি লাভ করেন। ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা

---

১৮০. আশরাফুস সাওয়ানেহ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩১-৩২

অর্জন করেন। এমনকি মাওলানা আহমাদ হাসান ছাহেবও তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং সম্মান করতেন। এখানে নিয়োগ হওয়ার পর মাত্র তিন চার মাস অতিক্রম হতেই তাঁর অসাধারণ যোগ্যতাকে সামনে রেখে মাদরাসার পরিচালকগণ চাইলেন যে, হযরত তাঁর ওয়াযের মধ্যে মাদরাসার সহযোগিতার জন্যে চাঁদা দানের প্রতিও উদ্বুদ্ধ করবেন। হযরত থানবী রহ. এটাকে দ্বীনী গায়রতের পরিপন্থী মনে করলেন। তিনি এমন করতে সুস্পষ্টভাবে অস্বীকৃতি জানালেন। মাদরাসার পরিচালকগণ নিজেদের বৈঠকে এ বিষয়ে কিছু অভিযোগ উত্থাপন করলে বিষয়টি হযরতও জানতে পারলেন। তখন হযরত বললেন, এটা আমার কাজ নয়, মাদরাসা পরিচালকদের কাজ। আমার কাজ তো শুধু পড়ানো। কিন্তু মাদরাসার পরিচালকগণ এটা মেনে নিলেন না। তারা এ বিষয় নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন। বিষয়টি হযরতের কাছে খুব অসহনীয় লাগলো। তিনি সেখান থেকে ইস্তফা দিয়ে বাড়িতে চলে আসার ইচ্ছা করলেন। রওয়ানা হওয়ার পূর্বে তিনি মাওলানা শাহ ফযলুর রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী রহ.-এর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গঞ্জে মুরাদাবাদ তাশরীফ নিয়ে যান। কারণ, পরবর্তীতে এখানে আর আসার তাওফীক নাও হতে পারে। যদিও মাদরাসা পরিচালকগণ হযরত থানবী রহ.-এর মতো অমূল্য রতনকে চিনতে না পেরে হাতছাড়া করেছিলো। কিন্তু শহরের অধিবাসীরা হযরত থানবী রহ. দ্বারা এতো প্রভাবিত ছিলো যে, এই বিচ্ছেদ তারা সহ্য করতে পারলো না। তাই তারা হযরত থানবী রহ.-কে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে চিন্তা করতে আরম্ভ করলো। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে আব্দুর রহমান খান সাহেব এবং হাজী কেফায়েতুল্লাহ সাহেবের তাঁর প্রতি অসাধারণ ভক্তি ছিলো। তাঁরা কানপুরের টপকাপুর মহল্লার জামে মসজিদে নতুন মাদরাসা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তারা নিজেরা বেতন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।। সুতরাং তিনি গঞ্জে মুরাদাবাদ থেকে কানপুর ফিরে এলে তাঁরা দুজন অনেক পীড়াপীড়ি করে হযরত থানবী রহ.-কে রেখে দেন। হযরত থানবী রহ.-ও তাদের ইখলাস দেখে সেখানে পাঠদান করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তিনি ঐ মাদরাসার নামকরণ করেন 'জামেউল উলূম'। তিনি এমন হৃদয়গ্রাহীভাবে পাঠদান করতেন যে, বিষয়বস্তু ছাত্রদের মন-মস্তিষ্কে বসে যেতো। যে কোনো ছাত্র তাঁর কাছে দু-চার সবক পাঠ করলে অন্য কারো কাছে পড়তে আর তৃপ্তি বোধ করতো না। কঠিন থেকে কঠিন বিষয় তিনি সহজে বুঝিয়ে দিতেন এবং ছাত্রদের মস্তিষ্কে বসিয়ে দিতেন। এভাবে তিনি একাধারে চৌদ্দ বছর পাঠদান করেন। সাথে সাথে

ওয়ায, ফতওয়া প্রদান ও গ্রন্থ রচনার ধারাও অব্যাহত থাকে। পরিশেষে তিনি ১৩১৫ হিজরীর সফর মাসের শেষ দিকে স্বীয় পীর ও মুরশিদ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ ছাহেবের পরামর্শক্রমে কানপুর থেকে চলে আসেন এবং থানাভবনে অবস্থান করেন। হযরত হাজী ছাহেব রহ. এতে আনন্দ প্রকাশ করে এক চিঠিতে লেখেন,

> 'খুব ভালো হয়েছে যে আপনি থানাভবনে তাশরীফ এনেছেন। আশা করি আপনার দ্বারা অনেক মানুষের জাহেরী ও বাতেনী ফায়দা হবে। আপনি আমাদের মসজিদ ও মাদরাসা নতুন করে আবাদ করবেন। আমি সবসময় আপনার জন্যে দু'আ করছি এবং আপনার প্রতি সর্বদা আমার মনোযোগ রয়েছে।'[১৮১]

এই চৌদ্দ বছর সময়ে তাঁর ইলমের সাগর থেকে হাজার হাজার মানুষ পরিতৃপ্ত হন। যাঁদের মধ্যে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক হারদুওয়ানী, মাওলানা মুহাম্মাদ রশীদ কানপুরী, মাওলানা আহমাদ আলী ফতেহপুরী, মাওলানা যাফর আহমাদ ছাহেব ওসমানী থানবী, মাওলানা সাদেকুল ইয়াকীন কুরসুবী, মাওলানা শাহ লুৎফুর রসুল বারাবাংকী, মাওলানা হাকীম মুহাম্মাদ মোস্তফা বিজনুরী, মাওলানা ফযলে হক বারাবাংকীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যুক্তিবাদী, শিক্ষাবীদ ও মনস্তত্ত্বীদগণের নিকট তো এখন এ রহস্য উন্মোচিত হয়েছে যে, বিশেষ এক পরিবেশ ও দ্বীক্ষাকেন্দ্র তৈরি করা ছাড়া শুধু পুস্তক পড়া ও পড়ানোর দ্বারা মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে না। যেই বিশেষ পরিবেশ ও দ্বীক্ষাকেন্দ্রে কিছুদিন ছাত্ররা একাগ্রতার সঙ্গে একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গির অধীনে জীবন যাপন করা শিখবে। তবে নবুওয়াত-প্রদীপের পতঙ্গরা প্রথম দিন থেকেই এ রহস্যের নাগাল পেয়েছিলেন। যে কারণে তাঁরা নিজেদের বেশিরভাগ সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে অতিবাহিত করেন। সেখানে তাঁরা ইসলামী তালীম ও তারবিয়াত লাভ করতেন। আসহাবে সুফফার জীবন এর উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। এ কারণে শুরু থেকেই বুযুর্গগণের সোহবতে বসা এবং তাঁদের থেকে ফয়েয লাভ করার রীতি আসলাফের মধ্যে কার্যকর ছিলো। কারণ, এর দ্বারা ইলম ও মারেফতের

---

১৮১. আশরাফুস সাওয়ানেহ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৯৭, মাকতুবাতে ইমদাদিয়ার উদ্ধৃতিতে, মাকতুব নম্বর: ৩৬

যে রহস্য জ্ঞান লাভ হয়, তা পুস্তকের পৃষ্ঠা দ্বারা সম্ভব নয়। আকবর মরহুম তাঁর কবিতায় চমৎকার বলেছেন যে,

کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں آدمی، آدمی بناتے ہیں

কোর্স তো শব্দ শিক্ষা দেয়,
মানুষই প্রকৃত মানুষ তৈরি করে।

বুযুর্গদের সান্নিধ্যার্জনের আগ্রহ

হযরত থানবী রহ.-এরও আল্লাহ ওয়ালাগণের সোহবতের প্রতি একান্ত অনুরাগ এবং পরিপূর্ণ আগ্রহ-উদ্দীপনা ছিলো। তিনি মহান পূর্বসূরীগণের বিভিন্ন ঘটনা ও জীবনি বিমুগ্ধ হয়ে শোনাতেন। তিনি বলতেন, এঁদের মধ্যে আল্লাহ-প্রেমের নেশা ছিলো। তাঁদের আলোচনার দ্বারাও নেশার অবস্থা তৈরি হয়। তাঁরা ছিলেন খোদা-প্রেমিক। তাঁদের জীবনী ও ঘটনা পাঠ করা হবে আর অন্তরে আল্লাহর মহব্বত পয়দা হবে না, এটা অসম্ভব।[১৮২]

হযরত থানবী রহ. তৎকালীন যুগের সকল বুযুর্গের সঙ্গে মিলিত হন। তাঁদের সকলের থেকে দু'আ, তাওয়াজ্জুহ ও স্নেহের মাধ্যমে ইস্তিফাদা করেন। সুতরাং তিনি মাওলানা শাহ রফিউদ্দীন ছাহেব রহ.-এর তাওয়াজ্জুহ লাভ করেন। তিনি বলেন, তাঁর মজলিসে এতো বেশি প্রভাব অনুভূত হতো, যেন একেবারে পাক-পরিষ্কার হয়ে গিয়েছি। এমনিভাবে তিনি শাহ ফযলে রহমান ছাহেব গঞ্জ মুরাদাবাদী এবং শাহ আবু হামেদ ছাহেব ভুপালী রহ. (যিনি নকশবন্দিয়া সিলসিলার উঁচু স্তরের বুযুর্গ ছিলেন)-এর সাক্ষাত লাভেও ধন্য হন।

সূফী শাহ সোলায়মানী ছাহেব লাজপুরী রহ., হযরত শাইখ মাওলানা ফতেহ মুহাম্মাদ ছাহেব থানবী রহ., মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব ছাহেব নানুতুবী রহ., হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ ছাহেব গাঙ্গুহী রহ., হযরত শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান ছাহেব রহ. এ সকল হযরতের সঙ্গে হযরত থানবী রহ. এমনভাবে মিলিত হন এবং ইস্তিফাদা করেন যে, তাঁদের প্রত্যেকে তাঁর মেধা, প্রতিভা, যোগ্যতা ও উচ্চ আমলের স্বীকৃতি প্রদান করেন।[১৮৩]

বায়আতের ঘটনা

হযরতের ছাত্র জামানায় একবার হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. দেওবন্দ তাশরীফ আনেন। হযরত থানবী রহ. অত্যাধিক আগ্রহ নিয়ে

১৮২. আশরাফুস সাওয়ানেহ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১০৯
১৮৩. এই ধারার বিস্তারিত ঘটনাবলীর জন্য আশরাফুস সাওয়ানেহ খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৬৩ থেকে শেষ পর্যন্ত দ্রষ্টব্য

তাঁর সঙ্গে মোসাফাহা করার জন্যে অগ্রসর হন। আগ্রহাতিসহ্যে পা পিছলে পড়ে যান। হযরত গাঙ্গুহী রহ. ধরে ফেলেন। তখন তিনি বাইআত ও তার হাকীকত সম্পর্কে অপরিচিত হলেও অধিক আকর্ষণের ফলে বাইআতের আবেদন করেন। হযরত গাঙ্গুহী রহ. ছাত্র অবস্থায় বাইআত হওয়াকে মুনাসিব মনে করেননি। ফলে তিনি বাইআত করতে অস্বীকার করেন। হযরত থানবী রহ.-এর অন্তরে আক্ষেপ ও নিরাশার আকারে এ আবেগ প্রতিপালিত হতে থাকে। ১২৯৯ হিজরীতে যখন হযরত গাঙ্গুহী রহ. হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, তখন তাঁর মাধ্যমেই হযরত থানবী রহ. শাইখুল আরব ওয়াল আজম হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মাক্কী রহ.-এর খেদমতে পত্র লেখেন যে, আপনি মাওলানাকে বলে দিন, তিনি যেন আমাকে বাইআত করে নেন। এই দুই আরেফের মধ্যে কী রহস্য আদান প্রদান হয় জানি না। তবে বাহ্যিকভাবে চিঠির উত্তরে হযরত হাজী ছাহেব রহ. নিজেই তাঁকে বাইআত করে নেন। আরেফ বিল্লাহ হযরত হাজী ছাহেব রহ. সুদূর মক্কা শরীফ থেকে থানাভবনের এই বিরল মুক্তাকে চিনে ফেলেন। সুতরাং হযরত হাজী ছাহেব রহ. মাওলানা থানবী রহ. ছাত্র থাকা অবস্থাতেই তাঁর সম্মানিত পিতাকে বলে পাঠান যে, তুমি হজ্বে এলে তোমার বড়ো ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আসবে।

১৩০১ হিজরীর শাওয়াল মাসে যখন মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত থানবী রহ. ছাত্র জীবন সমাপ্ত করে কানপুরে দরস ও তাদরীসে নিয়োজিত ছিলেন, তখন হজ্বের সফরের সব আয়োজন সম্পন্ন হয়। তিনি তাঁর সম্মানিত পিতার সঙ্গে হজ্বের সফরে রওয়ানা হন। অন্তহীন আবেগ-উদ্দীপনা নিয়ে মক্কা শরীফ পৌছেন এবং শাইখ রহ.-এর আলোকময় সোহবত দ্বারা ধন্য হন। হযরত শাইখ রহ. ছয় মাসের জন্যে তাকে কাছে রাখতে চাইলেন। কিন্তু সম্মানিত পিতা তাঁর এই বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারছিলেন না। এজন্যে তিনি পিতার আনুগত্যকে অগ্রগণ্য মনে করে যাওয়ার অনুমতি দেন। কিন্তু হিন্দুস্তান পৌছার পরেও হযরত থানবী রহ. স্থীর থাকতে পারছিলেন না। হযরত হাজী ছাহেব রহ.-এর বরকতময় এই কথাগুলো কানে বাজতে থাকে।

میاں اشرف علی تم میرے پاس چھ مہینے رہ جاؤ

'মিয়াঁ আশরাফ আলী তুমি আমার কাছে ছয় মাস থেকে যাও।'

সুতরাং ১৩১০ হিজরীতে তিনি দ্বিতীয় বার সেখানে যাওয়ার সংকল্প করেন। মক্কা শরীফ গিয়ে হযরতের বিশেষ সোহবতের মহা মূল্যবান সেই

নেয়ামত দ্বারা তিনি ভূষিত হন। যা দীর্ঘদিন ধরে পীর ও মুরীদের অন্তরে একটি বাসনারূপে প্রতিপালিত হচ্ছিলো।[১৮৪]

হযরত হাজী ছাহেব রহ.-এর অসাধারণ ফয়েয পৌছানোর শক্তি আর হযরত থানবী রহ.-এর অসাধারণ ফয়েয লাভের যোগ্যতার ফলে অল্প দিনেই পরস্পরে এই পর্যায়ের মুনাসাবাত তৈরি হয় যে, হযরত হাজী ছাহেব রহ. বলেন, তুমি আমার তরীকার উপর পুরাপুরি রয়েছো। মোটকথা, এভাবে ১৩১১ হিজরীতে হযরত থানবী রহ. হযরত হাজী ছাহেব রহ.-এর রঙ্গে পুরোপুরি রঞ্জিত হয়ে এবং আধ্যাত্মিক দৌলতে সমৃদ্ধশালী হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

থানাভবনে স্থায়ীভাবে অবস্থান

মুরশিদের খেদমত থেকে ফিরে এসে হযরত থানবী রহ. কিছুদিন কানপুরে দরস দানের কাজে মশগুল থাকেন। অতঃপর ১৩১৫ হিজরীতে মুরশিদের নির্দেশক্রমে স্থায়ীভাবে থানাভবনে অবস্থান করেন। আর এখান থেকেই তাঁর জীবন-উদ্দেশ্যের সেই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সূচিত হয়।

হযরত থানবী রহ. থানাভবনের এক কোণায় বসে ধন-দৌলত, বিলাশ-বৈভব এবং জাগতিক সমস্ত আরাম আয়েশ বর্জন করেও এমন এক রাজত্ব চালান, যা খুব কম মানুষেরই ভাগ্যে জোটে। হিন্দুস্থান বরং সর্বত্র থেকে মানুষ পতঙ্গের ন্যায় তাঁর নিকট ছুটে আসে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুপাতে এই আলোকবর্তিকা থেকে আলো লাভ করে ফিরে যায়।

প্রেমপিয়াসীদের এমনভাবে যাতায়াত শুরু হয় যে, থানাভবনের মতো ছোট শহরের জন্যে একটি স্বতন্ত্র রেলওয়ে স্টেশন বানাতে হয়। খানকাহে ইমদাদিয়ার মারেফতের এই দোকানে এতো বেশি ভীড় জমে, যা হয়তো হযরত নেযামুদ্দীন আওলীয়া রহ. ও শাইখ আহমাদ সারহিন্দী রহ.-এর পর অতুলনীয় ছিলো।

অন্তিম রোগ ও আখেরাতের সফর

হেদায়াত ও মারেফতের এই সূর্য, যা ১২৮০ হিজরীতে থানাভবনের দিগন্তে উদীত হয় এবং ১৩০১ হিজরী থেকে সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী শরীয়ত ও তরীকতের আলো ছড়াতে থাকে, পরিশেষে ১৩৬২ হিজরীতে চিরতরের জন্যে তা দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়।

---

১৮৪. এই ধারার বিস্তারিত ঘটনাবলীর জন্য আশরাফুস সাওয়ানেহ খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৬৩ থেকে শেষ পর্যন্ত দ্রষ্টব্য

জীবন-বিয়োগের প্রায় পাঁচ বছর পূর্ব থেকেই পাকস্থলী ও গুর্দায় বিভিন্ন রোগ দেখা দেয়। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ফুলে যায়। সব ধরনের চিকিৎসার পরেও ক্ষুধা প্রায় শেষ হয়ে যায়। দুর্বল, অক্ষম ও শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। বেশিরভাগ সময় তন্দ্রাভাব তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখে। কিন্তু চেতনা ফিরে পেতেই বিজ্ঞ আরেফসুলভ কথাবার্তা এবং চিঠিপত্রের জবাব পূর্ববৎ দিতে থাকেন। যা দেখে বুঝে আসে যে, এটা তন্দ্রাচ্ছন্নভাব নয়, বরং আত্মবিলোপের অবস্থা। তা না হলে কারো জ্ঞান এ কথা মানতে পারে না যে, এ পরিমাণ তন্দ্রাচ্ছন্নতা বা অর্ধ অচেতন অবস্থার পর যখন চোখ খুলতেন, তখন মুখে ও কথায় তন্দ্রার কোনো প্রভাব পরিদৃষ্ট হওয়ার পরিবর্তে বিজ্ঞজনোচিত ও আরেফসুলভ কথাবার্তা আরম্ভ হতো।

পরিশেষে অন্তিম রোগ চলতে থাকে। ১৫ই রজব ১৩৬২ হিজরীর সোমবার ভোর বেলা থেকেই অবিরত দাস্ত (ডায়রিয়া) হতে থাকে। সেদিন মাগরিব নামাযের পর অচেতন অবস্থা আচ্ছন্ন করলে সোয়া ঘণ্টা পর্যন্ত আর চেতনা ফিরে আসে না। দ্রুত ও শব্দ করে শ্বাস চলতে থাকে। শ্বাস উপরে উঠলে দর্শকরা দেখতে পায় যে, তাঁর শাহাদত আঙ্গুলের মধ্যভাগে তালুর পিঠ থেকে এমন এক তিব্র আলো বের হচ্ছে যে, জ্বলন্ত বিদ্যুতের বাতি তার সামনে ম্লান হয়ে যায়। বিস্ময়ের কি আছে যে, তাঁর বরকতময় আঙ্গুলি দ্বারা গ্রন্থ রচনার আকারে এবং মানব-চিন্তা ও আমলকে আলোকিত করার রূপে যেই প্রকৃত নূর ছড়িয়ে পড়েছে, তারই এটা বাহ্যিক রূপ ছিলো। পরিশেষে ১৬/১৭ রজব ১৩৬২ হিজরী এবং ১৯/২০ জুলাই ১৯৪৩ ঈসাব্দের মধ্যবর্তী রাতে মহাপবিত্র ও মহাপ্রজ্ঞাশীল আল্লাহ তাঁর এই পবিত্র ও মহামূল্যবান আমানতকে নিজের কাছে ফিরিয়ে নেন, যা ১২৮০ হিজরীর রবিউস সানী মাসে দুনিয়াবাসীকে তিনি দান করেছিলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন!

রচনা ও লেখনীর মাধ্যমে সংস্কার-সংশোধনের ধারা

হযরত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত রহ.-এর দ্বীনী ও ইলমী ফয়েয ও বরকত এতো বহুমুখী ও বিচিত্র যে, একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে তা আয়ত্ত করা শুধু কষ্টসাধ্যই নয়, বরং অসম্ভব। তাঁর গ্রন্থের সংখ্যাই প্রায় ৮০০। যার মধ্যে কতোগুলো খুব ছোট পুস্তিকা। যেগুলোকে প্রবন্ধ বলাই বেশি উপযোগী (তবে এসব প্রবন্ধও গভীরতা ও ব্যাপকতার দিক থেকে এতোই সামগ্রিক যে, অনেক বৃহদাকার গ্রন্থেও তা অতি কষ্টেই পাওয়া সম্ভব)। আর কতোগুলো তো কয়েক ভলিউমব্যাপী। এসব গ্রন্থের বিষয়বস্তু দেখা হলে সাময়িক প্রয়োজনের এমন কোনো বিষয়ই অবশিষ্ট থাকে না, যেই বিষয় তাঁর রচনা নেই।

তিনি তাঁর গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে সবসময় এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতেন যে, যেই শ্রেণির জন্যে এই গ্রন্থ রচনা করা হচ্ছে, তার বর্ণনাভঙ্গিও যেন তাদের উপযোগী হয়। এ কারণেই জ্ঞানগর্ভ পুস্তিকা আর সাধারণের জন্যে লিখিত কিতাবসমূহের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গির মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। সাধারণের জন্যে লিখিত সহজ কিতাবসমূহের মধ্যে তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয় ও পরম উপকারী সংকলন বেহেশতী যেওর এবং ইলমী গ্রন্থসমূহের মধ্যে বয়ানুল কুরআন ও ইমদাদুল ফাতাওয়া দেখে বিষয়টি অনুমান করা যায়।

হযরত থানবী রহ.-এর মাওয়ায়েয ও মালফুযাত- যার বেশিরভাগ আলহামদুলিল্লাহ প্রকাশিত হয়ে সর্বসম্মুখে চলে এসেছে- সেগুলোর স্বাদ তারাই উপলব্ধি করতে পারবেন, যারা এই ধারার কিছু কিতাব পাঠ করেছেন। প্রত্যেক ওয়াযের মধ্যে বহুমুখী ইলমের এক সাগর চতুর্দিকে তরাঙ্গায়িত হতে দেখা যায়।

তাসাওউফ সম্পর্কিত বিভ্রান্তির নিরসন

এখানে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার করা মুনাসেব মনে হচ্ছে, তা এই যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে, বরং বিশিষ্টজনদের মধ্যেও ব্যাপকভাবে তাসাওউফের বিষয়ে কয়েকটি বড়ো ধরনের মৌলিক বিভ্রান্তি রয়েছে। সেগুলোর একটি হলো, তাসাওউফের বিধি-বিধান ও তার শিক্ষাসমূহ কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গৃহীত না হয়ে বরং বেশিরভাগ অপরিচিত ও বাইরের প্রভাবে প্রভাবিত। এই ভুল বোঝাবুঝির নিরসনের জন্যে হযরত থানবী রহ. তাসাওউফের মৌলিক ও সঠিক শিক্ষাসমূহ কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সংকলন করে পেশ করার ব্যাপারে সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি এ বিষয়ে مَسَائِلُ السُّلُوْكِ مِنْ كَلَامِ مَلِكِ الْمُلُوْكِ নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেন। যার মধ্যে তিনি কুরআনে কারীমের আয়াত দ্বারা তাসাওউফের মাসআলাসমূহ প্রমাণিত করেন। اَلتَّشَرُّفُ بِمَعْرِفَةِ أَحَادِيْثِ التَّصَوُّفِ নামে তিনি আরেকটি কিতাব রচনা করেন। যা চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এতে তিনি তাসাওউফ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ সংকলন করেছেন।

দ্বিতীয় বিভ্রান্তি- যা তাসাওউফ শব্দের অর্থের মধ্যেই সংঘটিত হয়েছে- তা হলো, তাসাওউফ শরীয়ত থেকে সম্পূর্ণ পৃথক একটি জিনিস। যে তাসাওউফ অবলম্বন করবে, তার জন্যে শরীয়তের বিধান মেনে চলা জরুরী নয়। অথচ এটা মরাত্মক এক মৌলিক ভ্রান্তি। হযরত এ বিষয়টিও তাঁর বিভিন্ন ওয়ায ও পুস্তকে অনেক জায়গায় আলোকপাত করেছেন। এক

জায়গায় তিনি ইরশাদ করেন যে, দরবেশদের উপর একটি প্রভাব এই হয়েছে যে, তারা শরীয়ত ও তরীকতকে পৃথক জিনিস মনে করেছে। তারা হাকীকতকে আসল উদ্দেশ্য আর শরীয়তকে ব্যাবস্থাপনামূলক আইন বলে বিশ্বাস করেছে। তারা আলেমদের থেকে দূরে সরে গিয়েছে। আধ্যাত্মিক ভাব ও অবস্থা ও প্রক্ষেপণকে চূড়ান্ত মেরাজ জ্ঞান করেছে। নিজেদের কল্পনাকে কাশফ আর কাশফকে চূড়ান্ত স্থিরকৃত বিষয়ের উর্ধ্বের বিষয় বলে বিশ্বাস করেছে। সেগুলোকে শরীয়তের মাপকাঠিতে ওজন করার এবং আলেমদের সামনে পেশ করারও প্রয়োজন বোধ করেনি।[১৮৫]

বিভ্রান্ত সূফীরা বলে যে, কুরআন ও হাদীসে যাহেরী আহকাম বর্ণিত হয়েছে, আর তাসাওউফের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে বাতেনি ইলম। তাদের নিকট কুরআন হাদীসের প্রয়োজনই নেই, নাউযুবিল্লাহ।[১৮৬]

কঠোর কর্মশৃঙ্খলা ও নিয়মনিষ্ঠতা

হযরত থানবী রহ.-এর জীবনে তাঁর কাজের শৃঙ্খলার বিষয়টি এমনই একটি অধ্যায় যে, তা অত্যন্ত শিক্ষনীয় বিষয়। হযরত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত রহ.-এর শুধুমাত্র ইলমী ও আমলী কৃতিত্ব পাঠকারী ব্যক্তি অনেক সময় চিন্তা করতে আরম্ভ করে যে, এমন এক ব্যক্তিত্ব- যাঁর রাত-দিনের এই পরিমাণ ব্যস্ততা- তিনি হয়তো এসব কাজ নিয়েই সর্বদা মশগুল থাকতেন। তাঁর না পরিবারের লোকদের নিকট বসে তাদের অবস্থা শোনার সুযোগ হয়েছে, আর না কারো সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে কথা বলার অবস্থা হয়েছে। কিন্তু তাঁর মা'মুলাত দেখলে তাঁর এই কারামত বোঝা যায় যে, তিনি এসব ব্যস্ততা সত্ত্বেও সাধারণ উম্মতের জন্যে যে শুধু এতো বিশাল তাবলীগি কাজ করেছেন তা নয়, বরং এর সাথে সাথে পরিবারের লোকদের হক আদায় করা, যার অর্থ শুধু এই নয় যে, তাদের খাদ্য-বস্ত্রের ব্যবস্থা করতেন, বরং তিনি তাদের নিকট বসতেন, তাদের কথা শুনতেন এবং নিজের কথা তাদেরকে বলতেন।

তিনি সবসময় নিজেই নামায পড়াতেন। কারণ, তিনি মনে করতেন যে, বারবার ইমাম পরিবর্তন করার ফলে জামাআতের ব্যবস্থাপনায় ব্যত্যয় ঘটে। ফজর নামায শেষ করে সর্বপ্রথম খানকায় অবস্থানরত মুরীদ ও সালেকগণের যেই দল যিকির ও শোগলে লিপ্ত থাকতেন, তাদের কাজের দিকে মনোযোগী

---

১৮৫. তালীমুদ্দীন, পৃষ্ঠা: ৫

১৮৬. শরীয়ত ও তরীকত, পৃষ্ঠা: ২৬

হতেন। এরা নিজ নিজ আধ্যাত্মিক অবস্থা লিখে চিঠির বাক্সে রেখে দিতেন। ফজরের নামাযের পর হযরত নিজহাতে তা খুলতেন। একেকটি চিঠি পাঠ করে তার উপর প্রত্যেকের উপযোগী উত্তর লিখে চিঠিগুলো ক্রমানুসারে রেখে দিতেন। এ বিষয়ে মানুষকে তাগিদ দেওয়া ছিলো যে, চিঠিগুলো যেন উপরে নীচে না রাখা হয়, বরং পৃথক পৃথক করে রাখা হয়। যাতে প্রত্যেকে তাকানো মাত্র যার যার চিঠি নিয়ে নিতে পারে। খুঁজতে না হয়। এ কাজ শেষ করে কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করতেন। বেশিরভাগ সময় ছোট একটি ফাইল হাতে নিয়ে বায়ু সেবনের উদ্দেশ্যে জনপদের বাইরে বের হতেন। চাশতের সময় থেকে নিয়ে দুপুরের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত আগে এ নিয়ম ছিলো যে, এ সময়ে তিনি গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের কাজ করতেন। পরবর্তীতে শেষদিকে এক দেড় ঘণ্টার জন্যে একটি মজলিস অনুষ্ঠিত হতো। সেখানে সাধারণত বিশিষ্টজনেরাই উপস্থিত থাকতেন। কখনোই বড়ো মজমা হতো না।

এগারটার সময় সাহারানপুর থেকে ট্রেন আসতো। বেশিরভাগ চিঠিপত্র ঐ গাড়িতেই আসতো। এ কারণে গাড়ির আওয়াজ শুনে, আর কখনো ঘড়ি দেখে কয়েক মিনিট পরে যখন ওঠার ইচ্ছা করতেন, তখন উপস্থিত ব্যক্তিগণের নিকট অত্যন্ত আবেদনের সুরে এই বলে অনুমতি চাইতেন যে, একটু বাড়ি থেকে আসি। এরপর চিঠি দেখা, খানা খাওয়া এবং সামান্য সময় বিশ্রামের জন্যে মহিলাঙ্গনে তাশরিফ নিয়ে যেতেন। যা সেখান থেকে দুই ফার্লং দূরত্বে ছিলো।

এরপর সোয়া দুই ঘণ্টা পর যখন যোহরের আযান হতো তখন তিনি ফিরে আসতেন। নামায শেষ করে তিন দরজা-বিশিষ্ট ঘরে এসে বসতেন। তখন থেকেই সাধারণ মজলিস আরম্ভ হতো, যা আসরের আযানের সময় সমাপ্ত হতো। আসরের নামাযের পর তিনি বাড়িতে তাশরিফ নিয়ে যেতেন। মাগরিবের নামাযের পর বাড়ির লোকদেরকে সুযোগ দেওয়া হতো। অন্যথায় গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের কাজ করতেন। প্রতিদিনের এই রুটিন মাফিক কাজ এমন নিয়মিত হতো, যেমন সূর্যের উদয় অস্ত নিয়মিত হয়। এটা হযরতের জীবনের নেহায়েত সংক্ষিপ্ত অধ্যায়। আখলাক, আদত, মুআশারাত, সদাচরণ, আনন্দ ও হাস্যরস সংক্রান্ত অনেক বিষয়ই এমন রয়েছে, যেগুলো এখানে উল্লেখ করার অবকাশ নেই। এসব বিষয়ে বিস্তারিত কিতাব লিখিত হয়েছে। এ কারণে এ বলেই ক্ষান্ত করছি।[১৮৭]

---

১৮৭. ইমদাদুল ফাতাওয়া, পৃষ্ঠা: ২-১২ থেকে সংগৃহীত

রেলের ঘটনা

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর শিষ্য-মুরীদদের সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ছিলো যে, তারা যখন রেলে ভ্রমণ করতেন, তখন তারা নিজেদের মালামাল অবশ্যই ওজন করিয়ে নিতেন। একজন যাত্রীর যে পরিমাণ মাল বিনা ভাড়ায় বহন করা বৈধ ছিলো, তার অতিরিক্ত মালের ভাড়া তারা রেলওয়েকে পরিশোধ করে তারপর ভ্রমণ করতেন। এ কাজ সম্পাদন না করে তারা রেলে ভ্রমণ করার কথা কল্পনাই করতেন না।

একবার হযরত থানবী রহ.-এর নিজের এ ধরনের একটা ঘটনা ঘটেছিলো। তিনি রেলওয়ের যেখানে মালামাল ওজন করা হয়, সেখানে গেলেন। ঘটনাক্রমে রেলওয়ের যেই কর্মচারী সেখানে ছিলো, সে হযরত থানবী রহ.-কে চিনতো। সে জিজ্ঞাসা করলো, হযরত! আপনি এখানে কেন এসেছেন?

হযরত থানবী রহ. বললেন, এই মালগুলো ওজন করাতে এসেছি। যদি অনুমোদিত পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়, তা হলে ভাড়া পরিশোধ করবো।

কর্মচারী বললো, এ কষ্ট আপনাকে করতে হবে না। মাল যদি বেশিও হয়, তবুও আপনাকে কেউ জিজ্ঞাসা করবে না।

হযরত হাকীমুল উম্মত রহ. তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আমার সঙ্গে কোন পর্যন্ত যাবেন?

সে একটি স্টেশনের নাম উল্লেখ করে বললো, অমুক স্টেশন পর্যন্ত।

হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কী হবে?

সে বললো, তারপর আমার স্থলে যে লোক দায়িত্বে আসবে, আমি তাকে বলে দেবো, যেন সে আপনার মালের প্রতি খেয়াল রাখে।

হযরত এবার জিজ্ঞাসা করলেন, সে কোন পর্যন্ত যাবে?

ঐ লোক বললো, সে আপনার শেষ গন্তব্য পর্যন্ত যাবে। আপনার আর কোনো সমস্যা থাকবে না।

হযরত রহ. বললেন, আমার তো আরও সামনে যেতে হবে।

ঐ লোক জিজ্ঞাসা করলো, এরপর আপনি কোথায় যাবেন?

হযরত থানবী রহ. বললেন, আমাকে আরও সামনে আল্লাহর কাছে যেতে হবে। সেখানে কোন গার্ড আমার সঙ্গে যাবে, যে সেখানে আল্লাহর সামনে প্রশ্নোত্তর থেকে আমাকে রক্ষা করবে?

এরপর হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. বললেন,

'এই রেল তোমার মালিকানা নয়। এর উপর তোমার কোনোই অধিকার নেই। কর্তৃপক্ষ তোমাকে এ অধিকার দেয়নি যে, তুমি কারও অতিরিক্ত মালের ভাড়া না নিয়ে ছেড়ে দেবে। কাজেই আমি তোমার কারণে দুনিয়ার পাকড়াও থেকে রক্ষা পেলেও এভাবে আমি যে কটি পয়সা বাঁচাবো, সেগুলো আমার জন্যে হারাম হবে। আর হারাম অর্থের জন্যে আল্লাহর কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। তখন আমাকে কে রক্ষা করবে? কে তখন আমার পক্ষ থেকে উত্তর দেবে?'

হযরত রহ.-এর এ বক্তব্য শোনার পর লোকটির চোখ খুলে গেলো। এবার সে হযরতের মালগুলো ওজন করিয়ে অতিরিক্ত মালের ভাড়া নিয়ে নিলো। হযরত মালের উপযুক্ত ভাড়া পরিশোধ করে তবে রেলে উঠলেন।

কাজেই কেউ যদি রেল কিংবা বিমানে ভ্রমণ করার সময় অনুমতির চেয়ে বেশি মাল বিনা ভাড়ায় বহন করে, তা হলে এর ফলে যে অর্থ সাশ্রয় হবে, তা হারাম হবে। এভাবে তার অবশিষ্ট হালাল অর্থের সাথে হারাম অর্থ মিশ্রিত হয়ে যাবে।

জনৈক খলীফার খেলাফত প্রত্যাহার

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর বড়ো মাপের একজন খলীফা ছিলেন। হযরত তাঁকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে খেলাফত প্রদান করেছিলেন। একবার তিনি সফর করে হযরতের কাছে এলেন। সঙ্গে একটি ছেলেও ছিলো। তিনি হযরতের খেদমতে উপস্থিত হয়ে সালাম ও কুশল বিনিময় করলেন।

হযরত তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথা থেকে এসেছো?

তিনি একটি জায়গার নাম উল্লেখ করে বললেন, অমুক জায়গা থেকে।

হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, রেলগাড়িতে করে এসেছো?

বললেন, হ্যাঁ, রেলগাড়িতে করে এসেছি।

হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সঙ্গের এই ছেলেটির টিকিট পুরো নিয়েছো, নাকি অর্ধেক নিয়েছো?

অনুমান করুন, খানকায় বসে পীর ছাহেব মুরীদকে জিজ্ঞাসা করছেন, টিকিট পুরো নিয়েছে, নাকি অর্ধেক নিয়েছে! এই খানকা ছাড়া আর কোনো খানকায় এ জাতীয় প্রশ্নের তো কল্পনাই করা যায় না। ওসব জায়গায় খোঁজ

নেওয়া হয়, আমল যা যা দিয়েছিলাম, সব ঠিকমতো আদায় করেছো কি না? তাহাজ্জুদ ঠিক মতো পড়েছো কি না? ইশরাক পড়েছো কি না? কিন্তু এখানে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, বাচ্চার টিকিট পুরো নিয়েছো, নাকি অর্ধেক নিয়েছো?

তিনি উত্তর দিলেন, অর্ধেক নিয়েছি।

হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, এর বয়স কতো?

তিনি উত্তর দিলেন, বয়স তো তেরো বছর, কিন্তু দেখতে বারো বছরের বলে মনে হয়, সেজন্যে টিকিট অর্ধেক নিয়েছি।

এই উত্তর শুনে হযরত মনে খুব ব্যথা পেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার খেলাফত প্রত্যাহার করে নিলেন। বললেন, আমি ভুল করে ফেলেছি; তুমি আমার খেলাফত পাওয়ার যোগ্য নও। কারণ, তোমার মাঝে হারাম-হালালের চিন্তা নেই। ছেলের বয়স যখন তেরো বছর হয়ে গেছে, তখন তোমাকে তার ফুল (পূর্ণ) টিকিটই নেওয়া আবশ্যক ছিলো। তোমার জন্যে ওয়াজিব ছিলো, এই ছেলের টিকিট ফুল নেওয়া। কাজেই এর জন্যে হাফ (অর্ধেক) টিকিট নিয়ে তুমি যে কটি টাকা সাশ্রয় করেছো, সেগুলো হারাম হয়েছে। আর যে ব্যক্তির হারাম হালালের চিন্তা নেই, সে খলীফা হওয়ার যোগ্য নয়।

সুতরাং তিনি তার থেকে খেলাফত প্রত্যাহার করে নিলেন। কোনো ব্যক্তি যদি হযরত থানবী রহ.-এর নিকট এসে বলতো, হযরত আমার ওযীফা ছুটে গিয়েছে। তখন হযরত বলতেন, ওযীফা ছুটে গিয়েছে তো ইস্তিগফার করো। পুনরায় আমল আরম্ভ করো। হিম্মতকে কাজে লাগাও। নতুন করে নিয়ত করো যে, আগামীতে আমল ছাড়বো না। ওযীফা ছুটে যাওয়ার কারণে হযরত কখনো খেলাফত প্রত্যাহার করে নেননি। কিন্তু মানুষের মধ্যে যখন হালাল হারামের চিন্তা থাকে না, তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না। এ কারণেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرَائِضِ

'অন্যান্য ফরয আমলের পর হালাল উপার্জনও একটি ফরয।'

কেয়ামতের দিন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিভাবে কথা বলবে?

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. একবার কোথাও সফরে যাচ্ছিলেন। পথে আধুনিক শিক্ষার অতিভক্ত এক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত হয়। তিনি কুরআনের একটি আয়াতের উপর এই সংশয় তুলে ধরে যে, হযরত কুরআনে এসেছে, কিয়ামতের দিন মানুষের অঙ্গপ্রতঙ্গ কথা

বলবে। হাত সাক্ষ্য দিবে, আমার মাধ্যমে সে এই গোনাহ করেছে। পা সাক্ষ্য দিবে, আমার দ্বারা সে এই গোনাহ করেছে। তো হযরত হাত-পা কথা বলবে, এটা তো একটা অদ্ভুত ব্যাপার! এটা কী করে সম্ভব? হযরত বললেন, এটা আল্লাহর কুদরত, তিনি যাকে বাকশক্তি দান করবেন, সে কথা বলবে। সে বললো, হযরত এমন ঘটনা কখনো ঘটেছে কি? হযরত বললেন, তুমি কি দলীল জানতে চাচ্ছো, না কোনো দৃষ্টান্ত দেখতে চাচ্ছো? দলীল তো এতোটুকুই যথেষ্ট যে, আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অতএব তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। আর সম্ভব হওয়ার জন্যে সবকিছুর দৃষ্টান্ত থাকতে হয় না। তখন ঐ লোক বললো, হযরত মনের প্রশান্তির জন্যে একটা দৃষ্টান্ত দেখান না! হযরত বললেন, আচ্ছা বলো তো, জিহ্বা কীভাবে কথা বলে? সে যেহেতু বলেছিলো জিহ্বা ছাড়া হাত কীভাবে কথা বলবে, এজন্যে হযরত বললেন, জিহ্বার তো কোনো জিহ্বা নেই, তাহলে জিহ্বা কীভাবে কথা বলে? এটাও তো একটা গোশতের টুকরা। এখানে বাকশক্তি এলো কোত্থেকে? এটা তো আল্লাহই দান করেছেন। সুতরাং যে আল্লাহ জিহ্বাকে বাকশক্তি দান করেছেন, তিনি তো হাতকেও বাকশক্তি দান করতে পারেন। এতে আশ্চর্যের কী আছে?

ভাই নিয়াযের সঙ্গে হযরত থানভীর ঘটনা

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর এক খাদেম ছিলেন, নাম তার 'নিয়ায'। খানকায় যাতায়াতকারী সবাই তাকে 'ভাই নিয়ায' বলে ডাকতো। সে হযরতের খাস খাদেম ছিলো। যেহেতু হযরতের খেদমত করতো এবং হযরতের সাহচর্যধন্য ছিলো, আর এমন লোকদের মধ্যে অনেক সময় কিছু মান-অভিমান কাজ করে, তাই 'ভাই নিয়াযে'র মধ্যেও কিছুটা 'নায' ছিলো। এ জন্যে সে খানকায় আগত লোকদের সঙ্গে কখনো কখনো কিছুটা শক্ত আচরণ করতো। একবার হযরতের কাছে কেউ ভাই নিয়াযের ব্যাপারে অভিযোগ করে বললো, হযরত! সে মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করে। আমাকেও সে অন্যায় কথা বলেছে। হযরতের কাছে যেহেতু আগেও বিভিন্ন সময় তার ব্যাপারে অভিযোগ এসেছে। এ জন্যে এবার হযরত খুব কষ্ট পেলেন এবং নারাজ হলেন। হযরত তাকে ডাকলেন এবং বকা দিয়ে বললেন, ভাই নিয়ায! তুমি সবার সঙ্গে কেন ঝগড়া করে বেড়াও? সে হযরতের এ কথা শোনামাত্র বলে উঠলো, 'হযরত মিথ্যা বলবেন না, আল্লাহকে ভয় করুন।' দেখুন, একজন চাকর বা খাদেম তার মনিবকে কেমন কথা বলছে! আর মনিব

হলেন হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী রহ.। আসলে তার উদ্দেশ্য মূলত এমন ছিলো না যে, হযরত আপনি মিথ্যা বলছেন। আপনি মিথ্যা বলবেন না। বরং তার উদ্দেশ্য ছিলো, যারা আপনার কাছে অভিযোগ করেছে, তারা মিথ্যা অভিযোগ করেছে। তাদের উচিত ছিলো মিথ্যা না বলা এবং আল্লাহকে ভয় করা। কিন্তু উত্তেজনার মধ্যে অনিচ্ছাতেই মুখ দিয়ে বের হয়ে গিয়েছে- হযরত মিথ্যা বলবেন না, আল্লাহকে ভয় করুন। লক্ষ করুন! মনিব যখন শাসন করে, তখন যদি ভৃত্য বলে- 'মিথ্যা বলবেন না, আল্লাহকে ভয় করুন' তাহলে মনিবের রাগ আরো বেড়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তিনি ছিলেন হযরত হাকীমুল উম্মত। সে যখন বললো, মিথ্যা বলবেন না, আল্লাহকে ভয় করুন। হযরত সঙ্গে সঙ্গে মাথা নত করে ফেললেন এবং আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ বলতে বলতে সেখান থেকে চলে গেলেন।

হযরত থানবী রহ. এমনটি কেন করলেন? এ কারণে করলেন যে, তিনি যখন নিজ চাকরকে ধমক দিলেন আর সে বললো, আল্লাহকে ভয় করুন! তখন সাথে সাথে তাঁর মনে হলো, আমি একদিকের কথা শুনে তাকে ধমকাতে আরম্ভ করেছি। আমি তাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিনি যে, মানুষ তোমার বিরুদ্ধে যে এই অভিযোগ করছে, এর বাস্তবতা কতুটুকু? তার বক্তব্য শোনার পরেই ফয়সালা করা প্রয়োজন ছিলো। এক পক্ষের কথা শুনে ধমক দেওয়া সমীচীন হয়নি। এ কারণে তিনি নিজ কথার উপর অটল না থেকে আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ বলতে বলতে সেখান থেকে চলে গিয়েছেন। এঁরাই হলেন- كَانَ وَقَّافًا عِنْدَ حُدُوْدِ اللهِ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার বেঁধে দেওয়া সীমার সামনে এঁরা থেমে যান।

হযরত থানভীর বিনয়

যে সকল আল্লাহওয়ালার কথা শুনে ও পড়ে আমরা দ্বীন শিখে থাকি, তাদের জীবনী পড়লে জানা যাবে যে, তাঁরা নিজেদেরকে এতোই মূল্যহীন মনে করতেন, যার কোনো সীমা নেই। সুতরাং হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব থানবী রহ.-এর এই উক্তি আমি আমার অনেক বুযুর্গ থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন,

> 'আমার অবস্থা এই যে, আমি প্রত্যেক মুসলমানকে বর্তমানে এবং প্রত্যেক কাফেরকে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দিক দিয়ে নিজের চেয়ে উত্তম মনে করি। মুসলমানকে তো

এ জন্যে উত্তম মনে করি যে, সে মুসলমান এবং ঈমানওয়ালা। আর কাফেরকে এ কারণে উত্তম মনে করি যে, হতে পারে আল্লাহ তা'আলা তাকেও ঈমানের তাওফীক দান করবেন এবং সে আমার থেকে আগে চলে যাবে।'

অল্প নেয়ামতেরও মূল্যায়ন করতে হবে

আমি আমার মুরুব্বী হযরত ডা. আব্দুল হাই ছাহেব আরেফী রহ. থেকে হযরত থানবী রহ.-এর ঘটনা শুনেছি যে, একবার হযরত থানবী রহ. অসুস্থ হন। সে সময় এক ব্যক্তি তাকে দুধ পান করতে দেয়। তিনি দুধ পান করেন। অল্প দুধ বেঁচে যায়। বাঁচা দুধ তিনি মাথার দিকে রেখে দেন। এমন সময় তাঁর চোখ বুঁজে আসে। জাগ্রত হয়ে পাশে দাঁড়ানো লোকটিকে জিজ্ঞাসা করেন- ভাই! বেঁচে যাওয়া সেই দুধটুকু কোথায়? লোকটি বললো, হযরত সামান্য দুধ দেখে তা ফেলে দিয়েছি। হযরত থানবী রহ. খুব অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন, তুমি আল্লাহর এই নেয়ামত ফেলে দিলে। তুমি খুব খারাপ কাজ করেছো। আমি ঐ দুধ পান করতে পারিনি তুমি পান করে নিতে। বা অন্য কাউকে পান করাতে। বিড়াল বা তোতা পাখিকে পান করাতে। আল্লাহর কোনো মাখলুকের কাজে আসতো। তুমি তা ফেলে দিলে কেন? এর পর তিনি একটি মূলনীতি বর্ণনা করেন।

> **'যেই জিনিসের অধিক পরিমাণ দ্বারা মানুষ তার সাধারণ জীবনে উপকার লাভ করে, সেই জিনিসের অল্প পরিমাণের সম্মান ও মূল্যায়ন করা মানুষের উপর ওয়াজিব।'**

নিজ ত্রুটিতে জিদ ধরা উচিত নয়

আমাদের শাইখ হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ. বলতেন, মানুষ যদি অন্যায় ও গোনাহের কাজে লিপ্ত থাকে আর এ অবস্থাতেই আল্লাহ ওয়ালাদের নিকট চলে যায় এতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যদি সেখানে গিয়ে মিথ্যা বলে বা নিজের ভুলের উপর অটল থাকে তাহলে এটা খুব বিপদজনক বিষয়। আম্বিয়ায়ে কেরামের শান তো অনেক উর্ধ্বে। অনেক

সময় তাঁদের ওয়ারিসগণের উপরেও আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে তোমাদের প্রকৃত অবস্থা তাঁদেরকে জানিয়ে দেন।

হযরত ডা. ছাহেব রহ. হযরত থানবী রহ.-এর এ ঘটনা শোনান যে, একবার হযরতের মজলিস হচ্ছিলো। হযরত ওয়ায করছিলেন। এক ব্যক্তি সে মজলিসেই দেওয়াল বা বালিশে হেলান দিয়ে অহঙ্কারের ভঙ্গিতে বসে থাকে। এভাবে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসা মজলিসের আদবের পরিপন্থী। মজলিসে যে ব্যক্তি আসতো, সে তো নিজের ইসলাহের উদ্দেশ্যেই আসতো। তাই কোনো ভুল কাজ করলে তা সংশোধন করে দেওয়া হযরতের দায়িত্ব ছিলো। সুতরাং হযরত থানবী রহ. লোকটিকে ধরলেন। বললেন, এভাবে বসা মজলিসের আদবের পরিপন্থী। আপনি আদবের সঙ্গে ভালোভাবে বসুন। লোকটি সোজা হয়ে না বসে সমস্যা দেখিয়ে বললো যে, হযরত আমার কোমরে কষ্ট আছে, এ কারণে এভাবে বসেছি। বাহ্যত সে বলতে চাচ্ছিলো আপনার এভাবে ধরা ঠিক না। আমার অবস্থা আপনি কী জানেন? আমার কষ্ট তো আপনার জানা নেই। তাই আমাকে এভাবে ধরা উচিত নয়।

হযরত ডা. ছাহেব রহ. নিজেই বলেন যে, আমি হযরত থানবী রহ.-কে দেখলাম, তিনি এক মুহূর্তের জন্যে মাথা ঝুঁকিয়ে চোখ বন্ধ করলেন। এরপর মাথা উঠিয়ে বললেন, আপনি মিথ্যা বলছেন। আপনার কোমরে কোনো কষ্ট নেই। আপনি মজলিস থেকে উঠে যান। এ কথা বলে ধমক দিয়ে তুলে দিলেন। বাহ্যত মনে হয় যে, তার কোমরে কষ্ট আছে না নাই, তাতো হযরত জানেন না। কিন্তু কতক সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোনো নেক বান্দাকে কোনো ঘটনা সম্পর্কে জানিয়ে দেন। এ কারণে আল্লাহ ওয়ালাদের নিকট মিথ্যা বলা বা তাঁদেরকে ধোঁকা দেওয়া খুবই বিপদজনক বিষয়। যদি ভুল হয়ে যায় আর মানুষ সেজন্যে লজ্জিত হয় এবং আল্লাহ তা'আলা সে জন্যে তাওবা করার তাওফীক দান করেন, তাহলে ইনশা আল্লাহ ঐ গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। যাই হোক, হযরত থানবী রহ. ঐ ব্যক্তিকে মজলিস থেকে উঠিয়ে দিলেন। পরবর্তীতে লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে অকপটে স্বীকার করে যে, বাস্তবে হযরতই সঠিক বলেছেন। আমার কোমরে কোনো কষ্ট ছিলো না। আমি মূলত আমার কথা ঠিক রাখার জন্যে ঐরূপ বলেছিলাম।

অন্যের মনে আনন্দদান

একটি বিরল ও বিস্ময়কর ঘটনা স্মরণ হলো। ঘটনাটি আমি আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ.- থেকে

শুনেছি। খুবই শিক্ষনীয় ঘটনা। ঘটনাটি হলো, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর দুজন স্ত্রী ছিলেন। হযরতের সঙ্গে উভয় স্ত্রীর খুব ভালো সম্পর্ক ছিলো। বড়োজন আগের যুগের মানুষ ছিলেন। তিনি হযরতকে খুব আরাম পৌছানের চিন্তা করতেন। ঈদ আসছিলো। বড়ো স্ত্রী মনে মনে চিন্তা করলেন, হযরতের জন্যে উন্নত মানের এবং ভালো কাপড়ের একটি আচকান (সেরোয়ানী) বানাবো। সে সময় 'চোখের নেশা' নামে একটি খুব সৌখিন কাপড় ছিলো। তিনি হযরতকে জিজ্ঞাসা না করে সেই কাপড় দিয়ে আচকান (সেরোয়ানী) বানাতে আরম্ভ করেন। হযরতকে এ কারণে বলেন নি যে, আচকান তৈরি করে হঠাৎ পেশ করলে অপত্যাশিতভাবে পাওয়ায় তিনি অধিক খুশি হবেন। পুরো রমাযান মাস তিনি এটা সেলাই করেন। সে যুগে মেশিনের রেওয়াজ ছিলো না, হাতে সেলাই করতে হতো। আচকান তৈরি হলে ঈদের রাতে তিনি হযরতের খেদমতে তা পেশ করে বললেন, আমি আপনার জন্যে এই আচকানটি তৈয়ার করেছি। আমার মনের বাসনা আপনি এটা পড়ে ঈদের নামায পড়াবেন। হযরতের রুচি-প্রকৃতির সাথে এই শখের আচকানের কোনোই সাযুজ্য ছিলো না। এটা ছিলো হযরতের মেজাযের একেবারে পরিপন্থী। হযরত বলেন, আমি যদি পরতে অস্বীকার করি, তাহলে তার মন ভেঙ্গে যাবে। তিনি তো পুরো রমাযান এটা সেলাই করার পিছনে মেহনত করেছেন। মহব্বত নিয়ে সেলাই করেছেন। এজন্যে তিনি তাকে খুশি করার জন্যে বললেন, মাশাআল্লাহ তুমি তো চমৎকার আচকান বানিয়েছো। তারপর তিনি সেটা পরিধান করে ঈদের নামায পড়ালেন। নামায শেষ হলে এক ব্যক্তি হযরতের কাছে এসে বললো, হযরত আপনি যেই আচকান পরেছেন, তা আপনার সাজে না। এটা খুব সৌখিন ধরনের আচকান হয়েছে। উত্তরে হযরত বললেন, হ্যাঁ ভাই তুমি ঠিক কথাই বলেছো। একথা বলে তিনি আচকানটি খুলে ঐ লোকটিকেই দিয়ে দিলেন। এটা তোমার জন্যে হাদিয়া। এটা তুমি পরিধান করো।

এরপর হযরত থানবী রহ. এ ঘটনা আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেবকে শোনান যে, যে সময় এই আচকান পরে ঈদগাহের দিকে যাচ্ছিলাম, তখন আমার মনে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিলো। কারণ সারাজীবন এ ধরনের সৌখিন পোশাক কখনও পরিনি। কিন্তু তখন অন্তরে এই নিয়ত ছিলো যে, যেই আল্লাহর বান্দী কষ্ট করে সেলাই করেছে, তার অন্তর খুশি হোক। হযরত স্ত্রীকে খুশি করার জন্যে নিজে এ কষ্ট সহ্য করেছেন এবং এটা পরার কারণে মানুষের তিরস্কারও সহ্য করেছেন।

সময়ের মূল্য ও হযরত থানভী রহ.

আমার শায়েখ হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ.- আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন- বলেন যে, আমি নিজে হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-কে দেখেছি, তিনি অন্তিম রোগে শয্যাশায়ী। চিকিৎসকগণ দেখা-সাক্ষাত নিষেধ করে দিয়েছে। বেশি কথা বলতেও নিষেধ করেছে। একদিন চোখ বুঁঝে বিছানায় শুয়ে ছিলেন। শোয়া অবস্থায় হঠাৎ চোখ খুললেন এবং বললেন, ভাই! মওলবী মুহাম্মাদ শফী ছাহেবকে ডাকো। তাঁকে ডাকা হলো। তিনি তাশরীফ আনলে বললেন, আপনি আহকামুল কুরআন লিখছেন। আমার এই মাত্র খেয়াল হলো, কুরআনে কারীমের অমুক আয়াত দ্বারা অমুক মাসআলা উদ্ভাবিত হয়। ইতিপূর্বে এ মাসআলা আমি কোথায়ও দেখিনি। আমি আপনাকে এজন্যে বললাম যে, এই আয়াতে যখন পৌছবেন তখন এ মাসআলাটিও লিখবেন। এ কথা বলে তিনি পুনরায় চোখ বন্ধ করলেন। একটু পরে আবার চোখ খুললেন। বললেন, অমুককে ডেকে আনো। তিনি এলে তার সাথে সম্পৃক্ত কিছু কাজের কথা বললেন। হযরতের খানকার নাজেম মাওলানা শাব্বীর আলী ছাহেবের হযরতের সঙ্গে অকৃত্রিম সম্পর্ক ছিলো। তিনি যখন দেখলেন যে, হযরত বারবার এরূপ করছেন, তখন তিনি হযরতকে বললেন, হযরত চিকিৎসকগণ কথা বলতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আপনি তো বিভিন্নজনকে ডেকে তাদের সঙ্গে বারবার কথা বলছেন। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি আমাদের উপর রহম করুন! তার উত্তরে হযরত এক বিস্ময়কর কথা বলেন। তিনি বলেন, কথা তো ঠিকই বলছো, কিন্তু আমি চিন্তা করছি যে, জীবনের সেই মুহূর্ত কোন কাজের, যা কারো খেদমতে ব্যয় হলো না? যদি কারো খেদমতে জীবন অতিবাহিত হয় তাহলে এটা আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত।

হযরত থানভীর চূড়ান্ত বিনয়

একবার হযরত থানবী রহ.-এর বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা খায়ের মুহাম্মাদ ছাহেব রহ. হযরত মুফতী মুহাম্মাদ হাসান ছাহেব রহ.-কে বললেন, আমি যখন হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর মজলিসে বসা থাকি, তখন আমার মনে হয় যে, যতো মানুষ মজলিসে বসা আছে সকলেই আমার থেকে শ্রেষ্ঠ। আমি সবার চেয়ে নিষ্কর্মা ও অপদার্থ। হযরত মুফতী মুহাম্মাদ হাসান ছাহেব রহ. শুনে বললেন, আমার অবস্থাও অনুরূপ। অতঃপর উভয়ে পরামর্শ করলেন, আমরা হযরত থানবী রহ.-এর

সামনে নিজেদের এ অবস্থার কথা উল্লেখ করি। জানা তো নেই, এ অবস্থা ভালো না মন্দ। সুতরাং তাঁরা উভয়ে হযরত থানবী রহ.-এর খেদমতে হাজির হয়ে নিজেদের অবস্থার বর্ণনা দিলেন। হযরত থানবী রহ. উত্তরে বললেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি সত্য করে বলছি, যখন আমি মজলিসে বসা থাকি তখন আমারও এ অবস্থাই হয় যে, এ মজলিসের সবচেয়ে অকর্মণ্য ও অপদার্থ আমিই। এরা সকলে আমার চেয়ে উত্তম।

এটা হলো বিনয়ের হাকীকত। বিনয়ের এই হাকীকত যখন প্রবল হয়, তখন মানুষ নিজেকে মানুষ তো মানুষ পশুর চেয়েও অধম মনে করতে আরম্ভ করে।

খেদমত ও সময় নিষ্ঠতার চমৎকার সমন্বয়

হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর ওস্তাদ ছিলেন। একবার তিনি থানাভবনে হযরতের বাড়িতে তাশরীফ আনেন। ওস্তাদের আগমনে হযরত থানবী রহ. এতো বেশি আনন্দিত হন এবং এতো বেশি তাঁর সম্মান করেন যে, একবেলায় দস্তরখানে বায়ান্ন প্রকারের খাবার পেশ করেন। খানা শেষ হলে তিনি ওস্তাদকে বলেন, হযরত আমি এ সময়টি 'বয়ানুল কুরআন' সংকলনের জন্যে নির্ধারণ করে রেখেছি। আপনি অনুমতি দিলে অল্প সময়ের জন্যে আমি আমার নিয়মিত আমল পুরা করতাম। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. বললেন, হ্যাঁ ভাই অবশ্যই যাও। হযরত থানবী রহ. বলেন, আমি লেখার কাজে বসলাম। কিন্তু তাতে মন বসছিলো না। কারণ, ওস্তাদ তাশরীফ এনেছেন, তাঁর কাছে বসে থাকতে মন চাচ্ছিলো। তাই অনিয়মিত হওয়ার বেবরকতি থেকে বাঁচার জন্যে দু-তিন লাইন লিখে হযরতের খেদমতে হাজির হই। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. বললেন, আরে ভাই তুমি তো অনেক তাড়াতাড়ি চলে এসেছো! হযরত থানবী রহ. বললেন, হযরত কাজে মন বসছিলো না, চিন্তা করলাম যাতে নাগা না হয় এবং নিয়মিত আমলটা পুরা হয়, এজন্যে দু-তিন লাইন লিখে চলে এসেছি। বড়োরা এমনই ছিলেন। তাঁরা এমন ছিলেন না যে, এজন্যে অসন্তুষ্ট হয়ে বলবেন, আমি তোমার কাছে এলাম আর তুমি কিতাব লিখতে যাচ্ছো, এ কেমন বেয়াদবি!

হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান উসমানী রহ.-এর ঘটনা

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. তাঁর যে সকল বুযুর্গের আলোচনা অধিক পরিমাণে করতেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান ছাহেব রহ.। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম ছিলেন। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলতেন, মাদরাসা পরিচালনার কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে তাঁর ইলম ও আমলের উঁচু মাকাম মানুষের সামনে প্রকাশ পায়নি। অন্যথায় ইলম ও আমল উভয় দিক থেকে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিস্ময়কর যোগ্যতা দান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-এর কিছু উক্তি তুলে ধরছি।

১. হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলতেন, হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান রহ. আরবী সাহিত্যের পরিচ্ছন্ন রুচির অধিকারী ছিলেন। তাঁর আরবী লেখা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সাহিত্যপূর্ণ হতো। বর্তমানে দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে শিক্ষা সমাপনকারীদেরকে যেই সনদ দেওয়া হয়, তার পুরোটা হযরতেরই রচনা। আমরা যখন হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ ছাহেব কাশ্মীরি রহ.-এর পৃষ্ঠপোষকতায় আরবী গদ্য ও পদ্যের চর্চার জন্যে 'নাদিয়াতুল আদব' প্রতিষ্ঠা করি, তখন হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান ছাহেব রহ. খুব আগ্রহের সঙ্গে তাতে অংশগ্রহণ করতেন।

২. হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.বলেন, আমাকে গ্রন্থ রচনা, সংকলন ও প্রবন্ধ লেখার দিকে মনোযোগী করার মধ্যে হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান ছাহেব রহ.-এর বিরাট ভূমিকা রয়েছে। মাওলানার অভ্যাস ছিলো যে, তিনি মাদরাসা পরিচালনার কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও ছাত্রদের প্রতি সবিশেষ নজর রাখতেন। যেই ছাত্রের মধ্যে কোনো বিষয়ে যোগ্যতা দেখতেন, উৎসাহিত করে তার সেই যোগ্যতাকে বিকষিত করার চেষ্টা করতেন।

আমি সবে মাত্র দারুল উলূমে পড়ছিলাম। তখন মাওলানার বিশেষ কৃপাদৃষ্টি আমার প্রতি নিবদ্ধ হয়। বারবার এমন হয় যে, আমি পরীক্ষার হলে বসে উত্তরপত্র লিখছি আর হযরত মাওলানা আমার কাছে তাশরীফ এনে আমার উত্তরপত্র দেখছেন। উত্তর দেখে কখনো তিনি এতো খুশি হতেন যে, অন্যান্য ওস্তাদদেরকে গিয়ে বলতেন।

একবার একটি পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। যার মধ্যে উম্মতের ইজমায়ী কোনো বিষয়ের বিপরীত মত প্রকাশ করা হয়। হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান ছাহেব রহ. অধমকে এর উত্তর লেখার নির্দেশ দেন। আমি হুকুম তামিল করি। এটা ছিলো আমার প্রথম প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি লিখে আমি হযরত

মুহতামিম ছাহেবকে দেখালে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন। তখনই আমাকে হযরত শাহ ছাহেব রহ. শাইখুল আদব হযরত মাওলানা এযায আলী ছাহেব রহ. এবং অন্যান্য ওস্তাদের নিকট নিয়ে যান এবং আমার লেখা প্রবন্ধ দেখান।

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলতেন, সেটা ছিলো আমার ছাত্র জামানা। আমি প্রথম প্রবন্ধ লিখেছিলাম। এজন্যে নিঃসন্দেহে অনেক ভুল ভ্রান্তি তাতে ছিলো। কিন্তু হযরত মাওলানা আমার সঙ্গে যেই আচরণ করলেন, তাতে আমার এমন সাহস বৃদ্ধি পেলো যে, লেখার প্রতি অসাধারণ আগ্রহ সৃষ্টি হলো। এরপর 'আল কাসেম' নামে দারুল উলূম দেওবন্দের যেই পত্রিকা হযরতের সম্পাদনায় বের হতো, আমি তাতে প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করি।

নিয়মতান্ত্রিক পড়াশোনা শেষ করার পর কিছুদিন আমার এ অবস্থা থাকে যে, লেখালেখি ও গ্রন্থ রচনার দিকে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ হয় না। ফলে সে সময় হযরত মাওলানা আমার প্রতি কিছুটা অভিযোগ ও অনুযোগ করেন। পরবর্তীতে যখন দু-তিনটা পুস্তিকা লিখে তাঁকে দেখাই, তখন তিনি আনন্দে উদ্বেলিত হন এবং বলেন, এ কাজেই তো আমি তোমাকে মশগুল দেখতে চাই।

৩. হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলতেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান ছাহেব রহ.-কে এমন অসাধারণ ব্যবস্থাপনাগত যোগ্যতা এবং রাজনৈতিক জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছিলেন যে, তিনি মূলত মন্ত্রী হওয়ার মতো যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। দারুল উলূম দেওবন্দের উপর কঠিন থেকে কঠিন সময় অতিবাহিত হয়। মারাত্মক ধরনের অস্থির ও অশান্ত অবস্থা সৃষ্টি হয়। কিন্তু আমি কখনোই আল্লাহর এই বান্দাকে হতাশাগ্রস্থ বা পেরেশান হতে দেখিনি। কঠিন থেকে কঠিন অবস্থাতেও তাঁর প্রশান্তি ও আত্মনির্ভরতায় কোনো ব্যতিক্রম চোখে পড়েনি।

তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে নীতির পরিপন্থী কখনোই কিছু বরদাশত করেননি। সুব্যবস্থাপনা ও সুকৌশলে মাদরাসাকে বড়ো বড়ো ফেৎনা থেকে হেফাজত করার পুরোপুরি চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে একটি ঘটনা স্মরণ হলো। ঘটনাটি এই–

৪. হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান ছাহেব রহ.-কে আল্লাহ তা'আলা অসাধারণ ধৈর্য্য ও সহ্যের গুণ দান করেছিলেন। দারুল উলূম দেওবন্দ সংলগ্ন দেওবন্দের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির জমি ছিলো। তার এক ষষ্ঠমাংশ জায়গা দারুল উলূমের জন্যে ক্রয় করা হয়। সেই লোকের ইন্তিকালের পর তার একজন ওয়ারিশ একদিন দারুল উলূমের আঙিনায় এসে এই জমির হকদার হওয়ার দাবি করে এবং হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান ছাহেবকে সম্বোধন করে উঁচু আওয়াজে অনেক গালমন্দ করতে আরম্ভ করে। তার কথার ধরন এতোই

উত্তেজনাকর ছিলো যে, মাওলানার কিছু খাদেমেরও স্বভাবতই উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তারাও তাকে তারই মতো ভাষায় জবাব দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু মাওলানা তাদেরকে বাধা দেন এবং ঐ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেন। শেখ সাহেব! আপনি অহেতুক অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আপনি একটু ভিতরে আসুন। শান্তভাবে কথা বলুন। কিন্তু সে পূর্বের ন্যায় রাগ ঝারছিলো। মাওলানা কিছুক্ষণ পরে বললেন, একটু ভিতরে চলুন না, সেখানে বসে কথা হবে। এরপর জোর করে তাকে দফতরে নিয়ে গেলেন। আদর আপ্যায়ন করলেন। এরপর লোকটি একটু প্রশমিত হলে মাওলানা শান্তভাবে নিজের জায়গা থেকে উঠলেন। একটি আলমারি খুললেন। সেখান থেকে কিছু কাগজ বের করলেন। কাগজটি ঐ ব্যক্তির সামনে খুলে ধরলেন। বললেন, এই দেখুন! এ জমি আপনার পূর্ব-পুরুষ অমুক তারিখে দারুল উলূমের হাতে বিক্রি করে দিয়েছে এবং তা রেজিস্ট্রিও হয়েছে। লোকটি কাগজপত্র দেখে অত্যন্ত লজ্জিত হলো এবং মাওলানা যেই পরিমাণ ধৈর্য্য-সহ্যের পরিচয় দিয়েছেন, সে কারণে সীমাহীন প্রভাবিত হয়ে চলে গেলো।

৫. হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলেন যে, মাওলানা হাবীবুর রহমান ছাহেবের জামানায় দারুল উলূমের কাজ অনেক বিস্তৃত হয়। অনেকগুলো শাখা খোলা হয়। শত শত ছাত্র ছাত্রাবাসে অবস্থান করতো। এ কারণে মাওলানা রাতদিন ব্যবস্থাপনামূলক কাজে ব্যস্ত থাকতেন। এতদসত্ত্বেও তার নফল নামায, তিলাওয়াত ইত্যাদি ছাড়া প্রতিদিন সোয়া লক্ষ বার আল্লাহ তা'আলার নামের যিকিরের নিয়মিত আমল কখনো কাযা হয়নি।

৬. একবার দারুল উলূমের পরিচালনার বিরুদ্ধে এক তীব্র ঝড় বয়ে যায়। তাতে কিছু লোক হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান ছাহেবের জানের দুশমনে পরিণত হয়। এমতাবস্থায়ও তিনি খোলা ছাদে একা ঘুমাতেন।

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব বলেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হযরত! এমতাবস্থায় আপনার এভাবে ঘুমানো সমীচীন মনে হয় না। আপনি কমপক্ষে কামরার ভিতরে গিয়ে ঘুমাবেন। কিন্তু মাওলানা বেশ অমুখাপেক্ষিতার ভাব নিয়ে হেসে বললেন,

'আরে মিয়াঁ আমি তো সেই পিতার সন্তান (অর্থাৎ, সাইয়্যিদুনা হযরত ওসমান গণী রাযি.), যাঁর জানাযা উঠানোর জন্যে চারজন ব্যক্তিও পাওয়া যায়নি। যাঁকে রাতের অন্ধকারে বাকী কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। তাই আমার মৃত্যুর কি পরোয়া হতে পারে।'[১৮৮]

---

১৮৮. আকাবেরে দেওবন্ধ কিয়াথে, পৃষ্ঠা: ৬৮-৭১ থেকে সংগৃহীত

আল্লামা সাইয়্যেদ আনোয়ার শাহ ছাহেব কাশ্মীরী রহ.-এর ঘটনাবলী

ইমামুল আসর হযরত আল্লামা সাইয়্যেদ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ. হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-এর সে সকল ওস্তাদগণের অন্যতম ছিলেন, তাঁর ইলমী তারবিয়াত এবং গবেষণা-রুচির বৃক্ষে পানি সিঞ্চনে সম্ভবত সর্বাধিক যাঁর ভূমিকা রয়েছে। ওয়ালেদ ছাহেব রহ. হযরত শাহ ছাহেব রহ.-এর নিকট সহীহ বুখারী এবং জামে তিরমিযী ছাড়া আধুনিক দর্শন ও চিকিৎসা ইত্যাদি শাস্ত্রের কিতাবাদীও পড়েছিলেন। পাঠদান কালেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাঁর থেকে জ্ঞান আহরণের ধারা অব্যাহত থাকে। হযরত শাহ ছাহেব রহ.-এর নাম এলেই হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-এর মুখ-মণ্ডলে এক বিস্ময়কর আলো প্রকাশিত হতো। অত্যন্ত ভক্তির সঙ্গে তাঁর আলোচনা করতেন। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব থেকে শোনা হযরত শাহ ছাহেব রহ.-এর কিছু ঘটনা এখন স্মরণ হলো।

মানতেকের 'মোল্লা হাসান'-ও স্মৃতিতে পুরোপুরি সংরক্ষিত ছিল!

হযরত শাহ ছাহেব রহ.-কে আল্লাহ তা'আলা যেই অসাধারণ স্মরণশক্তি এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দান করেছিলেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.বলেন, একবার দারুল উলূম দেওবন্দে মানতেকের বিখ্যাত কিতাব মোল্লা হাসানের পাঠদানের দায়িত্ব আমার ছিলো। কিতাব অধ্যয়ন কালে এক জায়গায় আমার একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। যে কোনো ধরনের ইলমী প্রশ্ন দেখা দিলে হযরত শাহ ছাহেবই ছিলো আমাদের আশ্রয়স্থল। সুতরাং আমি তাঁর কাছে গেলাম। হযরত শাহ ছাহেব রহ. তখন লাইব্রেরীর গেলারিতে বসে মুতালাআয় মশগুল ছিলেন। আমাকে আসতে দেখে উপর থেকে সালামের পর জিজ্ঞাসা করলেন কী উদ্দেশ্যে এসেছো?

আমি বললাম, মোল্লা হাসানের এক জায়গায় একটি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, তা সমাধান করার জন্যে এসেছি। ভেবে ছিলাম, উত্তর দেওয়ার জন্যে হযরত শাহ ছাহেব আমাকে উপরে ডেকে নিবেন। কিন্তু হযরত উপরে ডেকে না নিয়ে সেখানে বসেই জিজ্ঞাসা করলেন, কোন জায়গায়? ইবারত পড়ুন। আমি

ইবারত পড়লাম। আমি প্রশ্ন তুলে ধরার আগেই হযরত শাহ ছাহেব বললেন, তোমার হয়তো এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এরপর নিজেই প্রশ্ন তুলে ধরলেন। এবং সেখানে বসে বসেই এমনভাবে তার উত্তর দিলেন যে, বিষয়টি আমার একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেলো।

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বিস্ময়কর এ ঘটনাটি শুনিয়ে বলতেন যে, যদি তাফসীর, হাদীস বা ফিক্‌হের কোনো কিতাব হতো, তাহলে আমার এতো বিস্ময় জাগতো না। বিস্ময় এ জন্যে জেগেছে যে, মানতেকের এমন একটি কিতাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছি, যা পড়া ও পড়ানোর পর হযরত শাহ ছাহেবের নিশ্চিতভাবে বহু বছর অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু এই প্রশ্নোত্তর দ্বারা অনুমিত হয় যে, এ কিতাবটিও তাঁর স্মৃতিতে পুরোপুরি সংরক্ষিত রয়েছে।

ফতহুল কাদীরের ইবারত

একদিন সহীহ বোখারী শরীফের দরসে একটি বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে হযরত শাহ ছাহেব রহ. ফাতহুল কাদীরের দীর্ঘ এক ইবারত এমনভাবে মুখস্থ পাঠ করেন, যেমন কিনা তিনি দেখে পাঠ করছেন। ইবারত পাঠ শেষ হলে ছাত্ররা হযরতের দিকে বিস্ময়ের সাথে তাকিয়ে ছিলো। ছাত্রদেরকে বিস্মিত দেখে হযরত শাহ ছাহেব বললেন,

মূর্খের দল! তোমরা কি মনে করেছো এই ইবারত আমি রাতে মুতালাআ করে এসেছি? ঘটনা হলো, আজ থেকে কয়েক বছর পূর্বে (সম্ভবত) টুংকের কুতাবখানায় ফাতহুল কাদীর আদ্যপান্ত মুতালাআ করেছি। এই ইবারত তখন থেকে স্মরণ আছে।

কিতাব অধ্যয়নও যে একটি রোগ, এ রোগের আমি কী করব?

একবার হযরত শাহ ছাহেব রহ. কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকেন। একদিন ফজরের সময় এ কথা ছড়িয়ে পড়ে যে, হযরতের ইন্তিকাল হয়েছে। ছাত্রদের উপর যেন বজ্রপাত হলো। ফজর নামাযের পর সাথে সাথে আমরা হযরতের বাড়ির দিকে দৌড়ে গেলাম। হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী ছাহেব রহ.-ও সঙ্গে ছিলেন। বাড়িতে গিয়ে জানতে পারলাম, সংবাদটি ভুল। আলহামদু লিল্লাহ। তবে রোগযাতনার তীব্রতা পূর্ববৎ রয়েছে। আমরা সকলে হযরতকে দেখার জন্যে কামরার ভিতর গিয়ে দেখি হযরত নামাযের চৌকির উপর বসা আছেন। সামনে বালিসের উপর

একটি কিতাব রাখা আছে। অন্ধকারের কারণে হযরত ঝুঁকে তা অধ্যয়ন করছেন। আমরা খাদেমরা এই দৃশ্য দেখে বিস্মিত হওয়ার সাথে সাথে আশঙ্কাও অনুভব করি যে, এমন মারাত্মক রোগ অবস্থায় মুতালাআর জন্যে এই পরিমাণ কষ্ট করা রোগ বৃদ্ধির কারণ হতে পারে! সুতরাং আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. হিম্মত করে অভিমানের সুরে বললেন, হযরত! এ বিষয়টি বুঝে আসছে না যে, এমন কোন বিষয়বস্তু রয়েছে, যা হযরতের অধ্যয়ন করা হয়নি? আর যদি এমন কোনো বিষয় থেকেও থাকে তার এমন কি তাৎক্ষণিক প্রয়োজন দেখা দিলো যে, তা কিছুদিন পরে অধ্যয়ন করা যাবে না? আর যদি তাৎক্ষণিক প্রয়োজনই দেখা দিয়ে থাকে তো আমরা তো আর মরে যাইনি। আপনি যে কাউকে হুকুম করলে, বিষয়টি দেখে বলে দিতো। কিন্তু এই অন্ধকারে এমন সময় যেই কষ্ট আপনি করছেন, তা আমরা আপনার যারা খাদেম আছি, আমাদের জন্যে অসহনীয়। ওয়ালেদ ছাহেব বলেন, এ কথার উত্তরে হযরত শাহ ছাহেব রহ. কিছু সময় পর্যন্ত তো একান্ত সরলভাবে অসহায় আঙ্গিকে মাওলানা শাব্বীর আহমাদ ছাহেবের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, ভাই ঠিক বলছো। কিন্তু এই কিতাবও তো একটি রোগ। এই রোগের কী করবো!

ছাদ ভেঙ্গেছে, তো আমি কী করব?

হযরত শাহ ছাহেব রহ. দিন-রাত কিতাব অধ্যয়ন ও ইলমী কাজ কর্মে এতো বেশি নিমজ্জিত থাকতেন যে, দুনিয়া তাকে স্পর্শ করেও দেখেনি। দুনিয়ার ঝামেলায় জড়ানো হযরত শাহ ছাহেবের সাধ্যের বাইরে ছিলো। দারুল উলূমের পরিচালকগণ ও ছাত্রদের যেহেতু এ বিষয় জানা ছিলো, এ জন্যে তারা হযরতের বাড়ি ঘরের কাজকর্ম নিজেরাই করে দেওয়ার চেষ্টা করতেন।

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলেন, একদিন হযরত শাহ ছাহেব রহ. মসজিদে বসা ছিলেন। এমন সময় একব্যক্তি এসে জানালো যে, হযরত আপনার কামরার ছাদ ভেঙ্গে পড়েছে। সংবাদদাতা এমন আঙ্গিকে সংবাদ দিয়েছিলো যে, সংবাদ শুনতেই হযরত লাফিয়ে উঠবেন। কিন্তু হযরত শান্তভাবে বসে থাকলেন এবং নিতান্ত সরলভাবে বললেন,

তো ভাই! আমি কি করবো? তুমি গিয়ে মাওলানা হাবীব ছাহেব (মুহতামিম দারুল উলুম)-কে বলো।

হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান ছাহেবকে জানানো হলো। তিনি ঘর মেরামতের কাজ করে দিলেন।

কারও গীবত হতে দিতেন না

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. অনেকবার বলেছেন যে, হযরত শাহ ছাহেব রহ. তাঁর মজলিসে কারো গীবত করা কোনো অবস্থাতেই মেনে নিতেন না। যখনই কেউ অন্য কারো আলোচনা আরম্ভ করতো এবং গীবতের কাছাকাছি পৌছতো, তখন হযরত রহ. হাত উঠিয়ে বলতেন, ব্যস এর প্রয়োজন নেই। এভাবে গীবতের ফেৎনা সেখানেই দাফন হতো।

বালাগাত ও অলঙ্কারশাস্ত্রেও ছিল তাঁর সর্বোচ্চ দক্ষতা

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. অনেক সময় বলতেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত শাহ ছাহেব রহ.-কে প্রত্যেক শাস্ত্রের উচ্চতর যোগ্যতা দান করেছিলেন। হযরত বলতেন, আমি চাইলে আল্লাহ তা'আলার অপার অনুগ্রহে হারীরির মতো সাহিত্যিকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহজেই করতে পারি। এবং যামাখশারী ও জুরজানীর থেকে উন্নত গদ্য রচনা করতে পারি। কিন্তু দুটি কিতাব এমন রয়েছে, যার অনুকরণ করাও আমার জন্যে কঠিন। একটি হিদায়া আরেকটি গুলিস্তাঁ।

হযরত শাহ ছাহেব রহ. বলতেন, দুই ল্যাংড়া বুযুর্গ (যামাখশারী ও জুরজানী) ইলমে বালাগাতের ঠিকা নিয়ে রেখেছে। অথচ বালাগাত শাস্ত্রের এমন অনেক অধ্যায় রয়েছে, যেগুলোর দিকে তাদের দৃষ্টি যায়নি।

দুনিয়া-আখেরাত উভয় হারালে!

হযরত শাহ ছাহেব রহ. তাঁর দরসে শুধু ইলমী তাহকীক বর্ণনা করার উপর ক্ষান্ত করতেন না, বরং সাথে সাথে ছাত্রদেরকে আমল আখলাকের ইসলাহের দিকেও মনোযোগী করতেন। একদিন তিনি ছাত্রদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

> আমাদের এই ইলমের মধ্যে তো দুনিয়া কখনোই ছিলো না। হ্যাঁ, এর মাধ্যমে দ্বীন পাওয়া যেতো। আফসোস! তোমরা তাও নিলে না। দুনিয়া আখেরাত উভয়টি হারালে।

তাফসীরে কাবীরের মূল্যায়ন

হযরত শাহ ছাহেব রহ. ইমাম রাজী রহ.-এর তাফসীরে কাবীর সম্পর্কে বলতেন যে, এটা কুরআনের শব্দের বিশ্লেষণে উৎকৃষ্টতম তাফসীর। এতে

সন্দেহ নেই যে, ইমাম রাজী রহ.-এর উপর মাকুলাতের প্রাবল্য ছিলো। এ কারণে তাফসীরে কাবীর সম্পর্কে কেউ কেউ এ কথা বলেদিয়েছেন যে,

فِيْهِ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا التَّفْسِيْرَ

এর মধ্যে তাফসীর ছাড়া সবই রয়েছে।

কিন্তু বাস্তবতা এই যে, ইনসাফের সাথে তাঁর তাফসীর অধ্যয়ন করলে প্রতীয়মান হবে যে, তিনি কুরআনের শব্দ ও বাক্যের বিষয়ে অসাধারণ চিন্তা গবেষণা করেছেন। এগুলোর তাহকীকের ক্ষেত্রে খুব মেহনত করেছেন। কতক বিষয়ে তাঁর সঙ্গে দ্বিমত থাকা ভিন্ন কথা, তবে মোটের উপর তাফসীর হিসেবেও তাঁর তাফসীর অনেক চমৎকার। তাছাড়া তিনি এমন অনেক সহীহ হাদীস তাঁর তাফসীরে এনেছেন, যেগুলো হাদীসের সহজলব্ধ কিতাবগুলোতে পাওয়া যায় না। এর দ্বারা জানা যায় যে, হাদীসশাস্ত্রেও তাঁর দৃষ্টি অনেক বিস্তৃত।

চারও মাযহাব হক হওয়া সম্পর্কে একটি বাণী

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. হযরত শাহ ছাহেব রহ.-এর এই উক্তি বর্ণনা করেন যে, হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী এই চার মাযহাবই সঠিক হওয়ার অর্থ এই যে, এগুলোর প্রত্যেকটির ইজতিহাদ আল্লাহর কাছে সওয়াবের কারণ এবং মুকাল্লিদদের জন্যে এর তাকলীদ করা জায়েয। তবে প্রকৃত বাস্তবতা হলো, সত্য একটিই। তবে সেটি কোনটি, তা নির্ধারণ করার কোনো পথ নেই। দুনিয়াতে তো এর কারণ স্পষ্ট যে, নবুওয়াতের ধারা শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে আখেরাতে এর হাকীকত খুলে দেওয়ার সম্ভাবনা ছিলো, কিন্তু (হযরত শাহ ছাহেব বলেন) আমার মতে আল্লাহ তা'আলা সেখানেও এই হাকীকত উন্মোচন করবেন না। কারণ, যেসকল ফকীহ ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতের সাথে ইজতিহাদ করে দ্বীনের খেদমত করেছেন, তাঁদের কাউকে ভুল সাব্যস্ত করে আল্লাহ তা'আলা হাশরের ময়দানে তাঁকে অপমানিত করা, তাঁর রহমতের জন্যে অস্বাভাবিক মনে হয়। এ জন্যে বাস্তবে যেটা সঠিক বাহ্যত আখেরাতেও তা নির্ধারণ করবেন না।

কাদিয়ানী মতবাদের খণ্ডন ও মুকাবিলায় হযরত কাশ্মীরী রহ.

শেষজীবনে হযরত শাহ ছাহেব রহ.-কে আল্লাহ তা'আলা যেন কাদিয়ানী মতবাদকে খণ্ডন করার জন্যেই বাছাই করে নিয়েছিলেন। অগ্রসরমান কাদিয়ানী ফেৎনার চিন্তা সব সময় তাঁর দিল দেমাগকে আচ্ছন্ন করে রাখতো। এই ফেৎনাকে নিষ্পেষিত করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা হযরত শাহ ছাহেব

দ্বারা অনেক কাজ নিয়েছেন। এ কাজের জন্যে হযরত শাহ ছাহেব রহ. তাঁর ছাত্রদেরকে নিজের সঙ্গে কাজে লাগিয়েছিলেন। তাঁরা বক্তব্য ও গ্রন্থ রচনা করার মাধ্যমে সারা দেশে কাদিয়ানী মতবাদকে খণ্ডন করার খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছিলেন। এই দলের মধ্যে হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. হযরত মাওলানা বদরে আলম ছাহেব মুহাজিরে মাদানী রহ. হযরত মাওলানা ইদ্রিস কান্ধালভী রহ. প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত শাহ ছাহেব রহ. এবং তাঁর এ সকল ছাত্র এ বিষয়ে কি কি অবদান রেখেছেন, তার বিস্তারিত আলোচনা আল বালাগ বিশেষ সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় ভাই জনাব মাওলানা ইউসুফ ছাহেব লুধিয়ানবী রহ.-এর প্রবন্ধে আপনারা পাবেন। এখানে এতদসংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

শাহ ছাহেব দুশ্চিন্তা

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. অনেকবার শুনিয়েছেন যে, হযরত শাহ ছাহেব রহ.-এর প্রচেষ্টায় প্রতি বছর কাদিয়ানে মুসলমানদের একটি সমাবেশ হতো। একবার আমরা হযরত শাহ ছাহেবের সঙ্গে এ সমাবেশে অংশগ্রহণের জন্যে গিয়েছিলাম। একদিন সেখানেই ফজরের নামাযের পর হযরতকে পেরেশান অবস্থায় বসে থাকতে দেখলাম। অধম কুশল জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, শরীর-স্বাস্থ্য তো ভালো আছো, কিন্তু আজকাল সবসময় মন-মস্তিষ্কে এই চিন্তা আচ্ছন্ন হয়ে আছে যে, আমরা আমাদের দরস, লেখনি এবং বক্তব্যে হানাফী মাযহাবকে প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে জোর দিয়ে এসেছি। আর ওদিকে কাদিয়ানী মতবাদ, ধর্মহীনতা ও বদদ্বীনীর এসব ফেৎনা কতোদূর পৌছে গিয়েছে! অথচ হানাফী ও শাফেয়ী-এর মতবিরোধ তো বেশির চেয়ে বেশি কোনটি অধিক প্রাধান্য পাওয়ারযোগ্য সে বিষয়ে, যে বিষয়ে হাশরেও ফয়সালা হবে না। অথচ এসব ফেৎনার কারণে দ্বীন ও ঈমানরে উপরে চরম আঘাত লাগছে। একারণে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে বসে আছি।

ভাওয়ালপুরের মোকদ্দমা ও হযরত শাহ ছাহেবের কারামত

ভাওয়ালপুরের মোকদ্দমা ছিলো সর্বপ্রথম মোকদ্দমা, যেখানে কাদিয়ানিদেরকে আদালতের পর্যায়ে অমুসলিম সাব্যস্ত করা হয়। এই মোকদ্দমার ফয়সালা নিজেদের পক্ষে করানোর জন্যে কাদিয়ানীরা তাদের সব শক্তি ব্যয় করে। হযরত শাহ ছাহেব রহ. যখন জানতে পারলেন যে, এমন একটি মোকদ্দমার শুনানি চলছে, তখন তিনি নিজে সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা

করেন। এতদউদ্দেশ্যে তিনি যেসব সঙ্গী নির্বাচন করেন, তাঁদের মধ্যে হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-ও ছিলেন। ঘটনাচক্রে সে সময় হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. তাঁর সম্মানিত পিতা (হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াসীন ছাহেব)-এর অসুস্থতার কারণে মানসিকভাবে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন এবং দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিলেন। কিন্তু হযরত শাহ ছাহেব রহ. যখন ভাওয়ালপুর যেতে বললেন, তখন তিনি প্রস্তুত হয়ে গেলেন। ভাওয়ালপুরে অবস্থানকালেই অকস্মাৎ ওয়ালেদ ছাহেবের নিকট দেওবন্দ থেকে টেলিগ্রাম আসে যে, তাঁর পিতার স্বাস্থ্য বেশি খারাপ হয়েছে। দ্রুত ফিরে আসা হোক।

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. টেলিগ্রামটি হযরত শাহ ছাহেব রহ.-এর নিকট নিয়ে গেলেন। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলতেন, সে সময় আমি চরম দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলাম। একদিকে ওয়ালেদ ছাহেবের অসুস্থতার কারণে চরম পেরেশানী ছিলো এবং টেলিগ্রামের দাবি ছিলো যে, একমুহূর্ত বিলম্ব না করে ফিরে যাই।

অপরদিকে এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজে হযরত শাহ ছাহেব রহ.-এর সাহচর্যের যেই সোভাগ্য আল্লাহ তা'আলা দান করেছিলেন, তা ত্যাগ করতে মনে কষ্ট হচ্ছিলো। মনে করেছিলাম, হযরত শাহ ছাহেব টেলিগ্রাম দেখে যাওয়ার অনুমতি দিবেন। কারণ, আমাদের বড়োরা সাধারণত এসব বিষয়ের প্রতি খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কিন্তু ঐদিন হযরত শাহ ছাহেবের কারামত প্রকাশিত হলো। তিনি টেলিগ্রাম শোনার পর খুব আস্থার সাথে বললেন,

> 'আপনার ওয়ালেদ ছাহেবের জন্যে দু'আ করবো। ইনশা আল্লাহ তিনি সুস্থ হয়ে যাবেন। আপনি নিশ্চিন্তভাবে এখানে কাজ করুন।'

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলেন, হযরত শাহ ছাহেব রহ.-এর মুখে এ কথা শুনে আমার অন্তরে এক ধরনের প্রশান্তির ভাব সৃষ্টি হলো। সব ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ও পেরেশানী কর্পূরের মতো উড়ে গেলো। এরপর হযরত শাহ ছাহেব রহ. নিজে ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-এর নামে এই বিষয়ে টেলিগ্রাম করলেন যে,

> 'মওলবী মুহাম্মাদ শফীকে এখানে প্রয়োজন। আমি তাকে আটকে রেখেছি। আমরা সকলে আপনার সুস্থতার জন্যে দু'আ করছি।'

এরপর আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে ওয়ালেদ ছাহেব সুস্থ হয়ে ওঠেন।

ভাওয়ালপুরের সেই আদালতে জ্ঞানের সাগর বইয়ে দিলেন!

ভাওয়ালপুরের এই মোকদ্দমাতেই হযরত শাহ ছাহেব রহ. তাঁর বক্তব্যে ইলম ও মারেফতের সাগর প্রবাহিত করেন। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলতেন যে, সেই বক্তব্য কালে উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীর উপর নিরবতা তো আচ্ছন্ন করেছিলোই, জজ ছাহেবের অবস্থাও এমন ছিলো যে, তিনি বিস্ময়ের ঘোরে হযরত শাহ ছাহেব রহ.-এর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আদালতের পক্ষ থেকে এ বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বশীল লোকেরা কিছু সময় পর্যন্ত তো হযরতকে সঙ্গ দেয়, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই হযরত শাহ ছাহেব রহ. তাঁর আসল রঙে আবির্ভূত হলে তারাও কলম রেখে দিয়ে তাঁর মুখ-মণ্ডলের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। বক্তব্য শেষে জজ ছাহেব বলেন যে, বক্তব্য যেহেতু লিপিবদ্ধ করা যায়নি, তাই আগামী কাল এ বক্তব্য লিখিত আকারে তুলে ধরা হোক। আদালত থেকে অবস্থানস্থলে ফেরার পর হযরত শাহ ছাহেব রহ., হযরত মাওলানা মুরতাযা হাসান ছাহেব রহ. ও অন্যান্য বুযুর্গের সামনে এ বিষয় আসে যে, হযরত শাহ ছাহেব রহ.-এর পক্ষ থেকে এ বক্তব্য কে লিপিবদ্ধ করবে? অবশেষে এ সৌভাগ্য হযরত ওয়ালেদ ছাহেবের নামে আসে। হযরত শাহ ছাহেব রহ. নিজে তাঁকে নির্দেশ দেন যে, বক্তব্যটি আপনি লিপিবদ্ধ করুন। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. নিবেদন করেন,

> 'হযরত আপনার পক্ষ থেকে আপনার মর্যাদার উপযোগী বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার সাধ্য তো আমার নেই, তবে প্রয়োজন পূরণের স্বার্থে আপনার নির্দেশ পালন করবো।'

হযরত বললেন, আমি দু'আ করবো, আপনি আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করুন।

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলেন, দিনে তো লেখার সুযোগ হয়নি, রাতের বেলা আমি আমার কামরায় লিখতে বসি। সারারাত বক্তব্য লিখতে থাকি। যখন ফজরের আযান হচ্ছিলো, তখন আমি শেষ লাইনগুলো লিখছিলাম। ঠিক সে মুহূর্তেই সামনের দিক থেকে হযরত শাহ ছাহেবের কক্ষের দরজা উন্মুক্ত হয়। হযরত ভিতরে তাশরীফ আনেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, কাজ কতোদূর হয়েছে? অধম নিবেদন করি, আলহামদু লিল্লাহ! এই মাত্র কাজ পূর্ণ হলো। হযরত যখন বক্তব্যটি দেখলেন এবং এ কথাও জানতে পারলেন যে, এর জন্যে সারারাত জেগেছি, তখন হযরত অন্তরের অন্তস্থল

থেকে এতো অধিক পরিমাণে দু'আ করলেন যে, তার মধুরতা আজও অনুভূত হয়। এই দু'আগুলোই আমার সবচেয়ে বড়ো পুঁজি।

ব্যাংকের সুদপ্রশ্নে জনৈক সাংবাদিককে উচিত জবাব

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. অনেকবার এ ঘটনা শুনিয়েছেন যে, (সম্ভবত কাদিয়ানী ফেৎনার সূত্রেই) হযরত শাহ ছাহেব রহ. লাহোর তাশরীফ আনেন। হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ.-ও সঙ্গে ছিলেন। আমিও সাথে ছিলাম। সে সময় মেহের ও সালেক (মরহুম)-কে পাঞ্জাবের বিখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট মনে করা হতো। তারা হযরত শাহ ছাহেব এবং আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ.-এর আগমন উপলক্ষে পত্রিকায় এই শিরোনাম দেন যে, 'লাহোরে ইলম ও ইরফানের বৃষ্টি।' পরবর্তীতে তারা সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে আসেন।

কথাবার্তার মাঝে সুদের আলোচনা আরম্ভ হয়। মাওলানা সালেক মরহুম হযরত আল্লামা উসমানী রহ.-কে প্রশ্ন করেন যে, বর্তমান যুগের ব্যাংকের ইন্টারেস্টকে সুদ সাব্যস্ত করার কারণ কী?

আল্লামা উসমানী রহ. তাকে উত্তর দেন। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করেন। এভাবে প্রশ্নোত্তরের ধারা কিছুটা দীর্ঘ হয়। আল্লামা উসমানী রহ. প্রত্যেকবার বিস্তারিত উত্তর দেন। কিন্তু তিনি পুনরায় কোনো প্রশ্ন করেন। তিনি তার আলোচনায় সেসকল লোকের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, যারা বলে থাকে যে, ব্যাংকের সুদকে ওলামায়ে কেরাম জায়েয সাব্যস্ত করলে মুসলমানদের জন্যে হয়তো উপকারী হবে।

হযরত শাহ ছাহেব রহ. মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন। তীব্র প্রয়োজন ছাড়া তিনি কথা বলতেন না। নিজের ইলমও জাহির করতেন না। এ কারণে আল্লামা উসমানী রহ.-এর আলোচনাকে যথেষ্ট মনে করে নীরব বসে ছিলেন। কিন্তু আলোচনা যখন দীর্ঘ হতে থাকলো, তখন হযরত আলোচনার মধ্যে অংশগ্রহণ করলেন এবং অকৃত্রিমভাবে বললেন,

দেখ ভাই সালেক! তুমি হলে সালেক (আল্লাহর পথের যাত্রী), আর আমি হলাম মাজযুব (আল্লাহর প্রেমের পাগল)। আমার কথায় কষ্ট নিয়ো না। আসল কথা হলো, আল্লাহ তা'আলার বানানো জাহান্নাম অনেক বিস্তৃত। কারো যদি সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা হয়, তাহলে সেখানে তো জায়গার অভাব নেই। আমরা তাকে বাধা দেওয়ার কে? তবে কেউ যদি আমাদের ঘাড়ের উপর পা রেখে জাহান্নামে যেতে চায়, তাহলে আমরা তার পা ধরে বসবো।

পরিশ্রম করি আমি, সাওয়াব নিয়ে যায় এ

কাদিয়ানী মতবাদ সম্পর্কে হযরত শাহ ছাহেব রহ.-এর নির্দেশে হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. আরবী ও উর্দূতে বেশ কয়েকটি কিতাব লেখেন। যেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আশরাফ খান ছাহেব এবং মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানবী ছাহেবের প্রবন্ধসমূহে দেখা যেতে পারে। সেগুলোর মধ্য থেকে একটি আরবী সংকলন হলো اَلتَّصْرِيْحُ بِمَا تَوَاتَرَ فِيْ نُزُوْلِ الْمَسِيْحِ। এই কিতাব সংকলনের ঘটনা এই যে, হযরত শাহ ছাহেব রহ. সেসব مُتَوَاتِرُ الْمَعْنٰى হাদীসের একটি সংকলন তৈয়ার করতে চাচ্ছিলেন, যেগুলোর দ্বারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আসমান থেকে নাযেল হওয়ার আকীদা প্রমাণিত হয়। এতদউদ্দেশ্যে হযরত শাহ ছাহেব রহ. প্রাথমিক উপাদানসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তার নোট নিজের কাছে সংরক্ষণ করেন। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে সেগুলোকে বিন্যস্ত করে কিতাবের রূপ দেওয়ার সুযোগ হয়নি। পরিশেষে তিনি এসব নোট হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-কে দেন। এবং নির্দেশ দেন যে, এগুলোর ভিত্তিতে আরবী ভাষায় একটি কিতাব রচনা করো। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. অত্যন্ত আন্তরিকতা ও মেহনতের সাথে এই হুকুম তামিল করেন এবং রাতদিন কাজে লাগিয়ে কয়েকদিনের মধ্যে এই কিতাব তৈরি করেন।

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলতেন যে, এই কিতাব সংকলনকালে কুতুবখানা থেকে কিতাবের স্তূপ উঠিয়ে উঠিয়ে যখন নিজের জায়গায় আনতাম এবং হযরত শাহ ছাহেবের কামরার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতাম, তখন হযরত অনেক আনন্দিত হতেন। পরিশেষে যখন কিতাব সংকলন সম্পন্ন করে তার পাণ্ডুলিপি হযরতের খেদমতে নিয়ে গেলাম, তখন তিনি খুব দু'আ দিলেন এবং উপস্থিত লোকদেরকে উদ্দেশ্যে করে বললেন,

'দেখ ভাই! পরিশ্রম তো করি আমি, আর সওয়াব নিয়ে যায় এ।'

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলতেন, হযরত শাহ ছাহেব রহ.-এর মাতৃভাষা যদিও উর্দূ ছিলো না, কিন্তু উর্দূ ভাষার পরিভাষাসমূহ তিনি খুব উপযুক্ত স্থানে ব্যবহার করতেন। দরসের মধ্যে নির্বাচিত উর্দূ শের শোনাতেন। আদব বা বালাগাতের কোনো বিষয় বর্ণনা করলে বলতেন যে, এটি জওকের বিষয়, আর জওক দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেছে।

একবার হযরত শাহ ছাহেব রহ. ঘটনা শোনান যে, আওরঙ্গজেব আলমগীরের একজন হিন্দু সচিব ছিলো। একবার সে লোভে পড়ে আত্মসাৎ

করে। শাস্তিস্বরূপ বাদশাহ তার চোখ তুলে দেয়। তখন ঐ হিন্দু সচিব যেই ফার্সি কবিতা বলে, তা সাহিত্যের অপূর্ব শৈলীর মর্যাদা রাখে। কবিতাটি এই-

بسیار گفتم نفس دنی را
ناکردہ باید ناکردنی را
نشنید از من نفس کافر
تا دید آخر نادیدنی را

"এ নিকৃষ্ট মনকে আমি অনেক বার বলেছি, অনুচিত কাজ কখনো না করা চাই। কিন্তু এ অবাধ্য মন শুনলো না। ফলে যে দৃশ্য না দেখা কাম্য ছিলো, তা-ই দেখতে হলো।"

হযরত শাহ ছাহেব রহ.-এর উদ্ধৃতিতে হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-এর শোনানো আরেকটি গযলের শের স্মরণ হলো। তা এই-

راستی فتنہ انگیز است سرو قد دوست
ہستی ما جز دروغ مصلحت آمیز نیست

"লম্বা ও সুন্দর গঠনের বন্ধুর দৃষ্টান্ত হলো, সেই সত্য কথার মতো যা ফেৎনা সৃষ্টি করে, আর আমাদের মতো অসুন্দর ও খাটো মানুষের দৃষ্টান্ত হলো, সেই মিথ্যে কথার মতো যা ফেৎনাকে নিভিয়ে দেয়।"

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.বলতেন, হযরত শাহ ছাহেব রহ.-এর সোহবতের ফয়েযে আমাদের মধ্যেও কিতাব মুতালাআ করার মনোযোগ সৃষ্টি হয়। লেখাপড়া সমাপ্তির পর প্রায় এক বছর পর্যন্ত আমি এভাবে অতিবাহিত করি যে, কয়েকটি সবক পড়ানোর পর কিতাব অধ্যয়ন করা ছাড়া অন্য কোনো কাজ ছিলো না। দুপুরে দারুল উলূম দেওবন্দের কুতুবখানায় প্রবেশ করতাম। কুতুবখানার ব্যবস্থাপক কতক সময় বাহির থেকে তালা লাগিয়ে চলে যেতেন, আর আমি ভিতরে কিতাব মুতালাআ করতে থাকতাম।

আব্বাজানের প্রতি শাহ ছাহেবের সদা সন্তুষ্টি

মুহাদ্দিসে আসর হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ ইউসুফ বানূরী ছাহেব রহ. বলতেন যে, হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. হযরত শাহ ছাহেব রহ.-এর সেসকল শাগরিদের অন্যতম, যাঁদের প্রতি হযরত সর্বদা

সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁদের প্রতি কখনো মনে সামান্য ক্লেদও সৃষ্টি হয়নি। অথচ দারুল উলূম দেওবন্দে এমন এমন ফেৎনা মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠে, যখন সেখানকার ওস্তাদগণ দুই দলে বিভক্ত হয়ে যান। পরিশেষে এ জটিলতার ফলে হযরত শাহ ছাহেব রহ. ইস্তেফা দেন। এ সময় হযরত মুফতী ছাহেব রহ. হযরত শাহ ছাহেব রহ.-এর পরিবর্তে হযরত থানবী রহ., হযরত মিয়াঁ ছাহেব রহ. এবং হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান ছাহেব রহ.-এর সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু মতের এই ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও হযরত শাহ ছাহেব রহ.-এর নিকট মুফতী ছাহেব রহ.-এর ভক্তসুলভ যাতায়াত অব্যাহত থাকে। হযরত শাহ ছাহেব রহ.-ও তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত স্নেহ-মমতার আচরণ করতে থাকেন।

হযরত মাওলানা বানূরী রহ. বলেন, আমার খুব স্মরণ আছে যে, সে সময় একবার হযরত মুফতী ছাহেব রহ. হযরত শাহ ছাহেব রহ.-এর খেদমতে একটি হাদিয়া নিয়ে যান। হযরত শাহ ছাহেব রহ. অত্যন্ত স্নেহের সাথে তা গ্রহণ করেন।

শাহ ছাহেবের তত্ত্বাবধানে সাহিত্য পরিষদ

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. অনেকবার শুনিয়েছেন যে, দারুল উলূম দেওবন্দের ওস্তাদ ও ছাত্রগণ হযরত শাহ ছাহেব রহ.-এর পৃষ্ঠপোষকতায় আরবী গদ্য ও পদ্যের অনুশীলনের জন্যে 'নাদিয়াতুল আদব' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি বৃহস্পতিবারে তার জলসা হতো। হযরত শাহ ছাহেব রহ. তার সভাপতিত্ব করতেন। পদ্ধতি এই ছিলো যে, প্রতি শনিবারে একটি চরণ দেওয়া হতো এবং ওস্তাদ ছাত্রদেরকে সেই চরণের ওজনে কাসীদা রচনার দাওয়াত দেওয়া হতো। একবার সেই চরণটি ছিলো এই,

تَعَزَّ فَإِنَّ الصَّبْرَ بِالْحُرِّ أَجْمَلُ

ঘটনাচক্রে ঐ সপ্তাহে আমার কবিতা রচনা করার সুযোগ হয়নি। তাৎক্ষণিকভাবে আমি দ্রুত মাত্র সাত আটটি শের রচনা করি। তার মধ্যে কয়েকটি শের এই,

تَرَحَّلَ عَنِّيَ الصَّبْرُ يَوْمَ تَرَحَّلُوْا

فَبِتُّ بِقَلْبٍ فِيْ الْحَشَا يَتَمَلْمَلُ

يَقُوْلُ نَصِيْحِيْ فِيْ هَوَاهُ تَوَجُّعًا

تَعَزَّ فَإِنَّ الصَّبْرَ بِالْحُرِّ أَجْمَلُ

يُصَبِّرُنِي وَالصَّبْرُ عَنْ شَكِيَّتِي

وَمَا غَالَنِي فِي الْحُبِّ إِلَّا التَّجَمُّلُ

بَكَيْنَا فَأَبْكَيْنَا وَلَا مِثْلَ نَاقِفٍ

لِحَنْظَلَةَ فِي الْحَيِّ يَوْمَ تَحَمَّلُوا

"আমার থেকে সবর বিদায় নিলো, যেদিন তারা চলে গেলো। তারপর থেকে আমি অস্থির মনে দিন গুজরান করছি। হিতৈষী আমাকে বলে, তার প্রেমে তুমি ব্যথিত? শান্ত হও, সবর করো, কারণ অভিজাত ব্যক্তির সাথে সবর সুন্দর মানায়। হিতৈষী আমাকে সবর করতে বলছে, কিন্তু যার সম্পর্কে আমার অভিযোগ অস্থিরতা তার থেকে আমি কিভাবে সবর করি। তার সৌন্দর্যই আমাকে প্রেমে ফেলে শেষ করেছে। যেদিন তারা চলে যাচ্ছিলো সেদিন আমি কেঁদেছি এবং কাঁদিয়েছি। তবে হানযালার মাথা ফেটে ফেলা ব্যক্তির মতো নয়।"

এই গযলের শেরের সংখ্যা যেহেতু কম ছিলো তাই আমি শেরের মধ্যেই এই বলে ওজর পেশ করি যে,

أَتَيْتُ بِهِ فِي ضِيقِ الْوَقْتِ مُسْرِعًا

فَدُونَكَ عُذْرِيَ الْمَعَاذِيرُ تُقْبَلُ

"এ শেরগুলো আমি অল্প সময়ে তাড়াহুড়ো করে বানিয়ে এনেছি। সুতরাং আপনার সামনে আমার ওজর পেশ করা হলো। আর আপনার এখানে মানুষের ওজর কবুল করা হয়।"

হযরত শাহ ছাহেব রহ. এসব শেরের জন্যে খুব ধন্যবাদ দেন। এবং শেষ শেরকে কেন্দ্র করে বলেন,

قَدْ قَبِلْنَا عُذْرَكَ يَا شَيْخَ السَّرُوجِ

অর্থাৎ, সারুজার শাইখ আমরা আপনার ওজর কবুল করলাম।[১৮৯]

---

১৮৯. আকাবেরে দেওবন্দ কেয়া থে, পৃষ্ঠা: ৪১-৫৪ হতে সংগৃহীত

হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আসগর হুসাইন ছাহেব রহ.-এর ঘটনাবলী

জন্মগত ওলী

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-এর তারবিয়াতে যেসকল বুযুর্গ ভূমিকা রাখেন, তাঁদের মধ্যে হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আসগর হুসাইন ছাহেব রহ.-এর সম্মানিত নাম শীর্ষে রয়েছে। তিনি দেওবন্দে হযরত মিয়াঁ ছাহেব উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। আমাদের দাদা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসীন ছাহেব রহ. তাঁর ওস্তাদ ছিলেন। তিনি বলতেন যে, সে মায়ের পেট থেকে ওলী হয়ে জন্ম নিয়েছে। শিশুকালে সে কখনো মিথ্যা বলেনি। শিশুরা ক্লাসে বিভিন্ন রকমের দুষ্টুমি করতো, কিন্তু মিয়াঁ ছাহেব তাদের থেকে দূরে থাকতেন এবং কখনো কোনো ভুল হয়ে গেলে তা অস্বীকার না করে বা কোনো অপব্যাখ্যা না দিয়ে পরিষ্কার ভাষায় ভুল স্বীকার করতেন।

হযরত মিয়াঁ ছাহেব রহ. হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-এর ওস্তাদও ছিলেন। তাছাড়া দারুল ইশাআত কুতুবখানায় উভয়ে শরীকানায় ব্যবসা করতেন। শিশুকাল থেকে নিয়ে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত হযরত মিয়াঁ ছাহেব রহ. হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-এর গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক বিষয়সমূহেও হস্তক্ষেপ করতেন। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. তাঁর এমন সব বিরল বিস্ময়কর ঘটনা শোনাতেন, যার দৃষ্টান্ত এ যুগে পাওয়া কঠিন। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. ছাড়া সেগুলো জানার মতো লোকও হয়তো আর কেউ নেই।

একবার অধম মরহুম বড়ো ভাই মাওলানা যাকী কাইফির নিকট আবেদন করে যে, হযরত মিয়াঁ ছাহেব রহ. সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন। যার মধ্যে এ জাতীয় ঘটনা অন্তর্ভুক্ত হবে। সেই মর্মে ভাইজান মরহুম একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি মাসিক আলবালাগে প্রকাশিত হয়। নিম্নে প্রথমে সেই প্রবন্ধের নির্বাচিত কিছু ঘটনা তুলে ধরবো, তারপর এমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তুলে ধরবো, যা ঐ প্রবন্ধে আসেনি।

প্রতিবেশী গরিবদের কথা চিন্তা করে...

আমার বড়ো ভাই জনাব যাকী কাইফী মরহুম তার ঘটনা শোনাতেন যে, আমি একবার হযরত মিয়াঁ ছাহেবের কাছে গেলাম। আমের মৌসুম ছিলো। সে যুগে আম চুষে খাওয়া হতো। মিয়াঁ ছাহেব বললেন, আম চুষবে? আব্বাজান আরয করলেন, একদিকে তো আম, তাও আবার হযরতের দেওয়া আম! তা তো نُورٌ عَلٰى نُورٍ সোনায় সোহাগা! জী, হযরত! অবশ্যই দিন। মিয়াঁ ছাহেব উঠে ভিতরে গেলেন এবং এক টুকরি আম এনে আব্বাজানের সামনে রাখলেন। সঙ্গে আরেকটি খালি টুকরি আনলেন, আমের আঁটি এবং ছিলকা রাখার জন্য। যখন আম চুষে ফারেগ হলেন, তখন আব্বাজান আমের আঁটি এবং ছিলকার টুকরি উঠিয়ে বাহিরে ফেলার জন্য রওয়ানা হলেন।

হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছো? আব্বাজান বলেন, আমি বললাম, হযরত! বাইরে ফেলতে যাচ্ছি। হযরত বললেন, না, এগুলো বাইরে ফেলো না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? তিনি বললেন, বাইরের দরজায় যখন এতোগুলো ছিলকা ও আঁটি মহল্লার ছেলেরা দেখবে, তাদের মধ্যে অনেকে গরিব, যাদের আম খাওয়ার সামর্থ্য নেই, তখন হতে পারে তাদের অন্তরে আক্ষেপ জাগবে! এই আক্ষেপ জাগা ভালো বিষয় নয়। এজন্যে এগুলো বাইরে ফেলি না; বরং ছিলকা ছাগলকে খাইয়ে দেই। এটা হলো প্রতিবেশীর হক।

আমের ছিলকা ফেলার ব্যাপারে এতো অধিক পরিমাণে সতর্কতা অবলম্বনের বিষয়ে ওয়ালেদ ছাহেব জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে, আমার বাড়ির আশে পাশে অনেক গরীব মিসকিন লোক বাস করে। তাদের বেশিরভাগ এমন, যারা অতি কষ্টে রুটি জোগাড় করে থাকে। তারা একসঙ্গে এতোগুলো ফলের ছিলকা দেখলে তাদের দারিদ্র্যের অনুভূতি তীব্র হবে। অসামর্থের কারণে আক্ষেপ হবে। আর আমি এ কষ্ট দেওয়ার কারণ হবো। এজন্যে এগুলো এমন সব জায়গায় ফেলি, যেখান দিয়ে পশুপাল অতিক্রম করে। ছিলকাগুলো তাদের কাজে আসে। আঁটিগুলো এমন জায়গায় রাখি, যেখানে শিশুরা খেলাধুলা করে। তারা এগুলো সিদ্ধ করে খায়। তাছাড়া এসব ছিলকা ও আঁটিও এক প্রকারের নেয়ামত, এগুলো নষ্ট করা উচিত নয়।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষ করার মতো যে, মিয়াঁ ছাহেব নিজে তো খুব কমই আম চেখে দেখতেন। বেশিরভাগ মেহমানদের জন্যে ব্যবস্থা হতো। মহল্লার গরীব শিশুদেরকেও ডেকে খাওয়ানো হতো। এতদসত্ত্বেও ছিলকা ও আঁটি একজায়গায় স্তূপ করা থেকে বিরত থাকতেন। যাতে করে তা গরীবদের

আক্ষেপের কারণ না হয়। কতক ফকীহ বাজারের খাবার খাওয়া থেকে এজন্যে বিরত থাকতেন যে, এগুলোর উপর গরীব মানুষের নজর পড়ে থাকে, আর অক্ষমতার ফলে এগুলো তাদের আক্ষেপের কারণ হয়।

লক্ষ করুন! এ সকল আল্লাহ ওয়ালার দৃষ্টি জাগতিক কাজকর্মে কতো সূক্ষ্ম হয়ে থাকে। তাঁরা প্রত্যেক জিনিসের হক কীভাবে আদায় করে থাকেন।

দস্তরখান ঝাড়ার সঠিক পদ্ধতি

হযরত মাওলানা সায়্যিদ আসগার হুসাইন ছাহেব রহ. অসাধারণ এক বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর বৃত্তান্ত শুনলে সাহাবায়ে কেরামের জামানার কথা স্মরণ হয়। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলেন,

একবার আমি তাঁর খেদমতে হাজির হই। খানা খাওয়ার সময় হয়ে ছিলো। তিনি বললেন, এসো খানা খাও! আমি তাঁর সাথে খেতে বসলাম। খাওয়া শেষ হলে আমি দস্তরখান পরিষ্কার করতে শুরু করলাম। তিনি যখন দেখলেন আমি দস্তরখান গোটাচ্ছি, আমার হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন, কী করছো? বললাম, হযরত দস্তরখান ঝাড়তে যাচ্ছি। হযরত মিয়াঁ ছাহেব রহ. বললেন, দস্তরখান কীভাবে ঝাড়তে হয় জানো কি? বললাম, হযরত! দস্তখান ঝাড়া এমন কি কঠিন শাস্ত্র, যা নিয়মতান্ত্রিকভাবে শিখতে হবে? বাইরে নিয়ে ঝেড়ে ফেলবো! মিয়াঁ ছাহেব রহ. বললেন, এজন্যেই তো জিজ্ঞাসা করছি যে, দস্তরখান কীভাবে ঝাড়তে হয় জানো কি না? আমি বললাম, তাহলে আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। বললেন, দস্তরখান ঝাড়াও একটা বিদ্যা। তারপর তিনি দস্তরখানটি আবার খুলে ফেললেন। তারপর তাতে গোশতের যেসব কণা পড়েছিলো তা আলাদা করলেন, হাড়গুলো আলাদা করলেন, রুটির টুকরাসমূহ আলাদা করলেন এবং রুটির কণাগুলোও আলাদা করলেন। তারপর বললেন, দেখো, এই চার রকম জিনিস এর মধ্যে পাওয়া গেছে। আমার কাছে চারও জিনিসের জন্যে পৃথক পৃথক জায়গা নির্ধারিত রয়েছে। গোশতের টুকরাগুলো অমুক জায়গায় রাখি, বিড়াল সেখান থেকে এগুলো খেয়ে নেয়। রুটির টুকরাগুলো দেওয়ালের উপর রেখে দেই। কাক-চিল ইত্যাদি পাখি এসে তা নিয়ে যায়। হাড়গুলো রাখি অমুক জায়গায়। মহল্লার কুকুরগুলো সেখান থেকে সেগুলো খায়। আর এই রুটির কণাগুলো পিঁপড়ার বাসার কাছে রেখে দেই, তারা এগুলো খেয়ে নেয়।

তারপর বললেন, এসবই আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক। এর কোনওটাই নষ্ট করা উচিত নয়। আব্বাজান রহ. বলতেন, সেদিন আমি শিখলাম যে, দস্তরখান ঝাড়াও একটা বিদ্যা, যা যথারীতি শেখার প্রয়োজন রয়েছে।

আমরা সাধারণত ময়লা-আবর্জনা ফেলার জায়গায় দস্তরখান ঝেড়ে আসি। আল্লাহ প্রদত্ত রিযিকের কোনও মূল্য দেই না। জগতে আল্লাহর কতো সৃষ্টি আছে! তাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলা এসব রিযিক সরবরাহ করেছেন। তুমি নিজে যা খেতে পারো না, অন্য কোনও মাখলূকের জন্যে তা হেফাজত করো। রুটির টুকরা কোথাও পড়ে থাকতে দেখলে অবহেলা করো না। তা আল্লাহর দেওয়া রিযিক। আদবের সাথে কোনও উঁচু জায়গায় রেখে দাও। কোনও মাখলূক এসে খেয়ে নেবে। আসলে পশ্চিমা সংস্কৃতি যতোই বিস্তার লাভ করছে, ততোই ইসলামী আদব-কায়দা আমাদের সমাজ থেকে বিদায় নিচ্ছে।

যে চিন্তা থেকে কাঁচাঘর পাকা করেননি

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলেন, একদিন আমি হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আসগর হুসাইন ছাহেব রহ.-এর খেদমতে হাজির হলাম। দেখলাম, তাঁর কাঁচা ঘরটির বিপর্যস্ত অবস্থা। যখনই বৃষ্টি আসে, বিভিন্ন জায়গা থেকে ভেঙেচুরে পড়ে। হযরত মিয়াঁ ছাহেব রহ. একবার এখানে সংস্কার করেন, তো আরেকবার ওখানে। আমি আরয করলাম, হযরত! আপনি একবার যদি বাড়িটি পাকা করে নিতেন, তাহলে নিত্যদিনের এই ঝামেলা থেকে বেঁচে যেতেন। তাছাড়া প্রতি বছর এর পিছনে যেই পরিমাণ টাকা ব্যয় হয়, তা জমা করা হলে কয়েক বছরে পাকা বাড়ি হয়ে যেতো।

হযরত মিয়াঁ ছাহেব রহ. বললেন, ওহ্‌হো, মুহাম্মাদ শফী! তুমি তো খুব বুদ্ধির কথা বলেছো! আমি বুড়ো হয়ে গেলাম, আজ পর্যন্ত কথাটা আমার মাথায় আসেনি।

আরয করলাম, হযরত, আপনি নারাজ হয়েছেন? আমার ভুল হয়েছে, ক্ষমা করে দিন।

তখন হযরত মিয়াঁ ছাহেব আমাকে দরজার বাইরে নিয়ে গিয়ে বললেন, দেখো তো, এ গলির এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত কোনও পাকা ঘর চোখে পড়ে কি?

আমি বললাম, না হযরত, একটিও পাকা বাড়ি দেখছি না।

তিনি বললেন, তা হলে বলো তো, এসব কাঁচা বাড়ির ভেতরে আমার একটাই পাকা বাড়ি কেমন দেখা যাবে? কীভাবে আমি এ সব কাঁচা বাড়ির মধ্যে নিজ বাড়িটি পাকা করি?

এ সকল মহান ব্যক্তিত্বই হলেন আমাদের ওলামায়ে দেওবন্দ! এ সকল মহামনীষীর এরূপ দু'-একটি ঘটনা নয়, তাঁদের প্রত্যেকেরই জীবনে এরূপ

অসংখ্য ঘটনা আছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রত্যেককেই আলাদা আলাদা গুণ দিয়েছিলেন। তাঁদের ঘটনাবলী সাহাবায়ে কেরামের জামানাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এ সকল বুযুর্গদের সম্পর্কে আমাদের পড়াশোনা করা উচিত। তাঁদেরকে জানা উচিত। মনে রাখতে হবে, ইলম কেবল ইলমের জন্যেই নয়, আমলই আসল লক্ষবস্তু। সুতরাং ইলমকে আত্মশুদ্ধির উপায় বানানোর চেষ্টা করতে হবে।

এ সকল ব্যক্তিত্বই ছিলেন পূর্বসূরীগণের নমুনা। হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর খেলাফতকালে একবার মদীনা শরীফে ঘি-এর দুর্মূল্য দেখা দিলো। তখন হযরত আমীরুল মুমিনীন সাইয়্যেদিনা ওমর ফারুক রাযি. ঘি খাওয়া বর্জন করলেন। তিনি বললেন, আমি ঘি তখন খাবো, যখন মদীনার সাধারণ মানুষ ঘি খেতে পারবে।

এ ঘটনা ইতিহাসে পড়েছিলাম এবং শুনেছিলাম। কিন্তু আত্মত্যাগ, সমবেদনা ও ভ্রাতৃত্বের এই উচ্চমার্গের জ্বলন্ত ও জাগ্রত ছবি হযরত মিয়াঁ ছাহেব রহ.-এর জীবনে দৃষ্টিগোচর হয়।

'তিনি একা যেন বদনাম না হন'

একজন বিখ্যাত আলেমে দ্বীন বুযুর্গের সঙ্গে রাজনৈতিক কিছু বিষয়ে হযরত মিয়াঁ ছাহেব রহ.-এর তীব্র মতবিরোধ ছিলো। সব সময় সর্ব সম্মুখে তিনি তা প্রকাশ করতেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁর শানে কারো দ্বারা কোনো অসমীচীন শব্দ বের হলে তিনি কঠোরভাবে তাকে সতর্ক করতেন। তাঁর মতবিরোধও ছিলো

اِخْتِلَافُ أُمَّتِيْ رَحْمَةٌ

'আমার উম্মতের মতোবিরোধ রহমত স্বরূপ'-এর আলোকে। মতবিরোধের সীমা থেকে চুল পরিমাণ অতিক্রম করা তাঁর স্বভাবের মধ্যে ছিলো না।

যাঁর সঙ্গে মতোবিরোধ ছিলো তিনি একবার তীব্র অনাবৃষ্টি দেখে ইসতিসকা নামায পড়ার ঘোষণা দিলেন। মিয়াঁ ছাহেব রহ. সম্ভবত কাশফের মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, এ সময়ে বৃষ্টি হবে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ওয়ালেদ ছাহেবকে বললেন, মিয়াঁ বৃষ্টি তো হবে না, তবে নামাযের সওয়াব অর্জনের জন্যে যাওয়া জরুরী। সুতরাং হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. তাঁর সঙ্গে ইসতিসকার নামায আদায় করেন। বৃষ্টি হওয়ার ছিলো না, হলো না। ঐ বুযুর্গ দ্বিতীয় দিনের জন্যে নামাযের ঘোষণা করলেন। সেদিনও তিনি প্রথম

দিনের মতো কথা বলে নামায আদায় করতে গেলেন এবং বৃষ্টি হওয়া ছাড়াই ফিরে এলেন। তৃতীয় দিনের জন্যে আবারো নামাযের ঘোষণা হলো। মিয়াঁ ছাহেব তৃতীয় দিনেও নামাযের জন্যে ময়দানে গেলেন এবং নিজেই ঐ বুযুর্গকে বললেন, আপনি অনুমতি দিলে আমি নামায পড়াবো।

সকলে বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করছিলো যে, মিয়াঁ ছাহেব তো কখনো পীড়াপীড়ি করলেও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি করেন না। আজকে তিনি নামায পড়ানোর আবেদন কীভাবে করছেন!

যাইহোক, মিয়াঁ ছাহেবের ইমামতিতে ইসতিসকার নামায আরম্ভ হলো। মিয়াঁ ছাহেবের ভক্তদের অন্তরে বারবার এ চিন্তা জাগছিলো যে, আজ অবশ্যই বৃষ্টি হবে। মিয়াঁ ছাহেব হয়তো কাশফের মাধ্যমে জানতে পেরেই ইমামের পরিবর্তন করেছেন। কিন্তু আজও একই অবস্থা যে, তীব্র রোদ জ্বল জ্বল করছিলো। মেঘের কোনো নাম নিশানাও ছিলো না। বাধ্য হয়ে পুরো মজমা ভগ্নহৃদয়ে পেরেশান অবস্থায় ফিরে আসে।

ওয়ালেদ ছাহেব রহ. তাঁর অভ্যাসের পরিপন্থী এ কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনি তো কখনো পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেরও ইমামতি করেন না, আজকে এমনটি কেন করলেন?

তিনি বললেন, আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো, যেই আলেমে দ্বীন দুদিন ধরে নামায পড়াচ্ছিলেন, তার সম্পর্কে যেন মানুষের ধারণা খারাপ না হয়। এ সময় বৃষ্টি হওয়া ভাগ্যে নেই। একজন আলেম বা বুযুর্গ ব্যক্তির এতে কী ত্রুটি রয়েছে? তাই বদনাম হলে শুধু একজন আলেমের না হোক, এ জন্যে আমিও এতে শরীক হই।

দৈনন্দিনের ঘটনা থেকে শিক্ষাগ্রহণ

হযরত মিয়াঁ ছাহেব রহ.-এর প্রতিদিনের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষাগ্রহণের বিশেষ এক আঙ্গিক ছিলো। প্রত্যেক ঘটনা থেকে কোনো না কোনো শিক্ষা তিনি গ্রহণ করতেন। তাঁর বাড়ি দারুল উলূম থেকে বেশ দূরে কেল্লা মহল্লায় ছিলো। পথে কিছু জঙ্গলও ছিলো।

দারুল উলূমে তাশরীফ এনে একটি কামরায় তিনি বসতেন। যেখানে হযরতের লিখিত কিতাবাদী প্রকাশ করার ধারা চালু ছিলো। 'দারুত তাদরীস ওয়াল ইশাআত' তার নাম ছিলো। আমার ওয়ালেদ মাজেদ মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ.-ও অবসর সময়ে সেখানে বসতেন।

একদিন বাড়ি থেকে তাশরীফ আনলেন। ওয়ালেদ ছাহেবকে সম্বোধন করে বললেন, আজ আমি একটি বিস্ময়কর তামাশা দেখে এসেছি। ওয়ালেদ ছাহেব সেই তামাশার বিবরণ শোনার জন্যে আপদমস্তক মনোযোগী হলেন।

তিনি বললেন, কোটলা মহল্লার বাইরে খোলা জায়গায় ছোট ছোট কয়েকটি মেয়ে বসে পরস্পরে ঝগড়া করছিলো। একে অপরকে আঘাত করছিলো। আমি কাছে গিয়ে জানতে পারলাম, এরা সকলে মিলে মাঠ থেকে গোবর কুড়িয়ে এনে এক জায়গায় স্তূপ করেছে। এখন সেগুলো বণ্টন করা নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়েছে। প্রাপ্ত অংশের কম বেশির কারণে মারামারি চলছে। প্রথম দৃষ্টিতে আমার হাসি পেলো। এরা কেমন নাপাক ও নোংরা জিনিসের জন্যে লড়ছে। তাদের নির্বুদ্ধিতা এবং শিশুসুলভ মানসিকতার কারণে হাসতে হাসতে আমি তাদের ঝগড়া বন্ধ করার চেষ্টা করছিলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরে এ কথা ঢেলে দেন যে, যারা এদের নির্বুদ্ধিতার কারণে হাসছে, তাদের যদি প্রকৃত দৃষ্টি থাকতো, তাহলে নিশ্চিত বিশ্বাস করতো যে, যারা দুনিয়ার ধন-দৌলত, আসবাবপত্র ও পদ-পদবীর জন্যে লড়ে থাকে, বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ লোকদের এসব লড়াইও শিশুদের লড়াইয়ের চেয়ে উত্তম কিছু নয়। এগুলোও ধ্বংসশীল এবং অল্প দিনের মধ্যে হাতছাড়া হয়ে যাবে। এসব জিনিসও আখেরাতের নেয়ামতের তুলনায় গবরের চেয়ে অধিক মর্যাদা রাখে না।

হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়টি সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন,

اَلدُّنْيَا جِيْفَةٌ وَطَالِبُوْهَا كِلَابٌ

'দুনিয়া একটি মৃত প্রাণী, আর তার উপর যারা হামলিয়ে পড়ে, তারা কুকুর।'

লক্ষ করে দেখুন! এ ধরনের শত শত ঘটনা সকলের দৃষ্টির সামনেই আসে, কিন্তু এগুলো থেকে শিক্ষা লাভ করার মতো চিন্তা ও দৃষ্টি কয়জনের আছে?

হযরত মাওলানা মিয়াঁ আসগর হুসাইন রহ. আমার দাদা হযরত মাওলানা ইয়াসীন ছাহেব রহ.-এর শাগরিদ ছিলেন। আমার দাদাজান বলতেন, সে জন্মগত ওলী। শৈশবকালে আমার কাছে পড়তে আসতো। তখন থেকে আজ পর্যন্ত একটা মিথ্যা কথা সে বলেনি। বাচ্চাদেরকে যখন পড়াতাম, কোনো বাচ্চা দুষ্টুমি করলে আমি রেগে কড়া ভাষায় জিজ্ঞাসা করতাম, এ কাজ কে করেছে? সব বাচ্চা মুখ বুঁজে বসে থাকতো, কিন্তু মিয়াঁ আসগর দাঁড়িয়ে বলতো, ওস্তাদ জি! আমার দ্বারা এ ভুল হয়ে গেছে। এমন সময়ও কখনো তার মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বের হয়নি।

আমাদের দৃষ্টান্ত

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. হযরত মিয়াঁ ছাহেব রহ.-এর ঘটনা শোনাতেন যে, একবার আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে গেলে তিনি বললেন, মিয়াঁ শফী! আজ আমরা আরবীতে কথা বলবো। আমি খুব আশ্চর্য বোধ করলাম। কেননা আর কখনও এরূপ হয়নি। আজ কী হলো যে, আরবীতে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিলেন! আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, হযরত কেন? বললেন, আমরা যখন কথাবার্তা বলি, তখন অনেক অহেতুক কথাও হয়ে যায়। জবানের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। আরবীতে কথা বললে তা হবে না। কারণ, আমিও অনর্গল আরবী বলতে পারি না, তুমিও পারো না। কষ্টে-সৃষ্টে যা বলি, তা দিয়ে কেবল প্রয়োজনীয় কথাই বলা হবে, অনর্থক কথা হবে না।

তারপর বললেন, আমাদের দৃষ্টান্ত ওই ব্যক্তির মতো, যে প্রচুর টাকা-পয়সা নিয়ে সফরে বের হয়েছে। পথে সে দু' হাতে তা উড়াতে থাকলো। কোনও হিসাব নেই। এভাবে প্রায় সব টাকাই খরচ হয়ে গেলো। সামান্য কিছু অবশিষ্ট আছে, অথচ সফর অনেক দূরের। বহু পথ এখনও বাকি। এতক্ষণে তার হুঁশ হলো। চিন্তা করলো, এভাবে খরচ করলে তো গন্তব্যে পৌছা যাবে না। কাজেই খুব হিসাব করে তা খরচ করতে লাগলো, যাতে পথেই সম্বলহীন হয়ে না পড়ে। তো ভাই! আমাদের সম্বল তো আয়ু, যার বিপুল অংশই অহেতুক কাজে খরচ হয়ে গেছে। কয়েক মুহূর্ত যা অবশিষ্ট আছে, তা সাবধানে ব্যয় করা উচিত, যাতে এই সামান্য সময়টুকুও বাজে খরচ না হয়ে যায়। এ কথাই বহু পূর্বে হযরত হাসান বসরী রহ.-ও বলে গেছেন। বস্তুত দেওবন্দ আল্লাহওয়ালাদের ভূমি। এখানে আল্লাহ তা'আলা এমন সব বুযুর্গদের আবির্ভাব ঘটিয়েছিলেন, যাঁরা সাহাবায়ে কেরামের প্রতিচ্ছবি ছিলেন। যাঁদের দেখলে সাহাবায়ে কেরামের কথা স্মরণ হতো।

এসব ঘটনা ভাইজান মরহুম তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। এখন হযরত ওয়ালেদ ছাহেব থেকে শোনা আরো কিছু ঘটনা পাঠক সমীপে পেশ করছি।

আব্বাজান থেকে কুরআন শরীফ কেনার ঘটনা

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. দারুল উলূম দেওবন্দে পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে ছোট একটি কুতুবখানাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরিবারের সদস্য সংখ্যা অধিক। মাদরাসার বেতন যথেষ্ট হয় না। এজন্যে ব্যবসার উদ্দেশ্যে তিনি এটা করেছিলেন। সাথে এ উদ্দেশ্যও ছিলো যে, তাঁর লিখিত কিতাবাদী প্রকাশ করা সহজ হবে। কিন্তু ব্যবসা একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র। শুরুর দিকে হযরত

ওয়ালেদ ছাহেবের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিলো না। তিনি বলেন, একবার দিল্লীতে গিয়ে দেখি, সেখানে একটি কুতুবখানায় নতুন একটি কুরআন শরীফ প্রকাশিত হয়েছে। তার অনেকগুলো কপি কিনে আমি দেওবন্দে নিয়ে আসি। আমি ভেবেছিলাম, অনেক কম মূল্যে কপিগুলো পেয়েছি, তাই ভালো ব্যবসা হবে। দেওবন্দ পৌঁছে আমি সর্বপ্রথম হযরত মিয়াঁ ছাহেব রহ.-কে বিষয়টি জানালাম। তিনি অধমের খুব প্রশংসা করলেন। সাথে বললেন যে, এ সবগুলো কপি কিছু লাভ রেখে আমাকে বিক্রি করে দাও। আমি হযরত মিয়াঁ ছাহেবের হুকুমের তামিল করলাম। সবগুলো কপি তাঁকে দিয়ে দিলাম। হযরত খুব তাড়াতাড়ি তার মূল্য পরিশোধ করলেন। আমি পরিতৃপ্ত ছিলাম যে, খুব ভালো ব্যবসা করেছি। হযরত মিয়াঁ ছাহেব রহ.-এর মতো অভিজ্ঞ ও বুযুর্গ ব্যক্তিও তা পছন্দ করেছেন। এখানেই বিষয়টি শেষ হয়ে যায়। কিন্তু বেশ কিছুদিন পর একদিন আমি হযরত মিয়াঁ ছাহেবের কুতুবখানায় পৌঁছে দেখি যে, ঐ কুরআন শরীফের সবগুলো কপি এক জায়গায় ওভাবেই রেখে দেওয়া আছে। দেখে মনে হলো, এর একটি কপিও হয়তো বিক্রি হয়নি। আমার খুব বিস্ময় জাগলো। হযরত মিয়াঁ ছাহেবকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তখন এর রহস্য উন্মোচিত হলো যে, হযরত মিয়াঁ ছাহেব কতো উঁচুভাবে চিন্তা করে থাকেন।

তিনি বললেন, আজ আমি আপনাকে বলছি যে, আপনি যেসব কুরআন শরীফ ক্রয় করে এনেছিলেন, তার মধ্যে অনেক ভুল ছিলো এবং আপনি বেশি দাম দিয়ে কিনেছিলেন। তাই আমার জানা ছিলো, এগুলো বিক্রি করা কঠিন হবে। আমি যদি তখন আপনাকে এ কথা বলতাম, তাহলে আপনার মন ভেঙ্গে যেতো। এজন্যে আমি আপনার থেকে সবগুলো কপি কিনে নিয়েছি।

হযরত মিয়াঁ ছাহেবের একটি চিঠির দু'টি লাইন

অধমের মরহুম ভাই মাওলানা মুহাম্মাদ যাকি কাইফী অধমের ফরমায়েশে যখন হযরত মিয়াঁ ছাহেব রহ. সম্পর্কে প্রবন্ধটি লেখেন এবং তা আল বালাগে প্রকাশ হওয়ার জন্যে আসে, তখন হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. প্রবন্ধটি পাঠ করে নিজে এর উপরে কয়েক লাইন লেখেন। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো।

স্নেহের মওলবী মুহাম্মাদ যাকী সাল্লামাহু হযরত মিয়াঁ ছাহেবের কিছু ঘটনা আমার থেকেই শুনে লিখেছে। এটা দেখে আনন্দিত হই যে, সে এ কথাগুলোর মূল্যায়ন করেছে এবং স্মরণ রেখেছে। কিন্তু যুগের সেই বিরল ব্যক্তিত্বের ইলমী ও আমলী যোগ্যতা ও উৎকর্ষতা এবং তাঁর বিশেষ জীবন-

পদ্ধতির ছিঁটে-ফোঁটাও এ কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে দেখা সম্ভব নয়। স্নেহাস্পদ এ কয়েকটি লাইন লিখে অতীতের এক বিস্মৃত মজলিসের চিত্র দৃষ্টির সম্মুখে তুলে ধরে আমাকে অস্থির করে তুলেছে। হযরত মিয়াঁ ছাহেব রহ.-এর নূরানী চেহারা সামনে ভেসে উঠেছে। তাঁর হৃদয়গ্রাহী কথাগুলো কানে গুঞ্জরিত হচ্ছে। বিভিন্ন সময়ের ঘটনা স্মরণ হচ্ছে। কিন্তু সেগুলো লিপিবদ্ধ করার সুযোগ ও শক্তি কোথায় পাবো! শুধু একটি চিঠির কথা এসময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে হৃদয় ও জিহ্বায় চলে এসেছে, যা হযরত মিয়াঁ ছাহেবের সাবলীল ও অর্থপূর্ণ লেখার একটি নমুনা, তা-ই এখানে লিখে ক্ষান্ত হচ্ছি।

হযরত মিয়াঁ ছাহেব রহ. তাঁর ব্যবসায়িক কুতুবখানাটি অল্পমূল্য ধরে আমাকে দিয়ে দিয়েছিলেন। সে মূল্যও মাসিক সামান্য পরিমাণ কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে। জীবনের শেষ দিকে একবার চিকিৎসার জন্যে তিনি কাসুলে গিয়ে ছিলেন। মাসিক কিস্তিটি মানি অর্ডার যোগে সেখানেই পাঠিয়ে দেই। তার উত্তর পত্র আসে। তার কিছু শব্দ স্মরণ রয়েছে-

'আপনার প্রেরিত أَحَبُّ الْأَشْيَاءِ وَأَبْغَضُهَا (সর্বাধিক প্রিয় ও সর্বাধিক ঘৃণ্য) উপঢৌকন হস্তগত হলো। নিত্যদিনের অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা কতো আর আদায় করা সম্ভব। শুধু দু'আ করছি। আপনার নিকটেও জীবদ্দশায় ও মৃত অবস্থায় দু'আর আশাবাদি।'

দুই লাইনের একটি পত্র, কিন্তু লক্ষ করুন! এর মধ্যে কতোভাব ও বিষয় লুকিয়ে আছে। একটি ঋণ কিস্তিওয়ারি পরিশোধ করার তিনি যেই অনুগ্রহ আমার উপর করেছিলেন, উল্টা সেটাকেই তিনি আমার অনুগ্রহ বলে সাব্যস্ত করছেন। তার নাম দিয়েছেন 'উপঢৌকন'। সাথে সাথে দুনিয়ার সম্পদের হাকীকত আরবীর এই ছোট বাক্যটিতে কীভাবে তুলে ধরেছেন! এর চেয়ে অধিক সুন্দর ও সংক্ষেপে উপস্থাপন হয়তো চিন্তাও করা যায় না। সম্পদ এমন এক জিনিস, যার মতো অধিক প্রিয় আর কোনো জিনিস নেই। এ সম্পদের মাধ্যমেই সমস্ত প্রিয় জিনিস অর্জন করা যায়। অপরদিকে এ সম্পদই এমন এক জিনিস, দুনিয়াতে এর চেয়ে ঘৃণ্য আর কিছু হতে পারে না। এই সম্পদই পিতাকে পুত্রের সঙ্গে, পুত্রকে পিতার সঙ্গে, স্বামীকে স্ত্রীর সঙ্গে, স্ত্রীকে স্বামীর সঙ্গে লড়াই ঝগড়ায় লিপ্ত করে। এর জন্যেই মানুষ একে অপরের গলা কাটে। শেষ বাক্যে সর্বদা মৃত্যুর কথা স্মরণ করার উপর আলোকপাত করে দু'আর জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কী চমৎকার উপস্থাপন! আল্লাহই তাঁকে এর পুরষ্কার দিবেন।[১৯০]

---

১৯০. আল বালাগ, রবিউস সানী ১৩৮৭ হিজরী থেকে সংগৃহীত

"সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া"-এর উপর তাঁর অভিমত

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-এর কিতাব সীরাতে খাতামিল আম্বিয়া-এর উপর হযরত মিয়াঁ ছাহেব রহ. যেই অভিমত লিখেছেন, নিম্নে তার কয়েকটি কথা উল্লেখ করা হচ্ছে-

> দারুল উলূম দেওবন্দের তরুণ মুদাররিস ও আলেম মওলবী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব আমার চোখের সামনে বেড়ে ওঠা শিশু। কিন্তু তার ইলম ও ফযল তাকে মাওলানা বলতে আমাকে বাধ্য করছে। তার আরবী ও উর্দূ গ্রন্থের সংখ্যা এতো দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, আমার মতো দুর্বল ও মৃত্যুর বাহনের পাদানিতে দাঁড়ানো বৃদ্ধের যদি ঈর্ষা জাগে, তবে তা যথার্থই। উভয় ভাষাতে সাবলীল, প্রাঞ্জল ও সুন্দর উপস্থাপনা আল্লাহ তা'আলা তাকে দান করেছেন। তার বিশেষ সৌন্দর্য এই যে, সালাফে সালেহীন এবং ওস্তাদ ও বুযুর্গগণের পদ্ধতি আঁকড়ে রেখেছে। বিভিন্ন জায়গায় আধুনিকতা ও নব্য সংস্কৃতির প্রভাব যেই দৃষ্টিকাড়া কিন্তু ধ্বংসাত্মক গহ্বর তৈরি করেছে, মানুষকে তা থেকে বাঁচানোর ফিকির করে ও কামিয়াব হয়। তার প্রত্যেক রচনা ও সংকলন দেখে অন্তর থেকে দু'আ আসে।[১৯১]

তীব্র জ্বরেও তিনি যেভাবে চিন্তা করেন

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. হযরত মিয়াঁ আসগর হুসাইন ছাহেব রহ.-এর ঘটনা বর্ণনা করেন যে, একবার আমি জানতে পারলাম, হযরত মিয়াঁ ছাহেব অসুস্থ। তাঁর জ্বর হয়েছে। আমি তাঁর সেবা শুশ্রূষার জন্যে তাঁর কাছে গেলাম। আমি দেখলাম, তীব্র জ্বরে তাঁর গা পুড়ে যাচ্ছে। কষ্ট ও অশান্তিতে অস্থির হয়ে আছেন। আমি গিয়ে সালাম দিলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত! কেমন আছেন? কেমন লাগছে? উত্তরে তিনি বললেন, 'আলহামদু লিল্লাহ! আমার চোখ ঠিকমতো কাজ করছে। আলহামদু লিল্লাহ! আমার কান ঠিকমতো কাজ করছে। আলহামদু লিল্লাহ! আমার জিহ্বা ঠিকমতো কাজ করছে। যেগুলোতে কোনো কষ্ট ছিলো না, সেগুলোর কথা একটা একটা করে উল্লেখ করে বললেন, এগুলোতে কোনো রোগ নেই। তবে জ্বর হয়েছে। দু'আ করো, আল্লাহ তা'আলা যেন তা ভালো করে দেন।

এই হলো একজন শোকরগুজার বান্দার আমল। যিনি ঠিক কষ্টের মধ্যেও যেসব নেয়ামত ও শান্তি বহাল আছে, সেগুলোর কথা স্মরণ করেন। ফলে কষ্টের তীব্রতা লাঘব হয়।

---

১৯১. আকাবেরে দেওবন্দ কিয়া থে, পৃষ্ঠা: ৫৪-৬৩ থেকে সংগৃহীত

হযরত মাওলানা
সাইয়্যেদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.-এর ঘটনাবলী

হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী ছাহেব রহ.-এর ব্যক্তিত্ব পরিচয় দানের অপেক্ষা রাখে না। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. হযরত মাদানী রহ.-এর নিকট যদিও কোনো কিতাব পড়েননি, কিন্তু যেসময় হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-কে দারুল উলূম দেওবন্দে ফতওয়া দানের খেদমতে নিয়োজিত করা হয়, সেসময় হযরত মাদানী রহ. সদরে মুদাররিস ও শাইখুল হাদীস ছিলেন। এ কারণে বিভিন্ন ইলমী বিষয়ে তাঁর থেকে উপকৃত হওয়া এবং পরামর্শ গ্রহণ করার ধারা ব্যাপকভাবে অব্যাহত ছিলো।

ভারত স্বাধীনতার কর্মপদ্ধতি নিয়ে ওলামায়ে দেওবন্দের মাঝে যেই মতবিরোধ দেখা দিয়েছিলো, তা শিক্ষিত ও সচেতন সকলেরই জানা। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী রহ. এবং হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ.-এর দৃষ্টিভঙ্গি এই ছিলো যে, মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র থাকা উচিত। যেখানে মুসলমানরা কোনো অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের অংশগ্রহণ ছাড়াই শাসন পরিচালনা করতে পারবে। এবং সেখানে ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান বাস্তবায়নের সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকবে।

অপরদিকে হযরত মাদানী রহ. এবং আরো কিছু আলেম উপমহাদেশের বিভক্তিকে মুসলমানদের জন্যে, বিশেষত যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেখানকার মুসলমানদের জন্যে ক্ষতিকর মনে করতেন। এ কারণে তাঁরা ভারত বিভক্তির বিপক্ষে ছিলেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কিছু পূর্বে উভয় দৃষ্টিভঙ্গির মতবিরোধ তুঙ্গে ছিলো। কিন্তু এটি একটি আদর্শ মতবিরোধ ছিলো। উভয়পক্ষ দিয়ানতদারীর সঙ্গে যেই মত ও অবস্থানকে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে উপকারী মনে করতেন তার উপর শুধু অটলই ছিলেন না, বরং তার সফলতার জন্যে বাস্তবে সচেষ্ট ছিলেন। এ বিষয়ে যেহেতু হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-এর অবস্থান হযরত থানবী রহ. এবং হযরত আল্লামা উসমানী রহ.-এর অবস্থানের পক্ষে ছিলো, এ জন্যে হযরত মাদানী রহ.-এর সঙ্গে মতবিরোধ ছিলো অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু

উভয়পক্ষের প্রত্যেকের অবস্থান যেহেতু ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত এবং মুসলমানদের কল্যাণকামনার উপর ভিত্তি করেছিলো, এ কারণে এ সকল বুযুর্গ মতবিরোধকে তার সীমারেখার মধ্যে রাখার এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, যা ভবিষ্যতপ্রজন্মের জন্যে আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে।

হযরত মাদানী রহ.-এর সঙ্গে এ বিষয়ে মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. যেই সম্মান, মর্যাদা ও ভক্তির সঙ্গে হযরত মাদানী রহ.-এর আলোচনা করতেন, তা দেখার মতো ছিলো। অধমের কখনোই স্মরণ পড়ে না যে, হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. কখনো হযরত মাদানী রহ.-এর মতবিরোধের আলোচনা করেছেন, আর একই সঙ্গে তাঁর ইলমী ও আমলী কামালাতের আলোচনা গুরুত্বের সাথে করেননি। হযরত মাদানী রহ. সম্পর্কে হযরত ওয়ালেদ ছাহেব থেকে শোনা কয়েকটি বিষয় নিম্নে তুলে ধরা হলো।

মজলিসে ইলমী

হযরত মাদানী রহ. হাদীসের দরস দেওয়ার উদ্দেশ্যে যখন দারুল উলূমে তাশরীফ আনেন, তখন দারুল উলূমের ওস্তাদগণের সমন্বয়ে তিনি একটি মজলিসে ইলমী কায়েম করেন। এ মজলিসের উদ্দেশ্য ছিলো, ওস্তাদগণ পরস্পরে বসে ইলমী বিষয়ে আলোচনা করবেন। কোনো ওস্তাদের ইলমী কোনো বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়ে থাকলে তা তিনি সকলের সামনে পেশ করবেন এবং সে বিষয়ে মতবিনিময় হবে। নিয়ম ছিলো প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে সকল ওস্তাদ নিজ নিজ বাড়ি থেকে খানা আনাতেন। একসঙ্গে খানা খাওয়া হতো এবং ইলমী বিষয়ে আলোচনা হতো। বড়ো মনোমুগ্ধকর হতো এই মজলিস। এতে ওস্তাদগণ পরস্পরের ইলম দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ লাভ করতেন। হযরত মাদানী রহ. হতেন সেই মজলিসের প্রাণপুরুষ।

আব্বাজানকে হাদীসের পাঠদানের প্রতি মনোযোগী করা

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলতেন, হযরত মাদানী রহ.-এর এই বিরাট অনুগ্রহ আমি কখনো ভুলতে পারবো না যে, তিনি আমাকে ইলমে হাদীসের দিকে মনোযোগী করেছেন। পীড়াপীড়ি করে তিনি আমাকে হাদীস পড়ানোর দিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ইতিপূর্বে আমি প্রাথমিক শাস্ত্রসমূহের সমস্ত কিতাব সহ তাফসীর ও ফিকহ পর্যন্ত প্রত্যেক ইলম ও ফনের কিতাবসমূহ দারুল উলূমে পড়িয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস পড়ানোর সুযোগ হয়নি। এই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. নিজে বলেন,

হযরত মাদানী রহ. যখন সিলেটে অবস্থান করছিলেন, তখন সেখানে হাদীস পড়ানোর জন্যে একজন মুদাররিসের প্রয়োজন দেখা দেয়। চিঠি লিখে আমাকে ডেকে পাঠান। আমি ওজর দেখাই যে, এ পর্যন্ত দারুল উলূমে হাদীস পড়ানোর সুযোগ আমার হয়নি।

তখন তিনি এই মর্মে চিঠি লেখেন যে, এমনটি কেন করেছো। হাদীসের তা'লীমকে জরুরী মনে করো। পরবর্তীতে দেওবন্দ তাশরীফ এনে পুনরায় নির্দেশ দেন। আমি নিবেদন করি যে, যেখানে হযরত শাহ ছাহেব রহ.-এর মতো ওস্তাদে মুহতারাম হাদীসের দরস দিয়ে থাকেন, সেখানে এমন নির্বোধ কে আছে যে, আমার কাছে হাদীস পড়তে চাইবে?

হযরত বললেন, না, কোনো না কোনো হাদীসের কিতাব অবশ্যই পড়াও। এরপর এজন্যে বারবার তাগিদ দিতে থাকেন। পরিশেষে দারুল উলূমের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম মুওয়াত্তায়ে ইমাম মালেক-এর দরস আমার উপর ন্যস্ত করা হয়। পরবর্তীতে দাওরায়ে হাদীসের অন্যান্য কিতাব পড়ানোর সুযোগ লাভ হয়।[১৯২]

শায়খের প্রতিচ্ছবি

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. অনেক সময় বলতেন যে, সাধারণত মানুষ হযরত মাদানী রহ.-এর শুধু রাজনৈতিক চেষ্টা-মেহনতকে তাঁর আসল যোগ্যতা মনে করেছে। অথচ বাস্তবতা হলো, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বহু বছর পর্যন্ত হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর খেদমত ও সোহবতে থাকার তাওফীক দান করেছেন। হযরত মাদানী রহ. নিজ শাইখের খেদমত, আকীদাত ও মহব্বতে নিজেকে যেভাবে ফানা করেন এবং নিজের বাস্তব জীবনে শাইখের গুণ ও যোগ্যতাকে যেভাবে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেন; তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের এই দিককে সেভাবে আলোকপাত করা হয়নি, যেভাবে আলোকপাত করা এর হক ছিলো।

থানাভবনে উপস্থিতির ঘটনা

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলেন, হযরত মাদানী রহ.-এর হযরত থানবী রহ.-এর সঙ্গে যদিও রাজনৈতিক মতবিরোধ ছিলো, কিন্তু তাঁর অন্তরে হযরত থানবী রহ.-এর মর্যাদা ও শ্রদ্ধা কেবল কম ছিলো না তাই নয়, বরং

১৯২. নুকুশ ও তাআসসুরাত, পৃষ্ঠাঃ ২৩

তিনি হযরত থানবী রহ.-এর সঙ্গে বড়োদের মতোই আচরণ করতেন। আমার স্মরণ আছে, ঠিক সেই সময়, যখন হযরত থানবী রহ. এবং হযরত মাদানী রহ.-এর রাজনৈতিক মতবিরোধ সুপ্রকাশিত ছিলো। একবার হযরত মাদানী রহ. দেওবন্দের কতক ওস্তাদকে বলেন, অনেকদিন হলো আমার থানাভবন যাওয়া হয়নি। হযরত থানবী রহ.-এর সঙ্গে দেখা করতে মন চাচ্ছে। সুতরাং হযরত মাদানী রহ. এবং আরো কিছু ওস্তাদ (যাঁদের মধ্যে শাইখুল আদব হযরত মাওলানা এযায আলী রহ.-এর সম্মানিত নাম অধমের নিশ্চিতভাবে স্মরণ আছে, অবশিষ্টদের নাম স্মরণ নেই) থানাভবনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ঘটনাচক্রে অনেক রাতে গাড়ি থানাভবনে পৌছে। এঁরা এমন সময় খানকার দরজায় পৌছেন, যখন খানকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। তাঁদের জানা ছিলো যে, খানকার নির্ধারিত রুটিন রয়েছে। তাই রুটিনের বিপরীত করা তাঁরা মোনাসেব মনে করেননি। হযরত থানবী রহ.-কেও এতো রাতে কষ্ট দেওয়া পছন্দ করেননি। আল্লাহ তা'আলা হযরত মাদানী রহ.-কে অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু ও মুজাহিদসুলভ জীবনে অভ্যস্ত বানিয়েছিলেন। সুতরাং তিনি সঙ্গীদের নিয়ে খানকার দরজার সামনের চত্বরেই শুয়ে ঘুমিয়ে যান।

হযরত থানবী রহ. ফজরের আযানের সময় যখন বাড়ি থেকে বাইরে তাশরীফ আনেন, তখন দেখেন যে, কিছু লোক বাইরের চত্বরে শুয়ে আছে। অন্ধকারে চেহারা দেখা যাচ্ছিলো না। চৌকিদারকে জিজ্ঞাসা করলে সেও জানে না বলে জানায়। কাছে গিয়ে দেখেন, হযরত মাদানী রহ. এবং হযরত মাওলানা এযায আলী ছাহেবগণের মতো ব্যক্তিত্ব।

হযরত থানবী রহ. অকস্মাৎ তাঁদেরকে দেখে আনন্দিত হন, কিন্তু এ জন্যে ব্যথিতও হন যে, এখানে তাঁরা এভাবে রাত কাটিয়েছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হযরত আপনারা এখানে ঘুমালেন কেন?

হযরত মাদানী রহ. বললেন, আমাদের জানা ছিলো যে, আপনার এখানে সবকিছুর নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে খানকা বন্ধ হয়। এর পরে তা খোলা হয় না। হযরত থানবী রহ. বললেন, খানকার নিয়ম তো এটাই, কিন্তু গরীবখানা তো ছিলো। সেখানে তো আপনাদের মতো ব্যক্তিত্বগণের জন্যে কোনো বিধি-নিষেধ ছিলো না। হযরত মাদানী রহ. বললেন, আমরা এতো রাতে আপনাকে কষ্ট দেওয়া মোনাসেব মনে করিনি।

মোটকথা, এভাবে তাঁরা থানাভবন যান। এক-দুদিন অবস্থান করে ফিরে আসেন। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. এ ঘটনা শোনানোর পর বলতেন,

কোনো ব্যক্তি এই লিল্লাহিয়াত ও বিনয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করে দেখাক তো! ঠিক মতবিরোধ অবস্থায়ও এঁরা কেমন সরল, অকৃত্রিম ও আত্মবিলোপের সঙ্গে পরস্পরের মুখোমুখি হতেন। আল্লাহু আকবার!

মতপার্থক্য কিভাবে করতে হয় তাও শিখিয়েছেন

কাপড়ের পাতলা মোজা, যার তলায় চামড়া লাগানো আছে। ফুকাহায়ে কেরাম যাকে رَقِيقٌ مُنَعَّلٌ বলেন, এমন মোজার উপর মাসাহ করা জায়েয হওয়ার বিষয়ে হানাফী ফকীহগণের মধ্যে কিছুটা মতবিরোধ চলে এসেছে। এ বিষয়ে হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-এর ফতওয়া ছিলো, এর উপর মাসাহ করা জায়েয নেই। (যার বিস্তারিত দলীল প্রমাণ সহ হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা লেখেন। ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দে তা প্রকাশিত হয়েছে) কিন্তু হযরত মাদানী রহ.-এর মত ছিলো জায়েয হওয়ার দিকে। এ বিষয়ে মৌখিক আলোচনা তো কয়েকবার হয়েছে, কিন্তু কোনো ফল বের হয়নি। একদিন হযরত মাদানী রহ. বললেন, মাসআলাটি তাহকীক করার জন্যে আমি সময় বের করে দারুল ইফতায় আসবো। একদিন হযরত তাশরীফ আনলেন। কিতাবাদি দেখে আলোচনা শুরু হলো। হযরত মাদানী রহ. তাঁর দলীল বর্ণনা করলেন। আমি আমার আপত্তি তুলে ধরতে থাকলাম। এমনকি এ আলোচনা তিনদিন পর্যন্ত চলতে থাকলো। পরিশেষে হযরত মাদানী রহ. বললেন, আপনার কথাও ওজনহীন নয়, কিন্তু আমার এ বিষয়ে অন্তর খোলাশা হচ্ছে না। আর আমার দলীলের উপর আপনার পরিতৃপ্তি হচ্ছে না। এজন্যে আপনি আপনার অবস্থানে থাকুন, আর আমি আমার অবস্থানে থাকি। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলেন, এ ঘটনার কিছুদিন পর আমার ভগ্নিপতি মাওলানা নাবীহ হাসান ছাহেব রহ.-এর বাড়িতে হযরত মাদানী ছাহেব রহ. তাশরীফ আনেন। আমিও সেখানে ছিলাম। হযরত মাদানী রহ. তখন এমন মোজাই পরিহিত ছিলেন। মাগরিবের নামাযের সময় হলো। হযরত মাদানী রহ. ঐ মোজার উপর মাসাহ করলেন এবং এরশাদ করলেন, মুফতী ছাহেব! আপনার নিকট তো এ মোজার উপর মাসাহ করা দুরস্ত নয়, এজন্যে আমার পিছনে আপনার নামাযও হবে না। তাই আপনি ইমামতি করুন। হযরতের কথায় আমিও লৌকিকতা না করে আমিই ইমামতি করলাম। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. এ ঘটনা বর্ণনা করে বলতেন যে, এঁরা মতবিরোধ করার পদ্ধতিও নিজেদের আমল দ্বারা শিখিয়েছেন।

'সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া'-এর উপর অভিমত

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. যখন সীরাতে খাতামিল আম্বিয়া সংকলন করেন, তখন তিনি হযরত মাদানী রহ.-এর খেদমতে তা পেশ করেন। পরবর্তীতে যখন এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে, তখন হযরত মাদানী রহ. সিলেটে অবস্থান করছিলেন। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. পুনরায় কিতাবের একটি কপি তাঁর খেদমতে পাঠিয়ে দেন। হযরত মাদানী রহ. একটি চিঠিতে অভিমত স্বরূপ লেখেন যে,

> 'আমি আপনার পুস্তিকার প্রথম সংস্করণই অক্ষরে অক্ষরে পাঠ করেছি, অত্যন্ত উপযোগী মনে করে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছি। অতিসত্বর এতদসংক্রান্ত একটি সভা কামরুলায় অনুষ্ঠিত হবে। এই পাঠ্যক্রম ইনশা আল্লাহ বাংলা ও আসামের সমস্ত কওমী মাদরাসার জন্যে অনুসৃত হবে। এর অবশিষ্ট অংশ দ্রুত পূর্ণ হওয়া দরকার। মূলত মাওলানা থানবী রহ. এবং অন্যান্য বুযুর্গের অভিমত লেখার পর আমাদের মতো অকর্মণ্যের কিছু লেখা মারাত্মক বেয়াদবি ও অহঙ্কারের শামিল।'[১৯৩]

---

১৯৩. আকাবেরে দেওবন্দ কেয়া থে, পৃষ্ঠাঃ ৮১-৮৬ থেকে সংগৃহীত

হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব রহ.-এর ঘটনাবলী

'আমি কাঁচা তাওয়ায় রুটি দিয়েছি'

হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আজ এমন কোন্ মুসলমান আছে যে অবগত নয়। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাবলীগ ও দ্বীনের দাওয়াতের জযবা তাঁর সীনার মধ্যে ভরে দিয়েছিলেন। যেখানে বসতেন, দ্বীনের কথা শুরু করে দিতেন এবং দ্বীনের পয়গাম পৌছাতেন। তাঁর একটি ঘটনা কেউ শুনিয়েছিলেন যে, এক ব্যক্তি তাঁর খেদমতে আসা-যাওয়া করতো। দীর্ঘ দিন আসতে থাকে। লোকটির দাড়ি ছিলো না। যখন তার আসা-যাওয়া দীর্ঘ দিন হয়ে গেলো, তখন হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব রহ. চিন্তা করলেন যে, এ লোক তো এখন আমাদের ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছে, সুতরাং একদিন তিনি লোকটিকে বললেন, ভাই সাহেব! আমার মন চায় তুমিও দাড়ির সুন্নাতের উপর আমল করো। লোকটি তাঁর কথা শুনে কিছুটা লজ্জিত হলো এবং পরের দিন থেকে আসা বন্ধ করে দিলো। যখন কয়েকদিন অতিবাহিত হলো, তখন হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব রহ. লোকদেরকে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা জানালো, সে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব রহ.-এর খুব আক্ষেপ হলো। তিনি লোকদেরকে বললেন, আমার চরম ভুল হয়েছে। আমি কাঁচা তাওয়ায় রুটি দিয়েছি। অর্থাৎ, তাওয়া গরম হয়ে উপযুক্ত হওয়ার আগেই আমি রুটি দিয়েছি। যার ফল এই হয়েছে যে, সে ব্যক্তি আসাই ছেড়ে দিয়েছে। সে যদি আসতে থাকতো তাহলে কমপক্ষে দ্বীনের কথা তার কানে প্রবেশ করতো। ফলে তার উপকার হতো।

ইস্তিদরাজের ভয় হয়

আমি আপনাদেরকে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস ছাহেব রহ.-এর একটি ঘটনা শোনাচ্ছি। একবার তিনি অসুস্থ হন। আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. সে সময় কোনো এক কাজে দেওবন্দ থেকে দিল্লী গিয়েছিলেন। দিল্লীতে গিয়ে তিনি জানতে পারেন যে, হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব রহ. খুব অসুস্থ। তাঁকে দেখার জন্যে

তিনি নিযামুদ্দীন তাশরীফ নিয়ে যান। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন যে, চিকিৎসকরা দেখা-সাক্ষাৎ নিষেধ করে দিয়েছেন। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব সেখানকার লোকদেরকে জানান, আমি তো দেখতে এসেছিলাম। অবস্থা জানতে পারলাম। দেখা-সাক্ষাৎ যেহেতু ডাক্তাররা নিষেধ করেছেন, তাই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন নেই। হযরত সুস্থ হলে শুধু এতোটুকু জানাবেন যে, আমি দেখা করতে এসেছিলাম এবং আমার সালাম পৌছাবেন। এ কথা বলে হযরত ওয়ালেদ ছাহেব বিদায় নিলেন।

কেউ একজন ভিতরে গিয়ে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস ছাহেব রহ.-কে বলেন যে, হযরত মুফতী ছাহেব এসেছিলেন। হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব রহ. মুফতী ছাহেবকে ডেকে আনার জন্যে পিছনে পিছনে একজন লোক পাঠিয়ে দেন। লোকটি যখন হযরত মুফতী ছাহেবের নিকট গিয়ে বলে যে, মাওলানা আপনাকে ডাকছেন, তখন হযরত মুফতী ছাহেব বললেন, যেহেতু ডাক্তাররা দেখা করতে নিষেধ করেছেন তাই এমতাবস্থায় দেখা করা ঠিক নয়। লোকটি বললো, মাওলানা আপনাকে ডেকে নেওয়ার জন্যে কড়াভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।

হযরত মুফতী ছাহেব বলেন যে, আমি তার সঙ্গে ফিরে গেলাম। হযরতের কাছে গিয়ে বসলাম। কুশল জিজ্ঞাসা করলাম। তখন হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব আমার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে অঝোরে কাঁদতে আরম্ভ করলেন।

হযরত মুফতী ছাহেব বলেন, আমার মনে হলো, তিনি রোগ যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন, তাই কাঁদছেন। আমি সান্ত্বনামূলক কিছু কথা বললাম।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস ছাহেব বললেন, আমি রোগ যন্ত্রণার জন্যে কাঁদছি না। আমি এ জন্যে কাঁদছি যে, আমার এখন দু'টি চিন্তা ও দু'টি আশঙ্কা রয়েছে। যে কারণে আমি পেরেশান। সে কারণেই আমি কাঁদছি। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কী চিন্তা আপনার? হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস ছাহেব বললেন, প্রথম কথা হলো, জামাতের কাজ এখন দিন দিন বিস্তার লাভ করছে। আলহামদু লিল্লাহ! তার ভালো ফল দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। মানুষ দলে দলে জামাতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। এখন আমার ভয় লাগছে যে, জামাতের এ সফলতা আল্লাহর পক্ষ থেকে 'ইসতিদ্‌রাজ' নয় তো? 'ইসতিদ্‌রাজ' বলা হয়, কোনো ভ্রান্ত মানুষকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ঢিল দেওয়া। সে বাহ্যিকভাবে সফলতা লাভ করতে থাকে, কিন্তু বাস্তবে তার কাজ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিমূলক হয় না। এতে অনুমান করে

দেখুন যে, হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব রহ. কতো উঁচু স্তরের বুযুর্গ যে, তিনি 'ইসতিদ্‌রাজে'র ভয় করছেন!

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব বলেন, আমি সাথে সাথে নিবেদন করলাম, হযরত! আপনাকে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, এটা 'ইসতিদরাজ' নয়। মাওলানা বললেন, এটা যে 'ইসতিদরাজ' নয়, তার কী প্রমাণ তোমার কাছে আছে? হযরত ওয়ালেদ ছাহেব বললেন, এর প্রমাণ এই যে, যখন কারো সঙ্গে 'ইসতিদরাজে'র আচরণ করা হয়, তখন তার মন-মগজে ধারণাও হয় না যে, এটা 'ইসতিদরাজ'। এমনকি 'ইসতিদরাজ' হওয়ার কোনো সন্দেহও তার মনে জাগে না। আপনার যেহেতু 'ইসতিদরাজ' হওয়ার সন্দেহ জাগছে, এ সন্দেহই প্রমাণ যে, এটা 'ইসতিদরাজ' নয়। এটা যদি 'ইসতিদরাজ' হতো, তাহলে আপনার অন্তরে এর চিন্তাও কখনো জাগতো না। তাই আমি এ বিষয়ে আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, এটা 'ইসতিদরাজ' নয়। যাকিছু হচ্ছে তা সবই আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও দয়া। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব বলেন, আমার এ উত্তর শুনে মাওলানার চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, আলহামদু লিল্লাহ! তোমার এ কথায় আমার বড়ো প্রশান্তি লাগছে।

তারপর হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব রহ. বললেন, আমার দ্বিতীয় চিন্তা এই যে, তাবলীগ জামাতের কাজে সাধারণ মানুষ অধিকহারে যোগ দিচ্ছে। আলেমদের সংখ্যা কম। আমার আশঙ্কা হলো, সাধারণ মানুষের হাতে যখন নের্তৃত্ব আসে, তখন পরবর্তীতে তারা অনেক সময় কাজটিকে ভুল পথে পরিচালিত করে। তাই এমন না হয় যে, তাবলীগ জামাআত কোনো ভুল পথে পরিচালিত হয়, আর তার আপদ আমার মাথায় আপতিত হয়। তাই আমার মন চায়, আলেমগণ অধিকহারে এ কাজে অন্তর্ভুক্ত হোন এবং তারা এর নের্তৃত্ব গ্রহণ করুন।

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব বললেন, আপনার এ চিন্তা সম্পূর্ণ ঠিক। কিন্তু আপনি তো নেক নিয়তে এবং সঠিক পদ্ধতিতে কাজ আরম্ভ করেছেন। পরবর্তীতে কেউ যদি তা নষ্ট করে তাহলে ইনশা আল্লাহ আপনার উপর তার দায়িত্ব বর্তাবে না।

যাইহোক, এ কথা ঠিক যে, আলেমগণের সম্মুখে অগ্রসর হয়ে এর নের্তৃত্ব সামলানো উচিত। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস ছাহেব রহ.-এর ঘটনা আমি ওয়ালেদ ছাহেবের নিকট হতে বারবার শুনেছি। এ থেকে আপনারা অনুমান করুন, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস ছাহেবের ইখলাস কতো উঁচু পর্যায়ের ছিলো এবং তার মনের ভাব ও আবেগ কেমন ছিলো!

শাইখুল আদব

হযরত মাওলানা এযায আলী ছাহেব রহ.-এর ঘটনাবলী

শাইখুল আদব হযরত মাওলানা এযায আলী ছাহেব রহ. দারুল উলূম দেওবন্দের সর্বজনপ্রিয় ওস্তাদগণের অন্যতম ছিলেন। যে ব্যক্তিই তাঁর কাছে কয়েকটি সবক পড়তো, সেই তাঁর ভক্ত অনুরক্ত হয়ে যেতো। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. আরবী সরফ ও নাহবের প্রায় সবগুলো কিতাবই তাঁর কাছে পড়েন।

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলতেন, যে বছর আমরা নিয়মিত আরবী পড়তে আরম্ভ করি, সেই বছরই হযরত শাইখুল আদব রহ. পাঠদান শুরু করেন। এরপর আমরা যতো অগ্রসর হচ্ছিলাম, হযরতের পাঠদানও অগ্রসর হচ্ছিলো। এভাবে কয়েক বছর পর্যন্ত তাঁরই ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়। এখানে তাঁর কিছু ঘটনা তুলে ধরা হচ্ছে।

১. ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলেন, ফার্সীর শেষ বছরেই আমরা আরবীর প্রাথমিক কিতাব মিযানুস সরফ ও নাহবেমীর পড়েছিলাম, কিন্তু তা পোক্ত হয়নি। পরবর্তী বছর যখন হযরত শাইখুল আদব ছাহেব রহ.-এর নিকট আমাদের সবক এলো, তখন তিনি মুফীদুত তালিবীন পড়াতে আরম্ভ করেন এবং প্রথম সবকেই সরফ ও নাহবের সমস্ত নিয়ম বাস্তবায়ন আরম্ভ করেন। তিনি প্রত্যেকটি শব্দের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতেন যে, এটা ইসিম, ফেল না হরফ? ইসিম হলে মোতামাক্কিন! না গাইরে মোতামাক্কিন? মোতামাক্কিন হলে কোন প্রকারের? তার এরাবের অবস্থা কী? মোটকথা, প্রত্যেক শব্দে শব্দে মিযান ও নাহবেমীর পুরোটা ইজরা করাতেন। এভাবে শুধু এক পৃষ্ঠায় আমাদের এক মাসের অধিক সময় লেগে যায়। তবে এক পৃষ্ঠা শেষ হতে হতে সরফ ও নাহবের মৌলিক সব কায়দা আমাদের আয়ত্বে চলে আসে।

২. হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলেন, হযরত শাইখুল আদব ছাহেব রহ.-এর পাঠদান-পদ্ধতির ফলে আরবীর প্রথম বছরেই আমরা আরবী ভাষায় ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করি। একবার তিনি আমাদেরকে বাড়ির যেই কাজ দিয়েছিলেন কোনো এক সমস্যার কারণে আমি সেটা পুরা

করতে পারিনি। অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ যতোটুকুই করেছিলাম, তার সঙ্গে মাফ চেয়ে কয়েকটি কথা লিখেছিলাম। উত্তরে তিনি ঐ কাগজেই এ কবিতাটি লিখে দেন,

بِقَدْرِ الْكَدِّ تُكْتَسَبُ الْمَعَالِيْ
وَمَنْ طَلَبَ الْعُلٰى سَهِرَ اللَّيَالِيْ

'যতো মেহনত করা হবে, ততো উঁচ্চ মার্গ লাভ হবে।
যে ব্যক্তি উন্নতি চায়, সে রাত জাগরণ করে।'

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলতেন যে, এরপর আর কখনো আমি বাড়ির কাজে ত্রুটি করিনি।

৩. হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলেন, আমরা যখন হযরত মাওলানা এযায আলী ছাহেবের নিকট নাফহাতুল ইয়ামান পড়ছিলাম, তখন হযরতের তাওয়াজ্জুহের ফয়েযে আরবীতে শের রচনা আরম্ভ করেছিলাম। ঘটনাটি এই ছিলো যে, একবার আমি উর্দূতে দু-চারটি শের রচনা করি। কেউ একজন হযরত মাওলানাকে বিষয়টি অবগত করে। তখন তিনি বলেন, উর্দূতে শের রচনা করলে তো কী এমন বড়ো কাজ করলো। রচনা করতে হলে আরবীতে করুক। এর সঙ্গে একটি চরণও দিয়ে দেন। সুতরাং আমি তখন থেকেই আরবীতে শের রচনার চেষ্টা আরম্ভ করি।

৪. হযরত ওয়ালেদ মাজেদ রহ. বলেন, যে বছর হযরত মাওলানা এযায আলী ছাহেব রহ.-কে প্রথমবার মাকামাতে হারীরী পড়ানোর জন্যে দেওয়া হয়, সে বছর আমরা তাঁর কাছে মাকামাত পড়ি। আমরা দেখতাম যে, মাওলানা এর জন্যে সারা রাত মোতালাআয় মগ্ন থাকতেন। তাঁর পাঠদান এ পরিমাণ তাহকীকী হতো যে, ছাত্ররা সিক্ত হয়ে যেতো। কিছুদিন পর হারীরীর পদ্ধতিতে মাওলানা ছাত্রদের দ্বারা রচনা লেখাতে আরম্ভ করেন। আমি সেই আঙ্গিকে কয়েকটি রচনা তৈরী করি। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা আমার কাছে সংরক্ষিত ছিলো। পরবর্তীতে সেগুলো হারিয়ে যায়।

৫. মাওলানার দরসের বরকতের আলোচনা করতে গিয়ে হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলতেন যে, আমরা একই বছরে মাকামাতে হারীরির ত্রিশ মাকালা তাহকীক ও তামরীনের সঙ্গে তাঁর কাছে পড়ি। এরপর দিওয়ানে মোতানাব্বি, রা পর্যন্ত ঐ বছরই পড়ি। আর এ সবকিছু এক ঘণ্টাতেই হয়। খারিজি সময় নেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি।

৬. হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. যখন পাঠদান শুরু করেন, তখন বিশেষভাবে আরবী আদবের পাঠদানের ক্ষেত্রে তাঁর অধিক খ্যাতি হয়। বহুবছর পর্যন্ত মাকামাতে হারীরীর পাঠদান তাঁর দায়িত্বে থাকে। তাঁর এই পাঠদানের অনেক খ্যাতি ছিলো। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-এর নিকট এটি পড়ার জন্যে পাশ করা আলেমগণও গুরুত্বের সঙ্গে আসতেন। এ সবকিছু হযরত শাইখুল আদব রহ.-এর বিশেষ দৃষ্টির ফল।

৭. হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. অনেকবার আলোচনা করেছেন যে, হযরত শাইখুল আদব রহ.-এর এ অভ্যাস পুরো মাদরাসার মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলো যে, তিনি ছোট বড়ো সকলকে আগে সালাম করার প্রতি সর্বদা গুরুত্বারোপ করতেন। সাধারণত অন্য কোনো ব্যক্তি তাঁকে আগে সালাম দিতে পারতো না। কোনো কোনো সময় ছাত্ররা পূর্ব থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে চেষ্টা করতো যে, আজ আমরা মাওলানাকে আগে সালাম করবো, কিন্তু তারা এ চেষ্টায় সফল হতো না।

৮. হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. শোনান যে, একবার কিছু লোক হযরত মাওলানা এযায আলী ছাহেব রহ.-এর সঙ্গে কোনো এক সফরে রওয়ানা হয়। আমিও তাদের সঙ্গে ছিলাম। সফরের শুরুতে হযরত মাওলানা বলেন, কোনো একজনকে সফরের আমীর বানিয়ে নাও। আমি বললাম, হযরত আমীর তো নির্ধারিতই আছে। তিনি বললেন, আমাকে যদি আমীর বানাতে চাও তাহলে আমাকে পুরোপুরি মেনে চলতে হবে। আমরা বললাম, ইনশা আল্লাহ অবশ্যই মেনে চলবো। কিন্তু এর ফল এই হলো যে, যখন সামানা উঠানোর প্রয়োজন হতো, তখন মাওলানা নিজে আগে বেড়ে শুধু নিজের সামানা উঠাতেন তা নয়, বরং সকলের সামানা উঠাতেন। আমরা সামানা উঠানোর জন্যে পীড়াপীড়ি করলে মাওলানা বলতেন, আমি আমীর। আমার আনুগত্য করা জরুরী।

এরপর পুরো সফরে এ অবস্থা চলতে থাকে। যখনই কোনো কঠিন কাজ আসতো, মাওলানা নিজে অগ্রসর হতেন। আমরা বাধা দিলে আমীরকে মেনে চলার নির্দেশ শুনিয়ে চুপ করিয়ে দিতেন।

৯. পাকিস্তানে আসার পরেও হযরত শাইখুল আদব রহ.-এর সঙ্গে হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-এর চিঠিপত্র চালু থাকে। সে সব চিঠি পড়ার সৌভাগ্য এ লেখকের হয়েছে। হযরত মাওলানার বিনয়ের অবস্থা এই ছিলো যে, তিনি হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-কে (যিনি মাওলানার ছাত্র হওয়াকে

নিজের জন্যে গর্বের বিষয় মনে করতেন) এমনভাবে পত্র লিখতেন, যেন ছোট কেউ বড়োর কাছে পত্র লিখছে।

শেষ বয়সে হযরত শাইখুল আদব রহ.-এর মধ্যে পাকিস্তানে আসার ঝোঁক সৃষ্টি হয়। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বিষয়টি জানতে পেরে তাঁর নিকট আবেদন করেন যে, যখনই পাকিস্তান তাশরীফ আনবেন, দারুল উলূম করাচীকে আপনার ফয়েয পৌছানোর কেন্দ্র বানাবেন। হযরত শাইখুল আদব রহ. এ ব্যাপারে ওয়াদাও করেছিলেন। কিন্তু এরপর তাঁর জীবন আর তাঁকে সঙ্গ দেয়নি। দেওবন্দ থেকেই তিনি প্রকৃত মালিকের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

১০. হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.- লাউড স্পীকার (নামায ও অন্যান্য দ্বীনী কাজে মাইক ব্যবহার) সম্পর্কে যেই পুস্তিকা লেখেন, সে সম্পর্কে হযরত শাইখুল আদব রহ. লেখেন,

লাউড স্পীকারের ব্যবহার বর্তমান যুগে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওলামায়ে কেরামের এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন মতামত প্রকাশিত হয়ে আসছে। যেহেতু এর সম্পর্ক নামাযের সঙ্গে, তাই এ মতবিরোধ মুসলমানদের জন্যে অধিক পেরেশাণীর কারণ হয়। জনাব মুহতারাম মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব এতদসংক্রান্ত বিস্তারিত ও উপকারী পুস্তিকা লিখেছেন। আমি তা আদ্যপান্ত শুনেছি। জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান এই লেখকের জন্যে অন্তরের অন্তস্থল থেকে দু'আ দিয়েছি। আল্লাহ যেন, লেখক আল্লামার অন্যান্য পুস্তিকার ন্যায় এ পুস্তিকাটিও নির্বিশেষে সকলের জন্যে উপকারী করেন এবং আল্লাহর নিকট তা মাকবুল হয়। আমীন। মুহাম্মাদ এযায আলী আমরুহুবী।[১৯৪]

(আলাতে জাদীদা, পৃষ্ঠা: ৫)

১৯৪. আকাবেরে দেওবন্দ কেয়া থে, পৃষ্ঠা: ৭১-৭৫ থেকে সংগৃহীত

শাইখুল ইসলাম
আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ.-এর ঘটনা

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. যে সকল আকাবেরের সোহবত পেয়েছেন এবং যাঁদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিলো তাঁদের মধ্যে শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. অন্যতম। তাঁর ব্যক্তিত্ব পরিচয় দানের অপেক্ষা রাখে না। তাঁর ইলমী ও রাজনৈতিক জীবন-বৃত্তান্ত-সম্বলিত বিস্তারিত কিতাব প্রকাশিত হয়েছে।

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. হিদায়ার কিছু অংশ এবং সহীহ মুসলিম শরীফ হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ.-এর কাছেই পড়েছিলেন। তিনি যখন ঢাবেলে সহীহ বোখারীর দরস দিতেন, তখন একবার অসুস্থতার কারণে দরস দানে অক্ষম হয়ে পড়েন। তখন তিনি তাঁর জায়গায় সহীহ বোখারীর দরস দেওয়ার জন্যে হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-এর নাম পেশ করেন। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. তখন দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। মাওলানার ফরমায়েশে তিনি ঢাবেল যান এবং কয়েক মাস সেখানে তাঁর পরিবর্তে সহীহ বোখারীর দরস দেন।

পরবর্তীতে যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্যে হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. দেশব্যাপী মেহনত ও দৌড়ঝাঁপ আরম্ভ করেন এবং এ উদ্দেশ্যে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. এ পুরো দৌড়ঝাঁপ ও পরিশ্রমে আল্লামার বাহুস্বরূপ কাজ করেন। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সারাদেশে সফর করেন। যে সব জায়গায় আল্লামা নিজে তাশরিফ নিতে পারেননি, সেখানে তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে হযরত ওয়ালেদ ছাহেবকে পাঠিয়েছেন। সীমান্ত প্রদেশে গণভোটের সময় পুরো প্রদেশে ভ্রমণকালে হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-কে তিনি সঙ্গে রাখেন।

পাকিস্তান গঠন হওয়ার পর যখন এখানে ইসলামী সংবিধান তৈরির চেষ্টা শুরু হয়, তখন শাইখুল ইসলাম হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ.-এর দাওয়াতে হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. পাকিস্তান তাশরিফ আনেন।

তাঁর নির্দেশনাতেই তিনি ইসলামী শিক্ষাবোর্ডের অন্তর্ভুক্ত হন। যা ইসলামী সংবিধানের কাঠামো তৈরির জন্যে গঠন করা হয়েছিলো। পরবর্তীতে মাওলানার ইন্তিকাল পর্যন্ত প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর সহকর্মী হিসেবে হযরত ওয়ালেদ ছাহেব ভূমিকা পালন করেন। হযরত মাওলানার জানাযা নামায পড়ানোর সৌভাগ্যও তাঁরই লাভ হয়।

হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. পাকিস্তান বিনির্মাণের প্রথম সারির অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন। কায়েদে আযম এবং নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান মরহুম দেশ বিভক্তির সময় তাঁকে নিজেদের সঙ্গে পাকিস্তান নিয়ে আসেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে তিনিই সর্বপ্রথম পতাকা উত্তোলন করেন।

তিনি চাইলে এখানে নিজের জন্যে অনেক জাগতিক সরঞ্জাম ও পদ পদবী লাভ করতে পারতেন। কিন্তু মাওলানা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দরবেশসুলভ জীবন যাপন করেন। নিজের জন্যে একটি বাড়িও গ্রহণ করেননি। মৃত্যু পর্যন্ত দুটি ভাড়া কক্ষে অবস্থান করেন। এমতাবস্থায় তিনি দুনিয়া ছেড়ে চলে যান যে, না তাঁর কোনো ব্যাংক ব্যালেন্স ছিলো, না নিজের বাড়ি ছিলো, না নিজের কোনো সাজ-সরঞ্জাম ছিলো।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে যখন হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. পাকিস্তান তাশরিফ আনেন, তখন প্রতিদিন বিকালে হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ.-এর নিকট নিয়মিত যেতেন। লেখক তখন খুব কম বয়সী ছিলাম। বেশির ভাগ সময় হযরত ওয়ালেদ ছাহেবের সঙ্গে মাওলানার খেদমতে চলে যেতাম। সে সময় করাচীতে মানসম্পন্ন কোনো ইলমী মারকায ছিলো না। ইলমী কোনো কুতুবখানাও ছিলো না। এ কারণে যখন ইলমী কোনো বিষয়ে তাহকীক করার প্রয়োজন হতো, তখন মাওলানা হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-এর নিকট তাশরীফ আনতেন। কারণ, ওয়ালেদ ছাহেব ব্যক্তিগত কিতাবের ভাণ্ডার সঙ্গে এনেছিলেন। সুতরাং আমাদের বাড়িতে ইলমী ও ফিক্‌হী মজলিস হতো। মাওলানা অসুস্থতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও ইলমের পিপাসা নিবারণের জন্যে তিন তলার সিড়ি অতিক্রম করে চলে আসতেন।

আল্লাহ তা'আলা হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ.-কে লেখা ও বক্তৃতায় ব্যতিক্রমী যোগ্যতা দান করেছিলেন। বিশেষ করে তাঁর বক্তৃতা অত্যন্ত প্রভাবশালী ও মনে গেঁথে যাওয়ার মতো ছিলো। কয়েকটি বাক্য দিয়ে তিনি মানব-হৃদয়ে নিজের কথা গেঁথে দিতেন। হযরত ওয়ালেদ

ছাহেব রহ. থেকে শোনা হযরত আল্লামা উসমানী রহ.-এর কয়েকটি কথা এখন স্মরণ হলো। নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হলো-

১. তিনি বলেন, হক কথা হক নিয়তে এবং হক পদ্ধতিতে যখনই বলা হবে, কখনই তা ক্ষতিকর হবে না। তাই যখনই তুমি দেখবে যে, হক কথা বলার ফলে কোথাও লড়াই-ঝগড়া হয়েছে, বা ক্ষতি হয়েছে, বা ফেৎনা-ফাসাদ হয়েছে, তখন বুঝবে যে, ঐ তিনটির কোনো একটি অবশ্যই বিঘ্নিত হয়েছে। হয় কথা হক ছিলো না, কিন্তু অহেতুক এটাকে হক কথা মনে করা হয়েছে। অথবা কথা তো হক ছিলো, কিন্তু নিয়ত বিশুদ্ধ ছিলো না। কথার পিছনে অন্যের সংশোধন উদ্দেশ্য ছিলো না। উদ্দেশ্য ছিলো, নিজের বড়ত্ব জাহির করা, না হয় অন্যকে অপমান করা। যে কারণে কথার মধ্যে সঠিক প্রভাব ছিলো না। কিংবা কথাও হক ছিলো এবং নিয়তও সঠিক ছিলো, তবে কথা বলার পদ্ধতি সঠিক ছিলো না। এমন পদ্ধতিতে কথা বলেছে, যেন অন্যকে লাঠি দ্বারা আঘাত করেছে। হক কথা কোনো লাঠি নয় যে, তা দ্বারা কাউকে আঘাত করবে। হক কথা বলা তো ভালোবাসা ও কল্যাণকামনার কাজ। হক পদ্ধতিতে তা সম্পাদন করতে হবে। কল্যাণকামনার অভাব হলে তখন হক কথা দ্বারাও ক্ষতি হয়ে থাকে।

২. স্বামী-স্ত্রী যদি এক ও নেক হয়, সেটাই দুনিয়ার জান্নাত।

৩. হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান তৈরির দায়িত্বপ্রাপ্ত এ্যাসেম্বলীর সদস্য ছিলেন। সেখানে রাতদিন ইসলামী সংবিধানের বিষয়ে অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে বাহাস-বিতর্ক হতো। একবার মাওলানার কোনো প্রস্তাবের বিষয়ে সম্ভবত (সাবেক গভর্নর জেনারেল) গোলাম মুহাম্মাদ সাহেব খোঁচা দিয়ে বলেন যে, মাওলানা এগুলো রাষ্ট্রীয় বিষয়, আলেমরা এর কী জানে! আলেমদের এসব বিষয়ে নাক গলানো উচিত নয়। তখন হযরত আল্লামা যেই বক্তব্য দিয়েছিলেন, তার একটি অত্যাধিক ওজস্বি বাক্য এই ছিলো-

'আমাদের এবং আপনাদের মাঝে শুধু এ, বি, সি, ডি-এর পর্দা অন্তরায় হয়ে আছে। এই কৃত্রিম পর্দা উঠিয়ে দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন, ইলম কাদের নিকট আছে, আর অজ্ঞ কারা।'

৪. ইসলামী সংবিধান বা ইসলামী আইনের কথা চিন্তা করতেই কতক মানুষের অন্তরে এ আশঙ্কা চেপে বসে যে, ইসলামী সংবিধান ও আইন বাস্তবায়ন করলে দেশে মোল্লাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। একবার এ জাতীয়

কোনো বিষয় নিয়ে এ্যাসেম্বলীতে আলোচনা চলছিলো, তখন হযরত শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. বলেন, 'আপনারা মোল্লাদের বিষয়ে আশঙ্কা করছেন যে, তারা আবার ক্ষমতায় চেপে না বসে। কিন্তু খুব ভালো করে বুঝুন! মোল্লাদের এ ধরনের কোনো ইচ্ছা নেই। মোল্লারা ক্ষমতা দখল করতে চায় না। তবে তারা ক্ষমতাসীনদেরকে কিছুটা মোল্লা অবশ্যই বানাতে চায়।'

৫. জন্মভূমির বিষয়ে হযরত আল্লামা উসমানী রহ.-এর একটি উক্তি হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. অনেক উদ্ধৃত করতেন। তিনি তাঁর দেওবন্দ ও থানাভবনের সফর নামাতেও লিখেছেন-

'স্মরণ হলো যে, আমার মুহতারাম ওস্তাদ ও শ্রদ্ধেয় ভাই শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. একদিন জন্মভূমির বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিলেন যে, প্রত্যেক মানুষের তিনটি জন্মভূমি রয়েছে। একটি দেহের, দ্বিতীয়টি ঈমানের এবং তৃতীয়টি আত্মার। দেহের জন্মভূমি সেই স্থান, যেখানে তার জন্ম হয়েছে। মুমিনের ঈমানী জন্মভূমি মদীনা শরীফ, যেখান থেকে সে ঈমানী নূর লাভ করেছে। আর রূহানী জন্মভূমি হলো জান্নাত, যেটা আত্মার জগতে তার আসল অবস্থানকেন্দ্র ছিলো। এদিক সেদিক ঘুরে পুনরায় তাকে সেখানেই যেতে হবে।'[১৯৫]

৬. হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলতেন, হযরত আল্লামা উসমানী রহ. জ্ঞান-গরিমার পর্বত ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতুবী রহ.-কে যেই 'ইলমে লাদুন্নি' দান করেছিলেন, বিশেষত দ্বীনের ফালসাফা, কালাম ও হিকমত বিষয়ে হযরত নানুতুবী রহ. যেই সূক্ষ্ম ইলম ও মাআরেফ লাভ করেছিলেন, তা ভালো ভালো আলেমের বোঝার উর্ধ্বের। কিন্তু ওলামায়ে দেওবন্দের মধ্যে দুইজন বুযুর্গ এমন রয়েছেন, যাঁরা হিকমতে কাসেমীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং তা বোধগম্য করার বিষয়ে সবিশেষ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। একজন হলেন, হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ., আর দ্বিতীয়জন হলেন, মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তাইয়্যেব ছাহেব রহ.।

৭. হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. থেকেই শুনেছি যে, যখন হযরত উসমানী রহ. সহীহ মুসলিমের উপর তাঁর জগত-বিখ্যাত ভাষ্যগ্রন্থ 'ফাতহুল মুলহিম' সংকলন করেন, তখন তার পাণ্ডুলিপি হারামাইন শরীফাইনে নিয়ে যান। সেখানে পবিত্র রওযার সামনে বসে পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা উল্টাতে থাকেন।

---

১৯৫. আকাবেরে দেওবন্দ কেয়া থে ?, পৃষ্ঠা: ৭৮

তারপর রওযা শরীফেও এবং হারাম শরীফের মুলতাযামেও পাণ্ডুলিপি রেখে দু'আ করেন যে,

'সম্বলহীন অবস্থায় অধম এ পাণ্ডুলিপি বিন্যস্ত করেছে। হে আল্লাহ এটি কবুল করুন এবং এটি প্রকাশের ব্যবস্থা করে দিন!'

এরপর হারামাইন শরীফাইন থেকে ফিরে এলে হায়দারাবাদের নিযামের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয় যে, আমরা আমাদের ব্যবস্থাপনায় এই কিতাব প্রকাশ করবো। সুতরাং হায়দারাবাদের নেযামের অর্থানুকূল্যেই অত্যন্ত জৌলুসের সঙ্গে তা প্রকাশিত হয় এবং পুরো ইলমী দুনিয়া থেকে তা স্বীকৃতি আদায় করে।

৮. হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. আল্লামা উসমানী রহ.-এর উর্দূ গ্রন্থসমূহের মধ্যে তাফসীরে উসমানী ছাড়াও ইসলাম, আল আকলু ওয়ান নাকলু এবং ই'জাযে কুরআনের অনেক প্রশংসা করতেন। অনেকবার তিনি এ কিতাবগুলোর ইংরেজি তরজমা হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেন। তিনি কতিপয় ইংরেজি শিক্ষিত ভক্তকে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণও করেন। কিন্তু আফসোস! হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-এর জীবদ্দশায় এ কাজ সম্পাদিত হয়নি।

لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا

'হয়তো আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীতে এর কোনো ব্যবস্থা করে দিবেন।'

৯. হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলতেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত উসমানী রহ.-কে বক্তব্যদানের অসাধারণ যোগ্যতা দান করেছিলেন। কিন্তু একই সঙ্গে স্বভাবের মধ্যে সূক্ষ্মতা ও পরিচ্ছন্নতাও খুব দান করেছিলেন। সুতরাং অপছন্দের সামান্য কিছু ঘটলে বক্তব্য দানের উৎসাহ হারিয়ে ফেলতেন। ফিরোজপুরে কাদিয়ানীদের সঙ্গে যখন আমাদের মুনাযারা শেষ হলো, তখন শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা রাতের বেলা এক বিরাট সাধারণ সভার আয়োজন করেন, তারা চিন্তা করেছিলেন এখন ফিরোজপুরে আকাবেরে ওলামায়ে দেওবন্দ সমাবেত হয়েছেন। যাঁদের মধ্যে হযরত শাহ ছাহেব রহ., হযরত মাওলানা মুর্তযা হাসান খান ছাহেব রহ. এবং আল্লামা উসমানী রহ. প্রমুখ রবী-শশীগণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। তাই এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে শহরবাসীকে তাঁদের দ্বারা উপকৃত করা প্রয়োজন। যদিও এঁদের সকলেই জ্ঞান-গরীমায় অতুলনীয় ছিলেন। কিন্তু বক্তব্যের বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আল্লামা উসমানীর উপর নিবদ্ধ ছিলো। কারণ, তাঁর বক্তৃতা আলেম সুলভ হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে সহজবোধ্যও হতো। সাধারণ মানুষ তার দ্বারা বেশি প্রভাবিত হতো। সুতরাং জলসার প্রোগ্রামে তাঁর বক্তব্যের ঘোষণাও দেওয়া হয়।

কিন্তু জলসার সময় যখন ঘনিয়ে আসে, তখন হযরত আল্লামা উসমানী রহ.-এর মন কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে যায়। বক্তব্য দানের জন্যে স্বতস্ফূর্ততা থাকে না। তিনি বক্তব্য দানে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। উপস্থিত সকল আলেম তাঁকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি উদ্বুদ্ধ হন না। হযরত মাওলানা মুর্তযা হাসান খান ছাহেব রহ. তাঁর উপর অসন্তুষ্টও হন।

কিন্তু আমি জানতাম, মাওলানা এ ব্যাপারে মাজুর। ভিতর থেকে স্বতস্ফূর্ততা সৃষ্টি না হলে তিনি বক্তব্য দিতে পারবেন না। এজন্যে আমি চুপ থাকি। সকলে যখন জলসায় যেতে আরম্ভ করেন, তখন আমি তাদেরকে বলি আপনারা যান আমি কিছুক্ষণ পর আসছি। এবার অবস্থান স্থলে হযরত আল্লামা উসমানীর সঙ্গে আমি একা থেকে যাই। কিছু সময় অতিবাহিত হলে আমি নিবেদন করি, হযরত আপনার মন কিছুটা সংকুচিত হয়ে আছে। এখানে একা থাকলে এ অবস্থা আরো বৃদ্ধি পাবে। আপনি জলসায় তাশরিফ নিয়ে গেলে এবং বয়ান না করলে হয়তো কিছুটা প্রফুল্ল বোধ হবে।

তিনি বললেন, মানুষ আমাকে বক্তব্য দিতে বাধ্য করবে। আমি বললাম, আমি এর দায়িত্ব নিচ্ছি। আপনার সম্মতি ও সন্তুষ্টির বাইরে কেউ আপনাকে পীড়াপীড়ি করবে না। তিনি রাজি হলেন। কিছুক্ষণ পর আমরা জলসা স্থলে পৌছি। সেখানে অন্য ওলামায়ে কেরাম বক্তব্য দান করছিলেন। অবশেষে জনসমাগমের আবেগ-উদ্দীপনা দেখে হযরত আল্লামা উসমানী রহ.-এর মন আপনা আপনি উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। তারপর নিজেই স্টেজ পরিচালককে বলেন, আমিও কিছু বলবো। এরপর মাওলানার দেড় ঘণ্টা বক্তব্য হয়। যা দর্শক শ্রোতাদেরকে পরিতৃপ্ত করে।

১০. হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলতেন, আল্লাহ তা'আলা আল্লামা উসমানী রহ.-কে লেখনীরও বিশেষ যোগ্যতা দান করেছিলেন। শাইখুল হিন্দ রহ. যখন ভারত স্বাধীনতার জন্যে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এতদোদ্দেশ্যে দিল্লীতে এক বিশাল সমাবেশের আয়োজন করা হয়। তার সভাপতির ভাষণ শাইখুল হিন্দ রহ.-কে দিতে হবে। হযরত নিজে তা লেখার সুযোগ পাননি। এজন্যে তাঁর বিভিন্ন ছাত্রকে এ ভাষণ লেখার জন্যে নির্দেশ দেন। তারা নিজ নিজ আঙ্গিকে সভাপতির ভাষণ লেখেন। পরিশেষে

তিনি যেই ভাষণটি পছন্দ করেন, তা হযরত আল্লামা উসমানী রহ.-এর লিখিত ছিলো। সুতরাং তিনি সেই ভাষণটিই পাঠ করেন এবং তা প্রকাশিতও হয়।

১১. হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-এর সঙ্গে হযরত আল্লামা উসমানী রহ.-এর আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিলো এবং হযরত ওয়ালেদ রহ. তাঁর ছাত্রও ছিলেন। উপরন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় তাঁর বাহু হয়েও কাজ করেন। এসব সম্পর্কের ফলে হযরত আল্লামা উসমানী রহ. ওয়ালেদ ছাহেবকে অনেক বেশি ভালোবাসতেন। তাঁর ইলমী ও আমলী যোগ্যতার কথা স্বীকার করতেন। দ্বিজাতি তত্ত্বের বিষয়ে হযরত ওয়ালেদ ছাহেব এক প্রশ্নের উত্তরে যেই বিস্তারিত পুস্তিকা লেখেন, তার অভিমতে আল্লামা উসমানী রহ. লেখেন-

'আমি এই ফতওয়া আদ্যপান্ত অধ্যয়ন করেছি। মাশাআল্লাহ বিষয়টি একেবারে পরিষ্কার করে দিয়েছেন। জ্ঞানী ও গবেষকদের জন্যে কিছুই অবশিষ্ট রাখেননি। এ বিষয়ের সবগুলো দিক সুস্পষ্ট আকারে সামনে এসেছে। আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা মুফতী ছাহেবকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।'[১৯৬]

তিনি হযরত ওয়ালেদ ছাহেবের পুস্তিকা- نَيْلُ الْمَآرِبِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوَارِبِ -এর উপর লেখেন,

'আমি মাসাহ আলাল জাওরাবাইন-এর আলোচনাটি পাঠ করি। আল্লাহ তা'আলা মুফতী ছাহেবের ইলম ও আমলে বরকত দান করুন। অত্যন্ত গবেষণা ও অনুসন্ধান করে উত্তর লিখেছেন। মোটকথা, আমার নিকট মুফতী ছাহেবের তাহকীক যথার্থ।'[১৯৭]

---

১৯৬. জাওয়াহেরুল ফিকহ, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৪৮

১৯৭. ফাতাওয়া দারুল উলুম দেওবন্দ, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৯৮-২৯৯, আকাবেরে দেওবন্দ কেয়া থে? পুস্তিকা থেকে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা: ৭৫-৮১

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ.-এর ঘটনাবলী

আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী' ছাহেব রহ. জীবনের সত্তর-পঁচাত্তরটি বছর দ্বীনী ইলম পড়া ও পড়ানোর কাজে অতিবাহিত করেন। শেষ জীবনে এসে 'মাআরিফুল কুরআন' নামে তাফসীর সংকলন করেন। এ সম্পর্কে তিনি আমাকে বারবার বলেন যে, আমার মধ্যে তো তাফসীর বিষয়ে কলম ধরার কোনো যোগ্যতা নেই, কিন্তু হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব থানবী রহ.-এর তাফসীরটি আমি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করেছি মাত্র। সারাটা জীবন তিনি এ কথা বলেছেন। কারণ বড়ো বড়ো আলেম তাফসীর বিষয়ে কথা বলতে কাঁপতে থাকেন।

জিহবায় তালা লাগাও

আমার স্মরণ আছে যে, আমার ওয়ালেদ মাজেদ মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ.-এর নিকট এক ব্যক্তি আসা-যাওয়া করতো। সে খুব বেশি কথা বলতো। কথা বলতে আরম্ভ করলে আর থামার নাম নেই। এক প্রশ্নের পর আরেক প্রশ্ন করতো, তারপর তৃতীয় প্রশ্ন করতো। অবিরাম কথা বলতেই থাকতো। হযরত ওয়ালিদ ছাহেব যেহেতু অত্যন্ত বিনয়ী ও ভদ্র মানুষ ছিলেন, এ জন্যে তিনি খুব বেশি ধর-পাকড় করতেন না। তিনি তার কথা সহ্য করে যেতেন।

একবার লোকটি হযরত ওয়ালেদ ছাহেবের নিকট বায়আত এবং ইসলাহী তা'আল্লুক করার আবেদন করে বললো, 'হযরত আমার মন চায় যে, আপনার সঙ্গে ইসলাহী সম্পর্ক স্থাপন করি। আপনার কাছে বায়আত হই। আপনি আমাকে কিছু যিকির ও নফল নামায বলে দিন।' হযরত ওয়ালেদ ছাহেব তাকে বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে ইসলাহী তা'আল্লুক করতে চাইলে ঠিক আছে, তবে তোমার জন্যে নফল ও যিকির ইত্যাদি নেই।' সে জিজ্ঞাসা করলো, 'তাহলে আমি কী করবো?' হযরত ওয়ালেদ ছাহেব বললেন, 'তোমার কাজ এই যে, তুমি তোমার জিহ্বায় তালা লাগাবে। তোমার জিহ্বা যে, সব সময় কাঁচির মতো চলতেই থাকে, তা বন্ধ করবে। প্রয়োজন পরিমাণ কথা বলবে। প্রয়োজনের অধিক একটি কথাও মুখ দিয়ে বের করবে না। এটাই তোমার চিকিৎসা, এটাই তোমার ওযীফা এবং এটাই তোমার

তাসবীহ। ঐ ব্যক্তির উপর এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ হতেই যেন কিয়ামত ভেঙ্গে পড়লো। কারণ, যে ব্যক্তি সারা জীবন অধিক কথা বলতে অভ্যস্ত, তার উপর এক মুহূর্তে ব্রেক লাগিয়ে দিলে তা হবে তার জন্যে কঠোর মুজাহাদা। সুতরাং ঐ ব্যক্তির জন্যে শুধুমাত্র কথা কম বলার মুজাহাদাই সফলতা বয়ে আনে। বিধায় এ পথে কথা কম বলার তীব্র প্রয়োজন রয়েছে। হাদীস শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيْهِ

'অসার ও অনর্থক বিষয় পরিহার করা মানুষের ইসলামের সৌন্দর্যের অন্যতম।'[১৯৮]

চেয়ারে বসে খাবার খাওয়া

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. একদিন দরসে আমাদেরকে একটা ঘটনা শুনিয়েছিলেন। তিনি বলেন, একদিন আমি কয়েকজন সঙ্গীসহ দেওবন্দ থেকে দিল্লী গিয়েছিলাম। দিল্লীতে পৌছার পর খাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলো। যেহেতু অন্য কোথাও খাওয়ার ব্যবস্থা ছিলো না, তাই হোটেলেই যেতে হলো। বলাবাহুল্য হোটেলে তো চেয়ার-টেবিলেই খাওয়ার ব্যবস্থা। দু'জন সাথী বললো, নীচে বসে খাওয়া সুন্নাত, তাই আমরা কিছুতেই চেয়ারে বসে খাবো না। তারা মনস্থির করলো, নীচে রুমাল বিছিয়ে বসে বেয়ারাকে দিয়ে খানা আনিয়ে সেখানেই খাবে। আমি তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলাম এবং বললাম, আজ চেয়ার-টেবিলে বসেই খেয়ে নিন। তারা বললো, চেয়ার-টেবিলে খাবো কেন, যখন নীচে বসে খাওয়াই সুন্নতের বেশি নিকটবর্তী? সুন্নতের উপর আমল করতে গিয়ে ভয় করবো কেন? কেনই বা লজ্জাবোধ করবো? আমি বললাম, ভয় ও লজ্জার বিষয় নয়, বরং ব্যাপারটা অন্য। আপনারা এখানে এই পরিবেশে নীচে কাপড় বিছিয়ে খেতে তো পারবেন, কিন্তু তাতে মানুষের কাছে সুন্নাত তামাশার বিষয়ে পরিণত হবে এবং সুন্নতের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। সুন্নতের অসম্মান ও অমর্যাদা করা কেবল গোনাহই নয়, অনেক সময় তা কুফরের পর্যায়েও পৌছে যায়।

এরপর তিনি তাদেরকে একটা ঘটনা শোনালেন। সুলায়মান ইবনে মিহ্‌রান আল-আ'মাশ রহ. নামে এক বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি আমাদের ইমাম

---

১৯৮. সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং- ২২৪০; সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- ৩৯৬৬; মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং- ১৬৪২; মুয়াত্তা মালিক, হাদীস নং- ১৪০২

আবু হানীফা রহ.–এরও উস্তায। সবগুলো হাদীসগ্রন্থে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। আ'মাশ অর্থ ক্ষীণদৃষ্টি, যার চোখের পালক ঝরে গেছে, ফলে আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। হযরত সুলায়মান ইবনে মিহ্রান রহ.-এর চোখে এ রকম সমস্যা থাকার কারণে তিনি আ'মাশ নামেই পরিচিত হয়ে উঠেন। তার এক শিষ্য ছিলো আ'রাজ (খোঁড়া)। এক পায়ে সমস্যা ছিলো বলে তিনি খুঁড়িয়ে হাটতেন, কিন্তু ছিলেন উস্তায-ভক্ত। সর্বক্ষণ উস্তাযের সাথে-সাথে থাকতেন। কোনও কোনও শিষ্য এমন হয়ে থাকে, যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উস্তাযের কাছে সমর্পিত করে রাখে। ফলে উস্তায যখন যেখানে যান, সেও সঙ্গে-সঙ্গে যায়। আ'মাশ রহ.-এর এই শিষ্য সে রকমই ছিলো। উস্তায যখন যেখানে আছেন, সঙ্গে তিনিও আছেন। উস্তায যখন বাজারে যান, তিনিও তার পিছনে পিছনে থাকেন। এই করে শেষ পর্যন্ত বাজারের লোকে ছন্দই বানিয়ে ফেলল–'অন্ধ গুরু খঞ্জ চেলা'। বিষয়টা হযরত আ'মাশ রহ. লক্ষ করলেন। শেষে একদিন শিষ্যকে বললেন, ভাই, আমি যখন বাজারে যাই তুমি আমার সাথে যাবে না। শিষ্য বললো, কেন? তিনি বললেন, দেখছো আমরা বাজারে গেলে লোকে আমাদের নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করে আর ছড়া কাটে 'অন্ধ গুরু খঞ্জ চেলা'? শিষ্য বললো, তাতে কি? نُؤجَرُ وَيَأْثَمُونَ 'আমরা সওয়াব পাবো, তারা গোনাহগার হবে।' অর্থাৎ অন্যকে নিয়ে উপহাস জায়েয নয়। উপহাস করলে উপহাসিত সওয়াব পায় আর উপহাসকারীর গোনাহ হয়। কাজেই আমাদের তো কোনও ক্ষতি নেই। বরং আমাদের লাভ। মুফ্তে সওয়াব পেয়ে যাবো। হযরত আ'মাশ রহ. উত্তর দিলেন,

نَسْلَمُ وَيَسْلَمُونَ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ نُؤجَرَ وَيَأْثَمُونَ

'আমরা সওয়াব পাবো আর তারা গোনাহগার হবে, এরচে' বরং ভালো আমরাও নিরাপদ থাকি, তারাও নিরাপদ থাকুক।' অর্থাৎ আমরাও ঠাট্টা থেকে বেঁচে থাকি, তারাও গোনাহ থেকে বেঁচে থাক। আমার সাথে যাওয়া তো ফরয-ওয়াজিব কিছু নয়। আবার না গেলে কোনও ক্ষতি নেই। বরং না গেলে ফায়দা আছে। মানুষ গোনাহ থেকে বেঁচে যাবে। তারা আমাদের মুসলিম ভাই। আমাদের কারণে গোনাহগার হবে এটা ভালো কথা নয়। তারচে' ভালো তাদেরও গোনাহ না হোক, আমরাও ঠাট্টা থেকে বেঁচে যাই। কাজেই এরপর আমার সাথে বাজারে যাবে না।

মনের বোঝা কাগজে রেখে দিলাম

আমার আব্বাজান মুফতী মুহাম্মাদ শফী' রহ. একদিন কাহিনী শোনাচ্ছিলেন। বললেন, একদিন আমি হযরত থানবী রহ.-এর সঙ্গে খানকাহ

থেকে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম। হযরত থানবী রহ. যখন খানকাহ থেকে বাড়ি যেতেন, তখন সাধারণ লোকদের জন্যে নির্দেশনা ছিলো, কেউ যেন তাঁর সঙ্গে না যায়। তাঁর সঙ্গে যাওয়া নিষেধ ছিলো। পীর ছাহেব কোথাও যাবেন আর ভক্ত-মুরীদদের একটি দল তার ডানে-বায়ে ও পিছনে হাঁটতে থাকবে এই দৃশ্য হযরত থানবী রহ. পছন্দ করতেন না। সেজন্যে তাঁর নিয়ম ছিলো, আমি যখন উঠে যাবো, তখন আমার সঙ্গে কেউ যেতে পারবে না। কথা যতো আছে, আগেই সেরে নিবে। আমি যখন বাড়ি যেতে রওনা হবো, তখন আমার সঙ্গে ডানে-বাঁয়ে কেউ থাকতে পারবে না। আমাকে একাকি যাওয়ার সুযোগ দাও। আরও আদেশ ছিলো, আমি যে মালপত্র নিয়ে যাবো, সেগুলো কেউ ধরতে পারবে না। আমার বোঝা আমি নিজেই বহন করে নিয়ে যাবো।

তার কারণ এই ছিলো যে, হযরত রহ. বলতেন, ভাই, আমি তো একজন খাদেম। খেদমত গ্রহণের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী! সেজন্যে চলার পথে ডানে-বাঁয়ে ও পিছনে মুরীদের বহর নিয়ে হাঁটা হযরত পছন্দ করতেন না। একজন সাধারণ মানুষ যেভাবে চলা-ফেরা করে, হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-ও ঠিক সেভাবেই চলতেন। তবে যদি কখনও এমন কোনো মুরীদ, যে হযরতের মেজায বোঝে তাঁর সঙ্গে যাওয়ার আবদার করতো, তা হলে তাতে তিনি বারণ করতেন না।

হযরতের সঙ্গে আমার আব্বাজানের বিশেষ সম্পর্ক ছিলো। তিনি বলেছেন, একদিন আমি হযরতের সঙ্গে খানকাহ থেকে তাঁর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পথে হঠাৎ পকেট থেকে একটি কাগজ বের করলেন এবং তাতে কিছু লিখলেন। পরে আবার কাগজটি পকেটে রেখে দিলেন। তারপর বললেন, 'মওলবী শফী'! তুমি তো দেখেছো, আমি কী করেছি?'

আব্বাজন বললেন, না হযরত! আমি বিষয়টি বুঝতে পারিনি। ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে দিন।

হযরত থানবী রহ. বললেন:

'আমার একটি কাজের কথা মনে পড়ে গেলো। সেটি আমার মনের উপর একটি বোঝা হয়ে ছিলো। সেটি আমি কাগজে লিখে নিলাম। মনের বোঝাটি কাগজে স্থানান্তর করে দিলাম। এখন আলহামদু লিল্লাহ মনটা অবসর আছে। এই অন্তর তো আসলে এক কাজের জন্যেই। তা হলো আল্লাহ পাকের যিকির। মনে যখনই কোনো অস্থিরতা বা পেরেশানির বোঝা চাপবে, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে, যাতে অন্তর সেই সত্তার জন্যে অবসর হয়ে যায়, যার জন্যে একে তৈরি করা হয়েছে।'

মালিকানা সম্পর্কে ভুল ধারণা না হয়

আমার আব্বাজান মুফতী মুহাম্মাদ শফী' রহ.-এর একটি ব্যক্তিগত কক্ষ ছিলো। ওই কক্ষে তিনি বিশ্রাম করতেন। একটি চৌকি বিছানো থাকতো। তার উপর তিনি শয়ন করতেন। আবার তারই উপর বসে লেখা-পড়ার কাজ করতেন। ওখানেই লোকজন এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতো। আমি দেখতাম, বাইরে থেকে যদি কোনো জিনিস উক্ত কক্ষে আসতো, তা হলে কাজ সমাধা হওয়ার পর সঙ্গে-সঙ্গে তিনি তা ফেরত পাঠিয়ে দিতেন। যেমন, তিনি এক গ্লাস পানি চাইলেন। অন্য কক্ষ থেকে কেউ গ্লাসে করে পানি এনে দিলো। তিনি পানিটুকু পান করেই বলতেন, গ্লাসটা নিয়ে যাও এবং যেখান থেকে এনেছো, সেখানে রেখে আসো। গ্লাস ফেরত নিতে বিলম্ব হলে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন। এভাবে প্লেট, জগ, গ্লাস যাকিছু বাইরে থেকে আসতো, সঙ্গে-সঙ্গে ফেরত পাঠিয়ে দিতেন।

একদিন আমি বললাম, এগুলো ফেরত নিতে যদি বিলম্ব হয়, তা হলে দয়া করে ক্ষমা করে দেবেন। তিনি বললেন, তুমি বুঝতে পারনি। ব্যাপার হলো, আমি আমার ওসিয়তনামায় লিখেছি, এই কক্ষে যাকিছু মালপত্র আছে, সবগুলোর মালিক আমি। আর অন্যান্য কামরায় যেসব মাল আছে, সেগুলোর মালিক তোমাদের আম্মাজান। সেজন্যেই আমি ভয় করি, যদি কখনও অন্য কোনো কক্ষের কোনো সামান আমার কক্ষে আসে আর সেই অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়ে যায়, তা হলে ওসিয়তনামার ভাষ্য অনুযায়ী এগুলোর মালিক আমি হবো। অথচ এর মালিক আমি নই। এজন্যেই আমি অন্য কোনো কক্ষের কোনো জিনিস এনে আমার কক্ষে না রেখে তাড়াতাড়ি ফেরত দিতে চাই।

আপনি টিকেট ছিঁড়ে ফেললেন কেন?

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব একবার রেলভ্রমণের জন্যে স্টেশনে গেলেন। গাড়িতে উঠতে গিয়ে দেখলেন, তিনি যেই শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করেছেন, সেই শ্রেণীর বগিতে তিলধারণের ঠাঁই নেই। গাড়িও ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। হাতে এতটুকু সময়ও ছিলো না যে, কাউন্টারে ফিরে গিয়ে টিকিট পরিবর্তন করে আনবেন।

অগত্যা তিনি উচ্চ শ্রেণীর একটি বগিতে উঠে বসলেন। ভাবলেন, চেকার টিকিট চেক করতে আসলে টিকিট পরিবর্তন করে নেবেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে পুরো রাস্তায় কোনো চেকার এলো না। এমনকি তাঁর নামার সময় এসে পড়লো। তিনি গাড়ি থেকে নেমে সোজা কাউন্টারে চলে গেলেন এবং উভয়

শ্রেণীর মাঝে ভাড়ার ব্যবধান জেনে নিলেন। তারপর ওই পরিমাণ মূল্যের একটি টিকিট ক্রয় করে সাথে-সাথে ওখানে দাঁড়িয়েই ছিঁড়ে ফেললেন।

রেলওয়ের যেই হিন্দু অফিসার টিকিট দিয়েছিলেন তিনি ঘটনাটি দেখে খুব বিস্মিত হলেন যে, ঘটনা কী; লোকটি টাকা দিয়ে টিকিট ক্রয় করলো আবার এখানে দাঁড়িয়েই তা ছিঁড়ে ফেললো! তার মনে হয়তো সন্দেহ জাগলো যে, লোকটির মাথায় কোনো সমস্যা আছে। কৌতূহলবশত তিনি বাইরে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি টিকিট ক্রয় করে তা ছিঁড়ে ফেললেন; ব্যাপার কী?

আব্বাজান তাকে পুরো ঘটনা শুনিয়ে বললেন, টিকিটের চেয়ে উচ্চ শ্রেণীতে ভ্রমণ করার কারণে রেলওয়ে এই পরিমাণ অর্থ আমার কাছে পাওনা হয়ে গেছে। তাই এই প্রক্রিয়ায় আমি তাকে তার পাওনা পরিশোধ করে দিলাম। আর যেহেতু এই টিকিটটি বেকার ছিলো, তাই ছিঁড়ে ফেললাম।

লোকটি বললো, কিন্তু আপনি তো স্টেশনে চলে এসেছেন এবং রেল থেকে নেমে এসেছেন। এখন তো আপনার থেকে কেউ বাড়তি ভাড়া চাইতো না। তারপরও আপনি এটা কেন করলেন? এর জন্যে তো আপনাকে কেউ জিজ্ঞাসা করতো না।

আব্বাজান উত্তর দিলেন, আপনি এটা ঠিকই বলেছেন যে, কোনো মানুষ এখন আর আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না। কিন্তু আল্লাহ পাক অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবেন। এর জন্যে আমাকে একদিন অবশ্যই আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সেজন্যে একাজটি করা খুবই জরুরি ছিলো।

পাতিল হাতে মুফতী সাহেব

আমার শাইখ হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ. (আল্লাহ তাঁর মর্যাদা সুউচ্চ করুন) বলেন, একবার আমি আমার চেম্বারে বসে আছি (হযরতের চেম্বার তখন প্রিন্স রোডে ছিলো এবং আমাদের বাসাও তখন প্রিন্স রোডের কাছেই ছিলো) এমন সময় দেখলাম, পাকিস্তানের মুফতীয়ে আযম হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. একটি পাতিল নিয়ে খুব সাধারণ মানুষের মতো ফুটপাত দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। আমি তো এ দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেলাম যে, সারা বিশ্ব যার তাকওয়া, পরহেযগারী ও গুণগরিমায় মুখরিত, তিনি এভাবে একজন সাধারণ মানুষের মতো পাতিল হাতে নিয়ে হাঁটছেন? তখন সাথীদেরকে বললাম, দেখুন তো! তাঁকে দেখে কারো পক্ষে বোঝার উপায় আছে কি, তিনি পাকিস্তানের মুফতীয়ে আযম?

এরপর হযরত ডা. আরেফী রহ. বললেন, আল্লাহ রব্বুল আলামীন যাকে তাঁর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক নসিব করেন, তিনি নিজেকে সাধারণ মানুষের মাঝে এমনভাবে মিশিয়ে রাখেন, যা দেখে কখনো বোঝা যায় না যে, তিনি কোন স্তরের মানুষ।

আর এটাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। নিজের বিশেষ শান বজায় রাখার জন্যে সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা তাঁর সুন্নাতের পরিপন্থী।

মুরুব্বীর কথা মান্য করার সুফল

রবিবার দিন হযরত ওয়ালেদ ছাহেবের মজলিস হতো। কারণ, সে সময় রবিবারে ছিলো সরকারি ছুটি। এটা শেষ মজলিসের ঘটনা। এর পরে হযরত ওয়ালেদ ছাহেবের আর কোনো মজলিস হয়নি। পরবর্তী মজলিসের দিন আসার পূর্বেই হযরত ওয়ালেদ ছাহেবের ইন্তিকাল হয়ে যায়। ওয়ালেদ ছাহেব অসুস্থ ও শয্যাশায়ী হওয়ার ফলে মানুষ তাঁর কক্ষে সমবেত হতো। ওয়ালেদ ছাহেব চৌকির উপর থাকতেন। মানুষ সামনে, নীচে ও সোফার উপর বসতো। সেদিন অনেক মানুষ আসে এবং কামরা ভরে যায়। এমনকি কিছু লোক দাঁড়িয়েও থাকে। আমি কিছু বিলম্বে পৌছি। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব আমাকে দেখে বললেন যে, তুমি এখানে আমার নিকটে চলে আসো। আমি কিছুটা সংকোচ করতে লাগলাম যে, মানুষ ডিঙ্গিয়ে যাবো এবং হযরত ওয়ালেদ ছাহেবের নিকট বসবো! যদিও এ কথা আমার মাথায় ছিলো যে, মুরুব্বী কোনো কথা বললে তা মানা উচিত। কিন্তু আমি কিছুটা ইতস্ত করতে লাগলাম। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব যখন আমার ইতস্তভাব দেখলেন, তখন পুনরায় বললেন, তুমি এখানে আসো, তোমাকে একটা ঘটনা শোনাবো। যাই হোক, কোনো রকমে আমি সেখানে পৌছলাম এবং হযরত ওয়ালেদ ছাহেবের নিকট বসলাম।

ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বললেন, একবার হযরত থানবী রহ.-এর মজলিস হচ্ছিলো। সেখানেও এরকমই ঘটনা ঘটে যে, অনেক লোকের কারণে মজলিসের জায়গা ভরে যায় এবং জায়গা সংকীর্ণ হয়ে যায়। আমি কিছুটা দেরিতে পৌছি। তখন হযরত থানবী রহ. বললেন, তুমি এখানে আমার নিকটে চলে আসো। আমি কিছুটা ইতস্ত করতে লাগলাম যে, একেবারে হযরতের নিকট গিয়ে বসবো! তখন হযরত পুনরায় বললেন, তুমি এখানে আসো, তোমাকে একটা ঘটনা শোনাবো। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব বলেন,

তারপর আমি কোনো রকমে সেখানে পৌঁছলাম। হযরতের নিকটে গিয়ে বসলাম। তখন হযরত একটি ঘটনা শোনালেন।

ঘটনা এই শোনালেন যে, মোঘল সম্রাট আলমগীরের পিতার ইন্তিকালের পর তার স্থলাভিষিক্তের বিষয় সামনে আসে। তাঁরা ছিলেন দুই ভাই। এক আলমগীর, আরেক দারাশিকো। পরস্পরে রেশারেশি ছিলো। আলমগীরও তাঁর বাবার স্থলাভিষিক্ত ও বাদশাহ হতে চাচ্ছিলেন। তার ভাই দারাশিকোও সিংহাসনের প্রার্থী ছিলেন। সে সময় একজন বুযুর্গ ছিলেন। উভয়ে চাইলেন ঐ বুযুর্গের নিকট গিয়ে নিজের পক্ষে দু'আ করাবেন। প্রথমে দারাশিকো ঐ বুযুর্গের যিয়ারত ও দু'আর জন্যে গেলেন। তখন ঐ বুযুর্গ আসনের উপর বসা ছিলেন। ঐ বুযুর্গ দারাশিকোকে বললেন, এখানে আমার নিকটে চলে আসো এবং আসনের উপর বসো। দারাশিকো বললেন, না হযরত! আমার সাধ্য নেই যে, আপনার নিকট আসনের উপর বসবো। আমি তো এখানে নীচেই ঠিক আছি। ঐ বুযুর্গ আবার বললেন, আমি তোমাকে ডাকছি, এখানে চলে আসো। কিন্তু তিনি মানলেন না। তার নিকট গেলেন না। সেখানেই বসে থাকলেন। ঐ বুযুর্গ বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছা। তারপর ঐ বুযুর্গের যেই নসীহত করার ছিলো তা করলে তিনি ফিরে গেলেন।

তার চলে যাওয়ার কিছু সময় পর আলমগীর রহ. এলেন। তিনি নীচে বসতে চাইলে ঐ বুযুর্গ বললেন, তুমি এখানে আমার নিকট চলে আসো। তিনি অবিলম্বে উঠলেন এবং ঐ বুযুর্গের নিকট গিয়ে আসনের উপর বসলেন। তারপর তার যা নসীহত করার ছিলো তা করলেন। আলমগীর চলে গেলে ঐ বুযুর্গ মজলিসে উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, ঐ দুই ভাই তো নিজেরাই নিজেদের ফয়সালা করলো। দারাশিকোকে আমি আসন পেশ করেছিলাম, সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। আর আলমগীরকে পেশ করলে সে তা গ্রহণ করেছে। এ জন্যে উভয়ের ফয়সালা হয়ে গেছে। এখন রাজসিংহাসন আলমগীরই লাভ করবে। সুতরাং তিনিই লাভ করেন। এ ঘটনা হযরত থানবী রহ. হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-কে শোনান।

ঝগড়া পরিহারের সুফল

হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি হকের উপর থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া পরিহার করবে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের মধ্যভাগে তাকে মহল দান করবেন। আমি আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ.-কে সারা জীবন এ হাদীসের উপর আমল করতে দেখেছি। বিবাদ

নিরসনের জন্যে তিনি বড়ো থেকে বড়ো হক ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছেন। তাঁর এমন একটা ঘটনা শোনাচ্ছি, বর্তমানে মানুষের যা বিশ্বাস করা কঠিন মনে হবে। এই দারুল উলূম, যা এখন করাচীর কৌরঙ্গী এলাকায় প্রতিষ্ঠিত, প্রথমে নানকওয়াড়ায় ছোট্ট একটি ভবনে প্রতিষ্ঠিত ছিলো। কাজ বেড়ে গেলে ঐ জায়গা দারুল উলূমের জন্যে সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়। বিস্তৃত জায়গার প্রয়োজন পড়ে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এমন সাহায্য লাভ হয় যে, একেবারে শহরের মাঝখানে সরকারের পক্ষ থেকে অনেক বড়ো ও বিস্তৃত জায়গা পাওয়া যায়। যেখানে বর্তমানে ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত আছে। হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ.-এর মাযারও সেখানে রয়েছে। এই বিস্তৃত জায়গা দারুল উলূম করাচীর নামে বরাদ্ধ দেয়া হয়। জায়গা বরাদ্ধের কাগজপত্রও হাতে চলে আসে। জায়গাও দখলে চলে আসে। একটি কক্ষও বানিয়ে দেওয়া হয়। টেলিফোনের সংযোগও দেওয়া হয়। তারপর দারুল উলূমের ভিত্তিপ্রস্তর রাখার সময় একটা সমাবেশও করা হয়। যাতে পুরো পাকিস্তানের বড়ো বড়ো আলেম-উলামা তাশরীফ আনেন। ঐ সমাবেশের সময় কিছু লোক ঝগড়া শুরু করে যে, এই জায়গা দারুল উলূমের পাওয়া উচিত ছিলো না, বরং অমুকের পাওয়া উচিত ছিলো। ঘটনাক্রমে ঝগড়ার মধ্যে তারা এমন কিছু বড়ো ব্যক্তিত্বকেও নিজেদের সাথে শামিল করে নেয়, যারা ছিলেন হযরত ওয়ালেদ ছাহেবের জন্যে সম্মানের পাত্র। ওয়ালেদ ছাহেব তো প্রথমে যে কোনোভাবে ঝগড়া মিটাতে চাইলেন, কিন্তু ঝগড়া শেষ হলো না। ওয়ালেদ ছাহেব চিন্তা করলেন, যে মাদরাসার সূচনাই হচ্ছে ঝগড়ার মাধ্যমে, তার মধ্যে কী বরকত হবে? সুতরাং হযরত ওয়ালেদ ছাহেব তার এই ফয়সালা শুনিয়ে দিলেন যে, আমি এ জায়গা ছেড়ে দিচ্ছি।

দারুল উলূমের ব্যবস্থাপনা পরিষদ এ সিদ্ধান্ত শুনে হযরত ওয়ালেদ ছাহেবকে বললেন, হযরত! এ আপনি কেমন ফয়সালা করছেন? এতো বড়ো জায়গা তাও শহরের মাঝখানে এমন জায়গা পাওয়া তো কঠিন। এ জায়গা আপনি পেয়েছেন, তা আপনার দখলেও আছে, আপনি এমন জায়গা ছেড়ে দিচ্ছেন! হযরত ওয়ালেদ ছাহেব উত্তরে বললেন যে, আমি ব্যবস্থাপনা পরিষদকে এ জায়গা ছাড়তে বাধ্য করবো না। কারণ, ব্যবস্থাপনা পরিষদ মূলত এই জায়গার মালিক হয়ে গিয়েছে। আপনারা চাইলে এখানে মাদরাসা করুন। আমি এর মধ্যে থাকবো না। কারণ, যে মাদরাসার ভিত্তি ঝগড়ার উপর রাখা হচ্ছে, ঐ মাদরাসার মধ্যে আমি বরকত দেখছি না। তারপর

হাদীস শোনালেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি হকের উপর থেকে ঝগড়া হতে আত্মরক্ষার জন্য নিজের দাবী ছেড়ে দিবে তাকে জান্নাতের মাঝখানে ঘর দেওয়ার জন্যে আমি দায়িত্ব নিবো। আপনারা বলছেন যে, শহরের মাঝখানে এমন জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে, কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে, আমি তাকে জান্নাতের মাঝখানে ঘর দেওয়াবো। একথা বলে ঐ জায়গা ছেড়ে দেন। বর্তমান যুগে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া কঠিন যে, এমন ঝগড়ার কারণে কোনো ব্যক্তি এতো বড়ো জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার উপর যার পরিপূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে, সেই এ কাজ করতে পারে। এরপর আল্লাহ তা'আলা এমন মেহেরবানী করলেন যে, কয়েক মাস পরেই ঐ জমি থেকে কয়েকগুণ বড় জমি দান করলেন। যেখানে বর্তমানে দারুল উলূম প্রতিষ্ঠিত। এটা তো আমি আপনাদের সামনে একটা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করলাম। অন্যথায় হযরত ওয়ালেদ ছাহেবকে আমি সারাজীবন এ হাদীসের উপর যথাসাধ্য আমল করতে দেখেছি। হ্যাঁ, তবে যদি অন্য ব্যক্তি ঝগড়ার মধ্যে আটকিয়েই ফেলে, প্রতিহত করা ছাড়া কোনো উপায় না থাকে, তবে সে ভিন্ন কথা। আমরা ছোট ছোট বিষয় নিয়ে বসে যাই যে, অমুক সময় অমুক ব্যক্তি এ কথা বলেছিলো, অমুক এই করেছিলো, এখন সবসময়ের জন্যে তা অন্তরে বসিয়ে নেই। ঝগড়া দাঁড়িয়ে যায়। আজ আমাদের পুরো সমাজকে এই জিনিস ধ্বংস করছে। ঝগড়া মানুষের দ্বীনকে মুণ্ডন করে। মানুষের অন্তরকে বরবাদ করে। এজন্যে আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পরে ঝগড়া মিটিয়ে দিন। যদি দুই মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া দেখেন, তাহলে তাদের মধ্যে আপোস করার পুরোপুরি চেষ্টা করুন।

রোগী জানে না রোগের কথা

আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. তাঁর নিজের এ ঘটনা শুনিয়েছেন যে, একবার আমার ওয়ালেদ ছাহেব (অর্থাৎ, আমার দাদা) অসুস্থ ছিলেন। দেওবন্দে অবস্থান করছিলেন। সে সময় দিল্লীতে একজন বিখ্যাত অন্ধ হাকীম ছিলেন। অত্যন্ত দক্ষ এবং বিজ্ঞ হাকীম ছিলেন। তার মাধ্যমে চিকিৎসা চলছিলো। আমি ওয়ালেদ ছাহেবের অবস্থা বলে ঔষধ আনার জন্যে দেওবন্দ থেকে দিল্লী যাই। আমি তার দাওয়াখানায় পৌছি। ওয়ালেদ ছাহেবের অবস্থা বলে ঔষধ দিতে বলি। হাকীম ছাহেব ছিলেন অন্ধ। তিনি আমার আওয়াজ শুনে বললেন, আমি

তোমার ওয়ালেদ ছাহেবের ঔষধ তো পরে দেবো, প্রথমে তুমি নিজের জন্যে ঔষধ নাও। আমি বললাম, আমি তো ঠিক আছি, কোনো রোগ নেই। হাকীম ছাহেব বললেন, না, তুমি নিজের জন্যে এ ঔষধ নাও। সকালে এটা খাবে, দুপুরে এটা খাবে এবং সন্ধ্যায় এটা খাবে। এক সপ্তাহ পরে যখন আসবে তখন তোমার অবস্থা জানাবে। সুতরাং তিনি প্রথমে আমাকে ঔষধ দিলেন তারপর ওয়ালেদ ছাহেবের ঔষধ দিলেন। আমি যখন বাড়িতে ফিরে আসলাম এবং ওয়ালেদ ছাহেবকে বললাম, হাকীম সাহেব এভাবে আমাকেও ঔষধ দিয়েছেন। ওয়ালেদ ছাহেব বললেন, যেভাবে হাকীম ছাহেব বলেছেন সেভাবে করো। তার ঔষধ ব্যবহার করো। এক সপ্তাহ পর যখন পুনরায় হাকীম সাহেবের কাছে গেলাম তখন আমি বললাম যে, হাকীম সাহেব এখনো পর্যন্ত আমার এ রহস্য বুঝে আসেনি এবং কোনো রোগ ধরা পড়েনি। হাকীম সাহেব বললেন, গত সপ্তাহে তুমি যখন এসেছিলে তখন তোমার আওয়াজ শুনে আমার অনুমান হয় যে, তোমার ফুসফুসে সমস্যা হয়েছে এবং পরবর্তীতে টিবি রোগ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এজন্যে আমি তোমাকে ঔষধ দিয়েছি। আলহামদু লিল্লাহ! এখন তুমি এ রোগ থেকে বেঁচে গিয়েছো।

লক্ষ্য করুন! রোগীর খবর নেই যে, তার কী রোগ হয়েছে। চিকিৎসকের একথা বলে দেওয়া যে, তোমার এই রোগ হয়েছে, এটা তার অনুগ্রহ। তাই এটা বলা হবে না যে, চিকিৎসক তাকে রোগী বানিয়েছে। বরং তিনি তো বলে দিয়েছেন যে, তোমার মধ্যে এই রোগ হয়েছে। তুমি চিকিৎসা করাও! এ কথা বলার কারণে চিকিৎসকের উপর রাগ করার ও অসন্তুষ্ট হওয়ার কোনো অর্থ নেই।

দাওয়াত বনাম আদাওয়াত

আমাদের নিকটঅতীতের এক বুযুর্গ ছিলেন হযরত ইদরীস কান্ধলভী রহ. (আল্লাহ তাঁর মর্যাদা আরো সুউচ্চ করুন)। এই বুযুর্গ আমার আব্বাজান হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ.-এর একান্ত বাল্যবন্ধু ছিলেন। একবার তিনি লাহোর থেকে করাচী তাশরীফ আনলেন এবং আব্বাজানের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে দারুল উলূমে আসলেন। এমন সময় আসলেন, যখন খাবারের সময় না। তাঁর আগমনে আব্বাজান অনেক খুশি হলেন এবং সম্মানের সঙ্গে সংবর্ধনা জানালেন। যখন তিনি বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন আব্বাজান বললেন, ভাই ইদরীস ছাহেব! আমার দিলের তামান্না ছিলো আপনি আমাদের সঙ্গে এক বেলা খাবার খাবেন। কিন্তু সমস্যা হলো, আপনার অবস্থান এখান থেকে

অনেক দূরে। আপনার হাতে সময় একেবারেই কম। এখন যদি আমি আপনাকে পীড়াপীড়ি করি যে, আপনি আমাদের সঙ্গে এক বেলা খাবার খেয়ে যান, তাহলে আমি মনে করি এটা 'দাওয়াত' হবে না, বরং 'আদাওয়াত' (দুশমনি) হবে। কারণ, আপনার হাতে সময় অনেক কম। আর আরেকবার আসতে চাইলে তাতেও আপনার চার-পাঁচ ঘণ্টা সময় ব্যয় হবে। এতে আপনার অনেক কষ্ট হবে। এ জন্যে আমার মন চাইলেও আপনাকে দাওয়াত করছি না। কিন্তু দাওয়াত ছাড়াও মন মানছে না। তাই আপনাকে দাওয়াত করলে আমার যে পয়াসা খরচ হতো সেই সামান্য পরিমাণ পয়সা আপনি আমার পক্ষ থেকে হাদিয়া হিসাবে কবুল করুন। হযরত মাওলানা ইদরীস রহ. পয়সাগুলো আব্বাজানের কাছ থেকে গ্রহণ করে মাথার উপর রেখে বললেন, এটা আমার জন্যে অনেক বড়ো নেয়ামত। বস্তুত আমারও দিলের তামান্না ছিলো আপনার সঙ্গে এক বেলা খাবার খাবো। কিন্তু সময় সল্পতার কারণে কোনো অবকাশ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এখন আপনি আমার জন্যে পথ খুলে দিলেন।

এখানে দেখুন আব্বাজান যদি তাঁকে বলতেন, আপনাকে এক বেলা খাবার আমার সঙ্গে অবশ্যই খেতে হবে। এরপর তিনি বলতেন, ভাই আমার তো সময় নেই। প্রতি উত্তরে আব্বাজান বলতেন, না ভাই বন্ধুত্বের দাবি হলো অবশ্যই আপনাকে আমার দাওয়াত রাখতে হবে। তাহলে তিনি যে জরুরী কাজে এতো দীর্ঘ সফর করে এসেছেন সে কাজ বাদ দিয়ে হয়তো পাঁচ-সাত ঘণ্টা সময় কুরবানী করতেন। কিন্তু এটা আর তখন 'দাওয়াত' থাকতো না, 'আদাওয়াত' হয়ে যেতো।

নতুন আলেমের আপত্তি ও পুরাতন আলেমের সুগভীর উত্তর

আমার স্মরণ হলো, আমি দারুল উলূম থেকে নতুন ফারেগ হওয়ার পর একবার হযরত ওয়ালেদ মাজেদ রহ.-এর সঙ্গে গাড়িতে যাচ্ছিলাম। গাড়ি সিগনালে থেমে গেলো। আপনারা দেখেছেন, এসব ক্ষেত্রে অনেক ভিক্ষুক থাকে। একজন ভিক্ষুক চলে এলো এবং কিছু চাইলো। হযরত ওয়ালেদ মাজেদ রহ. কিছু বের করে তাকে দিয়ে দিলেন। আমি যেহেতু তখন নগদ নগদ পড়েছিলাম যে, যে ব্যক্তির জন্যে ভিক্ষা করা হারাম তাকে ভিক্ষা দেওয়াও নাজায়েয, তাই আমি হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-কে বললাম, হযরত! এরা সবাই তো পেশাদার ভিক্ষুক। এদের জন্যে তো ভিক্ষা করাই হালাল নয়। আল্লামা শামী রহ. তো লিখেছেন এদেরকে ভিক্ষা দেওয়াও

জায়েয নেই। তাই এরা ভিক্ষার হকদারও নয়। তখন হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. এমন একটা কথা বললেন, যা তার মতো উঁচু মাপের ব্যক্তিই বলতে পারেন। তিনি বললেন, ভাই কিসের হকদার হওয়ার কথা বলছো! তুমি বলো, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে আর তোমাকেও হকদার হওয়ার ভিত্তিতে দেওয়ার ফয়সালা করেন তাহলে আমার আর তোমার কী হক রয়েছে? আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যেই রিযিক লাভ হচ্ছে এবং তাঁর যেই অসংখ্য নেয়ামত বৃষ্টির মতো বর্ষিত হচ্ছে, তুমি কি তার হকদার? তুমি যদি নিজের আমল এবং চিন্তা-চেতনার প্রতি দৃষ্টি দাও তাহলে হকদার হওয়ার সুদূর সম্ভাবনাও দৃষ্টিগোচর হবে না, বরং রিযিক বন্ধ করে দেওয়ার হকদার বলে পরিগণিত হবে।

আল্লাহ তা'আলা যদি হকদার হওয়া আর না হওয়ার ভিত্তিতে দিতে আরম্ভ করেন, তাহলে আমাদের কী পরিণতি হবে? আসল কথা এই যে, ফুকাহায়ে কেরাম এ মাসআলা সেই ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন, যার সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে জানা আছে যে, তার জন্যে ভিক্ষা করা হালাল নয় এবং তাকে ভিক্ষা দিলে অধিক পরিমাণে গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু কোনো ভিক্ষুককে লক্ষণের ভিত্তিতে পেশাদার মনে হলেও যেহেতু নিশ্চিতভাবে জানা থাকে না, তাই তাকে ধমক না দিয়ে ভিক্ষা দেওয়াই উত্তম। কুরআনে পাকে এ বিষয়ে বলা হয়েছে,

أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝

'ভিক্ষুককে ধমক দিবেন না।'[১৯৯]

কারণ, তার হকদার হওয়ার প্রকৃত অবস্থা নিশ্চিতভাবে জানা নেই। হ্যাঁ, ভিক্ষা না দেওয়ার ব্যাপারে নিজের প্রয়োজন, সুযোগ-সুবিধা ও সাহস দেখা যেতে পারে, কিন্তু ধমক দেওয়া থেকে সর্বাবস্থায় বিরত থাকতে হবে।

ধমকই আমাকে পাল্টে দিয়েছে

আমি আমার মহান পিতা রহ.-এর মধ্যেও এ ব্যাপারটা বারবার লক্ষ করেছি। এমনিতে তো তিনি অত্যন্ত নম্র স্বভাবের লোক ছিলেন। রাগ করতেন না বললেই চলে। যে- কারও সাথে তার ব্যবহার ছিলো কোমল ও বিনীত। কিন্তু কখনও কখনও এমনও হতো যে, হঠাৎ কারও উপর তুচ্ছ কোনো ব্যাপারে খুব রেগে গেলেন। স্থূলদর্শীদের কাছে তা বেখাপ্পা মনে হতো।

---

১৯৯. সূরা আদদুহা, আয়াত: ১০

তাদের ধারণায় লোকটার উপর বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেক বান্দাদের অন্তরে এই বোধ জাগিয়ে দেন যে, কখন কার প্রতি কী আচরণ করতে হবে। অন্যরা তা বুঝতে পারে না বলেই ভুল ধারণা করে।

তাঁর এরকম একটা ঘটনা শুনুন। একবার একজন খ্যাতিমান উচ্চ শিক্ষিত ও গুরুত্বপূর্ণ লোক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসে। কথাবার্তা শুরু হলো। কিন্তু তিনি হয়ত দু'তিনটি বাক্যই বলতে পেরেছিলেন, এরই মধ্যে আব্বাজান রহ. তাকে কঠিনভাবে তিরস্কার করতে শুরু করে দিলেন। আমি স্তম্ভিত। আজ পর্যন্ত তাকে এমন কঠিনভাবে কাউকে ধমকাতে দেখিনি। এমন কি তিনি তাকে এ পর্যন্তও বললেন যে, 'এখান থেকে বের হয়ে যাও'। এভাবে তিনি তাকে অফিস থেকে বের করে দিলেন। অদ্যাবধি আমি এমন দৃশ্য দেখিনি। আমি ভাবলাম, ইয়া আল্লাহ! এই লোক তো বিগড়ে যাবে। কারণ সে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, কোর্ট-প্যান্ট পরিহিত ভদ্রলোক। দাড়ি আছে নামমাত্র। আব্বাজান রহ. তাকে যেভাবে ধমকিয়েছেন, তাতে সে চিরতরে দূরে সরে যাবে। কিন্তু আমার সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। সে ব্যক্তি নিজেই একদিন আমাকে বলেছে, মুফ্তী ছাহেবের সেই ধমক আমার জীবনকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে। সেই ধমক আমার উপর এমনই প্রভাব বিস্তার করে যে, তাতে আমার চিন্তা-চেতনার কেন্দ্রবিন্দুই বদলে যায়।

বদলা নাও অথবা ক্ষমা করো

আমার পিতা হযরত মাওলানা মুফ্তী মুহাম্মদ শফী রহ. যখন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি সেই সময়কার কথা। চেতনা ফিরে এলে তিনি সর্বপ্রথম যে কথা আমাকে বললেন, তা হলো–

'যতো লোকের সাথে আমার সম্পর্ক আছে, তাদের সকলের কাছে আমার পক্ষ থেকে একটি চিঠি পাঠাও। লিখে দাও যে, আমার দ্বারা কারও কোনো হক নষ্ট হয়ে থাকলে, কারও গীবত করে থাকলে বা কারও সাথে কোনো মন্দ আচরণ করে থাকলে, সে যেন তার বদলা নিয়ে নেয়, অথবা ক্ষমা করে দেয়।

নির্দেশ মতো আমি একখানি পত্র লিখি এবং 'তালাফিয়ে মা ফাত' (ক্ষতিপূরণ) নামে প্রথমে 'আল-বালাগ' পত্রিকায় ছেপে দেই। তারপর হ্যান্ডবিল আকারেও ছেপে তাঁর সাথে যাদের সম্পর্ক ছিলো তাদের সকলের কাছে পাঠিয়ে দেই।

আমার মৃত্যুর কারণে যেনো রোযাদারের কষ্ট না হয়

হযরত ওয়ালেদ ছাহাবের এ ঘটনা আপনাদেরকে পূর্বেও শুনিয়েছি যে, তার অন্তিম রোগে রমাযানুল মুবারক মাস চলে আসে। রমাযানুল মুবারক মাসে বারবার তাঁর হার্টের কষ্ট হয়। এতো মারাত্মক কষ্ট হয় যে, কখনো ধারণা হতো, এটাই হয়তো শেষ আঘাত। এমন অসুস্থতার মধ্যে যখন রমাযান মাস পার হয়ে গেলো, তখন তিনি একদিন বললেন, প্রত্যেক মুসলমানের আশা হয়, রমাযান মাসে যেন তার মৃত্যু নসীব হয়। আমার অন্তরেও এ কামনা জাগতো, আল্লাহ তা'আলা যেন রমাযানের মুবারক মাসে আমার মউত দান করেন। কারণ, হাদীস শরীফে এসেছে, রমাযানুল মুবারক মাসে জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার অবস্থা বিস্ময়কর যে, আমি বারবার দু'আ করার কথা চিন্তা করছিলাম যে, হে আল্লাহ! রমাযান মাসে আমার মৃত্যু দান করুন। কিন্তু আমার মুখে এই দু'আ কখনো আসেনি। কারণ আমার চিন্তা হতো, আমি আমার জন্যে রমাযান মাসে মৃত্যু চাইবো! তাহলে আমার সেবা শুশ্রূষাকারী এবং সাক্ষাতপ্রার্থীদের সকলকে রোযা অবস্থায় মারাত্মক কষ্ট করতে হবে। রোযাবস্থায় তারা ব্যথা পাবে। রোযাবস্থায় তাদেরকে কাফন দাফনের সব ব্যবস্থা করতে হবে। ফলে তাদের কষ্ট হবে। এ কারণে আমার মুখে এ দু'আ আসেনি যে, রমাযানুল মুবারক মাসে যেন আমার মৃত্যু হয়। তারপর তিনি এই শের পড়লেন,

تمام عمر اس احتیاط میں گذری

آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو

'সারাটি জীবন এই সতর্কতাতেই অতিবাহিত হয়,

যেন বাসা কোনো কানন-শাখের জন্যে বোঝা না হয়।'

সুতরাং রমাযানুল মুবারকের এগারো দিন পর শাওয়ালের এগারো তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়। এবার চিন্তা করে দেখুন! যিনি মৃত্যুর সময় চিন্তা করছেন যে, আমার মৃত্যু দ্বারাও যেন কারো কষ্ট না হয়, তাঁর জীবদ্দশায় মানুষের আবেগ অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখার কী অবস্থা হবে!

হে আল্লাহ! রহম করুন

আমার স্মরণ আছে যে, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব রহ. প্রচণ্ড রোগবেদনায় জর্জরিত ছিলেন। একদিকে হৃদরোগের কষ্ট। আরেক দিকে অর্শরোগের যন্ত্রণা। অপরদিকে প্রায় সারা শরীরে

এক জাতীয় ফোঁড়া বের হয়েছে। সেগুলোর তীব্র দহন। চিকিৎসকগণ বলতেন যে, এই ফোঁড়াগুলোর জ্বালা এরূপ যে, মনে হয় শরীরে কেউ জ্বলন্ত কয়লা রেখে দিয়েছে।

এই অবস্থাতেই জোয়ান ছেলের মৃত্যু সংবাদ আসে। রোগের তীব্রতার ফলে জানাযায় অংশগ্রহণের অবস্থাও নেই। এমতাবস্থায় তাঁর মুখ দিয়ে বের হয়ে এলো- 'হে আল্লাহ, রহম করুন! হে আল্লাহ, রহম করুন! হে আল্লাহ, রহম করুন!' এর কিছুক্ষণ পরই বললেন, এটা আমি কী বলে ফেললাম 'হে আল্লাহ, রহম করুন!' এর অর্থ তো আবার এই দাঁড়ায় না যে, এ যাবৎকাল আল্লাহ তা'আলা রহম করেননি। অথচ আমরা তো সবসময় আল্লাহর রহমতের বারিধারায় সিক্ত হয়ে জীবন ধারণ করছি। যদিও এখন সামান্য কষ্ট দেখা দিয়েছে, কিন্তু সব সময় তো আল্লাহর অনুগ্রহ হচ্ছেই। তাই এখন আমি দু'আ করছি যে, 'হে আল্লাহ, এই কষ্টের নেয়ামতকে আরামের নেয়ামত দ্বারা বদলিয়ে দিন।' অর্থাৎ, এই কষ্টও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত। কারণ এই কষ্টের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা যেই সওয়াব ও পুরস্কার দান করবেন, তা বিরাট। তাই এই কষ্টও নেয়ামত। কিন্তু আমরা আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতার কারণে এটাকে নেয়ামত মনে করি না। এই নেয়ামত বরদাশত করার মতো ক্ষমতা আমাদের নেই। তাই হে আল্লাহ, এই কষ্টের নেয়ামতকে আরামের নেয়ামত দ্বারা পরিবর্তন করে দিন।

হযরত মাওলানা ইদরীস কান্ধলভী রহ.-এর ঘটনা

আমাদের নিকটঅতীতের এক বুযুর্গ ছিলেন হযরত ইদরীস কান্ধলভী রহ. (আল্লাহ তাঁর মর্যাদা আরো সুউচ্চ করুন)। এই বুযুর্গ আমার আব্বাজান হযরত মুফতী শফী রহ.-এর একান্ত বাল্যবন্ধু ছিলেন। একবার তিনি লাহোর থেকে করাচী তাশরীফ আনলেন এবং আব্বাজানের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে দারুল উলূমে আসলেন। এমন সময় আসলেন, যখন খাবারের সময় না। তাঁর আগমনে আব্বাজান অনেক খুশি হলেন এবং সম্মানের সঙ্গে সংবর্ধনা জানালেন। যখন তিনি বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন আব্বাজান বললেন, ভাই ইদরীস ছাহেব! আমার দিলের তামান্না ছিলো আপনি আমাদের সঙ্গে এক বেলা খাবার খাবেন। কিন্তু সমস্যা হলো, আপনার অবস্থান এখান থেকে অনেক দূরে। আপনার হাতে সময় একেবারেই কম। এখন যদি আমি আপনাকে পীড়াপীড়ি করি যে, আপনি আমাদের সঙ্গে এক বেলা খাবার খেয়ে যান, তাহলে আমি মনে করি এটা 'দাওয়াত' হবে না, বরং 'আদাওয়াত' (দুশমনি) হবে। কারণ, আপনার হাতে সময় অনেক কম। আর আরেকবার আসতে চাইলে তাতেও আপনার চার-পাঁচ ঘণ্টা সময় ব্যয় হবে। এতে আপনার অনেক কষ্ট হবে। এ জন্যে আমার মন চাইলেও আপনাকে দাওয়াত করছি না। কিন্তু দাওয়াত ছাড়াও মন মানছে না। তাই আপনাকে দাওয়াত করলে আমার যে পয়াসা খরচ হতো সেই সামান্য পরিমাণ পয়সা আপনি আমার পক্ষ থেকে হাদিয়া হিসাবে কবুল করুন। হযরত মাওলানা ইদরীস ছাহেব রহ. পয়সাগুলো আব্বাজানের কাছ থেকে গ্রহণ করে মাথার উপর রেখে বললেন, এটা আমার জন্যে অনেক বড়ো নেয়ামত। বস্তুত আমারও দিলের তামান্না ছিলো আপনার সঙ্গে এক বেলা খাবার খাবো। কিন্তু সময় সল্পতার কারণে কোনো অবকাশ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এখন আপনি আমার জন্যে পথ খুলে দিলেন।

এখানে দেখুন আব্বাজান যদি তাঁকে বলতেন, আপনাকে এক বেলা খাবার আমার সঙ্গে অবশ্যই খেতে হবে। এরপর তিনি বলতেন, ভাই আমার তো সময় নেই। প্রতি উত্তরে আব্বাজান বলতেন, না ভাই বন্ধুত্বের দাবি হলো

অবশ্যই আপনাকে আমার দাওয়াত রাখতে হবে। তাহলে তিনি যে জরুরী কাজে এতো দীর্ঘ সফর করে এসেছেন সে কাজ বাদ দিয়ে হয়তো পাঁচ-সাত ঘণ্টা সময় কুরবানী করতেন। কিন্তু এটা আর তখন 'দাওয়াত' থাকতো না, 'আদাওয়াত' হয়ে যেতো।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরীস কান্ধলভী রহ.-আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন- আমার আব্বাজান মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ.-এর সহপাঠী ছিলেন। উভয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ও মহব্বত ছিলো। তাঁর পক্ষ হতে মহব্বতের একটা নিদর্শন হলো, তিনি আব্বাজান রহ.-এর রচিত প্রতিটি গ্রন্থের দু'টি করে কপি নিজের কাছে রাখতেন এবং নিজে যা লিখতেন আব্বাজান রহ.-এর রচিত গ্রন্থের নামেই তাঁর নামকরণ করতেন। যেমন আব্বাজান রহ.-এর রচিত তাফসীর গ্রন্থের নাম মা'আরিফুল কুরআন। তিনিও একখানি তাফসীরগ্রন্থ লেখেন এবং তারও নাম দেন মা'আরিফুল কুরআন। আব্বাজান রহ. دعاوی مرزا (মিরযা কাদিয়ানীর বিচিত্র দাবী) নামে একখানি বই লেখেন। তিনিও একই বিষয়ে একখানি বই লেখেন এবং নাম দেন دعاوی مرزا। এমনিভাবে আরও কয়েকটি বই তিনি অভিন্ন নামে রচনা করেন।

আমার মনে কখনো হিংসা বা ঈর্ষা দেখা দেয়নি

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরীস কান্ধলভী রহ. লাহোরে থাকতেন। একবার আমি লাহোর গেলে তাঁর সাথে সাক্ষাত করলাম। বিদায়কালে বললেন, 'মওলবী শফী'কে আমার সালাম বলো'।

তিনি 'মওলবী' শব্দ থেকে আগবেড়ে কখনও 'মাওলানা' বলতেন না। তিনি বলেন, মওলবী শফী'র সাথে আমার বায়ান্ন বছরের সম্পর্ক। আলহামদু লিল্লাহ এই দীর্ঘ সম্পর্কের ভেতর পরস্পরের মধ্যে কখনও বিন্দুমাত্র চির ধরেনি। তারপর বললেন, আচ্ছা বলো তো, আমাদের সম্পর্কে কখনও চির ধরেনি কেন? বললেন, আলেম ওলামার মধ্যে সম্পর্কে চির ধরে তার কারণ হল হিংসা। অমুকে কেন আমার চেয়ে সম্মুখে অগ্রসর হলো এই ঈর্ষাতেই অন্তরে মলিনতা দেখা দেয় এবং পরিণামে সম্পর্ক নষ্ট হয়। আলহামদুলিল্লাহ, মওলবী শফী'র প্রতি কখনও আমার মনে হিংসা ও ঈর্ষা দেখা দেয়নি।

তারপর বললেন, আচ্ছা বলো তো আমাদের মধ্যে হিংসা কেন দেখা দেয়নি? আমি আরয করলাম, আপনিই বলে দিন। বললেন, তুমি কি 'কাফিয়া' পড়েছো? বললাম, জী হাঁ, পড়েছি। বললেন, তাতে যে ধ্রুব

'তাওয়াবে'-এর আলোচনা আছে তা পড়েছো? বললাম জী হাঁ, পড়েছি। বললেন, 'তাওয়াবে'-এর মধ্যে 'না'ত'-এর বিষয়টা পড়েছো? বললাম, জী হাঁ পড়েছি। বললেন, 'না'ত' দু'প্রকার। একটি হলো 'মাতবূ'-এর 'না'ত'। আরেকটি 'মাতবূ'-এর 'মুতা'আল্লিক'-এর 'না'ত'। যেমন زَيْدٌ اَلْعَالِمُ (জ্ঞানী যায়েদ)। এখানে اَلْعَالِمُ (জ্ঞানী) যায়দের না'ত তথা বিশেষণ হয়েছে। কখনও না'ত সরাসরি মাতবূ-এর না হয়ে তার মুতা'আল্লিকের হয়, যেমন زَيْدٌ اَلْعَالِمُ غُلَامُهُ (যায়েদ, যার গোলাম জ্ঞানী)। এস্থলে اَلْعَالِمُ মূলত زَيْدٌ -এর না'ত (বিশেষণ), কিন্তু যখন তারকীব (বাক্যের শব্দ-বিশ্লেষণ) করবে, তখন زَيْدٌ-কে বিশেষিত বিশেষ্য এবং اَلْعَالِمُ غُلَامُهُ কে তার না'ত বা বিশেষণ বলবে, অথচ اَلْعَالِمُ 'যায়েদ'-এর বিশেষণ নয়; বরং তার মুতা'আল্লিক অর্থাৎ তার সাথে সম্পৃক্তজনের বিশেষণ। তা সত্ত্বেও তারকীবে তাকে যায়দেরই বিশেষণ বলা হয়।

এই ভূমিকা দানের পর তিনি বললেন, মওলবী সাহেব! যখন মওলবী শফী'-এর কোনও ইলমী অবদান আমার সামনে আসে, তখন আমি মনে করি, যে অবদান তিনি রেখেছেন প্রকৃতপক্ষে তা তার হলেও পরোক্ষভাবে আমারও বৈ কি! অর্থাৎ আমি زَيْدٌ اَلْعَالِمُ أَخُوْهُ (যায়দ, যার ভাই জ্ঞানী)-এর শ্রেণীভুক্ত। এ কারণেই সুদীর্ঘকালীন সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব সত্ত্বেও অন্তরে কখনও হিংসা দেখা দেয়নি। এই চেতনা আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকেই দান করুন।

হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ.-এর ঘটনাবলী

এটাও মীরাসের অন্তর্ভুক্ত

হযরত ওয়ালেদ ছাহেবের ইন্তিকালের পর আমার শায়েখ ডাক্তার আব্দুল হাই রহ. আমাদেরকে সমবেদনা জানাতে এবং সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে আমাদের বাসায় আসলেন। হযরত ওয়ালেদ ছাহেবের সঙ্গে হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই রহ.-এর এমন গভীর হৃদ্যতা ছিলো যে, তা আমার-আপনার কল্পনাতেও আসবে না। তিনি দুর্বল ছিলেন এবং এই দুর্বল শরীর নিয়েই আমাদের কাছে ছুটে এসেছিলেন। বিশেষ করে সে সময় তাঁর দুর্বলতা খুব বেশি ছিলো। আমি চিন্তা করলাম, এর জন্যে তো কিছু একটা করা দরকার। এমন দুর্বলতার সময় হযরত ওয়ালেদ ছাহেব একটি হালুয়া খেতেন। সেই হালুয়ার একটা কৌটা আমাদের ঘরে ছিলো। আমি কৌটাটা এনে হযরতের খেদমতে পেশ করে বললাম, হযরত! এখান থেকে এক চামচ পরিমাণ খেয়ে নিন। কিন্তু কৌটা দেখেই হযরত বললেন, এটা আমি কীভাবে খাবো? এটা তো এখন মীরাছের সম্পত্তি হয়ে গেছে। এখন এটা কাউকে প্রদান করা তোমার জন্যে জায়েয হবে না। যদিও তা এক চামচ পরিমাণই হোক না কেন? আমি বললাম, হযরত! হযরত ওয়ালেদ ছাহেবের যে কজন ওয়ারিস আছে, আল্লাহ পাকের মেহেরবানিতে আমরা সবাই সাবালক ও এখানে উপস্থিত আছি। আমরা সবাই সম্মত যে, আপনি এখান থেকে (কমপক্ষে) এক চামচ পরিমাণ খেয়ে নিন। এবার হযরত রহ. এক চামচ পরিমাণ হালুয়া খেলেন।

স্ত্রীর মনোরঞ্জন স্ত্রীর হক

হযরত ডা. আব্দুল হাই রহ. প্রতি রমাযানে আসর নামায পড়তে এসে মাগরিব পর্যন্ত ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করতেন। তিলাওয়াত, যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীলে মশগুল থাকতেন এবং সবশেষে ইফতারের আগ পর্যন্ত লম্বা সময় নিয়ে দু'আ করতেন। হযরত তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকেও পরামর্শ দিতেন যে, তারাও যেন এই আমলের অভ্যাস গড়ে তোলে। কারণ, এতে সময়টা মসজিদে অতিবাহিত হওয়ার পাশাপাশি

ইতিকাফের ফযীলতও অর্জিত হয় এবং ব্যক্তিগত আমলগুলো আদায় করার এবং দু'আ করারও বিশেষ সুযোগ লাভ হয়। আর দু'আই তো হলো রমাযান মাসের বিশেষ অর্জন। কারণ, সারা দিনের রোযা শেষে ইফতারের একেবারে কাছাকাছি সময়ে মানুষের অবস্থা অনেকটা বিনম্র ও বিনয়ী হয়। এ অবস্থায় দু'আ করলে আল্লাহর কাছে খুব বেশি কবুল হয়। হযরত অনেক সময়ই এটাকে অভ্যাসে পরিণত করার পরামর্শ এবং তাগিদ দিতেন। ফলে এখনও হযরতের সঙ্গে সম্পৃক্ত লোকদের অনেকের মধ্যে এ আমল অবশিষ্ট আছে।

একবার তাদের একজন হযরতকে বললেন, হযরত! আপনার কথা অনুযায়ী আমি অভ্যাস করে নিয়েছিলাম যে, আসরের নামাযের পরের সময়টা মসজিদে বসে ই'তিকাফ, যিকির-আযকার ও দু'আয় অতিবাহিত করতাম। কিন্তু আমার স্ত্রী একদিন বললেন, আপনি সারা দিন বাইরে থাকেন, আসরের নামাযের পরে যদি একসঙ্গে বসে কিছু কথাবার্তা বলতাম, একসঙ্গে ইফতার করতাম, তাহলে একটু ভালো লাগতো। কিন্তু এখন আপনি এ সময়টাও মসজিদে বসে থাকেন। এখন আমি বড়ো দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আছি যে, আমার এই আমল বহাল রাখবো, না স্ত্রীর কথা অনুযায়ী আসরের নামাযের পরের সময় বাসায় অতিবাহিত করবো? হযরত এ কথা শোনামাত্র বললেন, আপনার স্ত্রী ঠিক বলেছেন। এখন থেকে আপনি আসরের নামাযের পরের সময় ঘরেই থাকবেন। সেখানে স্ত্রীকে সঙ্গ দিয়ে যতটুকু পারেন তিলাওয়াত, যিকির-আযকার করবেন। তারপর একসঙ্গে ইফতার করবেন।

এরপর হযরত বললেন, আমি যে অভ্যাস বানিয়েছি, এটা বেশির চেয়ে বেশি একটা মুস্তাহাব আমল। আর আপনার স্ত্রী যে আমলের কথা বলেছেন, তা তার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, শরীয়তের সীমানায় থেকে স্ত্রীর মনোরঞ্জন করা স্ত্রীর অধিকার। অনেক সময় তার এই মনোরঞ্জন ওয়াজিব হয়ে যায়। সুতরাং আপনি স্ত্রীকে খুশি করার জন্যে এ আমল ছেড়ে দিলেও আশা করি আল্লাহ আপনাকে এর বরকত থেকে বঞ্চিত করবেন না। স্ত্রীর হক আদায়ের জন্যে এ আমল ছেড়ে দিলেও এর পূর্ণ সওয়াব আপনি পেয়ে যাবেন।

আত্মীয়ের হক রয়েছে

একদিন হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী রহ. তাঁর ভক্ত-মুরীদদের সঙ্গে ঘরে বসে ছিলেন। হঠাৎ হযরতের এক আত্মীয় এসে উপস্থিত হলেন। তার দাড়ি-মোচ সব মুণ্ডানো। দরজায় এসেই সে গালি-গালাজ শুরু করে

দিলো। নিতান্তই বেয়াদবের মতো গাল-মন্দের যতো শব্দ তার জানা ছিলো, একাধারে সব বলতে থাকলো। এদিকে তার প্রত্যেক কথার জবাবে হযরত বলে যাচ্ছিলেন, ভাই আমাদের ভুল হয়ে গিয়েছে, আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। সামনে এ ভুলের ক্ষতিপূরণ করে দেবো। তোমার পায়ে ধরি, তুমি ক্ষমা করে দাও। অবশেষে হযরতের বিনয়ী আচরণে তার এই অগ্নিশর্মা রাগ ঠাণ্ডা হলো।

পরে বললেন, আল্লাহর এ বান্দার কাছে কোনো ভুল তথ্য পৌছে ছিলো। এ কারণেই সে এভাবে রাগ হয়েছে। আমি ইচ্ছা করলে তার জবাব দিতে পারতাম এবং তার গাল-মন্দেরও প্রতিশোধ নিতে পারতাম। কিন্তু আমি তাকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করেছি। কারণ, যতো হোক সে আমার আত্মীয়। আত্মীয়ের অনেক হক রয়েছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অনেক সহজ। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত শিক্ষা হলো, আত্মীয়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। আর এটাই হলো,

لَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ

মন্দের প্রতিউত্তর মন্দ দ্বারা না দেওয়া, বরং আদর-সোহাগ এবং মহব্বত ও কল্যাণকামনা দ্বারা দেওয়া।

আমার নামায, সেতো ঠোকার মাত্র

আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই রহ.-এর সামনে যখন কেউ এসে বলতো যে, 'আমি কি আর নামায পড়ি, কয়েকটা ঠোকর মারি।' তিনি এসব কথায় খুব ভয় পেতেন। সুতরাং এক ব্যক্তি এসে হযরতের কাছে বললো যে, হযরত আমার নামায আর কি! সেজদা আর কি! সেজদার মধ্যে প্রবৃত্তির অনেক পঁচা পঁচা কামনা-বাসনা জাগ্রত হয়। আমার এ নামায তো আল্লাহর সামনে পেশ করার উপযুক্ত নয়।

হযরত বললেন, আচ্ছা তোমার প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা দিয়ে ভরা এ সেজদা তো অত্যন্ত নাপাক।

সে বললো, হ্যাঁ, অত্যন্ত নাপাক সেজদা।

হযরত বললেন, আচ্ছা এমন নাপাক সেজদা তুমি আমাকে করো। কারণ, খাহেশাতপূর্ণ এ সেজদা আল্লাহর সামনে পেশ করার উপযুক্ত নয়, এ জন্যে এ সেজদা আল্লাহকে না করে আমাকে করো।

সে বললো, হযরত এ আপনি কেমন কথা বলছেন! আমি আপনাকে সেজদা করবো!

হযরত বললেন, এটা যেহেতু নাপাক সেজদা এবং আল্লাহকে করার উপযুক্ত নয়, তাই আমাকে করে দেখাও!

লোকটি বললো, হযরত এটা হতে পারে না। আমি অন্য কাউকে সেজদা করতে পারি না।

হযরত বললেন, এ সেজদা যখন অন্য কোথাও হতে পারে না, তাই বোঝা গেলো, এ সেজদা তাঁর জন্যেই। এ কপাল অন্য কোথাও ঠেকতে পারে না। এ সেজদা অন্য কোথাও হতে পারে না। এ মাথা অন্য কোনো চৌকাঠে নত হতে পারে না। এ সেজদা তো তাঁর জন্যেই এবং তাঁরই তাওফীকে লাভ হয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের ভুল-ত্রুটির কারণে এ সেজদা খারাপ হয়ে গিয়েছে। এ জন্যে ইস্তিগফার করো। কিন্তু এ কপাল তো সেখানেই ঠেকবে। কবি কতো চমৎকার বলেছেন,

قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے

وہ سجدہ جس کو تیرے آستاں سے نسبت ہے

'কবুল হোক বা না হোক, তারপরেও তা নেয়ামত,

এ সেজদা, তোমার চৌকাঠের সঙ্গে যার সম্পর্ক রয়েছে।'

এ সেজদা কোনো মামুলী জিনিস নয়। সেজদা সম্পর্কে উল্টা-সিধা মন্তব্য করো না। আল্লাহর দেওয়া তাওফীকের শোকর আদায় করো।

এটাই তো কারামত

হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি– আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন– আমাদেরকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কখনও কখনও বলতেন, বিবাহ করেছি পঞ্চান্ন বছর হয়েছে, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, এই পঞ্চান্ন বছরে কখনও রূঢ় স্বরে কথা বলিনি।

আমি বলে থাকি, হাওয়ায় উড়ে চলা বা পানিতে হেঁটে যাওয়াকে মানুষ কারামত মনে করে, কিন্তু আসল কারামত তো এটাই। পঞ্চান্ন বছর যাবৎ দাম্পত্য জীবন যাপন করছেন, আর এটা তো এমনই সম্পর্ক, যাতে অপছন্দের কিছু না কিছু না ঘটে পারে না, এবং তাতে কখনও না কখনও মনে খারাপ লেগেই থাকবে, অথচ বলছেন, আমি কখনও আওয়াজ বদলে কথা বলিনি। এখানেই শেষ নয়, হযরতের মুহতারামা স্ত্রী আমাদেরকে

জানিয়েছেন, সারা জীবনে কখনও আমাকে পানি দাও এতুটুকু আদেশ পর্যন্ত তিনি করেননি। কোনও কাজেরই হুকুম তিনি আমাকে কখনও করেননি। আমি নিজ আগ্রহে তার প্রতি লক্ষ রাখতাম, তার কাজ করে দিতাম এবং এটাকে নিজের জন্যে সৌভাগ্যের বিষয় গণ্য করতাম। কিন্তু তিনি নিজে থেকে আমাকে কোনও দিন তার কোনো কাজ করে দেওয়ার জন্যে আদেশ করেননি।

সেবক হওয়াতেই মর্যাদা

হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী রহ. বলতেন, আমি নিজেকে একজন খাদেমই মনে করি। আমার বিশ্বাস, আমাকে দুনিয়ায় খেদমতের জন্যেই পাঠানো হয়েছে। আমার সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত, তাদের খেদমত করাকে আমি নিজ দায়িত্ব মনে করি। নিজেকে আমি সেবা লাভের উপযুক্ত গণ্য করি না যে, অন্যরা আমার সেবা করবে আর আমি তাদের মাখদূম হয়ে থাকবো। বরং আমিই খাদেম। আমি আমার স্ত্রীরও খাদেম, সন্তানদেরও খাদেম। আমার মুরীদদেরও খাদেম হয়ে থাকতে চাই এবং আরও যতো লোকের সাথে আমার সম্পর্ক আছে, তাদের খাদেম হয়েই বাঁচতে চাই এবং এ বিশ্বাসের সাথেই আমি মৃত্যুবরণ করতে চাই। আমি মনে করি, বান্দার জন্যে সেবক হওয়ার মধ্যেই মর্যাদা। তাই আমি খাদেমই থাকতে চাই। তিনি বলেন,

ز تسبیح و سجادہ و دلق نیست   طریقت بجز خدمت خلق نیست

তাসবীহ, জায়নামায ও চটের পোশাক দিয়ে তরীকত (আধ্যাত্মিকতা) হয় না। তরীকত তো হয় সৃষ্টির সেবা দ্বারা।

তরীকত মূলত মানবসেবারই নাম। হযরত বলতেন, যখন বুঝে ফেলেছি যে, আমি একজন খাদেম, মাখদুম নই, তখন অন্যের উপর হুকুম চালাই কীভাবে? খাদেম কি কাউকে আদেশ করতে পারে যে, এই কাজ করে দাও? সারা জীবন এভাবেই চলেছি যে, যখন কোনো প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তা নিজেই করেছি। কাউকে করে দিতে বলিনি। এটাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ। আমরা বাহ্যিক কাজসমূহে তো সুন্নতের অনুসরণ করি, কিন্তু আখলাক-চরিত্র, মানুষের সাথে আচার-ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুন্নতের প্রতি গুরুত্ব দেই না অথচ এটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভাইজান যাকী কাইফী রহ.-এর ঘটনাবলী

নিজের লাগাম অন্যের হাতে দাও...

আমার সর্বজ্যেষ্ঠ ভাইয়ের নাম ছিলো যাকী কায়ফী। তিনি একজন কবি ছিলেন। বাল্যকালে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে কাফিয়া-শরহে জামী পর্যন্ত পড়েছিলেন। তারপর পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে লেগে যান। একদিন আমি তাকে জিজ্ঞাস করলাম, ভাইজান, আপনি লেখা-পড়া শেষ করলেন না কেন? মাঝখানেই কেন ছেড়ে দিলেন? উত্তরে বললেন, বড়ো মিয়াঁ আমার ব্যাপারটা চুকিয়ে দিয়েছেন।

'বড়ো মিয়াঁ' হলেন হযরত মিয়াঁ সাইয়্যেদ আসগার হুসাইন ছাহেব রহ.। যিনি 'মিয়াঁ ছাহেব' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কাশফ ও কারামতওয়ালা বুযুর্গ ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ঘটনা কী, খুলে বলুন তো? বললেন, একদিন বাসা থেকে দারুল উলূম যাচ্ছিলাম। পথেই হযরত মিয়াঁ ছাহেবের বাড়ি। তিনি বাড়িতেই ছিলেন। ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-এর শিক্ষার প্রভাবে এটা তো সম্ভব ছিলো না যে, মিয়াঁ ছাহেব রহ.-এর বাড়ির পাশ দিয়ে যাবো আর তাঁর সাথে দেখা করে দু'আ নিয়ে যাবো না। তাই ভাবলাম তাঁর সাথে দেখা করে দু'আ নিয়ে যাই। মিয়াঁ ছাহেব রহ.-এর কাছে বাদাম বা অন্য কোনও খাবার থাকতো। কোনও শিশু দেখা করতে গেলে তা দিয়ে দিতেন। যাইহোক, আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে গেলাম। সালাম দিলাম। তিনি জবাব দিলেন। তারপর দু'আ চাইলাম, হযরত! আমার জন্যে দু'আ করবেন যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইলম দান করেন। বড়ো মিয়াঁ বললেন, না ভাই, না, ইলম বড়ো মন্দ জিনিস। আমি তোমার জন্যে দু'আ করবো না।

একথা শুনে তো আমি স্তম্ভিত। ইনি কী বলছেন? ইলম মন্দ জিনিস? তারপর নিজের সম্পর্কে বলতে শুরু করলেন, ভাই! প্রথমে আমি দারুল উলূমে বকুল গাছের নীচে পুরানো ছেঁড়া চাটাইতে বসতাম। এখন চকিতে বসে পড়াই। এখন যদি মিয়াঁ ছাহেবকে বলো, নীচে বসে পড়াতে হবে, তবে তার খারাপ লাগবে। এভাবেই ইলম তাকাব্বুর সৃষ্টি করে। এজন্যেই আমি

তোমার জন্যে ইলমের দু'আ করবো না। ভাইজান বলেন, সেদিনই আমার মনে হয়েছিলো মিয়াঁ ছাহেব আমার গতি পরিস্কার করে দিয়েছেন। আমি বুঝতে পেরেছিলাম ইলম আমার জন্যে নয়। যাইহোক তিনি কাশফওয়ালা বুযুর্গ ছিলেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তিনি জানতে পেরেছিলেন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্তি তার তাকদীরে নেই। তাই সুচিন্তিত পন্থায় ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে দিলেন। তা বোঝাতে গিয়ে যে কথা বলেছেন তা লক্ষ্য করার মতো। বললেন, ইলম তাকাব্বুর জন্মায়। আর যদি তাই হয়, ইলমের কারণে অহঙ্কার সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে সেই আলেম হওয়া অপেক্ষা মূর্খ থাকা অনেক ভালো। কেননা সে অবস্থায় আখেরাতে অহঙ্কারের শাস্তি থেকে তো রক্ষা পাওয়া যাবে। তাই বলে কি ইলম শিখবে না? শিখবে, অবশ্যই শিখবে, তবে অহঙ্কার যাতে সৃষ্টি হতে না পারে সে ব্যবস্থাও নেবে। এর একমাত্র উপায়, হলো নিজের লাগাম অন্য কারও হাতে তুলে দেওয়া। তিনি লক্ষ রাখবেন আমার মধ্যে কী কী রোগ জন্ম নিচ্ছে। সে অনুপাতে তিনি উপযুক্ত ওষুধ প্রদান করবেন।

গ্রাহক পাঠানো তাঁর কাজ, আমার নয়...

বড়ো ভাই জনাব মুহাম্মাদ যাকী কাইফী রহ.-এর 'এদারায়ে ইসলামিয়াত' নামে লাহোরে দ্বীনী কিতাবের একটি দোকান ছিলো। এখনো সে দোকান রয়েছে। একবার তিনি বলতে লাগলেন, ব্যবসার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমত ও কুদরতের বিস্ময়কর কারিশমা দেখিয়ে থাকেন। একদিন আমি সকালে জাগলাম। পুরো শহরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। বাজারে কয়েক ইঞ্চি পানি জমে গেছে। আমার অন্তরে চিন্তা আসলো, আজ বৃষ্টির দিন। মানুষ ঘর থেকে বের হতে ভয় পাচ্ছে। রাস্তায় পানি জমে গেছে। এমতাবস্থায় কে কিতাব কিনতে আসবে? কিতাবও কোনো জাগতিক বা পাঠ্যক্রমভুক্ত নয়, বরং দ্বীনী কিতাব। যার বিষয়ে আমাদের অবস্থা এই যে, যখন দুনিয়ার যাবতীয় প্রয়োজন পুরো হয়ে যায়, তখন চিন্তা হয় যে, একটি দ্বীনী কিতাব ক্রয় করে পাঠ করি। এসব কিতাব দিয়ে ক্ষুধাও মেটে না, পিপাসাও নিবারিত হয় না। এর দ্বারা জাগতিক কোনো প্রয়োজনও পুরা হয় না। এ যুগের হিসেবে দ্বীনী কিতাব হলো, একটি অর্থহীন বিষয়। মনে করা হয় যে, অবসর সময় পাওয়া গেলে তখন দ্বীনী কিতাব পড়বো। তাই এমন মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে কে দ্বীনী কিতাব কিনতে আসবে? তাই আজ দোকানে যাবো না। ছুটি কাটাবো।

কিন্তু যেহেতু তিনি বুযুর্গদের সাহচর্য লাভ করেছিলেন। সোহবত উঠিয়ে ছিলেন হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর। তিনি বলেন, একই সাথে আমার অন্তরে আরেকটি চিন্তা জাগলো যে, ঠিক আছে, কেউ কিতাব কিনতে আসতেও পারে, নাও পারে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমার জন্যে রিযিকের এই মাধ্যম নির্ধারণ করেছেন। এখন আমার কাজ হলো, আমি যাবো এবং দোকান খুলে বসে থাকবো। গ্রাহক পাঠানো আমার কাজ নয়। তা আরেকজনের কাজ। তাই আমার নিজের কাজে ত্রুটি করা উচিত নয়। বৃষ্টি হোক, চাই ঢল নামুক, আমার দোকান খোলা উচিত। এ কথা চিন্তা করে আমি ছাতা নিয়ে পানির ভিতর দিয়ে চলে গেলাম। বাজারে গিয়ে দোকান খুলে বসলাম। চিন্তা করলাম, আজ তো কোনো গ্রাহক আসবে না। বসে বসে কুরআন তিলাওয়াত করি। আমি মাত্র কুরআন শরীফ খুলে তিলাওয়াত করতে বসেছি। এমন সময় দেখি যে, মানুষ ছাতা মাথায় দিয়ে কিতাব ক্রয় করতে আসছে। আমি অবাক হলাম যে, এই লোকগুলোর এমন কী প্রয়োজন দেখা দিলো যে, এই তুফান ও ঢলের মধ্যে আমার নিকট এসে এমন সব কিতাব ক্রয় করছে, যেগুলোর তাৎক্ষণিক কোনো প্রয়োজন নেই! কিন্তু মানুষ এলো এবং প্রতিদিন যে পরিমাণ বিক্রি হয় ঐ দিনও সে পরিমাণ বিক্রি হলো। তখন আমার মনে এ কথা জাগ্রত হলো যে, এ সব গ্রাহক নিজের থেকে আসছে না। প্রকৃতপক্ষে অন্য কেউ পাঠাচ্ছেন। আর তিনি এ জন্যে পাঠাচ্ছেন যে, আমার রিযিকের মাধ্যম তিনি এ সব গ্রাহককে বানিয়েছেন।

আহ্! কোথায় পাবো এমন মানুষ?

আমার বড়ো ভাই জনাব যাকী কাইফী মরহুম তার ঘটনা শোনাতেন যে, আমি একবার হযরত মিয়াঁ ছাহেবের কাছে গেলাম। আমের মৌসুম ছিলো। মিয়াঁ ছাহেব আম দিয়ে বললেন, খাও। ঐ যুগে আম চুষে খাওয়া হতো। যখন ছিলকা ও আঁটি একত্রিত হলো তখন আমি বললাম যে, এগুলো বাইরে ফেলে দেই এবং তুলে নিয়ে দরজার দিকে হাঁটা দিলাম। হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছো? আমি বললাম, হযরত বাইরে ফেলতে যাচ্ছি। হযরত বললেন, না, এগুলো বাইরে ফেলো না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? তিনি বললেন, বাইরের দরজায় যখন এতোগুলো ছিলকা ও আঁটি মহল্লার ছেলেরা দেখবে, তাদের মধ্যে অনেকে গরিব আছে, যাদের আম খাওয়ার সামর্থ্য নেই, তখন হতে পারে তাদের অন্তরে আক্ষেপ জাগবে! এই

আক্ষেপ জাগা ভালো বিষয় নয়। এজন্যে এগুলো বাইরে ফেলবে না। বরং ছিলকা ছাগলকে খাইয়ে দেই।

আল্লাহ্‌র নে'আমতের মূল্যায়ন কর

একবার আমি হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-এর সাথে লাহোর গিয়েছিলাম। আমি ছিলাম ছোট শিশু। আমার বড়ো ভাই জনাব যাকী কায়ফী রহ. লাহোরে থাকতেন। লাহোরে ওয়ালেদ ছাহেব রহ., ভাইয়া ও আমি-এ তিনজন পায়ে হেঁটে এক জায়গায় যাচ্ছিলাম। নাম ছিলো 'কাপুরতলা হাউস'। আমরা হাঁটছিলাম অন্ধকার রাতে। এক জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া ছিলো। খুব কষ্টে সে জায়গা পার হতে হতো। বড়ো ভাই পকেট থেকে পয়সা বের করছিলেন, হঠাৎ একটা কয়েন পড়ে গেলো। একে অন্ধকার, আবার যাওয়ার তাড়া, ওদিকে কাঁটাতারের ঝামেলা। ভাই সাহেব মনে করলেন শুধু শুধু এর পিছনে পড়ে সময় নষ্ট করা কেন। সুতরাং খোঁজাখুঁজি বাদ দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন।

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কী পড়লো? ভাই সাহেব বললেন, একটা কয়েন পড়ে গেছে। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব বললেন, তুলে নিচ্ছো না কেন? ভাই সাহেব বললেন, মাত্র দু'পয়সা বা এক আনা তো! হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বললেন, দু'ই পয়সা হোক আর এক আনা, প্রথমে খুঁজে তো দেখো! খুঁজে না পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা। না খুঁজেই চলে যাচ্ছো কেন? সুতরাং হযরত ওয়ালেদ ছাহেব একটা ম্যাচ আনালেন। তারপর নিজেই কাঠি জ্বালিয়ে বললেন, এবার খোঁজো। আমরা তালাশ করতে লাগলাম।

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বললেন, দেখো! এক পয়সা হোক আর দুই পয়সা, তা আল্লাহ তা'আলার নেআমত বটে। কাজেই তাকে মামুলি জিনিস মনে করে অবহেলা করা আর না খুঁজে চলে যাওয়া কিছুতেই ঠিক নয়। তাতে নেআমতের অবমূল্যায়ন করা হয়।

হযরত থানবী রহ. তাঁর এক বাণীতে বলেন, যেসব নেআমত বহু অংশ বিশিষ্ট এবং সেই বহু অংশ দ্বারাই উপকার লাভ করা হয়, তার ক্ষুদ্রাংশকেও ইজ্জত করা ও মূল্য দেওয়া উচিত। এটা তোমার অবশ্যকর্তব্য। এ কারণেই হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বললেন, যে পয়সা পড়ে গেছে, তা এক বা দু' পয়সাই হোক না কেন, কিছুক্ষণ অবশ্যই তা তালাশ করে নাও। এর জন্যে কিছুটা সময় ব্যয় করো, যাতে আল্লাহ তা'আলার নেআমতের অকৃতজ্ঞতা না হয়ে যায়। বিনা তালাশে চলে যাওয়াটা অপব্যয় ও অকৃতজ্ঞতা। হাঁ তুমি যদি

দান করে দিতে চাও তবে কোনো অভাবগ্রস্তকে দিয়ে দাও। তার কাজে আসবে। সেটা অপব্যয় নয়। সদকা করা হবে এবং পয়সার সঠিক ব্যবহার হবে।

আল্লাহপ্রদত্ত ছোট ছোট নেআমতের কদর করলে এবং সেজন্যে শোকর আদায় করলে আল্লাহ তা'আলা নেআমত আরও বাড়িয়ে দেন। কদর না করলে সেজন্যে নেআমত লোপ পাওয়ার ও শাস্তি আসার আশঙ্কা রয়েছে। যাইহোক পয়সা হারিয়ে যাওয়ার পর তা তালাশ না করা, পয়সা বেহুদা খরচ করাও ইচ্ছাকৃত নষ্ট করে ফেলার নামান্তর।

তোমাকে এখন থেকেই সূফী বানাচ্ছি

আমি এ ঘটনা আপনাদেরকে এর আগেও শুনিয়েছি যে, আমার ভাই জনাব মুহাম্মাদ যাকী কাইফী মরহুম– আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন, আমীন– তিনি শিশু বয়সে হযরত ওয়ালেদ ছাহেবের সঙ্গে হযরত থানবী রহ.-এর খেদমতে যাতায়াত করতেন। হযরত শিশুদেরকে খুব আদর করতেন। কারণ, এটা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. প্রতি বছর রমাযান মাস থানাভবনে পরিবার-পরিজন নিয়ে কাটাতেন। শিশুদের ব্যাপারে কোনো নিয়ম-কানুন ছিলো না। বড়ো বড়ো মানুষ খানকার মধ্যে অবস্থানকালে এ বিষয়ে সতর্ক থাকতেন যে, কোনো কাজ যেন হযরতের মেজাযের খেলাফ না হয়। কিন্তু শিশুরা স্বাধীনভাবে হযরতের নিকট চলে যেতো। হযরতের নিয়ম এই ছিলো যে, খানা খাওয়ার পর চুন, সুপারি ও খর ছাড়া পান পাতা চিবাতেন। কারণ, পান হজমের কাজ দেয়। এতে কোনো ক্ষতি নেই। আমার বড়ো ভাই জনাব যাকী কাইফী মরহুমের উপর খানা খাওয়ার পর ঘর থেকে পান আনার দায়িত্ব ছিলো। এ কারণে হযরত তার নাম দিয়েছিলেন 'পানী' (পানওয়ালা)।

ভাই ছাহেব মরহুম যখন লিখতে শিখলেন, তখন হযরত ওয়ালেদ ছাহেব বললেন যে, তুমি প্রথম চিঠি হযরত থানবী রহ.-কে লিখো। ওয়ালেদ ছাহেব তার দ্বারা চিঠি লিখিয়ে হযরতের খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন। হযরত থানবী রহ. তার উত্তরে ইলমের একটি অধ্যায় খুলে দিলেন। উত্তরে হযরত লিখলেন,

> 'তোমার চিঠি পেলাম। মন খুব আনন্দিত হলো যে, তুমি লিখতে শিখেছো। এখন তুমি নিজের লেখাকে আরো

ভালো করার চেষ্টা করো। আর নিয়ত এই করো যে, পাঠকের যেন কষ্ট না হয়। দেখো! আমি তোমাকে এখন থেকেই সূফী বানাচ্ছি।'

যেই শিশু মাত্র লেখা শিখছে, বলাবাহুল্য যে, সে আঁকা-বাঁকা লিখবে। সে সময় শিশুটিকে বলা হচ্ছে যে, হাতের লেখা ঠিক করো, যাতে পাঠকের কষ্ট না হয়। সাথে এ কথাও বলছেন যে, দেখো! আমি এখন থেকেই তোমাকে সূফী বানাচ্ছি! কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে, হাতের লেখা ঠিক হওয়ার সঙ্গে সূফী হওয়ার কী সম্পর্ক? কারণ, আমাদের মাথায় বদ্ধমূল যে, যে ব্যক্তি যতো বেশি এলোমেলো, সে ততো বড়ো সূফী! যে যতো বেশি ময়লা ও অপরিষ্কার, সে ততো বড়ো সূফী! যার কোনো কাজেরই শৃঙ্খলা নেই, সে হলো বড়ো সূফী! মূলত: কাউকে কোনোভাবে কষ্ট না দেওয়া হলো একজন সূফীর বড়ো বৈশিষ্ট্য। লেখা সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হলে তা পাঠ করতে মানুষের কষ্ট হবে না। তাই হযরত বলেছেন যে, লেখা সুন্দর করবে। দেখো! আমি তোমাকে এখন থেকেই সূফী বানাচ্ছি।

ঘটনাকে উল্টোভাবে না, সোজা পাঠ করো

মুহতারাম ভাই মোস্তফা সাদেক ছাহেব খুব ভালো কথা স্মরণ করিয়েছেন। যখন আমার বড়ো ভাই যাকী কাইফী মরহুম ছাহেবের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে, তখন হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. খুব মারাত্মক অসুস্থ ছিলেন। হৃদরোগে আক্রান্ত ছিলেন। সারা শরীরে ঘা হয়েছিলো এবং সেগুলো অঙ্গারের মতো জ্বলতো। এমতাবস্থায় তার সবচেয়ে প্রিয় সন্তানের মৃত্যুর সংবাদ এলো। অন্য কেউ হলে হয় তো এ দুঃখের অভিযোগ নিয়েই বসে পড়তো। কিন্তু তিনি তখন যাকী কাইফী মরহুম ছাহেবের সন্তানদের নামে লাহোরে যেই পত্র লেখেন, সেই পত্র পুরোটা পাঠযোগ্য। সে পত্রে তিনি লেখেন যে-

'ঘটনা তো বিরাট! কিন্তু আমার আদরের সন্তানেরা শোনো! এ সব ঘটনায় আমরা ব্যথিত হই এ জন্যে যে, আমরা ঘটনাকে উল্টোভাবে পাঠ করে থাকি। উল্টোভাবে পাঠ করা এভাবে যে, একজন জোয়ান মানুষ। পঞ্চাশ বছর বয়স। এখনো তার কোনো সন্তান বিবাহ দেয়নি। এক সন্তান মদীনা মুনাওওয়ারায় পড়ছে, এমতাবস্থায় হজ থেকে এসে হঠাৎ তার মৃত্যু হয়ে গেলো! এ ঘটনাটিকেই সোজাভাবে

পাঠ করো। তা এভাবে যে, প্রত্যেক মানুষের একেকটি শ্বাস আল্লাহর নিকট লেখা আছে। তাই সে নির্ধারিত পরিমাণ শ্বাস নিয়ে এসেছে। হাতেগোণা কিছু শ্বাস নিয়ে এসেছে। যতোগুলো শ্বাস নিয়ে সে এসেছে, ততোগুলো শ্বাসই সে লাভ করবে। এরচেয়ে কম-বেশি হওয়ার উপায় নেই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনায় তোমাদের সান্ত্বনার জন্যে কতো উপকরণ রেখেছেন যে, এক ছেলে মদীনা মুনাওওয়ারায় লেখাপড়া করছে। আল্লাহ তা'আলা তার মাধ্যমে হজের ব্যবস্থা করেছেন। হজে গিয়েছেন। সেখানে যাওয়ার পর ছেলের জন্যে খেদমত করার সুযোগ লাভ হয়েছে। সেখানেও মৃত্যু হতে পারতো। কিন্তু হজের পুরো ইবাদত সম্পন্ন করলেন। দেশে এলেন। দেশে আসার পর আলহামদু লিল্লাহ আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মিলিত হলেন। সবার সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের পর নিজের বন্ধুবান্ধবকে দাওয়াত করলেন। করাচীতে এসে মা-বাবার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করলেন। এ সমস্ত ব্যবস্থাপনার পর আল্লাহ তা'আলা তাকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন। এসব ঘটনাকে উল্টো না পড়ে সোজাভাবে পাঠ করো, তাহলে বুঝতে পারবে যে, এই কষ্টের বিষয়টি কতগুলো রহমতকে জড়িয়ে আছে।'

বিভিন্ন ঘটনা

এক রাখালের বিস্ময়কর ঘটনা

খাইবারের যুদ্ধের সময় ইহুদীদের সঙ্গে লড়াই চলছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামসহ খাইবারের দুর্গ অবরোধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহিনী খাইবারের দুর্গের চর্তুদিকে অবস্থান নিয়েছে। খাইবারের ভিতরে সাধারণ এক রাখাল পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ছাগল চরাতো। তার অন্তরে ইচ্ছা জাগলো যে, খাইবারের বাইরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহিনী শিবির স্থাপন করেছে তাদেরকে গিয়ে একটু দেখি। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামতো অনেক শুনেছি। তিনি কী বলেন এবং তিনি কেমন মানুষ গিয়ে দেখি। ছাগল নিয়ে খাইবারের দুর্গের বাইরে বের হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোঁজে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই! মুহাম্মাদ কোথায়? (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লোকেরা বললো, অমুক তাঁবুর মধ্যে আছেন।

তিনি বলেন, আমার বিশ্বাস হচ্ছিলো না যে, খেজুরের এই অতি সাধারণ তাঁবুর মধ্যে এতো বড়ো সর্দার, এতো বড়ো নবী অবস্থান করবেন। কিন্তু লোকেরা বারবার বললে আমি গেলাম। গিয়ে দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে অবস্থান করছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কী পয়গাম নিয়ে এসেছেন? তিনি সংক্ষেপে একত্ববাদের আকীদা সম্পর্কে আলোকপাত করলেন। তিনি বললেন, আমি যদি আপনার এই দাওয়াত কবুল করি তাহলে আমার কী অবস্থা হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমরা তোমাকে বুকে জড়িয়ে নিবো। তুমি আমাদের ভাই হয়ে যাবে। অন্যদের যে অধিকার রয়েছে তুমিও তা লাভ করবে। রাখাল বললো, আপনি আমার সঙ্গে এমন কথা বলছেন! ঠাট্টা করছেন! আমি কালো নিগ্রো একজন রাখাল। আমার শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। এমতাবস্থায় আপনি আমাকে বুকে জড়িয়ে নিবেন।

অথচ এরাতো আমাকে গলা ধাক্কা দেয়। তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণ করে। তো আপনারা আমাকে কেন বুকে জড়িয়ে নিবেন?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর চোখে সব মাখলুক সমান। এ কারণে আমরা তোমাকে বুকে জুড়িয়ে নিবো। রাখাল বললো, আমি যদি আপনার কথা মেনে নেই এবং মুসলমান হই, তাহলে আমার কী পরিণতি হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যদি এ যুদ্ধে মারা যাও তাহলে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ তা'আলা তোমার এই চেহারার কৃষ্ণতাকে শুভ্রতায় পরিণত করে দিবেন। তোমার শরীরের দুর্গন্ধকে সুগন্ধে পরিণত করে দিবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথা তার অন্তরে প্রভাব বিস্তার করলো। তিনি সাথে সাথে কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, এখন আপনি যেই হুকুম দিবেন আমি তাই করতে তৈয়ার আছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম তাকে নামাযের হুকুম দেননি, রোযার হুকুম দেননি, প্রথম হুকুম এই দিয়েছেন যে, তুমি যেসব ছাগল চরানোর জন্যে নিয়ে এসেছো, সেগুলো তোমার কাছে আমানত। আগে এই ছাগলগুলো ফিরিয়ে দিয়ে আসো, তারপর তোমার করণীয় সম্পর্কে জেনো। ছাগলগুলো কাদের? ইহুদীদের। যাদের উপর আক্রমণ করছেন। যাদের সঙ্গে যুদ্ধ চলছে। যাদের মাল গনীমত হিসেবে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যুদ্ধের অবস্থায় গণীমতের মাল নেওয়া তো জায়েয, কিন্তু তুমি এগুলো এনেছো তাদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে। যার দাবি হলো, তাদের মাল হেফাজত করা। তাদের সঙ্গে কৃত চুক্তি রক্ষা করা। এটা তাদের অধিকার। তাই তাদের নিকট পৌছিয়ে দিয়ে আসো।

রাখাল বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এসব ছাগল তো এমন দুশমনদের, যারা আপনার রক্তের পিয়াসী। তারপরও আপনি তাদের নিকট এগুলো ফিরিয়ে দিবেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, প্রথমে তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। সুতরাং ছাগলগুলো ফিরিয়ে দেওয়া হলো।[২০০]

ছাগলগুলো ফেরত দিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কী করবো?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এখন তো নামাযের সময় নয় যে নামায পড়তে বলবো। রমাযানের মাস নয় যে রোযা রাখাতে বলবো।

---

২০০. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৬০৯-৬১১

তোমার সম্পদও নেই যে, তার যাকাত দিতে বলবো। এখন একটি মাত্র ইবাদত হচ্ছে, যা তরবারীর ছায়ার নীচে সম্পন্ন করতে হয়, তা হলো, জিহাদ। এতে অংশ নাও। সুতরাং তিনি তাতে অংশ নিলেন। বর্ণনায় তাঁর নাম এসেছে 'আসওয়াদে রা'য়ী'। যুদ্ধ শেষ হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিলো যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর কে আহত হলো এবং কে শহীদ হলো তিনি তা দেখতে যেতেন। তিনি দেখলেন, একজায়গায় সাহাবায়ে কেরাম সমবেত হয়েছেন। একে অপরকে জিজ্ঞাসা করছেন ইনি কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, এমন এক ব্যক্তির লাশ পাওয়া গিয়েছে, যাকে আমরা চিনি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকটে গিয়ে দেখলেন। তিনি বললেন, তোমরা চেনো না, কিন্তু আমি একে চিনি। আমি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা একে জান্নাতুল ফেরদাউসে কাওছার ও তাসনীম দ্বারা গোলস দিয়েছেন। তার চেহারার কৃষ্ণতাকে উজ্জ্বলতায় পরিণত করেছেন। তার দুর্গন্ধকে সুগন্ধ দ্বারা বদলে দিয়েছেন।

স্বপ্ন সংক্রান্ত একটি বিস্ময়কর ঘটনা

একজন বিচারপতির কাছে একটি মামলা দায়ের হলো। শরীয়তের দলীল-প্রমাণের উপর চিন্তাভাবনা করে এবিষয়ে সিদ্ধান্তমূলক একটি ফলাফলে তিনি উপনীত হন। রাতে স্বপ্নযোগে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত লাভ করেন। তিনি বলছেন যে, তুমি যে সিদ্ধান্ত দিতে যাচ্ছো তা ভুল। তুমি এই সিদ্ধান্ত দাও। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তিনি খুব পেরেশান হন। কারণ শরীয়তের দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে তার ফয়সালাই সঠিক মনে হচ্ছিলো। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে বলছেন, না ফয়সালা অন্যটি।

তিনি খলীফাকে ঘটনা জানান। খলীফা সকল আলেমকে জমা করেন। আলেমগণ বলেন, বিষয়টি আসলে জটিল। কারণ, স্বপ্নযোগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত লাভ হয়েছে। আর শয়তান তাঁর সুরত ধারণ করতে পারে না। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অনুপাতেই আমল করা উচিৎ। সেখানে ঐ জামানার মুজাদ্দিদ বিশিষ্ট বুযুর্গ শাইখ ইযযুদ্দীন ইবনে সালাম রহ.-ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে বললেন, কাজী ছাহেব! আপনি শরীয়তের দলীলের ভিত্তিতে যেই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন, সেই মোতাবেক ফয়সালা করুন। আর এর আযাব ও সওয়াব

আমার কাঁধে দিন। আমি এর দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করছি। স্বপ্নের ভিত্তিতে ফয়সালা করা জায়েয নেই। কারণ, স্বপ্নের বিষয়ে হাজারো ব্যাখ্যা হতে পারে। নিজের মনের চিন্তার প্রভাব তার উপর পড়তে পারে। শয়তান যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুরত ধারণ করতে পারে না, কিন্তু হতে পারে যে, জাগ্রত হওয়ার পর শয়তান কোনো ওয়াসওয়াসা মনের মধ্যে ঢেলে দিয়েছে। কোনো ভুল কথা অন্তরে চলে এসেছে। শরীয়ত জাগ্রত অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শোনা কথার বিপরীতে স্বপ্নকে দলীল সাব্যস্ত করেনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সব বাণী অবিচ্ছিন্ন সনদে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে, সেগুলোই আমাদের জন্যে দলীল। আমাদেরকে তার উপরই আমল করতে হবে। আপনিও তার উপরই আমল করুন, আর এর সওয়াব ও গোনাহ আমার কাঁধে আরোপ করুন।

একটি কথায় পুরো জীবনের পরিবর্তন

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা কা'নাবী রহ. বড়ো মাপের একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। সুনানে আবু দাউদে তাঁর সূত্রে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি একবার কোথাও যাচ্ছিলেন। রাস্তায় শো'বা নামের এক লোকের সঙ্গে সাক্ষাত। যিনি পরবর্তীতে অনেক বড়ো মুহাদ্দিস হয়েছিলেন। কিন্তু শুরুতে ছিলেন বখাটে টাইপের একজন লোক।

শো'বা দেখলেন, একজন মুহাদ্দিস (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আসছেন। আল্লাহ মালুম, তার মনে কি ভাবাবেগের উদয় হলো। সামনে অগ্রসর হয়ে বেয়াদবের মতো ঘোড়ার লাগাম ধরে বলতে লাগলেন, এই শায়েখ! আমাকে একটি হাদীস শুনিয়ে যাও! তিনি উত্তর দিলেন, এটা হাদীস শোনার পন্থা নয়; অন্য সময় শুনে নিও। তিনি বললেন, না, আমি এখনই শুনবো এবং একটি হাদীস হলেও আমাকে শোনাতে হবে।

মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা অনেক রাগ করলেন। কিন্তু চিন্তা করলেন, সে যখন না-ছোড় বান্দা, তো তার বর্তমান অবস্থার সঙ্গে মিল রেখে একটি হাদীস অন্তত শুনিয়ে দেই। এরপর তিনি শোনালেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ

'যখন তোমার লজ্জা চলে যাবে, তখন তুমি যা ইচ্ছা তাই করো।'[২০১]

---

২০১. সহীহ বোখারী, হাদীস নং- ৩২২৪

শো'বা রহ. বলেন, হাদীসটি কানে পড়ামাত্র আমার দিলে এমন প্রভাব বিস্তার করলো, মনে হলো যেন এ হাদীসটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্যেই বলেছেন। দিলে এমন আঘাত লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে অতীত জীবনের সকল কর্মকাণ্ড থেকে তাওবা করলাম।

এরপর আল্লাহ তা'আলা হযরত শো'বা রহ.-কে এমন সুউচ্চ মাকাম ও মর্যাদা দান করলেন যে, আজ তাঁকে 'আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস' উপাধীতে স্মরণ করা হয়। বোঝা গেলো, কোনো কোনো সময় একটি বাক্যও মানুষের পুরো জীবন এবং জীবনের গতি ও গন্তব্য পরিবর্তন করে দিতে পারে।

এক খান সাহেবকে সুপথে আনার ঘটনা

হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানবী রহ.-এর ঘটনা আছে যে, একবার তিনি একটি গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে তিনি একটি মসজিদ বিরান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলেন। লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, মসজিদটি বিরান হয়ে পড়ে আছে, তোমরা এটা আবাদ করো না কেন? লোকেরা বললো যে, এখানে একজন খান ছাহেব আছেন, তিনি এ এলাকার সর্দার। দ্বীনদারীর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। না নামাযের সাথে সম্পর্ক আছে, না রোযার সাথে সম্পর্ক আছে। সব সময় মদ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে। তার কাছে বাজারী নারীদের আনাগোনা রয়েছে। তার কারণে পুরা বসতি খারাপ হয়ে গেছে। খান ছাহেব নামায পড়তে মসজিদে এলে বসতির সবাই নামায পড়তে আরম্ভ করবে।

মাওলানা রহমতুল্লাহ রহ. বললেন, আমাকে তার ঠিকানা বলে দাও এবং তার সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দাও! লোকেরা খান ছাহেবের বাড়ি দেখিয়ে দিলো। মাওলানা ছাহেব দাওয়াত দেওয়ার জন্যে তার বাড়ি গেলেন। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে মাওলানা ছাহেব বললেন, 'ভাই খান ছাহেব! মাশাআল্লাহ আপনি একজন মুসলমান। আপনাদের মহল্লার মসজিদটি বিরান হয়ে পড়ে আছে। আপনি যদি মসজিদে নামায পড়তে যান, তাহলে আপনাকে দেখে অন্যেরাও মসজিদে যাবে। ফলে মসজিদ আবাদ হবে। এতে আপনার আমলনামায় অনেক নেকী জমা হবে। মাওলানা ছাহেব এমনভাবে দাওয়াত দিলেন যে, খান ছাহেবের উপর তাঁর কথার প্রভাব পড়লো। খান ছাহেব বললেন যে, আমি নামায পড়তে তৈরি আছি, কিন্তু আমার দ্বারা ওযু করা সম্ভব নয়। ওযু করার ক্ষমতা আমার নেই। দ্বিতীয় হলো, আমার দ্বারা মদ ছাড়া সম্ভব নয়। তৃতীয়, আমি নারীদের যাতায়াত বন্ধ করতে পারবো না।

এমতাবস্থায় আমি কী করে নামায পড়বো। এ জন্যে আমি নামাযে যাই না। মাওলানা ছাহেব তো প্রথমে অস্থির হয়ে পড়লেন যে, একে কী উত্তর দিবেন!

তারপর তিনি বললেন যে, আচ্ছা আপনি নামায পড়তে তৈরি আছেন কি না? খান ছাহেব বললো, হ্যাঁ আমি নামায পড়তে তৈরি আছি, কিন্তু ওযু করতে পারবো না। মাওলানা ছাহেব বললেন যে, আচ্ছা আপনি ওযু ছাড়াই নামায পড়ুন। অন্যান্য বিষয়ও চলতে থাকবে। কোনো অসুবিধা নেই। খান ছাহেব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে, ওযু ছাড়া নামায পড়বো! মাওলানা ছাহেব বললেন যে, হ্যাঁ ওযু ছাড়াই নামায পড়বেন। তবে নামাযের জন্যে মসজিদে যাবেন। খান ছাহেব বললেন যে, এতো সহজ বিষয় হলে ঠিক আছে যাবো। মাওলানা ছাহেব বললেন যে, 'ওয়াদা করুন! নামাযের জন্যে আপনি মসজিদে যাবেন।' খান ছাহেব ওয়াদা করলেন, 'হ্যাঁ! আমি ওয়াদা করছি, নামায পড়তে মসজিদে যাবো।'

মাওলানা ছাহেব তার থেকে ওয়াদা তো নিলেন এবং ওযু ছাড়া নামায পড়তে অনুমতিও দিলেন, তবে তার ঘর থেকে বের হয়ে সোজা ঐ মসজিদে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে দু' রাকআত নামায পড়লেন। নামাযের পর সিজদায় পড়ে খুব কাঁদলেন এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করলেন যে, 'হে আল্লাহ! আমার ক্ষমতা এতোটুকুই ছিলো। সামনের কাজ আপনিই করে দিন।'

নামাযের সময় যখন হলো। তখন খান ছাহেবের মনে পড়লো, আমি তো ওয়াদা করেছি, তাই নামাযের জন্যে মসজিদে যাওয়া উচিত। তিনি যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। ঘর থেকে যখন বের হতে লাগলেন, তখন মনের মধ্যে এই চিন্তা জাগলো যে, আজ তো প্রথমবার নামাযের জন্যে যাচ্ছি। যদিও মওলবী ছাহেব বিনা ওযুতে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু এতো দিন পর প্রথমবার নামায পড়তে যাচ্ছি। কমপক্ষে আজকে ওযু করে নেই। শুধু ওযু নয়, বরং আজ প্রথমদিন গোসল করে যাই। তারপর চাইলে ওযু ছাড়া নামায পড়বো। সুতরাং তিনি গোসল করলেন। পাক-পরিষ্কার কাপড় পরলেন। সুগন্ধি লাগালেন এবং ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে গেলেন। যখন তিনি নামায পড়লেন, তখন তার মনের অবস্থাই পাল্টে গেলো। নামায পড়ে ফিরে আসার পর আল্লাহ তা'আলা তার মনের মধ্যে মদ, নারী ইত্যাদির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিলেন। তারপর থেকে খান ছাহেব এমন পাকা নামাযী হলেন যে, ওযু সহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে আরম্ভ করলেন।

নিরেট দুনিয়াবিরাগী এখানে আপত্তি করবে যে, মাওলানা ছাহেব খান ছাহেবকে বিনা ওযুতে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। অথচ অনেক সময় বিনা ওযুতে নামায পড়া কুফরী পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়। কিন্তু আপত্তিকারীরা এটা দেখে না যে, মাওলানা ছাহেব একদিকে তো খান ছাহেবকে বিনা ওযুতে নামায পড়ার অনুমতি দিলেন, অপরদিকে তিনি মসজিদে গিয়ে সিজদায় পড়ে কেঁদে কেটে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করলেন যে, হে আল্লাহ! এ পর্যন্ত তো আমি নিয়ে এসেছি, বাকিটা আপনার হাতে।

আসল ব্যাপার এই ছিলো যে, কোনো কোনো সময় প্রাথমিক পর্যায়ের লোকের উপর থেকে শর্ত ও বাধ্যবাধকতা হটিয়ে দিলে তাকে সঠিক পথে আনার জন্যে তা উপকারী হয়। তবে এটা সবার কাজ নয় যে, আপনিও বিনা ওযুতে নামায পড়ার ফতওয়া দিয়ে দিবেন। বরং যেসব বান্দার কথা ও কাজের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা প্রভাব দান করেন, আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে অন্তর্জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দান করেন এবং বেদনা ও জ্বালা দান করেন, তাদের জন্যেই এমন কথা বলার হক রয়েছে।

ক্রোধও আল্লাহর জন্যে হতে হবে

হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আওলিয়া রহ. উঁচু মাকামের আল্লাহর ওলী ছিলেন। তাঁর যুগে হাকীম যিয়াউদ্দীন ছাহেব নামে একজন বড়ো আলেম, ফকীহ, মুফতী ও মাওলানা ছিলেন। হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আওলিয়া রহ. সূফী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আর হাকীম যিয়াউদ্দীন ছাহেব ছিলেন মুফতী ও ফকীহ হিসেবে প্রসিদ্ধ। হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আওলিয়া রহ. 'সেমা' জায়েয বলতেন। অনেক সূফীর নিকট 'সেমা'-এর প্রচলন ছিলো। 'সেমা' অর্থ হলো, বাদ্যযন্ত্র ছাড়া আল্লাহর গুণ ও প্রশংসা সম্বলিত কবিতা সুর দিয়ে বা সুর ছাড়া সুন্দরভাবে একজন পাঠ করা, আর অন্যেরা তা ভক্তি ও ভালোবাসার সাথে শোনা। কতক সূফী এর অনুমতি দিতেন, আর অনেক ফকীহ ও মুফতী এ ধরনের সেমাকেও নাজায়েয বলতেন; বরং বিদআত আখ্যা দিতেন। সুতরাং তাঁর যুগের মাওলানা হাকীম যিয়াউদ্দীন ছাহেবও সেমা নাজায়েয হওয়ার ফতওয়া দিয়েছিলেন, আর হযরত নেজামুদ্দিন আওলিয়া রহ. সেমা শুনতেন।

মাওলানা হাকীম যিয়াউদ্দীন ছাহেব রহ.-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আওলিয়া রহ. তাঁকে দেখতে যান। তিনি সেখানে গিয়ে দায়িত্বরত ব্যক্তিকে বললেন যে, হাকীম যিয়াউদ্দীন ছাহেবের নিকট

নিবেদন করুন, নিযামুদ্দীন দেখতে এসেছে। ভিতর থেকে হাকীম যিয়াউদ্দীন ছাহেব উত্তর দেন, তাকে বাহিরে থামাও। আমি কোনো বিদআতীর মুখ দেখতে চাই না। হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আওলিয়া রহ. উত্তর দেন, তাঁকে বলুন, বিদআতী বিদআত থেকে তাওবা করার জন্যে এসেছে। তখনই মাওলানা হাকীম যিয়াউদ্দীন ছাহেব নিজের পাগড়ী পাঠিয়ে দিয়ে বলেন যে, এটা বিছিয়ে দিয়ে খাজা ছাহেবকে বলো জুতা পরে এর উপর দিয়ে হেঁটে আসবেন, খালি পায়ে আসবেন না। খাজা ছাহেব পাগড়ী উঠিয়ে মাথার উপর রাখেন এবং বলেন, এটি আমার সম্মানের পাগড়ী। এভাবে তিনি ভিতরে যান। ভিতরে গিয়ে মুসাফাহা করে উপবেশন করে হাকীম যিয়াউদ্দীন রহ.-এর দিকে তাওয়াজ্জুহ দান করেন। তাঁর উপস্থিতিতে হাকীম যিয়াউদ্দীন রহ.-এর মৃত্যু হয়। খাজা ছাহেব বলেন, আলহামদুলিল্লাহ! হাকীম যিয়াউদ্দীন ছাহেবকে আল্লাহ তা'আলা কবুল করেছেন। মর্যাদা বৃদ্ধির সঙ্গে তার ইন্তিকাল হয়েছে।

'মসনবী' কি খোদাপ্রদত্ত বাণী?

বলা হয় যে, কাব্যচর্চার সঙ্গে মাওলানা রূমী রহ.-এর কোনো সম্পর্ক ছিলো না। মাওলানা রূমী রহ.-এর শায়েখ খাজা শামসুদ্দীন তিবরিযী রহ. একবার আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করেন যে, 'হে আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরে যে ইলম দান করেছেন, তা প্রকাশ করার জন্যে কোনো জিহ্বা দান করুন।' এ দু'আর ফলে মাওলানা রূমী রহ. তাঁর কাছে মুরীদ হন। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুখে 'মসনবী' চালু করে দেন। অথচ ইতোপূর্বে তিনি কখনো কবিতা রচনা করেননি। কিন্তু শায়েখের দু'আর পর তাঁর মুখে এ সব কবিতা আসতে থাকে। তিনি দফতরের পর দফতর মসনবী লেখেন। যখন আল্লাহ তা'আলার মঞ্জুরী বন্ধ হলো, তখন কবিতা আসাও বন্ধ হলো। এমনকি শেষে তিনি একটি ঘটনা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, সেই ঘটনাও পুরা হয়নি। মাঝপথেই কবিতা আসা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি ঐ ঘটনাকে অসম্পূর্ণই রেখে যান। তার কয়েক শতাব্দী পর হিন্দুস্তানের ইলাহী বখ্শ কান্ধলভীর মুখে আল্লাহ তা'আলা এই কবিতা চালু করে দেন। ফলে ঐ জায়গার পর থেকে তিনি কবিতা বলতে আরম্ভ করেন। তিনি মসনবীর শেষ দফতর পুরা করেন। এ কারণে তাঁকে 'খাতেমে মসনবী' বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুখে এ কবিতা চালু করলে তা চালু হয়, আর বন্ধ করলে বন্ধ হয়ে যায়। মোটকথা, এ কথাগুলোও আল্লাহ তা'আলার দান। এর মধ্যে বিশেষ বরকত ও প্রতিক্রিয়া রয়েছে। এ প্রতিক্রিয়াও আল্লাহ তা'আলাই দান

করেন। এ জন্যে হযরত থানবী রহ. বলেন যে, মসনবী অধ্যয়ন করবে, বুঝে আসুক বা না আসুক। কারণ এটা পড়া ফায়দাশূন্য নয়।

ইহুদী শাইলাকের ঘটনা

আপনারা 'শাইলাক'-এর ঘটনা শুনে থাকবেন। এটি রোমের একটি ঘটনা। 'শাইলাক' একজন ইহুদী। একলোক ঠেকায় পড়ে তার কাছে কিছু টাকা ধার আনতে গিয়েছিলো। শাইলাক বললো, আমি সুদ ছাড়া ঋণ দেই না। লোকটি বাধ্য হয়ে সুদের চুক্তিতে ঋণ গ্রহণ করলো। শাইলাক তাকে বলে দিলো, এতো দিনের মধ্যে পারিশোধ করতে হবে, আর মূল টাকার অতিরিক্ত এতো টাকা সুদ দিতে হবে।

মেয়াদ শেষ হলো এবং ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত দিন এসে পড়লো। শাইলাক ঋণের টাকা উসুল করার জন্যে ঋণগ্রহীতার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো। লোকটি বললো, আমার কাছে অল্প কিছু টাকা আছে, সুতরাং সে টাকাগুলো দিয়ে বললো, আমার কাছে আর নেই থাকলে দিতাম। শাইলাক আরেকটি তারিখ ধার্য করে দিয়ে বললো, এই তারিখের মধ্যে দিয়ে দিয়ো আর এখন তোমাকে দ্বিগুণ সুদ আদায় করতে হবে।

দ্বিতীয় তারিখটিতেও শাইলাক তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো। ঋণগ্রহীতা বললো, আপনি তো সুদ দ্বিগুণ করে দিয়েছেন; যা আদায় করতে আমি অপারগ। কাজেই সুদের অংশটা বাদ দিয়ে আসল টাকাটা নিয়ে নিন এবং আমাকে এই ঋণের দায় থেকে মুক্তি দিন। শাইলাক বললো, না, তা হবে না। আমি তো পুরো সুদই নিবো। তবে এটুকু করতে পারি যে, আমি তোমাকে আরেকটি তারিখ ঠিক করে দিচ্ছি; সেই তারিখে যদি না দাও, তা হলে আমি তোমার শরীর থেকে এক পাউন্ড গোশত কেটে নিয়ে তা চিবিয়ে খাবো। আর টাকা তো আলাদা উসুল করবোই।

সেই তারিখটিও এসে পড়লো। গরিব ঋণগ্রহীতা বেচারা টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলো। শাইলাক তার ঘরে ছুরি নিয়ে হাজির হলো। গরিব বেচারা পেরেশান হয়ে গেলো এবং কোনোমতে পালিয়ে রাজদরবারে চলে গেলো। গিয়ে রাজাকে বললো, মহারাজ! আমি একটি বিপদে পড়েছি, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। শাইলাক আমার গায়ের গোশত কেটে নিতে চাচ্ছে।

আদালতে মামলা হলো। ঋণগ্রহীতা লোকটিকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হলো। বিচারের জন্যে এজলাস বসলো। শাইলাক আদালতে

জোরালো বক্তব্য দিয়ে বললো, মাননীয় আদালত! আমার সঙ্গে সুবিচার করুন। এই লোকটি এতদিন যাবত আমার সঙ্গে টালবাহানা করছে। আমার থেকে সুদের উপর ঋণ নিয়ে এখন পরিশোধ করছে না। শেষ পর্যন্ত সে নিজেই আমাকে তার গায়ের গোশত কেটে দেবে বলে এখন তাও দিচ্ছে না। আমি আদালতের কাছে এর সুবিচার কামনা করছি। আমি আশা করি, আদালত আমার পক্ষে এই ডিক্রি জারি করবেন, যাতে আমি তার গোশত কেটে নিতে পারি। কারণ, ন্যায়বিচারের দাবি এটাই।

ঋণগ্রহীতা গরিব লোকটি কারাগারে বন্দী ছিলো। তাকে আদালতে হাজির করা হয়নি। তার পক্ষে তার স্ত্রী আদালতে এলো। সে স্বামীর পক্ষে বক্তব্য দিয়ে বললো, মহামান্য আদালত! সুদখোর শাইলাক আপনার কাছে সুবিচার দাবি করেছে। তার দাবি অনুসারে সুবিচারের দাবি হলো, তাকে আমার ঋণগ্রহীতা স্বামীর গায়ের গোশত কেটে নেওয়ার অধিকার প্রদান করা। আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, আল্লাহ যদি আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সুবিচারই করেন, তা হলে আমাদের ঠিকানা কোথায় হবে? এ জগতে সুবিচারই সব কিছু নয়। দয়া বলেও একটা কথা সংসারে আছে। আল্লাহপাক আমাদের উপর দয়া করলেই কেবল মুক্তি পাবো। আল্লাহর দয়া ছাড়া আমরা মুক্তি পাবো না।

সুতরাং বাদশাহ দয়ার ভিত্তিতে লোকটির পক্ষে রায় প্রদান করলেন।

যাইহোক, ইহুদি জাতি শাইলাকের মতো সারা পৃথিবীতে কৃপণ হিসেবে প্রসিদ্ধ।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. একটি ঘটনা লিখেছেন। এক বুযুর্গ ছিলেন। তিনি যখন যে দু'আ করতেন, আল্লাহপাক তা-ই কবুল করতেন। এক গরিব লোক তার কাছে গিয়ে বললো, হযরত! আপনি আমার জন্যে দু'আ করুন, যেন আল্লাহপাক আমাকে সম্পদশালী বানিয়ে দেন। আমি অনেক সমস্যায় আছি। আমার মনে বড়ো সাধ জেগেছে, আমি সব চেয়ে বড়ো ধনী হবো।

বুযুর্গ প্রথমে নীতিকথা দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন, ওসব তোমার দরকার নেই; যেমন আছো, তেমনই ভালো। এই চক্করে তুমি পড়ো না। আল্লাহর কাছে শান্তি চাও। এর চেয়ে বেশি কিছু দরকার নেই।

কিন্তু লোকটি মানলো না। বললো, না বড়লোক আমাকে হতেই হবে। অগত্যা বুযুর্গ বললেন, আচ্ছা, ঠিক আছে; তুমি বড়ো মাপের একজন ধনী মানুষ খুঁজে বের করো। পরে এসে আমাকে বলো; আমি দু'আ করে দেবো, আল্লাহ যেন তোমাকে তার মতো বানিয়ে দেন।

লোকটি বড়লোকের খোঁজে শহরে বেরিয়ে পড়লো। খুঁজতে-খুঁজতে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে পেলো এবং তাকেই পছন্দ করলো যে, আমি এই ব্যক্তির মতো হবো। তার একটি দোকান আছে। দোকানটা সোনায় পরিপূর্ণ। পাঁচ-ছয়টি ছেলে আছে। তার মধ্যে একটি ছেলে খুবই সুন্দর এবং সে পিতাকে তার ব্যবসায় সহযোগিতা করে। একজন মানুষের জীবনে সুখের উপকরণ যা-যা থাকা দরকার, সবই তার আছে। এক কথায় দুনিয়ার সব নেয়ামত আল্লাহপাক তাকে দান করেছেন।

লোকটি মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিলো, আমি এর মতো হবো।

গরিব লোকটি ফিরে এলো। বুযুর্গকে বললো, হযরত! আমি দেখে এসেছি। বড়লোক একজন পেয়েছি। এক সোনা ব্যবসায়ী। অনেক বড়ো ধনী মানুষ। আপনি দু'আ করুন, আল্লাহ যেন আমাকে তার মতো বানিয়ে দেন।

বুযুর্গ তাকে সাধ্যমতো বোঝালেন যে, তুমি আগে ভালো মতো খোঁজ-খবর নাও তারপর দু'আ করবো।

লোকটি বলল, না, আপনি দু'আ করুন; আমি তার মতো হতে চাই।

বুযর্গ বললেন, ঠিক আছে করবো। তার আগে তুমি আবার তার কাছে যাও। তুমি তো তার বাহ্যিক অবস্থাটা দেখে এসেছো। এবার গিয়ে ভেতরের খবরটা নিয়ে এসো, আসলে সে কেমন সুখী। তুমি আবার গিয়ে তার সঙ্গে একাকি কথা বলো আর জিজ্ঞাসা করো যে, আপনি প্রকৃতই সুখী কি না?

লোকটি আবার গেলো এবং সোনা ব্যবসায়ীর সঙ্গে একান্তে আলাপ করলো। জিজ্ঞাসা করলো, আমি তো আপনার বাহ্যিক অবস্থা দেখেছি। আপনার দোকান খুবই উন্নত। বাহ্যিক অবস্থা হিসেবে তো আপনাকে বেশ সুখী বলে মনে হয়। কিন্তু এখন আমি আপনার মুখ থেকে জানতে চাই, আপনি আসলে কেমন সুখী?

ব্যবসায়ী বললো, মিয়াঁ, কোন চক্কর পড়েছো তুমি! আমার মতো দুঃখী আর বিপদগ্রস্ত মানুষ জগতে দ্বিতীয়জন নেই। আমার সোনার ব্যবসা আছে। বেশ ভালোই চলছিলো। আয়-উপার্জন অনেক হচ্ছিলো। হঠাৎ একবার আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লো। অনেক চিকিৎসা করালাম। কিন্তু কোনো কাজ হলো না। স্ত্রী সুস্থ হলো না। আমি চরম এক অশান্তি ও পেরেশানিতে পড়ে

গেলাম। অবশেষে সেও হাল ছেড়ে দিলো। নিরাশ হয়ে গেলো। আমি তাকে খুব ভালোবাসতাম। সে আমাকে বললো, আমি মরে গেলে তো তুমি আরেকটা বিয়ে করে আমাকে ভুলে যাবে।

আমি বললাম, তোমাকে ওয়াদা দিচ্ছি, আমি আর বিয়ে করবো না। সে বললো, তার নিশ্চয়তা কী? আমি কী করে বিশ্বাস করবো যে, তুমি আবার বিয়ে করবে না?

আমি বললাম, এ কথা আমি কসম খেয়েও বলতে রাজী আছি। সে বললো, তোমার কসমে আমি বিশ্বাস করি না। অবশেষে তাকে নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্যে আমি আমার যৌনাঙ্গ কেটে ফেললাম যে, এবার বিশ্বাস করো, তুমি মারা গেলে আমি আর কাউকে বিয়ে করবো না, তোমাকে স্মরণ করেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেবো।

কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় সে আর মরলো না। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেলো। কিন্তু আমি তো যৌনশক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম।

এ অবস্থায় আমরা বেশ কিছু দিন অতিবাহিত করলাম। আমার স্ত্রী ছিলো যুবতী। যৌনকামনা নিবারণে আমার থেকে নিরাশ হয়ে কিছু দিন ধৈর্যধারণ করার পর সে পাপের পথ অবলম্বন করলো। এই যে দোকানে সুদর্শন ছেলেটি দেখতে পাচ্ছেন, এর জনক আমি নই; কিন্তু জননী আমার স্ত্রী। এ আমার স্ত্রীর অবৈধ সন্তান। আমি সব দেখি আর ছটফট করি। জীবনটা আমার অশান্তির সাগর। সেই সাগরেই আমি সব সময় হাবুডুবু খাই। তুমি দুনিয়া ঘুরে আমার চেয়ে দুঃখী মানুষ আরেকজন পাবে না।

কাজেই বাহ্যিক জাঁকজমকপূর্ণ যাদেরকে দেখা যাচ্ছে, তাদের ভেতরটায় একটু উঁকি দিয়ে দেখো। তাহলে বুঝতে পারবে, এর ভেতরটায় কতো অন্ধকার। তাই আল্লাহর কাছে চাওয়ার জিনিস হলো আফিয়ত তথা সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তা। দু'আ করতে হবে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সুখ দান করুন, আমাকে শান্তি দান করুন। আর সম্পদ যাকিছু দান করেছেন, তাতে বরকত দিন।

রাজাকে গালি দেওয়ার পুরস্কার

(নিম্নের ঘটনাটি যে পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, হাদীস শরীফে এসেছে, এক ব্যক্তিকে আল্লাহর দরবারে পেশ করা হলো। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের বললেন, তার আমলনামা দেখ, সে কী কী আমল করেছে। ফেরেশতারা দেখলেন, তার আমলনামা প্রায় নেকীশূন্য। না নামায আছে, না রোযা আছে, না

আছে অন্য কোনো ইবাদত। শুধু এতটুকু আছে যে, সে বড় ব্যবসায়ী ছিল। চাকর-নকরকে সে বলে রেখেছিল, কোনো ক্রেতাকে অভাবগ্রস্ত দেখলে তার সঙ্গে সদয় আচরণ করবে। পাওনা পরিশোধে তার সঙ্গে কঠোরতা করবে না। প্রয়োজনে ক্ষমা করে দেবে। সুতরাং সে ব্যক্তি আজীবন অভাবীদের সঙ্গে এমন আচরণ করেছে। হয় সুযোগ দিয়েছে, না হয় ক্ষমা করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তার এ আমলের বদলায় তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং জান্নাত দান করলেন।

তো এটা ছিল তাঁর রহমত ও দয়ার বিশেষ আচরণ; আইনের আচরণ নয়। আইন হলো, বান্দাকে সমস্ত ফরয অবশ্যই আদায় করতে হবে এবং যাবতীয় গুনাহ থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। তা না করে যদি এ ঘটনার উপর ভিত্তি করে শুধু মানুষকে এভাবে ক্ষমা করতে থাকে অথবা নিজের অন্য কোনো নেক আমলের উপর ভরসা করে বসে থাকে, তাহলে এটা ঠিক হবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলার আচরণ তার বান্দাদের সাথে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কারও সাথে রহমতের আরচণ, কারও সাথে আইন ও ইনসাফের আচরণ। এজন্য এ জাতীয় ঘটনাবলির সঠিক উপলব্ধি ও সঠিক সবক অর্জন করা চাই।

ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা : ২২৬-২২৮ অবলম্বনে।

হযরত থানভী রহ. এ জাতীয় ঘটনাসমূহের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরার জন্য একটা ঘটনা বলেন, দক্ষিণ হায়দারাবাদের এক রাজার ঘটনা। একবার তার এক মন্ত্রী তাকে দাওয়াত করল। রাজা তার বাড়ি গেল। মন্ত্রীর ছোট্ট একটা ছেলে ছিল। সে একা একা খেলছিল। রাজার আবার শিশুদেরকে ঘাঁটানোর এবং বিরক্ত করার অভ্যাস ছিল। তিনি শিশুটির কান মলে দিলেন। শিশুটি ছিল খুবই তেজী। সে কী জানে কে নবাব, কে রাজা! ব্যস, রাজাকে কান মলার উত্তর দিয়ে দিল এবং একটা গালি শুনিয়ে দিল। গালি শুনে মন্ত্রী ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন—না জানি এখন বাচ্চার কী পরিণতি হয়। কারণ বাদশাহ নামদারের মুখ দিয়ে যা বের হয় তাই এখানকার আইন। তাই মন্ত্রী রাজাপরায়ণতা দেখানোর জন্য তরবারি বের করে বললেন, হুজুর! আমি এখনি তার কল্লা উড়িয়ে দেই। কারণ সে আপনার সঙ্গে বেয়াদবি করেছে। রাজা বললেন, আরে রাখ, শিশু তো এমন করবেই। বাকি আমার কাছে মনে হচ্ছে এ ছেলে বড় মেধাবী ও আত্মাভিমানী! তার মধ্যে এ পরিমাণ আত্মমর্যাদাবোধ আছে যে, কেউ যদি তাকে কান মলা দেয় তাহলে সে অত সহজে তার সামনে দবে যাবার নয়। বরং সে নিজেই এর প্রতিশোধ নেবে।

কারণ সে নিজের উপর আস্থাশীল ও আত্মনির্ভরশীল। আমি তার এ আত্মমর্যাদাবোধ ও আস্থাশীলতায় মুগ্ধ হয়েছি। অতএব তার জন্য এখন থেকে একটা মাসিক ভাতা চালু করে দাও। সুতরাং তার নামে ভাতা চালু হয়ে গেল। সে ভাতার নাম ছিল 'ওযীফায়ে দোশনাম' বা 'গালি-ভাতা'।

হযরত থানভী রহ. বলেন, এখন বল, তুমিও কি এটা চিন্তা করে বাদশাহকে গালি দিতে যাবে যে, গালি দিলে ভাতা পাওয়া যায়? বলাবহুল্য, এ কাজ কেউ করবে না। কারণ এটা হলো বিশেষ ও বিচ্ছিন্ন একটা ঘটনা। শিশুটির বিশেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ রেখে রাজা ওই মহানুভবতা দেখিয়েছেন। গালি দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তাকে শাস্তি না দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন। কিন্তু এটা কোনো আইন নয় যে, যে-ই বাদশাকে গালি দেবে, সে-ই ভাতা পাবে। বরং কেউ গালি দিলে তার উপর উত্তম-মাধ্যম চলবে। জেলে বন্দী করা হবে। এমনকি তাকে হত্যাও করা যেতে পারে!

ঠিক এই আচরণটিই আল্লাহ তা'আলার ওখানে হয়। তিনি কাউকে কোনো এক অসিলায় ক্ষমা করেন, তো অন্য কাউকে অন্য কোনো অসিলায় ক্ষমা করেন। কারও এক আমল কবূল করেন, তো অন্যজনের অন্য আমল কবূল করেন। তাঁর রহমত কোনো আইন-কানুন ও শর্তের অধীন নয়। তিনি যাকে চান এবং যেভাবে চান দয়া ও অনুগ্রহ করেন।

তাঁর ঘোষণা— وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ

'আর আমার দয়া—সে তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত।'[২০২]

তাঁর ওখানে কারও প্রতি কোনো অবিচার তো কখনো হয় না। কিন্তু এমন হয় যে, কখনো কারও কোনো আমল তাঁর পছন্দ হলো, তো এর বদৌলতে তাকে তিনি বখশে দেন এবং মুক্তি দিয়ে দেন।

কবি ফয়জির ঘটনা

বাদশাহ আকবরের যুগে ফয়জি ছিলেন অনেক বড়ো কবি ও সাহিত্যিক। একবার তিনি নাপিত দিয়ে দাড়ি মুণ্ডাচ্ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে এ অবস্থা দেখে বললো,

জনাব আপনি দাড়ি মুণ্ডাচ্ছেন?

কবি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, দাড়ি মুণ্ডাচ্ছি ঠিক, কিন্তু কারো মনে ব্যথা দিচ্ছি না।

---

২০২. সূরা আ'রাফ (৭), আয়াত ১৫৬

অর্থাৎ, আমার এ অন্যায় কর্ম তো আমার মধ্যেই সীমিত। আমি কারো কষ্টের কারণ হচ্ছি না। কিন্তু তুমি আমার এ কাজের জন্যে যেভাবে বললে তাতে তো তুমি আমার অন্তরে ব্যথা দিলে।

প্রতি উত্তরে ঐ ব্যক্তি বললো, আরে তুমি বলছো কারো মনে তুমি ব্যথা দাওনি, তুমি তো এ কাজ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে ব্যথা দিচ্ছো।

মাওলানা রফীউদ্দীন ছাহেব রহ.-এর ঘটনা

হযরত মাওলানা রফী উদ্দীন রহ. দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম ছিলেন। বিস্ময়কর বুযুর্গ ছিলেন। দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম মানে সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী। তিনি একটি গাভী পালন করতেন। একবার তিনি গাভী নিয়ে আসছেন। পথিমধ্যে মাদরাসার কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি গাভী নিয়েই মাদরাসায় চলে আসেন। গাভীটি মাদরাসার মাঠে গাছের সঙ্গে বেঁধে তিনি দপ্তরে যান। এমতাবস্থায় দেওবন্দের এক লোক মাদরাসায় এসে খুব হৈ-চৈ শুরু করে দেয়। এ গাভী কার? এখানে গাভী বেঁধেছে কে? লোকেরা বললো, এটা মুহতামিম ছাহেবের গাভী। এরপর সে বলতে লাগলো- ও! মাদরাসা মুহতামিম ছাহেবের কসাইখানা হয়েছে বুঝি! মাদরাসাকে উনি এমনভাবে খাওয়া আরম্ভ করেছেন যে, এখন এটাকে গোয়াল ঘর বানিয়েছেন! তার হৈ-চৈ শুনে সেখানে মানুষের জটলা হয়ে গেলো এবং বিভিন্ন অপবাদ শুরু হয়ে গেলো। হযরত দপ্তরে কাজ করছেন। আওয়াজ শুনে বের হলেন যে, কী ঘটনা? লোকেরা বললো, হযরত মাদরাসায় গাভী বাঁধার কারণে এ লোক খুব অসন্তুষ্ট হয়েছে। হযরত বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। এ মাদরাসা আল্লাহর। এখানে আমার গাভী বাঁধা ঠিক হয়নি। কারণ, গাভী আমার ব্যক্তিগত জিনিস, আর মাঠটি হলো মাদরাসার। আমার ভুল হয়েছে। আমি এই ভুলের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। আর আমার মন চাচ্ছে এই ভুলের কাফফারা হিসেবে আপনি গাভীটি নিয়ে যান। এ আল্লাহর বান্দাও এমন ছিলো যে, সে গাভী নিয়ে রওয়ানা দিলো।

দেখুন! যেখানে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে সাধারণ মানুষ সবার সামনে এভাবে উচ্চ-বাচ্য করলো, সেখানে তাকে কিছু তো বললেনই না, উল্টো গাভীটিও তাকে দিয়ে দিলেন। এটাই হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। لَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ 'মন্দকে মন্দ দ্বারা প্রতিহত না করা'-এর উপর আমল।

ক্ষমা ও ধৈর্যের একটি আদর্শ ঘটনা

হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর জামানায় দুই ব্যক্তির পরস্পরে ঝগড়া লাগল। তাতে একজনের দাঁত ভেঙ্গে গেলো। যার দাঁত ভেঙ্গে গেলো, সে অপরজনকে হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর কাছে ধরে নিয়ে এলো। এসে বললো, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত চাই। আপনি আমর দাঁতের 'কিসাস' দিয়ে দিন।

হযরত মুআবিয়া রাযি. বললেন, ঠিক আছে, তোমার 'কিসাস' নেওয়ার অধিকার আছে, কিন্তু এতে তোমার কী লাভ হবে? তোমার দাঁত তো ভেঙ্গেই গেছে। এখন তার দাঁত ভেঙ্গে তোমার কী লাভ হবে? তার চেয়ে বরং সমঝোতা করে তার কাছ থেকে দাঁতের 'দিয়্যাত' নিয়ে নাও। সে বললো, না আমি দাঁতের বদলে দাঁত চাই। হযরত মুআবিয়া রাযি. তাকে আবার বোঝালেন, কিন্তু সে তা মানলো না। অবশেষে তিনি বললেন, ঠিক আছে, চলো তার দাঁত ভেঙ্গে দিচ্ছি।

রাস্তায় হযরত আবুদ দারদা রাযি. বসা ছিলেন। তিনি ছিলেন অনেক বড়ো মাপের সাহাবী। তিনি বললেন, দেখো ভাই! 'কিসাস' তো নিতে যাচ্ছো, তবে একটি কথা শুনে যাও। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কেউ যদি কাউকে কষ্ট দেয় এবং সে তাকে ক্ষমা করে দেয় তাহলে আল্লাহ তাআলা এই ক্ষমাকারীকে তখন ক্ষমা করে দিবেন, যখন সে (পরকালে) ক্ষমার প্রতি সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী হবে। ইতিপূর্বে লোকটি দাঁতের বিনিময়ে টাকা নিতেও সম্মত ছিলো না, কিন্তু এ কথা শুনে সে হযরত আবুদ দারদা রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলো,

أَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'আপনি কি নিজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ কথা শুনেছেন?'

তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আমি নিজে শুনেছি এবং আমার এই কানগুলো শুনেছে। তখন সে বললো, আচ্ছা ঠিক আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এ কথা বলে থাকেন তাহলে আমি কোনো বিনিময় ছাড়াই তাকে ক্ষমা করে দিলাম।[২০৩]

২০৩. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং- ১৩১৩; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- ২৬৮৩

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অকৃত্রিম বন্ধু হযরত যাহের রাযি.

জনৈক বেদুঈন গ্রাম থেকে কখনো কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসতেন। তাঁর নাম ছিলো যাহের রাযি.। তিনি দেখতে শ্রীহীন এক গ্রাম্য মানুষ ছিলেন এবং ধন-সম্পদেও ছিলেন অনেক দুর্বল। মানুষের দৃষ্টিতেও তার বিশেষ কোনো মর্যাদা ছিলো না। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখলেন যাহের রাযি. বাজারে দাঁড়িয়ে আছেন। এটা খুব স্বাভাবিক যে, এমন একজন সাধারণ মানুষ যখন বাজারে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন কে তার প্রতি খেয়াল করে! গায়ের পোশাকও পুরাতন। এ অবস্থায় কেউই তার দিকে খেয়াল করার কথা নয়, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি অন্য সবাইকে বাদ দিয়ে পিছনের দিক থেকে হযরত যাহির রাযি.-এর কাছে এলেন। একবন্ধু আরেক বন্ধুর সঙ্গে যেভাবে হাসি-তামাশা করে ঠিক সেভাবে পিছন থেকে হাত বাড়িয়ে তার চোখ দুটো ধরে ফেললেন। আর যাহির রাযি. নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা শুরু করলেন। এর পর ফেরিওয়ালা যেভাবে তার পণ্য বিক্রির জন্যে ক্রেতা আহবান করে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেভাবে বলতে লাগলেন-

مَنْ يَّشْتَرِيْ هٰذَا الْعَبْدَ مِنِّيْ

'গোলামটি কে খরিদ করবে?'

এ পর্যন্ত যাহের রাযি. বুঝতে পারেননি যে, কে তাকে ধরেছে। এ জন্যে এতোক্ষণ নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু আওয়াজ শোনামাত্র যখন চিনে ফেললেন, তখন ছাড়াবার পরিবর্তে নিজের শরীর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরের সঙ্গে লাগিয়ে দিলেন। আর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি আমাকে গোলাম হিসেবে বিক্রি করতে চান, তবে তো খুব কম মূল্য পাবেন। কারণ, আমি তো অতি সাধারণ মানুষ। যারা আমাকে কিনবে, তারা বেশি দাম দিবে না। তাঁর এ কথার উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতো চমৎকার কথা বলেছেন। সুবহানাল্লাহ! তিনি বলেছেন,

لٰكِنْ عِنْدَ اللّٰهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ

হে যাহির! মানুষ তোমাকে মূল্য দিক আর না দিক, আল্লাহর নিকট কিন্তু তুমি কম মূল্যের নও। আল্লাহর নিকট তোমার মূল্য অনেক। দেখুন! বাজারে নিশ্চয়ই অনেক বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী ছিলো। অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তির সমাগম ছিলো। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে বাদ দিয়ে হযরত যাহের রাযি.-কে খুশি করার জন্যে এবং তাঁকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্যে তাঁর কাছেই চলে গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে এমন বন্ধুসুলভ আচরণ করলেন, যা একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু অপর বন্ধুর সঙ্গে করে থাকে।[২০৪]

কাজী বাক্কার বিন কুতাইবা রহ.-এর শিক্ষণীয় ঘটনা

বাক্কার বিন কুতাইবা রহ. নামে একজন কাজী ছিলেন। তিনি ছিলেন বড়ো মাপের মুহাদ্দিস। মাদরাসাসমূহে 'তহাবী শরীফ' নামে হাদীসের একটি কিতাব পড়ানো হয়। এর লেখক হলেন ইমাম তহাবী রহ.। কাজী বাক্কার বিন কুতাইবা রহ. তাঁর ওস্তাদ। ঐ যুগের বাদশাহ তাঁর প্রতি সদয় হন। এমন সদয় হন যে, সব বিষয়ে তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন। সব ব্যাপারে তাকে ডাকতেন। সব দাওয়াতে তাকে আহবান করতেন। এমনকি তাকে পুরো দেশের কাজী বানিয়ে দেন। এখন সব ফয়সালা তাঁর কাছে আসছে। দিন-রাত বাদশার সঙ্গে ওঠা-বসা চলছে। তিনি কোনো সুপারিশ করলে বাদশাহ তা গ্রহণ করেন। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকে। তিনি তার কাজীর দায়িত্বও পালন করেন এবং বাদশাহকে উপযুক্ত পরামর্শও দান করেন।

তিনি তো ছিলেন আলেম ও বিচারক। বাদশাহর দাস ছিলেন না। বাদশাহ একবার ভুল কাজ করে বসেন। কাজী ছাহেব ফতওয়া দেন যে, বাদশাহর এ কাজ ভুল। শরীয়ত পরিপন্থী। এখন বাদশাহ অসন্তুষ্ট হয় যে, আমি এতো দিন পর্যন্ত তাকে খাওয়াচ্ছি, পরাচ্ছি, তাকে হাদিয়া তোহফা দিচ্ছি, তার সুপারিশ কবুল করছি এখন তিনিই আমার বিরুদ্ধে ফতওয়া দিলেন। সুতরাং অবিলম্বে তাকে কাজীর পদ থেকে বরখাস্ত করে। দুনিয়ার রাজা-বাদশারা খুব ছোট মনের হয়ে থাকে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে উদার দেখা গেলেও বাস্তবে ছোট মনের হয়ে থাকে। এই বাদশাহ শুধু তাকে বিচারপতির পদ থেকে বরখাস্তই করেনি, বরং তাঁর নিকট দূত পাঠিয়েছে যে, গিয়ে তাকে বলো, আজ পর্যন্ত আমি যতো হাদিয়া তোহফা দিয়েছি সব ফেরত দাও। কারণ, তুমি এখন আমার মর্জির খেলাফ কাজ শুরু করেছো। এবার আপনারা চিন্তা করুন!

---

২০৪. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ১২১৮৭; শামায়েলে তিরমিযী, পৃষ্ঠা: ১৬

কয়েক বছরের সব হাদিয়া, কখনো এটা দিয়েছে, কখনো ওটা দিয়েছে। যাইহোক, বাদশাহর সেই লোক এলে তিনি তাকে বাড়ির একটা কামরার মধ্যে নিয়ে গেলেন। একটা আলমারির তালা খুললেন। পুরো আলমারি থলে দিয়ে ভরা ছিলো। তিনি ঐ দূতকে বললেন, তোমার বাদশাহ পক্ষ থেকে হাদিয়ার যতো থলে আসতো তা সবগুলোই এই আলমারিতে রাখা আছে। থলের উপর যে সিল-মোহর লাগানো ছিলো তা এখনও খোলা হয়নি। এসব থলে নিয়ে যাও। কারণ, যেদিন থেকে বাদশাহর সাথে সম্পর্ক হয়েছে, আলহামদু লিল্লাহ, ঐ দিন থেকেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীস আমার মাথায় ছিলো যে,

أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَّا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَّا

'নিজের বন্ধুকে ধীরে ধীরে মহব্বত করো। হতে পারে সে একদিন তোমার শত্রুতে পরিণত হবে।'[২০৫]

আমার ধারণা ছিলো যে, হয়তো এমন কোনো সময় আসবে, যখন এ সব হাদিয়া আমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। আলহামদুল্লিাহ, বাদশাহর দেওয়া হাদিয়া-তোহফার মধ্যে থেকে একটি কণাও আমি আজ পর্যন্ত ব্যবহার করিনি। এটা হলো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর উপর আমল করার সঠিক নমুনা। এমন নয় যে, যখন বন্ধুত্ব হলো তখন সব ধরনের সুবিধা ভোগ করা হচ্ছে, আর যখন শত্রুতা হলো তখন লজ্জা ও অনুতাপ হচ্ছে।

মওলবীগিরি বিক্রির জিনিস নয়

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ছাহেব রহ. তাঁর কোনো ওস্তাদ বা শাইখের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন যে, একবার তিনি এক দোকানে একটি জিনিস ক্রয় করতে যান। দোকানদার তাকে চিনতো না। তিনি ঐ জিনিসের মূল্য জিজ্ঞাসা করেন। দোকানদার মূল্য বলে। তিনি মূল্য পরিশোধ করছিলেন এমন সময় অন্য এক ব্যক্তি সেখানে আসে, যে ঐ মাওলানা ছাহেবকে চিনতো। ঐ লোকটি দোকানদারকে বললো যে, ইনি অমুক মাওলানা ছাহেব, তাকে ছাড় দিয়েন। তখন মাওলানা ছাহেব বললেন,

'আমি আমার মওলবী হওয়ার মূল্য নিতে চাই না। এই জিনিসের প্রকৃত মূল্য যা তাই আমার থেকে নাও। এ কারণে যে, প্রথমে তুমি যেই মূল্য বলেছিলে, সেই মূল্যে তুমি খুশি মনে এই জিনিস দিতে প্রস্তুত ছিলে। এখন

---

২০৫. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং- ১৯২০

যদি অন্য মানুষের কথায় তুমি ছাড় দাও, আর তাতে তোমার দিল পরিতৃপ্ত না থাকে, তাহলে তা খুশি মনে দেওয়া হবে না। তখন এ জিনিসের মধ্যে আমার বরকত হবে না এবং তা নেওয়া আমার জন্যে হালাল হবে না। এজন্যে তুমি আমাকে যেই পরিমাণ মূল্য বলেছিলে, ঐ পরিমাণ মূল্যই নাও।'

এ ঘটনা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেন যে, মওলবীগিরি বিক্রির জিনিস নয় যে, বাজারে তা বিক্রি করা হবে, আর মানুষ এর কারণে জিনিসের মূল্য কম রাখবে।

প্রতিবেশী

আবু হামযা সুক্কারী রহ. ছিলেন হাদীসের একজন 'রাবী' (বর্ণনাকারী)। আরবী ভাষায় চিনিকে 'সুক্কার' বলা হয়। তাঁর জীবনীকারগণ লিখেছেন যে, তাঁকে 'সুক্কারী' বলার কারণ তাঁর কথাবার্তা, বাকভঙ্গী এবং ধরন-ধারণ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং সুমিষ্ট ছিলো। তিনি কথা বলার সময় শ্রোতাগণ বিমোহিত হয়ে পড়তো। তিনি বাগদাদ নগরীর একটি মহল্লায় বাস করতেন। কিছুদিন পর তিনি বাড়ি বিক্রি করে অন্যত্র চলে যাওয়ার ইচ্ছা করেন। বাড়ির ক্রেতার সঙ্গেও কথাবার্তা অনেকটা চূড়ান্ত হয়ে যায়। এমন সময় তাঁর প্রতিবেশী ও মহল্লার লোকেরা বিষয়টি জানতে পারে যে, তিনি এ মহল্লা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার ইচ্ছা করেছেন। তখন মহল্লার লোকদের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল তাঁর নিকট আসে। তারা তাঁকে মহল্লা ছেড়ে চলে না যাওয়ার জন্যে কাকুতি-মিনতি করে অনুরোধ করে। আবু হামযা সুক্কারী তাঁর সমস্যার কথা তুলে ধরলে মহল্লার সকলে সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব পেশ করে যে, এ বাড়ি তৈরি করতে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে, আমরা সে পরিমাণ অর্থ আপনার খেদমতে হাদিয়াস্বরূপ দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আপনি আমাদেরকে আপনার প্রতিবেশী হওয়া থেকে বঞ্চিত করবেন না। তিনি মহল্লার লোকদের এমন আন্তরিকতাপূর্ণ ভালোবাসা প্রত্যক্ষ করে মহল্লা ছেড়ে চলে যাওয়ার ইচ্ছা মুলতবি করেন।

দয়ার সুউচ্চ স্তর

আল্লাহ তা'আলা হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান ছাহেব রহ.-কে মাখলুকের প্রতি দয়া করার বিস্ময়কর সুউচ্চ মাকাম দান করেছিলেন। কোনো পশুকে প্রহার করা তো দূরের কথা, তার জায়গা থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যেও কখনো তাঁর হাত উঠতো না। চিন্তা করতেন, এটা তো আল্লাহর

মাখলুক। এমনকি একবার তাঁর পায়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, সেখানে মাছি এসে বসে। স্বভাবতই ক্ষত স্থানে মাছি বসলে বেশি কষ্ট হয়। কিন্তু তথাপিও তিনি মাছিগুলো তাড়াতেন না। নিজের কাজে মগ্ন থাকতেন। একজন এসে এ অবস্থা দেখে বললো, হযরত অনুমতি হলে আমি মাছিগুলো তাড়িয়ে দেই। উত্তরে হযরত বললেন, আরে ভাই! মাছিগুলো নিজের কাজ করছে। আমাকে আমার কাজ করতে দাও।

তাঁর অন্তরে এই চিন্তা ছিলো যে, এ মাছিগুলো তো আল্লাহর মাখলুক। এগুলোকে এখান থেকে তাড়িয়ে কেন পেরেশান করবো? মোটকথা, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর মহব্বতের দাবি তখনই সত্য বিবেচিত হবে, যখন তাঁর মাখলুকের প্রতিও অন্তরে মহব্বত থাকবে এবং তাদের প্রতি দয়া থাকবে।

এক বুযুর্গের শিক্ষণীয় ঘটনা

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি জনৈক বুযুর্গের ঘটনা লিখেছেন যে, তার স্ত্রী খুব ঝগড়াটে স্বভাবের ছিলো। সর্বক্ষণ কলহ-বিবাদে লেগে থাকতো। বুযুর্গ ঘরে ঢুকলে সে তার সাথে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করতো। মুখে যা আসতো তাই বলতো। কেউ একজন তাকে বললো, হযরত ঘরের মধ্যে এরকম ঝগড়া-বিবাদ পুষছেন কেন। তালাক দিয়ে এ পাট চুকিয়ে ফেলুন। বুযুর্গ বললেন ভাই তালাক দেওয়া তো সহজ। যখন ইচ্ছা দিতে পারব। কিন্তু এর মধ্যে যে, আরও বহু গুণ দেখতে পাই! তার মধ্যে তো এমন একটা গুণ আছে। যে কারণে আমি তাকে কখনও ছাড়তে পারবো না। সে কারণেই আমি তাকে তালাক দিচ্ছি না। গুণটি হলো বিশ্বস্ততা। এ গুণটি তার মধ্যে এমনই অসাধারণ যে, ধরে নাও আমি যদি বন্দি হয়ে পঞ্চাশ বছরও জেলে পড়ে থাকি। তবুও আমার বিশ্বাস আমি তাকে ঘরের যে কোণে বসিয়ে যাবো সেখানেই বসে থাকবে এবং কারও দিকে চোখ তুলে তাকাবে না। এটা এমনই এক গুণ যার কোনো মূল্য দেওয়া সম্ভব নয়।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

আমি কিতাবে একটি ঘটনা পড়েছিলাম। জানিনা সত্য না মিথ্যা। কিন্তু ঘটনাটি খুবই শিক্ষনীয়। তা এই যে, এক ব্যক্তি বৃদ্ধ হলো। সে তার ছেলেকে উচ্চ শিক্ষা দিলো। একদিন বাড়ির আঙিনায় বাপ-বেটা বাসা ছিলো। ইতোমধ্যে একটি কাক বাড়ির দেয়ালে এসে বসলো। তখন বাপ বেটাকে

জিজ্ঞাসা করলো, এটা কী জিনিস? সে উত্তর দিলো, আব্বাজান এটা একটা কাক। একটু পরে বাপ পুনরায় জিজ্ঞাসা কলো, বেটা এটা কী? বেটা বললো, আব্বাজান এইমাত্র তো বললাম এটা কাক। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর বাপ পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো, বেটা এটা কী? এবার ছেলের কণ্ঠস্বর পরিবর্তন হলো। সে ঝাংটা দিয়ে বললো, আব্বাজান কাক কাক কাক। এর একটু পর বাপ আবারো জিজ্ঞাসা করলো, বেটা এটা কী? এবার বেটা আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতো পারলো না। সে বললো, আপনি সব সময় একই কথা বারবার জিজ্ঞাসা করতে থাকেন। হাজার বার বললাম, এটা কাক, কিন্তু আপনার বুঝে এলো না। এভাবে ছেলে বাপকে ধমকাতে আরম্ভ করলো। একটু পরে বাপ উঠে তার কামরায় চলে গেলো এবং একটা পুরাতন ডায়রি বের করে আনলো। ঐ ডায়রির একটা পৃষ্ঠা খুলে ছেলেকে দেখিয়ে বললো, বেটা এটা কী লেখা আছে, একটু পড়ো। সে পড়ে দেখলো, তাতে লেখা আছে- 'আজ আমার ছোট ছেলে আঙিনায় বসে ছিলো। আমিও বসে ছিলাম। ইতোমধ্যে একটি কাক এলো। ছেলে আমাকে পঁচিশবার জিজ্ঞাসা করলো, আব্বাজান এটা কী? তো আমি পঁচিশবার উত্তর দিলাম, বেটা এটা কাক। তার এই ভঙ্গি আমার অনেক ভালো লাগলো।' ছেলে এটা পড়ার পর বাপ ছেলেকে বললো, বেটা দেখো! বাপ আর বেটার মধ্যে এই হলো পার্থক্য। তুমি যখন শিশু ছিলে তখন তুমি আমাকে পঁচিশবার জিজ্ঞাসা করেছো। আমি পঁচিশবার প্রশান্তির সাথে শুধু উত্তর দিয়েছি তাই নয়, বরং ছেলের এই ভঙ্গি ভালো লেগেছে সে মনোভাবও প্রকাশ করেছি। আজ আমি মাত্র পাঁচবার জিজ্ঞাসা করেছি, আর তোমার এতো ক্রোধের উদ্রেক হয়েছে!

হযরত শাইখুল হাদীস রহ.-এর একটি ঘটনা

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া রহ. তাঁর আত্মজীবনীতে একটি ঘটনা লিখেছেন যে, আমি যখন ছোট শিশু ছিলাম, তখন আমার মা-বাবা আমার জন্যে ছোট একটি সুন্দর বালিশ বানিয়ে দিয়েছিলেন। যেমনটি সাধারণত শিশুদের জন্যে বানানো হয়। বালিশটি আমি খুব ভালোবাসতাম। সবসময় সাথে রাখতাম। একদিন আমার ওয়ালেদ ছাহেব শুতে চাচ্ছিলেন। তার বালিশের প্রয়োজন দেখা দিলো। আমি বললাম, আব্বাজান আমার বালিশটি নিন। একথা বলে আমি আমার বালিশটি তাঁর কাছে এমনভাবে পেশ করলাম, যেন আমি আমার অন্তরটা বের করে বাবাকে দিয়ে দিলাম। কিন্তু যেই মাত্র আমি বালিশটা তাঁকে দিলাম, তখনই তিনি

আমাকে একটা থাপ্পড় মারলেন এবং বললেন, এখন থেকেই তুই এই বালিশকে নিজের বালিশ বলিস! উদ্দেশ্য ছিলো, এই বালিশ তো মূলত বাপের দেওয়া তাই এটাকে নিজের বলা ভুল।

হযরত শাইখুল হাদিস রহ. লিখেন, তখন তো আমার খুব খারাপ লেগেছিলো। আমি তো আমার অন্তর বের করে বাবাকে দিলাম, আর বাবা প্রতিদানে একটা থাপ্পড় লাগিয়ে দিলেন! কিন্তু এখন বুঝে এসেছে যে, কতো সূক্ষ্ম বিষয়ে তিনি তখন সতর্ক করেছেন। এই ঘটনার পর আমার চিন্তার মোড় পরিবর্তন হয়েছে। এ ধরনের ছোট ছোট বিষয়ে মা-বাবাকে নজর দিতে হয়। তারপর শিশুর সঠিক তারবিয়াত হয় এবং শিশু সঠিকভাবে গড়ে উঠে।

এক বুযুর্গের ঘটনা

কিতাবে এক বুযুর্গের ঘটনা লিখেছে। তিনি আল্লাহর অনেক বড়ো ওলী ও দরবেশ লোক ছিলেন। আর আল্লাহওয়ালাদেরকে কঠিন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। একবার তাকে অনাহারে ভুগতে হচ্ছিলো। কয়েকদিন যাবৎ উপবাস চলছিলো। মুরীদ ও ভক্তদের মজলিসে ওয়ায করছিলেন। খুব দুর্বল আওয়াজে কথা বলছিলেন। উপস্থিত এক মুরীদ বিষয়টা লক্ষ করলো। সে আঁচ করতে পারলো, ক্ষুধার তীব্রতার কারণে হয়তো আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে গেছে। হয়ত কয়েকদিন যাবত কিছু খাওয়া হয়নি।

কাজেই শায়েখের জন্যে খানার ব্যবস্থা করার দরকার। তাড়াতাড়ি মজলিস থেকে উঠে গেলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা থালায় খানা এনে শায়েখের সামনে পেশ করলো। শায়েখ ক্ষণিক চিন্তা করে বললেন, না, এ খানা নিয়ে যাও। আমি এটা গ্রহণ করবো না। অগত্যা মুরীদ সে খাবার ফিরিয়ে নিয়ে গেলো। আজকালকার মুরীদ হলে তো পীড়াপীড়ি করতো যে, না হযরত, এ খানা আপনাকে অবশ্যই খেতে হবে। কিন্তু সে মুরীদ জানতো, শায়েখ অত্যন্ত কামেল পুরুষ। কামেল শায়েখের হুকুম বিনাবাক্যে মেনে নিতে হয়। কেননা তার মধ্যে কৃত্রিমতা নেই। লোক দেখানোর জন্যে প্রত্যাখ্যান করছেন না। নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে, যেজন্যে তিনি খেতে অস্বীকার করছেন। তাই সে খানা ফিরিয়ে নিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর মুরীদ সেই খাবার পুনরায় নিয়ে এলো এবং শায়েখের সামনে পেশ করে বললো, হযরত! এবার গ্রহণ করুন। শায়েখ বললেন, হ্যাঁ; এবার গ্রহণ করতে পারি।

পরবর্তীতে মুরীদ বললো যে, প্রথমবার খাবার আনার পর শায়েখ যখন তা প্রত্যাখ্যান করলেন, তখন আমার মনে একটা ধারণা জেগেছে যে, আমি

যখন মজলিস থেকে উঠে যাচ্ছিলাম, তখন হয়ত হযরত অনুমান করতে পেরেছেন যে, মুরীদ আমার দুর্বলতা উপলব্ধি করে বুঝে ফেলেছে, আমি ক'দিন যাবত আনাহারে আছি। তাই আমার জন্যে খানার ব্যবস্থা করতে গিয়েছে। ফলে তাঁর অন্তরে খানার প্রতি আগ্রহ দেখা দিয়েছিলো, অন্তর খানার প্রতীক্ষায় ছিলো। তাঁর সেই আগ্রহ ও প্রতীক্ষার অবস্থাতেই খাবার আনা হয়েছে। তাঁর সামনে এই হাদীস ছিলো যে, যেই হাদিয়া আগ্রহ ও প্রতীক্ষার সাথে লাভ হয়, তাতে বরকত থাকে না। তাই তিনি সে খাবার গ্রহণ করতে রাজি হননি। অগত্যা আমি তা ফেরত নিয়ে যাই। ফেরত নিয়ে যাওয়ায় তার আগ্রহ ও প্রতীক্ষাও খতম হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর যখন আবার সে খাবারই পুনরায় নিয়ে আসি, তখন হাদিয়া গ্রহণের পক্ষে সেই বাধা আর ছিলো না, তাই শায়েখ তা কবুল করেন।

যা হোক, হাদিয়া ও উপহারের সাথে যদি আশা ও প্রতীক্ষা যুক্ত হয়ে যায় বা দাতার নিয়ত সহীহ না থাকে সে সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন ও লোক দেখানোর উদ্দেশে তা দেয়, কিংবা তার প্রতিদান পাওয়ার লালসা দেখা দেয়, তবে তা হাদিয়ার মর্যাদা নষ্ট করে দেয়। এর ফলে হাদিয়ার বরকত ও নূর খতম হয়ে যায়।

হালাল দাওয়াতের বরকত

আমার পিতা হযরত মুফ্তী মুহাম্মাদ শফী রহ. ঘটনা শোনাতেন যে, দেওবন্দের এক বৃদ্ধ ঘাস কেটে বাজারে বিক্রি করতেন এবং তার উপার্জন দ্বারা জীবন নির্বাহ করতেন। রোজ আয় হতো ছয় পয়সা। তা তিন ভাগে ভাগ করে খরচ করতেন। দু'পয়সা নিজের প্রয়োজনে খরচ করতেন। দু'পয়সা দান-খয়রাত করতেন এবং বাকি দু'পয়সা দারুল উলুম দেওবন্দের বড়ো বড়ো বুযুর্গদেরকে দাওয়াত খাওয়ানোর জন্যে জমা করতেন। তাঁদের মধ্যে শাইখুল-হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান রহ. ও হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.-এর মতো ব্যক্তিবর্গও থাকতেন। তাঁরা বলতেন, আমরা সারা মাস এই দাওয়াতের অপেক্ষায় থাকি। অথচ বড়ো বড়ো নবাব রইসের দাওয়াতও তাঁরা এভাবে গ্রহণ করতেন না। কারণ, এটা ছিলো আল্লাহর এক বান্দার হালাল উপার্জনের আয়োজন। কেবল আল্লাহ তা'আলার মহব্বতেই এ দাওয়াত দেওয়া হতো। এতে যে নূরানিয়াত অনুভব হতো তা অন্য কোনো দাওয়াতে হতো না। তাঁরা বলতেন এই আল্লাহর বান্দা দাওয়াত খাওয়ালে কয়েকদিন পর্যন্ত অন্তরে নূর অনুভব হতে থাকে এবং এর ফলে ইবাদত-বন্দেগী ও যিকির-আযকারে আগ্রহ বোধ হয়। মোটকথা, ছোট ও মামুলি

জিনিস হাদিয়া দেওয়া হলে তাতে সহীহ নিয়ত ও ইখলাস থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি। সে সম্ভাবনা দামী জিনিসের ক্ষেত্রে অতটা থাকে না। এ জন্যেই মামুলি জিনিসের হাদিয়াকে বেশি কদর করা উচিত।

এক বুড়ি ও ঈগল পাখির ঘটনা

আরবী ভাষা শিক্ষার কিতাব 'মুফিদুত তালিবীন'-এ একটি ঘটনা লিখেছে যে, বাদশাহর ঈগল পাখি উড়ে এক বুড়ির নিকট চলে আসে। বুড়ি তা ধরে পালতে আরম্ভ করে। বুড়ি দেখলো, পাখির ঠোঁট বাঁকা এবং তার পাঞ্জা বাঁকা। বুড়ির খুব মায়া হলো। বেচারা পাখিটি আল্লাহর মাখলুক। তার খাবারের প্রয়োজন হলে কেমনে খাবে! কারণ তার ঠোঁট তো বাঁকা। চলার প্রয়োজন হলে চলবে কী করে! কারণ তার পাঞ্জা বাঁকা। বুড়ি চিন্তা করলো, আমি তার সমস্যার সমাধান করে দেই। সুতরাং সে কেঁচি দ্বারা প্রথমে তার ঠোঁট কাটলো তারপর তার পাঞ্জা কাটলো। ফলে পাখিটি আহত হলো এবং রক্ত প্রবাহিত হতে থাকলো। আগে যাও চলতে পারতো এখন আর তাও পারে না। ঘটনাটি নির্বোধ ব্যক্তির ভালোবাসা হিসেবে তুলে ধরা হয়। বুড়ি ঈগলকে ভালোবেসেছে, কিন্তু নির্বুদ্ধিতার সাথে। সে এ কথা চিন্তা করেনি যে, পাখির ঠোঁট ও থাবা বাকা হওয়া তার স্বভাবের অংশ। এ বক্রতার মধ্যেই তার সৌন্দর্য। এর এসব অঙ্গ বাঁকা না হলে সে আর ঈগলই থাকবে না।

প্রধান বিচারপতি হয়ে প্রতিদিন দুই শ' রাকাত নফল নামায পড়তেন

হযরত ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর শাগরিদ ছিলেন। উঁচুস্তরের ফকীহ ছিলেন। তিনি ফকীহ হিসেবে বিখ্যাত হলেও ওলী আল্লাহ হিসেবে বিখ্যাত নন। তাঁর জীবনীতে লিখেছে, তিনি প্রধান বিচারপতি হওয়ার পর চরম ব্যস্ততা সত্ত্বেও প্রতিদিন দুইশ রাকাত নফল নামায পড়তেন। তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে এক ব্যক্তি দেখলো, তাঁর মুখোমণ্ডলে চিন্তা ও অস্থিরতার ছাপ। লোকটি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনার কিসের দুঃশ্চিন্তা? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট হাজির হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসছে। তাঁর সামনে হাজির হয়ে নিজের জীবনের কাজ-কর্মের কী উত্তর দিবো! অন্য সব ঘটনার বিষয়ে আমার স্মরণ আছে যে, আমি সেগুলো থেকে তাওবা করেছি এবং আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নিয়েছি।

আল্লহ তা'আলার কাছে আশা রাখি তিনি আমাকে মাফ করে দিবেন। কিন্তু এমন একটি ঘটনা স্মরণ হচ্ছে, যে কারণে আমি খুব অস্থির। সে ঘটনা হলো, যখন আমি বিচারপতির পদে ছিলাম এবং মানুষের মাঝে ফয়সালা করতাম, সে সময় একবার একজন মুসলিম ও একজন অমুসলিমের মামলা আমার কাছে আসে। মামলার বিবরণী শোনার সময় মুসলমানকে ভালো জায়গায় বসাই, আর অমুসলিমকে তার চেয়ে নিম্নমানের জায়গায় বসাই। অথচ শরীয়তের নির্দেশ হলো, মামলার উভয় পক্ষের বসার জায়গাও সমান হতে হবে। যেখানে বাদীকে বসাবে, সেখানেই বিবাদীকে বসাবে। উভয়ের বসার জায়গার মধ্যে ব্যবধান করে অবিচার করা যাবে না। কিন্তু আমার দ্বারা এই অবিচার হয়েছে। যদিও আমি আলহামদুলিল্লাহ ন্যায়সঙ্গত ফয়সালা দিয়েছি, কিন্তু বসানোর ব্যাপারে শরীয়তের যেই নির্দেশ রয়েছে, তা রক্ষা করতে পারিনি। এটা নিয়ে আমার দুঃশ্চিন্তা হচ্ছে যে, এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করলে আমি কী উত্তর দিবো? কারণ, এটা এমন একটা জিনিস, যা তাওবা করার দ্বারা মাফ হয় না, যে পর্যন্ত হকদার মাফ না করে দেয়।

এক বুযুর্গ ও এক অহঙ্কারীর ঘটনা

অন্তরে যখন নিজেকে বড়ো বলে উপলব্ধি হয়। নিজের শান-শওকত চোখে পড়ে। অন্তরে অহমিকা সৃষ্টি হয়, তখন মানুষ অন্যকে বলে- 'জানো না আমি কে?' এক বুযুর্গ ব্যক্তি এমনই এক অহঙ্কারীকে সংশোধনমূলক কিছু একটা বললে সে বলে, 'জানো আমি কে?' অর্থাৎ, আমি এতো বড়ো মানুষ, আর তুমি কিনা আমাকে সংশোধন করতে এসেছো!

বুযুর্গ এর জবাবে বললেন, জানবো না কেন? তোমার পরিচয় হলো–

اَوَّلُكَ نُطْفَةٌ مَذِرَةٌ، وَاٰخِرُكَ جِيْفَةٌ قَذِرَةٌ وَاَنْتَ فِيْمَا بَيْنَ ذَالِكَ تَحْمِلُ الْعَذِرَةَ

'তোমার সূচনা হলো এক ফোঁটা নাপাক বীর্য। তোমার সমাপ্তি গলিত লাশ। তখন তুমি এমন পঁচে-গলে যাবে, তোমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ তোমাকে কাছে রাখতে চাইবে না। কারণ বেশিক্ষণ থাকেল দুর্গন্ধ ছড়িয়ে সারা এলাকা দূষিত করে ফেলবে। তা যাতে করতে না পারো তাই তোমাকে একটা গর্তে রেখে দিয়ে আসবে। এই হলো তোমার সূচনা ও সমাপ্তি। এতদুভয়ের মাঝখানের সময়টুকু সর্বক্ষণ তুমি মলমূত্র নিয়ে ঘুরছো।'

শাইখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ.-এর নাতীর ঘটনা

হযরত শাইখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ. খুব উঁচুস্তরের আল্লাহর ওলী ছিলেন। আমাদের বুযুর্গদের শাজারার মধ্যে তাঁর অবস্থান অনেক উঁচুতে। তাঁর একজন নাতী ছিলেন। শাইখ জীবিত থাকতে নাতীর মধ্যে আত্মশুদ্ধির চিন্তা জাগেনি। সারা দুনিয়ার মানুষ এসে দাদার নিকট থেকে ফয়েয লাভ করতো কিন্তু তিনি সাহেবযাদা হওয়ার চিন্তায় নিমজ্জিত ছিলেন। নিজের আত্মশুদ্ধির জন্যে দাদার শরণাপন্ন হননি। শাইখের ইন্তিকাল হলে তার আফসোস হয় যে, হায় আল্লাহ! আমি তো চরম বঞ্চিত হলাম। কতো দূর-দূরান্তের মানুষ এসে ফয়েয লাভ করলো আর আমি ঘরে থেকেও কিছু লাভ করতে পারলাম না! বাতির নীচে অন্ধকার! আফসোস জাগলে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন যে, এখন কী করি? কী করে এর ক্ষতিপূরণ হতে পারে? মনে হলো, আমার দাদার থেকে যেসব লোক আত্মশুদ্ধির এই দৌলত লাভ করেছেন তাদের মধ্য থেকে কোনো একজনের শরণাপন্ন হই। দাদার খলীফাদের মধ্য উঁচুস্তরের বুযুর্গ কে তা খোঁজ করতে আরম্ভ করলেন। জানতে পারলেন যে, বলখে উঁচুস্তরের একজন বুযুর্গ আছেন। কোথায় গাঙ্গুহ, আর কোথায় বলখ! যখন ঘরে এই দৌলত ছিলো, সবসময় তার শরণাপন্ন হতে পারতো, তখন কিছু অর্জন করেনি। অবশেষে বলখের এই দীর্ঘ কষ্টকর পথ সফর করতে হলো। সত্যিকারের অন্বেষণ ছিলো এজন্যে তিনি সফরে বের হলেন।

শাইখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ.-এর বলখে অবস্থানরত খলীফা যখন জানতে পারলেন যে, আমার শাইখের নাতী আসছে তখন তিনি নিজে শহর থেকে বাইরে বের হয়ে অত্যন্ত রাজকীয়ভাবে তাকে স্বাগত জানালেন। সসম্মানে বাড়ীতে নিয়ে আসলেন। জাঁকজমকপূর্ণ খাবার তৈরি করালেন। উঁচুস্তরের দাওয়াতের আয়োজন করলেন। ভালো মানের থাকার ব্যবস্থা করলেন। গালিচা বিছিয়ে দিলেন। আরো কতো কিছু যে করলেন তা আল্লাহই ভালো জানেন।

এক-দুই দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি বললেন যে, হযরত আপনি আমার সঙ্গে অত্যন্ত স্নেহের আচরণ করেছেন, অত্যন্ত সম্মানজনক আচরণ করেছেন, কিন্তু আমি তো এসেছি অন্য এক উদ্দেশ্যে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কী সেই উদ্দেশ্য? তিনি বললেন, আমার উদ্দেশ্য হলো আপনি আমাদের বাড়ি থেকে যেই দৌলত নিয়ে এসেছেন তার কিছু অংশ আমাকেও দিন। এজন্যে এসেছি। শাইখ বললেন, আচ্ছা! ঐ দৌলত নিতে এসেছো? তিনি বললেন, জি হ্যাঁ। শাইখ বললেন, ঐ দৌলত যদি নিতে এসে থাকো তাহলে এই

গালিচা, এই সম্মান, খানা-পিনার এই ব্যবস্থা সব বন্ধ করে দাও। উন্নত মানের থাকার ব্যবস্থা ত্যাগ করো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এখন আমি কী করবো? শাইখ বললেন, আমাদের মসজিদের পাশে একটি হাম্মাম রয়েছে। সেখানে ওযুকারীদের জন্যে পানি গরম করো। এটাই তোমার কাজ। বাইআত নয়, ওযীফা নয়, যিকির নয়, মামুলাত নয়, অন্য কিছুও নয়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, থাকবো কোথায়? শাইখ বললেন, রাতে যখন ঘুমাতে হয় তখন ঐ হাম্মামের কাছেই ঘুমিয়ে পড়বে। কোথায় এতো সম্মান ও শুভেচ্ছা, গালিচা বিছানো হচ্ছে, খানা পাকানো হচ্ছে, দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে, আর এখন হাম্মামে আগুন জ্বালানোর কাজে নিয়োজিত!

আগুন জ্বালাতে জ্বালাতে যখন কিছুদিন পার হয়ে গেলো, তখন শাইখ একদিন মেথরকে নির্দেশ দিলেন যে, হাম্মামের কাছে এক ব্যক্তি বসা আছে, ময়লার টুকরি নিয়ে তার নিকট দিয়ে যাবে। এমনভাবে যাবে যাতে ময়লার গন্ধ তার নাকে লাগে। মেথর টুকরি নিয়ে হাম্মামের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলো। সে তো ছিলো সাহেবজাদা, নওয়াবজাদার মতো জীবন কাটিয়েছে, কড়া দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো এবং বললো, তোর এতো বড়ো সাহস! এই ময়লার টুকরি নিয়ে আমার কাছ দিয়ে যাস! গাঙ্গুহ্ হলে দেখিয়ে দিতাম! শাইখ মেথরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি যখন টুকরি নিয়ে গেলে তখন কী হলো? সে বললো, সে তো অনেক রাগ হয়েছে এবং বলেছে– গাঙ্গুহ হলে তোমাকে শক্ত শাস্তি দিতাম। তিনি বললেন, ওহ্হো! এখনো তো অনেক ত্রুটি আছে। এখনো চাউল গলেনি।

আরো কিছুদিন অতিবাহিত হলে শাইখ মেথরকে বললেন, এখন টুকরি নিয়ে এমনভাবে অতিক্রম করবে, যেন টুকরি তার শরীরের সাথে লেগে যায় তারপর আমাকে বলবে কী হলো? সে তাই করলো। শাইখ জানতে চাইলেন কী হলো? সে বললো, যখন আমি টুকরি নিয়ে তার নিকট দিয়ে অতিক্রম করি এবং তার শরীরের সাথে টুকরির ঘষা লাগে, তখন সে অত্যন্ত কড়া দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায় কিন্তু মুখে কিছু বলেনি। শাইখ বললেন, আলহামদু লিল্লাহ। উপকার হচ্ছে।

তার কিছুদিন পর শাইখ বললেন, এবার এমনভাবে অতিক্রম করবে যে, টুকরি পড়ে গিয়ে তার উপরেও যেন অল্প ময়লা পড়ে। তারপর সে কী বলে তা আমাকে বলবে। সে তাই করলো। শাইখ জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কী অবস্থা? সে বললো, এবার তো অবাক করার মতো ঘটনা ঘটেছে। আমি টুকরি ফেললে তার উপরও ময়লা পড়লো এবং আমিও পড়ে গেলাম। তখন

সে তার নিজের কাপড়ের ব্যাপারে কোনো চিন্তা না করে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো যে, ব্যথা লাগেনি তো? শাইখ বললেন, আলহামদু লিল্লাহ! আল্লাহর শোকর। অন্তরে যে ভুত ছিলো তা বের হয়ে গেছে।

এবার তাকে ডেকে দায়িত্ব পরিবর্তন করে দিলেন। বললেন, এখন আর তোমাকে হাম্মামের কাজ করতে হবে না। এখন তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। আমি কখনো কখনো শিকার করতে যাই। তখন আমার শিকারী কুকুরের শিকল ধরে আমার সাথে যাবে। এখন কিছুটা উঁচুস্তর লাভ হলো। শাইখের সোহবত ও সাহচর্যের মর্যাদা লাভ হলো। তবে কুকুরের শিকল ধরে সাথে চলার নির্দেশ দেওয়া হলো। শিকারে বের হলে কুকুর কোনো শিকার দেখলে সেদিকে দৌড় দিতো। শাইখ হুকুম করেছেন শিকল ছাড়বে না। এজন্যে তিনি শিকল ছাড়েন না। কুকুর জোরে দৌড়াচ্ছিলো, কিন্তু তিনি শিকল ছাড়ছিলেন না। এমতাবস্থায় তিনি মাটিতে পড়ে যান। কুকুরের পিছনে পিছনে মাটিতে ছেচড়িয়ে চলছিলেন। শরীরের কয়েক জায়গা যখম হয়ে যায়। তিনি রক্তাক্ত হয়ে যান।

রাতের বেলা শাইখ নিজের শাইখ হযরত আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ.-কে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি বললেন, মিয়াঁ আমি তো তোমার দ্বারা এতো পরিশ্রম করাইনি। তখন তিনি সতর্ক হলেন। তাকে কাছে ডাকলেন, বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, আপনি যেই দৌলত নিতে এসেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে যেই দৌলত আপনাদের ঘরে দান করেছিলেন আলহামদু লিল্লাহ আমি তার পুরোটা আপনাকে অর্পণ করেছি। দাদার উত্তরাধিকার আপনার কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার দয়ায় এখন আপনি নিশ্চিন্তে দেশে ফিরে যান।

শাইখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার রহ.-এর ঘটনা

আল্লাহর কতক বান্দা এমন আছেন, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্যে কতক সূক্ষ্ম শক্তিকে তাদের কাছে পাঠিয়ে থাকেন। এসব সূক্ষ্ম শক্তিকে পাঠানোর উদ্দেশ্য থাকে এ বান্দাকে দুনিয়ার মহব্বত থেকে বের করে নিজের মহব্বতের দিকে নিয়ে আসা। হযরত শাইখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার রহ. বিখ্যাত বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর ঘটনা আমি আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, শাইখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার রহ. ইউনানী ঔষধ ও আতরের অনেক বড়ো ব্যবসায়ী ছিলেন। এ কারণেই তাকে 'আত্তার' বলা হয়। তার ঔষধ ও

আতরের অনেক বড়ো দোকান ছিলো। সুবিস্তৃত কারবার ছিলো। তখন তিনি একজন সাধারণ কিসিমের দুনিয়াদার ব্যবসায়ী ছিলেন। একদিন তিনি দোকানে বসা ছিলেন। দোকান ঔষধ ও আতরের শিশি দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলো। এমন সময় একজন মাজযুব ধরনের দরবেশ ও আত্মভোলা কিসিমের মানুষ দোকানে এলেন। তিনি দোকানের ভিতরে প্রবেশ করলেন। দোকানের ভিতরে দাঁড়িয়ে পুরো দোকান কখনো উপর থেকে নীচের দিকে দেখছিলেন, কখনো ডান থেকে বাম দিকে দেখছিলেন। কখনো ঔষধ পর্যবেক্ষণ করছিলেন। কখনো এক শিশি দেখছিলেন, কখনো অন্য শিশি দেখছিলেন। এভাবে যখন অনেক সময় পার হয়ে গেলো তখন শাইখ ফরীদ উদ্দীন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি দেখছো? কোন জিনিস তালাশ করছো? ঐ দরবেশ উত্তর দিলেন, এমনিই শিশিগুলো দেখছি। শাইখ ফরীদ উদ্দীন জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কিছু কেনার ইচ্ছা আছে কি? তিনি উত্তর দিলেন, না আমার কিছু কেনার ইচ্ছা নেই। এমনিতেই দেখছি। তারপর আবার আলমারীতে সংরক্ষিত শিশিগুলোর দিকে দেখছিলেন। বারবার দেখছিলেন। শাইখ ফরীদ উদ্দীন আবারো জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই তুমি দেখছোটা কি? তখন ঐ দরবেশ বললেন, আমি আসলে দেখছি, আপনি যখন মারা যাবেন তখন আপনার জান কীভাবে বের হবে? কারণ, আপনি এখানে এতগুলো শিশি রেখেছেন। আপনার মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসবে তখন আপনার রূহ কখনো এই শিশির মধ্যে প্রবেশ করবে, কখনো ঐ শিশির মধ্যে প্রবেশ করবে, তখন সে বের হওয়ার রাস্তা কোথায় পাবে?

বলা বাহুল্য যে, শাইখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার রহ. তখন একজন দুনিয়াদার ব্যবসায়ী ছিলেন। এসব কথা শুনে তার রাগ হলো। তিনি বললেন, তুমি আমার জানের চিন্তা করছো তোমার জান কীভাবে বের হবে? তোমার জান যেভাবে বের হবে, আমারটাও সেভাবে বের হবে। ঐ দরবেশ উত্তর দিলেন, আমার জান বের হতে তো কোনো পেরেশানী নেই। কারণ আমার কাছে তো কিছু নেই। আমার কাছে ব্যবসা, দোকান, শিশি, সাজ-সরঞ্জাম কিছুই নেই। আমার জান তো এভাবে বের হয়ে যাবে। একথা বলে ঐ দরবেশ দোকানের বাইরে মাটির উপর শুয়ে পড়লেন। 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' কালেমা বললেন এবং তার রূহ উড়ে গেলো।

এ ঘটনা দেখা মাত্র হযরত শাইখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার রহ.-এর অন্তরে বড়ো আঘাত লাগলো। তিনি চিন্তা করলেন, বাস্তবিকই তো আমি রাত-দিন

দুনিয়ার কারবার নিয়েই নিমগ্ন এবং ব্যস্ত রয়েছি। আল্লাহ তা'আলার দিকে কোনো মনোযোগ নেই। আর আল্লাহর এ বান্দা কতো সহজে আল্লাহর দরবারে চলে গেলেন। যাই হোক, ইনি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি গাইবী লতীফা ছিলেন, যিনি তার হিদায়াতের কারণ হলেন। সেদিনই তিনি নিজের সব কায়কারবার অন্যদের হাতে ন্যস্ত করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে হিদায়াত দান করলেন। আল্লাহর পথে অবিচল থেকে এতো বড়ো শাইখ হলেন যে, তিনি দুনিয়াবাসীর হিদায়াতের উপকরণ হলেন।

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম রহ.-এর ঘটনা

শাইখ ইবরাহীম ইবনে আদহাম রহ. এক অঞ্চলের বাদশাহ ছিলেন। রাতে দেখলেন তার মহলের ছাদের উপর এক ব্যক্তি বিচরণ করছে। তিনি মনে করলেন হয়তো কোনো চোর হবে, চুরি করার ইচ্ছায় এসেছে। ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এখানে কোত্থেকে এলে? কী করছো এখানে? সে বললো, আমার একটি উট হারিয়ে গেছে, সেই উট তালাশ করছি। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম রহ. বললেন, তোমার মাথা ঠিক আছে কি? মহলের ছাদের উপর উট কোথায়? তোমার উট যদি হারিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে বন জঙ্গলে গিয়ে খোঁজো। মহলের ছাদের উপর উট খোঁজা তো আহাম্মকী। তুমি তো আহাম্মক মানুষ দেখছি! লোকটি বললো, মহলের ছাদের উপর যদি উট পাওয়া না যায় তাহলে মহলের মধ্যে আল্লাহকেও পাওয়া যাবে না। আমি যদি আহাম্মক হয়ে থাকি তাহলে তুমি আমার চেয়ে বড়ো আহাম্মক। মহলের মধ্যে থেকে আল্লাহকে তালাশ করা এরচে' বড়ো আহাম্মকী। এ কথা বলা মাত্র তার অন্তরে মারাত্মক আঘাত লাগলো। বাদশাহী ছেড়ে বের হয়ে গেলেন। ইনিও আল্লাহর পক্ষ থেকে গায়েবী লতীফা ছিলেন।

নফসের মন্দ চরিত্রের বিস্ময়কর ঘটনা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী রহ. একটি ঘটনা লিখেছেন যে, আরব দেশে 'আশআব' নামক একজন খুবই লোভী ব্যক্তি ছিলো। একবার সে কোথাও যাওয়ার পথে দেখলো লোকেরা থালা বানাচ্ছে। সে তাদেরকে বললো, তোমরা এতো ছোট ছোট থালা বানাচ্ছো কেন? বড়ো বড়ো থালা বানাও! লোকেরা তাকে বললো, আমরা ছোট থালা বানাই আর বড়ো থালা বানাই তাতে তোমার কী? সে বললো, হতে পারে তোমরা যে থালা বনাচ্ছো কেউ তাতে করে আমার জন্যে উপঢৌকন আনবে, তাই তোমরা বড়ো থালা বানাও!

তারই লালসা সম্পর্কে বিখ্যাত আছে যে, সে পথ চলার সময় ছেলে-ছোকড়ারা উত্ত্যক্ত করার জন্যে তার পিছনে লাগলো। তাদের কবল থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যে সে জিজ্ঞাসা করলো, তোমরা এখানে কী করছো? অমুক জায়গায় যাও, সেখানে মিষ্টি বিতরণ করা হচ্ছে। একথা শোনামাত্র ছেলে-ছোকড়ারা সেদিকে দৌড় দিলো। পিছনে-পিছনে আশআবও ছুটলো। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কেন দৌড়াচ্ছো? সে বললো, হতে পারে আসলেই সেখানে মিষ্টি বিতরণ করা হচ্ছে।।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেন, কিছু লোক নিজেদের ইলম ও বুযুর্গী দ্বারা প্রথমে মানুষকে ধোঁকা দেয়। এভাবে কিছু লোক যখন তার ভক্ত হয়, তখন সে চিন্তা করে যে, আমার মধ্যে বিশেষ কোনো যোগ্যতা ও বুযুর্গী আছে বলেই তো মানুষ আমার পিছনে ছুটছে। এমন ভুল চিন্তা অনেক সময় মানুষকে অহঙ্কারে লিপ্ত করে।

শাইখ আবুল হাসান নূরী রহ.-এর ইখলাস

শাইখ আবুল হাসান নূরী রহ. অনেক উঁচু মাপের বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে দেখলেন সমুদ্র তীরে নৌকা থেকে কিছু মটকা নামানো হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করে জানা গেলো, এগুলো মদের মটকা, যা দেশের শাসকের জন্যে অন্য দেশ থেকে আনা হয়েছে। এখন একটি বড়ো জাহাজে বোঝাই করে তার নিকট নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শাইখ আবুল হাসান নূরী রহ. খুব কষ্ট পেলেন। মুসলিম দেশের একজন বাদশাহ মদের মটকা আনাচ্ছে। তার মধ্যে মন্দ কাজে নিষেধ করার জযবা জাগলো। তিনি ঐ বিশটা মটকা একটা একটা করে ভাঙ্গতে আরম্ভ করলেন। উনিশটা মটকা ভাঙ্গলেন। বিশতম মটকা ভাঙ্গার জন্যে যখন হাত উঠালেন তখন হঠাৎ অন্তরে একটা চিন্তা জাগার ফলে সেটি রেখে চলে আসলেন। বাদশাহর নিকট খবর পৌছলো যে, অমুক ব্যক্তি উনিশটা মটকা ভেঙ্গে ফেলেছে। বাদশাহ তাকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, এটা আপনি কি করলেন? তিনি বললেন, মূলত কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক বলেছেন- 'নেক কাজের নির্দেশ দাও, মন্দ কাজে বাধা দাও এবং এর ফলে যে কষ্ট আসে তাতে ধৈর্য ধারণ করো।' তাই যখন আমি দেখলাম যে, এই হারাম জিনিস আপনার পর্যন্ত পৌছবে তারপর মানুষের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়বে তখন সেগুলো ভাঙ্গতে চাইলাম। কিন্তু যখন চিন্তা জাগলো যে, তুমি অনেক বড়ো বাহাদুর, বাদশাহর জেল-জুলুমকে উপেক্ষা করে আল্লাহ

তা'আলার হুকুম বাস্তবায়ন করছো। মানুষ যখন জানতে পারবে যে, আবুল হাসান বাদশাহর মটকা ভেঙ্গে দিয়েছে তখন মানুষের মধ্যে খুব খ্যাতি হবে। যখন আমার এ চিন্তা জাগলো তখন মটকা ভাঙ্গা বন্ধ করে দিলাম। কারণ, এখন মটকা ভাঙ্গা আর আল্লাহর জন্যে হতো না, বরং মানুষের প্রশংসা কুড়ানোর জন্যে হতো। এ পর্যন্ত যতোগুলো মটকা ভেঙ্গেছিলাম সেগুলো ছিলো আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে। শেষ মটকাটি যদি ভাঙ্গতাম তাহলে তা হতো মানুষকে দেখানোর জন্যে এবং নিজের নফসের খাতিরে। এজন্যে সেটা রেখে চলে আসি।

বর্ণনায় এসেছে, বাদশাহের উপর শাইখ আবুল হাসান রহ.-এর এমন প্রভাব পড়লো যে, বাদশাহ তার হাতে বাইআত হলেন এবং বিশেষভাবে শহরের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিলেন যে, আপনি যতো গোনাহের কাজ দেখবেন সেগুলো বিলুপ্ত করবেন। মোটকথা, কাউকে নেক কাজের কথা বলা এবং গোনাহের কাজ থেকে বাধা দেওয়া তখন প্রশংসার যোগ্য, যখন তার উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছু না হয়। এ কাজই যদি নাম, যশ, খ্যাতি ও পরহেযগার উপাধী লাভের জন্যে হয় তাহলে সব মেহনত বেকার হয়ে যাবে, উল্টা গোনাহগার হবে।

এক নাপিতের ঘটনা

আমার ওয়ালেদ মাজেদ মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. একটি ঘটনা শোনাতেন যে, এক নাপিতকে বাদশাহ ক্ষৌরকার্যের জন্যে ডেকে পাঠালো। নাপিত সেখানে গিয়ে দেখে বাদশাহ ঘুমিয়ে পড়েছে। বাদশাহ্ ঘুমে থাকা অবস্থায়ই নাপিত এতো দক্ষতার সাথে চুল কেটে দেয় যে, বাদশাহ বুঝতেই পারে না। সে ঘুমিয়েই থাকে। ঘুম থেকে জেগে দেখে অতি চমৎকারভাবে চুল কাটা হয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করলো, এটা কীভাবে হয়েছে? এক ব্যক্তি বললো, নাপিত এসেছিলো আপনার ঘুমের অবস্থাতেই সে ক্ষৌরকার্য সম্পাদন করে দিয়েছে। বাদশাহ বললো, খুব দক্ষ নাপিত তো! সে এতো নিপুণভাবে কাজ করেছে যে, আমি বুঝতেই পারিনি। তাকে ডাকো। নাপিত এলে বাদশাহ বললো, আমি তোমার এই দক্ষতার কারণে তোমাকে 'নাপিতরাজ' উপাধীতে ভূষিত করলাম। নাপিত এই খেতাব লাভ করে কোনো প্রকার আনন্দ প্রকাশ করলো না। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলো, আমি তোমাকে এতো বড়ো খেতাব দিলাম আর তুমি কোনো প্রকার আনন্দ প্রকাশ করলে না। নাপিত উত্তর দিলো, বাদশাহ নামদার আপনার দয়া যে, আপনি

আমাকে এই খেতাব দিয়েছেন। কিন্তু যদি সব নাপিত মিলে আমাকে এই খেতাব দিতো তাহলে আমি আনন্দিত হতাম। কারণ তারা আমার পেশার লোক। আমার পেশা সম্পর্কে তারা জানে। আপনি তো এই শাস্ত্রের সূক্ষ্মতা সম্পর্কে অবগত নন। কোনো অদক্ষ লোক খেতাব দিলে সেটা বিশেষ কোনো আনন্দের বিষয় নয়। আনন্দ তো তখন হতো, যখন আমার শাস্ত্রের লোকেরা এই খেতাব দিতো। আমার ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলতেন, ঐ নাপিত অত্যন্ত বিজ্ঞজনোচিত কথা বলেছে। কারণ, যতো মাখলুক আছে, তারা নেক আমলের কদর জানে না। নেক আমলের প্রকৃত কদর তো জানেন আল্লাহ তা'আলা। তিনি যদি প্রশংসা করেন এবং খুশি হন তাহলে তা খুশির বিষয়, অন্যথায় মানুষের প্রশংসার কোনো মূল্য নেই।

সুলতান মাহমুদ ও আয়াযের শিক্ষণীয় ঘটনা

আমার শাইখ হযরত ডা. আব্দুল হাই ছাহেব আরেফী রহ. একটি ঘটনা শুনিয়েছিলেন, যা খুবই শিক্ষণীয়। হযরত বলেন, বিখ্যাত বিজেতা ও সম্রাট সুলতান মাহমুদ গজনবীর একটি প্রিয় গোলাম ছিলো। তার নাম ছিলো আয়ায। আয়ায যেহেতু বাদশাহর খুব প্রিয় ছিলো, এজন্যে মানুষ বলতো, সে খুব অহঙ্কারী। মাহমুদ গজনবী এই গোলামকে অন্য বড়ো বড়ো ব্যক্তিদের উপরে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। বাস্তবতাও এমনই ছিলো। সুলতান মাহমুদ গজনবী বড়ো বড়ো উযীর ও আমীরদের কথা এ পরিমাণ মানতেন না, যে পরিমাণ আয়াযের কথা মানতেন।

সুলতান মাহমুদ গজনবী চাইলেন এসব উযীর ও আমীরদেরকে দেখাই, তোমাদের মধ্যে আর আয়াযের মধ্যে কি পার্থক্য? একবার অনেক বড়ো একটি মূল্যবান হীরা উপঢৌকন স্বরূপ মাহমুদ গজনবীর কাছে আসে। হীরাটি অত্যন্ত মূল্যবান, অত্যন্ত সুন্দর ও অত্যন্ত জাঁকালো ছিলো। বাদশাহর দরবার বসেছে। সবাই সেই মূল্যবান হীরাটি দেখলো এবং তার প্রশংসা করলো। তারপর মাহমুদ গজনবী ওযীরে আযমকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি হীরাটি দেখেছেন? হীরাটি কেমন? উযীরে আযম বললেন, মহারাজ এটা অত্যন্ত মূল্যবান হীরা। সারা পৃথিবীতে এমন হীরা আর নেই। এটা অনেক বড়ো হীরা। বাদশাহ বললেন, হীরাটি মাটিতে ছুড়ে মেরে ভেঙ্গে ফেলুন। উযীরে আযম দাঁড়িয়ে করজোড়ে নিবেদন করলেন, জাহাঁপনা! এটা অনেক মূল্যবান হীরা, এটা আপনার নিকট ঐতিহাসিক উপঢৌকন, আপনি তা ভাঙ্গার নির্দেশ দিচ্ছেন! আমার আবেদন, আপনি এটাকে ভাঙ্গাবেন না।

বাদশাহ বললেন, আচ্ছা বসুন। তারপর আরেক উযীরকে ডাকলেন। তাকে বললেন, তুমি এটা ভাঙ্গো। সে উযীরও দাঁড়িয়ে গেলো এবং বলতে লাগলো, বাদশাহ সালামত! এটা অনেক দামি হীরা, এটা ভাঙ্গার সাহস আমার নেই। এভাবে তিনি অনেক উযীর ও আমীরকে ডেকে হীরাটি ভাঙ্গতে বললেন। কিন্তু সবাই মাফ চাইলো এবং ভাঙ্গতে অপারগতা জানালো।

অবশেষে সুলতান মাহমুদ গজনবী আয়াযকে ডাকলেন। আয়ায এসে বললো, জি জাঁহাপনা। মাহমুদ গজনবী বললেন, এই যে হীরাটি রাখা আছে তা ছুড়ে মেরে ভেঙ্গে ফেলো। আয়ায হীরাটি উঠালো এবং মাটিতে ছুড়ে মেরে ভেঙ্গে ফেললো। হীরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলো। বাদশাহ যখন দেখলেন, আয়ায হীরাটি ভেঙ্গে ফেলেছে, তখন তিনি তাকে ধমক দিলেন। তুমি হীরাটি কেন ভাঙ্গলে? এখানে উপবিষ্ট বড়ো বড়ো বুদ্ধিমান উযীর ও আমীরদেরকে হীরাটি ভাঙ্গতে বলা হলে তারা তা ভাঙ্গার সাহস করেনি। এরা কি পাগল? তুমি তাহলে ভাঙ্গলে কেন? আয়ায প্রথমে বললো, জাহাপনা ভুল হয়েছে। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ভাঙ্গলে কেন? আয়ায বললো, আমার অন্তরে চিন্তা জাগলো এটা একটা হীরা। এর মূল্য যতো বেশিই হোক না কেন এটা ভাঙ্গলেও আপনার হুকুম ভাঙ্গা উচিত হবে না। আপনার হুকুমকে হীরার চেয়ে অধিক দামী মনে করে আমি চিন্তা করলাম এই হীরা ভাঙ্গার তুলনায় আপনার নির্দেশ অমান্য করা বেশি খারাপ বিষয়। এজন্যে আমি হীরাটি ভেঙ্গে ফেলেছি।

তারপর মাহমুদ গজনবী উযীরদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, এই হলো আপনাদের মধ্যে আর আয়াযের মধ্যে পার্থক্য। আপনাদেরকে কোনো কাজের হুকুম দেওয়া হলে তার হিকমত আর রহস্য তালাশ করেন, আর আয়ায হুকুমের গোলাম। তাকে যা বলা হবে, তাই করবে। তার সামনে রহস্য আর কল্যাণের কোনো মূল্য নেই।

অতি ভোজন কোনও যোগ্যতার বিষয় নয়

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতুবী রহ.-এর একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ ঘটনা রয়েছে। তাঁর সময়ে হিন্দু-আর্যসমাজীরা ইসলামের বিরুদ্ধে চরম অপপ্রচার চালাচ্ছিলো। হযরত নানুতুবী রহ. ইসলামের সত্যতা প্রকাশ ও তাদের মিথ্যাচারের মুখোশ উন্মোচনের জন্যে তাদের সাথে অনেক বাহাস (ও বিতর্ক) করেছেন। সে রকম এক বাহাসেরই কথা। তিনি যথারীতি নির্ধারিত জায়গায় পৌছে গেলেন। বাহাস ছিলো আর্যসমাজের এক পণ্ডিতের সাথে। বাহাসের পূর্বে সেখানে খাওয়া-

দাওয়ার ব্যবস্থা ছিলো। হযরত নানুতুবী রহ. খুবই অল্প খেতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি কয়েক লোকমা খেয়ে উঠে গেলেন। অন্যদিকে পণ্ডিতজী ছিলেন খাওয়ার ওস্তাদ। খুব ঠেসে খেলেন। খাওয়া শেষে মেজবান হযরত নানুতুবী রহ.-কে লক্ষ করে বললো, আপনি তো খুব সামান্য খেলেন। তিনি বললেন, ব্যস আমার যে পরিমাণ প্রয়োজন ছিলো খেয়েছি। পণ্ডিতজী পাশেই বসা ছিলেন। বলে উঠলেন, মাওলানা, আপনি শুরুতেই হেরে গেলেন। খাওয়ায় আমার সাথে পারলেন না। এটা আপনার জন্যে এক অশুভ লক্ষণ। বোঝা যাচ্ছে খাওয়ায় যেমন হেরেছেন, যুক্তিতর্কেও তেমনি হারবেন। হযরত নানুতুবী রহ. বললেন, ভাই যদি হারজিতের লড়াই খানা-খাদ্যের ভেতর করতে হয়, তবে সেটা আমার সাথে কেন, একটা মোহিষ বা বলদের সাথেই করতে পারতেন। কে কতটা খেতে পারে সেই প্রতিযোগিতায় নামলে আপনি মোহিষের কাছে নির্ঘাত হারবেন। আমি তো যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা লড়তে এসেছিলাম। কে কতটা খেতে পারে সেই প্রতিযোগিতায় নামতে আসিনি।

হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের ঘটনা

জনশ্রুতি আছে যে, সারা বিশ্বের রাজত্ব লাভ করার পর একদা হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার সমীপে আরয করলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সারা জাহানের রাজত্ব দান করেছেন। আমার মন চাচ্ছে দুনিয়ার সমস্ত সৃষ্টিকে এক বছর পর্যন্ত দাওয়াত খাওয়াবো। আপনি অনুমতি দিন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, সুলায়মান এর সাধ্য তোমার নেই। তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহ! তাহলে এক মাসের দাওয়াত খাওয়ানোর অনুমতি দিন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তাও তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। শেষে আরয করলেন, তবে এক দিনের জন্যেই অনুমতি দিন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, সে ক্ষমতাও তোমার নেই। তবে তুমি যখন পীড়াপীড়ি করছো, ঠিক আছে এক দিনের জন্যে অনুমতি দেওয়া গেলো।

অনুমতি লাভের পর হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম মানুষ ও জীনদেরকে জোগাড়-যন্ত্র করার হুকুম দিলেন। কয়েক মাস পর্যন্ত রান্নাবান্না চললো। তারপর সাগর পাড়ে বিশাল দস্তরখান বিছানো হলো। তার উপর খাবার রাখা হলো। খাবার যাতে নষ্ট না হয় তাই বাতাসকে হুকুম দেওয়া হলো যেন তার উপর অবিরত প্রবাহিত হতে থাকে। প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম আরয করলেন, হে আল্লাহ! খাবার

প্রস্তুত। এখন আপনি আপনার কোনও মাখলূককে পাঠিয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, ঠিক আছে, আমি সর্বপ্রথম এক সামুদ্রিক মাছ পাঠাচ্ছি। একটি মাছ চলে এলো। এসে বললো, হে সুলায়মান, জানতে পারলাম আজ আপনার পক্ষ থেকে আমাদের দাওয়াত। তিনি বললেন, হাঁ এসো, খাদ্য গ্রহণ করো। সুতরাং মাছটি দস্তরখানের একদিক থেকে খেতে শুরু করলো। খেতে খেতে সে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সব খাবার খেয়ে ফেললো। তারপর বললো, আরও খাবার চাই। হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম বললেন, তুমি তো সব খাবারই খেয়ে শেষ করে ফেলেছো। মাছ বললো, মেজবান বুঝি এরকম কথাই বলে? জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিদিন পেট ভরেই খেয়ে আসছি, অথচ আজ আপনার এই দাওয়াত খেতে এসে আমাকে ক্ষুধার্ত থাকতে হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা তো আমাকে দু'বেলাই পেট ভরে খাওয়ান, অথচ আপনি এক বেলাও আমাকে পেট ভরে খাওয়াতে পারলেন না। মাছের কথা শেষ হতে না হতেই হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম সিজদায় পড়ে গেলেন এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

একটি বিচ্ছুর ঘটনা

ইমাম রাযী রহ. একজন উচ্চস্তরের বুযুর্গ ও ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন। তিনি 'তাফসীরে কাবীর' নামে একখানি বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ লিখেছেন। তাতে সূরা ফাতেহারই তাফসীর করেছেন দু'শ পৃষ্ঠাব্যাপী। ইমাম রাযী রহ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-আয়াতের তাফসীরের অধীনে একটি ঘটনা লিখেছেন। তিনি লেখেন, আমি সরাসরি বাগদাদ নিবাসী জনৈক বুযুর্গের কাছে শুনেছি, তিনি বলেন, একদিন বিকেল বেলা পায়চারি করতে করতে দজলা নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি একটা বিচ্ছু আমার সম্মুখ দিয়ে ছুটছে। সেটি দেখতেই মনে ভাবনা জাগলো, এটাও তো আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এটিকেও কোনও না কোনও উপকারের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু কী সে উপকার? এখন এটি কোথা থেকে আসলো আর কোথায়ই বা যাচ্ছে? কোথায় এর গন্তব্য? সেখানে গিয়ে এটি করবে কী?

ভাবলাম, হাতে সময় আছে, দেখি এটি কোথায় গিয়ে কী করে। আজ আমি এটিকে অনুসরণ করবো। সুতরাং বিচ্ছুটি সম্মুখদিকে চলতে থাকলো। আমিও পিছনে পিছনে চললাম। কিছুদূর যাওয়ার পর সেটি বাঁক পরিবর্তন করে নদীর দিকে ছুটলো। আমিও তার পিছনে যেতে থাকলাম। নদীর তীরে

পৌছে সেটি থেমে গেলো। আমিও কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালাম। একটু পরেই দেখলাম একটা কচ্ছপ সাঁতার কেটে তীরের দিকে আসছে। দেখতে দেখতে সেটি তীরে এসে ভিড়লো। অমনি বিচ্ছুটি লাফ দিয়ে তার পিঠে সওয়ার হয়ে গেলো, যেন বিচ্ছুটির নদী পার হওয়ার জন্যেই তাকে পাঠানো হয়েছিলো। সুতরাং আল্লাহর প্রেরিত সেই বাহনে করে সেটি নদী পার হতে লাগলো। আমি তো স্থির করেই রেখেছিলাম যে, বিচ্ছুটির গতিবিধি লক্ষ্য রাখবো। সুতরাং আমিও একটা নৌকা ভাড়া নিয়ে তার অনুসরণ করলাম। দেখলাম কচ্ছপটি নদীর ওপারে গিয়ে থামলো এবং বিচ্ছুটি তার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নীচে নেমে গেলো। আমি যথারীতি ভাড়া মিটিয়ে নীচে নেমে গেলাম। ফের বিচ্ছুটির পিছু নিলাম। সেটি সামনে চলতে থাকলো, আমি তার পিছনে পিছনে। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখলাম একটা গাছের নীচে এক ব্যক্তি শুয়ে ঘুমাচ্ছে। ভয় পেলাম পাছে বিচ্ছুটি তাকে দংশন করে। তাই দেরি করা ঠিক নয়। শীঘ্র লোকটাকে জাগানো দরকার। কিন্তু যেই না জাগানোর জন্যে তার কাছে গেলাম, দেখি কি এক বিষধর সাপ ফনা তুলে আছে। এই বুঝি তাকে দংশন করবে! আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিচ্ছুটি ক্ষীপ্র গতিতে সাপটার উপর হামলে পড়লো এবং এমনই এক দংশন তাকে করলো যে, মুহূর্তের মধ্যে সেটি ফনা ছেড়ে মাটিতে ওলট-পালট খেতে লাগলো। বোঝাই যাচ্ছিলো সেটি মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে। বিচ্ছুটি অন্য দিকে চলতে শুরু করলো। ঠিক এই মুহূর্তে লোকটার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। তার প্রথম নজর পড়লো বিচ্ছুর উপর। অমনি সে একটা পাথর তুলে সেটিকে মারতে উদ্যত হলো। আমি পাশে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলাম। আমি দ্রুত তার হাত ধরলাম। বললাম, তুমি যে বিচ্ছুটা মারতে যাচ্ছো, সে তোমার মহা উপকার করেছে। আজ ওর কারণেই তুমি প্রাণে বেঁচে গেলে। ওই যে মৃত সাপটিকে দেখছো, ওটি তোমাকে দংশন করতে যাচ্ছিলো। এখনই তুমি মারা পড়তে। কিন্তু তোমাকে রক্ষা করার জন্যে বহুদূর থেকে আল্লাহ তা'আলা এই বিচ্ছুটিকে পাঠিয়েছেন। এর হামলায় সাপটি মরে গেছে আর তুমি রক্ষা পেয়েছো। সেই উপকারী বন্ধুকেই কিনা তুমি হত্যা করতে যাচ্ছো!

বুযুর্গ বলেন, সেদিন আমি আল্লাহ তা'আলার রবুবিয়াতের কারিশমা দেখলাম। কীভাবে তিনি এপারের এক বিচ্ছু দ্বারা ওপারের ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সাপের কবল থেকে রক্ষা করলেন! এর দ্বারা বোঝা গেলো, দুনিয়ার কোনও বস্তুই অহেতুক নয়। সবকিছুর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা কোনও না কোনও উপকার নিহিত রেখেছেন।

সুন্নাতের অনুসরণের মাপকাঠি

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. একদিন দরসে আমাদেরকে একটা ঘটনা শুনিয়েছিলেন। তিনি বলেন, একদিন আমি কয়েকজন সঙ্গীসহ দেওবন্দ থেকে দিল্লী গিয়েছিলাম। দিল্লীতে পৌছার পর খাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলো। যেহেতু অন্য কোথাও খাওয়ার ব্যবস্থা ছিলো না, তাই হোটেলেই যেতে হলো। বলাবাহুল্য হোটেলে তো চেয়ার-টেবিলেই খাওয়ার ব্যবস্থা। দু'জন সাথী বললো, নীচে বসে খাওয়া সুন্নাত, তাই আমরা কিছুতেই চেয়ারে বসে খাবো না। তারা মনস্থির করলো, নীচে রুমাল বিছিয়ে বেয়ারাকে দিয়ে খানা আনিয়ে সেখানেই বসে খাবে। আমি তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলাম এবং বললাম, আজ চেয়ার-টেবিলে বসেই খেয়ে নিন। তারা বললো, চেয়ার-টেবিলে খাবো কেন, যখন নীচে বসে খাওয়াই সুন্নতের বেশি নিকটবর্তী? সুন্নতের উপর আমল করতে গিয়ে ভয় করবো কেন? কেনই বা লজ্জাবোধ করবো? আমি বললাম, ভয় ও লজ্জার বিষয় নয়, বরং ব্যাপারটা অন্য। আপনারা এখানে এই পরিবেশে নীচে কাপড় বিছিয়ে খেতে তো পারবেন, কিন্তু তাতে মানুষের কাছে সুন্নাত তামাশার বিষয়ে পরিণত হবে এবং সুন্নতের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। সুন্নাতের অসম্মান ও অমর্যাদা করা কেবল গোনাহই নয়, অনেক সময় তা কুফরের পর্যায়েও পৌছে যায়।

এরপর তিনি তাদেরকে একটা ঘটনা শোনালেন। সুলায়মান ইবনে মিহ্‌রান আল-আ'মাশ রহ. নামে এক বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি আমাদের ইমাম আবু হানীফা রহ.–এরও উস্‌তায। সবগুলো হাদীসগ্রন্থে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। আ'মাশ অর্থ ক্ষীণদৃষ্টি, যার চোখের পালক ঝরে গেছে, ফলে আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। হযরত সুলায়মান ইবনে মিহ্‌রান রহ.–এর চোখে এ রকম সমস্যা থাকার কারণে তিনি আ'মাশ নামেই পরিচিত হয়ে উঠেন। তার এক শিষ্য ছিলো আ'রাজ (খোঁড়া)। এক পায়ে সমস্যা ছিলো বলে তিনি খুঁড়িয়ে হাটতেন, কিন্তু ছিলেন উস্‌তায-ভক্ত। সর্বক্ষণ উস্‌তাযের সাথে-সাথে থাকতেন। কোনও কোনও শিষ্য এমন হয়ে থাকে, যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উস্‌তাযের কাছে সমর্পিত করে রাখে। ফলে উস্‌তায যখন যেখানে যান, সেও সঙ্গে-সঙ্গে যায়। আ'মাশ রহ.-এর এই শিষ্য সে রকমই ছিলো। উস্‌তায যখন যেখানে আছেন, সঙ্গে তিনিও আছেন। উস্‌তায যখন বাজারে যান, তিনিও তার পিছনে পিছনে থাকেন। এই করে শেষ পর্যন্ত বাজারের লোকে ছন্দই বানিয়ে ফেলল–'অন্ধ গুরু খঞ্জ চেলা'। বিষয়টা হযরত আ'মাশ রহ. লক্ষ করলেন। শেষে একদিন শিষ্যকে

বললেন, ভাই, আমি যখন বাজারে যাই তুমি আমার সাথে যাবে না। শিষ্য বললো, কেন? তিনি বললেন, দেখছো আমরা বাজারে গেলে লোকে আমাদের নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করে আর ছড়া কাটে 'অন্ধ গুরু খঞ্জ চেলা'? শিষ্য বললো, তাতে কি? نُؤجَرُ وَ يَأْثَمُوْنَ 'আমরা সওয়াব পাবো, তারা গোনাহগার হবে।' অর্থাৎ অন্যকে নিয়ে উপহাস জায়েয নয়। উপহাস করলে উপহাসিত সওয়াব পায় আর উপহাসকারীর গোনাহ হয়। কাজেই আমাদের তো কোনও ক্ষতি নেই। বরং আমাদের লাভ। মুফ্তে সওয়াব পেয়ে যাবো। হযরত আ'মাশ রহ. উত্তর দিলেন,

نَسْلَمُ وَيَسْلَمُوْنَ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ نُؤجَرَ وَيَأْثَمُوْنَ

'আমরা সওয়াব পাবো আর তারা গোনাহগার হবে, এরচে' বরং ভালো আমরাও নিরাপদ থাকি, তারাও নিরাপদ থাকুক।' অর্থাৎ আমরাও ঠাট্টা থেকে বেঁচে থাকি, তারাও গোনাহ থেকে বেঁচে থাক। আমার সাথে যাওয়া তো ফরয-ওয়াজিব কিছু নয়। আবার না গেলে কোনও ক্ষতি নেই। বরং না গেলে ফায়দা আছে। মানুষ গোনাহ থেকে বেঁচে যাবে। তারা আমাদের মুসলিম ভাই। আমাদের কারণে গোনাহগার হবে এটা ভালো কথা নয়। তারচে' ভালো তাদেরও গোনাহ না হোক, আমরাও ঠাট্টা থেকে বেঁচে যাই। কাজেই এরপর আমার সাথে বাজারে যাবে না।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

হযরত হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব থানবী কু.সি. তাঁর মাওয়ায়েযে এক ব্যক্তির ঘটনা লিখেছেন যে, সে অনেক বড়ো সম্পদশালী ছিলো। একদিন নিজের স্ত্রীর সঙ্গে খুব আবেগ-আগ্রহের সাথে উন্নত মানের খাবার খাচ্ছিলো। হঠাৎ দরজায় এক ভিক্ষুক এসে দাঁড়ায়। এমন সময়ে ভিক্ষুকের আসা এবং উঠে গিয়ে তাকে কিছু দেওয়া তার কাছে খুব খারাপ লাগে। ফলে সে ভিক্ষুককে ধমক দিয়ে অপমানিত করে বাইরে বের করে দেয়। তার কিছু দিন পরেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ শুরু হয়। এমনকি ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। লোকটি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়। তার স্ত্রী ইদ্দত পালনের পর অন্যত্র বিবাহ বসে। সেও ছিলো অনেক সম্পদশালী। তার সঙ্গেও একই ঘটনা ঘটে। একদিন সে নিজের স্বামীর সঙ্গে বসে খাবার খাচ্ছিলো। ইতোমধ্যে দরজায় এক ভিক্ষুক আসে। স্ত্রী তার স্বামীকে বলে, আমি তাকে কিছু হলেও দিয়ে আসি। কারণ আমার আশঙ্কা রয়েছে যে, ভিক্ষুককে কিছু না দিলে আল্লাহ তা'আলার গযব অবতীর্ণ হতে

পারে। স্বামী বললো, ঠিক আছে দিয়ে আসো। দেওয়ার জন্যে দরজায় গিয়ে দেখে সেই ভিক্ষুক হলো তার প্রথম স্বামী। সে ভীষণ অবাক হয়ে স্বামীর কাছে ফিরে আসে এবং বলে, আজ আমি এক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখেছি। এই ভিক্ষুক তো আমার প্রথম স্বামী। যিনি অনেক বড়ো সম্পদশালী ছিলেন। আজ তিনি ভিখারী হয়ে আমাদের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছেন। স্বামী বললো, আমি তোমাকে এরচেয়েও বিস্ময়কর কথা বলছি, তা হলো যেই ভিক্ষুক তখন তোমার কাছে এসেছিলো, সে মূলত আমিই ছিলাম। আল্লাহ তা'আলা তার সম্পদ দ্বিতীয় স্বামীকে দিয়েছেন, আর দ্বিতীয় স্বামীর দারিদ্র্য প্রথম স্বামীকে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মন্দ পরিণতি থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

খাজা আযীযুল হাসান রহ.-এর আল্লাহকে স্মরণ করার ঘটনা

হযরত হাকীমুল-উম্মত থানবী রহ.-এর হাতে গড়া লোকদেরকেও আল্লাহ তা'আলা এই যিকিরের গুণ দান করেছিলেন। আমি আমার ওয়ালেদ মাজেদ মুফতী মুহাম্মাদ শফী' রহ.-এর কাছে হযরত খাজা আযীযুল হাসান রহ.-এর একটি ঘটনা বহুবার শুনেছি। হযরত খাজা সাহেব রহ. হযরত থানবী রহ.-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ খলীফা ছিলেন। তিনি মাজযূব (আল্লাহপ্রেমে মাতোয়ারা) প্রকৃতির লোক ছিলেন। 'মাজযূব' উপাধিতেই তিনি সমধিক খ্যাত ছিলেন। ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলেন, একবার আমরা অমৃতসরে হযরত মুফতী মুহাম্মাদ হাসান রহ.-এর মাদ্‌রাসায় একত্র হই। আমের মওসুম। রাতে খানা খাওয়ার পর সকলে আম খাচ্ছিলাম। নিজেদের মধ্যে অন্তরঙ্গ কথাবার্তা হচ্ছিলো। হযরত মাজযূব রহ. একজন ভালো কবিও ছিলেন। তিনি একের পর এক কবিতা শোনাচ্ছিলেন। এভাবে প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেলো। কবিতা আবৃত্তি, হাস্য-রসিকতা সবই চলছিলো। তারপর হঠাৎ করেই হযরত মাজযূব রহ. বলে উঠলেন, দেখো ভায়েরা! অনেকক্ষণ যাবৎ আমরা এসব কথাবার্তা বলছি। বলো তো এ সময়কালে তোমাদের মধ্যে কার কার অন্তরে আল্লাহর যিকির ও স্মরণ জাগ্রত ছিলো, কোনও উদাসীনতা ও গাফলতি দেখা দেয়নি? আমরা বললাম, আমরা এক ঘণ্টা যাবৎ এসব খোশগল্পে মেতে আছি। অন্তরে গাফলত তো আছেই। হযরত মাজযূব রহ. বললেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানী, আমার অন্তরে এই পুরো সময়ে আল্লাহর যিকির ও স্মরণ জারি ছিলো। কোনও উদাসীনতা দেখা দেয়নি।

দেখুন! হাসি-রসিকতা হচ্ছে। অন্তরঙ্গ কথাবার্তা হচ্ছে। কবিতা আবৃতি হচ্ছে। তিনি তো অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কবিতা চর্চার ভেতরেই

কাটিয়ে দিতেন, অথচ দেখুন কী বলছেন, এতসব সত্ত্বেও এক মুহূর্তের জন্যেও তিনি আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হননি। গোটা সময়েই তাঁর অন্তর আল্লাহমুখী ছিলো।

এ অবস্থা সাধনা ও অনুশীলন ছাড়া অর্জিত হয় না। আল্লাহ তা'আলা যদি নিজ ফযল ও করমে এ অবস্থার কিয়দাংশও আমাদেরকে দান করেন, তবেই আমরা বুঝতে পারবো এটা কতো বড়ো নেআমত!

এক বুযুর্গের সুপারিশের ঘটনা

হযরত হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব রহ. তাঁর ওয়াযের মধ্যে এক বুযুর্গের ঘটনা লিখেছেন। সম্ভবত হযরত শাহ আব্দুল কাদের ছাহেবের ঘটনা। নাম ঠিক মতো স্মরণ নেই। এক ব্যক্তি ঐ বুযুর্গের খেদমতে এসে বললো, হযরত আমার একটি কাজ আটকে আছে। কাজটি অমুকের হাতে। আপনি তার কাছে সুপারিশ করে দিলে আমার কাজটি হয়ে যাবে। হযরত বললেন, তুমি যার নাম বলছো, সে আমার কট্টোর বিরোধী। আমার আশঙ্কা হয় আমার সুপারিশ তার কাছে পৌছলে সে তোমার কাজ করার ইচ্ছা রাখলেও আর করবে না। আমি তোমার জন্যে সুপারিশ করতাম, কিন্তু আমার সুপারিশের দ্বারা লাভের পরিবর্তে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু লোকটি নাছোড় বান্দা হয়ে ধরলো। বললো, আপনি শুধু লিখে দেন। যদিও সে আপনার বিরোধী, কিন্তু আপনার ব্যক্তিত্ব এমন যে, আশা করা যায় সে এটা প্রত্যাখ্যান করবে না। ঐ বুযুর্গ বাধ্য হয়ে তার নামে একটি কাগজ লিখে দিলেন। লোকটি কাগজ নিয়ে তার কাছে পৌছলে ঐ বুযুর্গের ধারণাই ঠিক প্রমাণিত হলো যে, সে কাজ করতে চাইলেও তাঁর সুপারিশের কারণে আর করবে না। উল্টা সে ঐ বুযুর্গকে গালি দিলো। এবার লোকটি ফিরে এসে বললো, হযরত আপনার কথাই ঠিক। বাস্তবেই সে আপনার সুপারিশের মর্যাদা রক্ষা না করে উল্টা গালি দিয়েছে। ঐ বুযুর্গ বললেন, এখন আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমার জন্যে দু'আ করবো, যেন তিনি তোমার সমস্যার সমাধান করে দেন।

একটি উপদেশমূলক ঘটনা

আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. তাওবা করার ভরসায় গোনাহ করার বিষয়ে তাঁর একটি ঘটনা বর্ণনা করতেন যে, দেওবন্দে অনেক সাপ-বিচ্ছু ছিলো। নিত্যদিন এগুলো মানুষকে দংশন করতো। যে কারণে সেখানে সাপ-বিচ্ছু দংশন করার অনেক তদবীর প্রচলিত

ছিলো। সেই তদবীরগুলো করলে বিষ নেমে যেতো। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-ও বিচ্ছুর বিষ নামানোর একটি তদবীর শিখেছিলেন। কাউকে বিচ্ছু দংশন করলে হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. ঐ তদবীর করলে অবিলম্বে তার ব্যথা-বেদনা দূর হয়ে যেতো এবং বিষ নেমে যেতো। তাই মানুষ অনেক দূর থেকে ওয়ালেদ ছাহেবের নিকট রোগী নিয়ে আসতো। তিনি দম করে দিতেন আর তার ব্যথা ভালো হয়ে যেতো। হযরত ওয়ালেদ ছাহেবের এই তদবীরের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-এর ঘরে একটি কুঠুরি ছিলো। সেটা স্টোর রুম হিসেবে ব্যবহার হতো। সে যুগে বিদ্যুৎ ছিলো না। লণ্ঠনের যুগ ছিলো। একদিন আমার আম্মা ঐ কুঠুরি থেকে একটি জিনিস বের করতে চাচ্ছিলেন। ঘরে একটি মাত্র লণ্ঠন ছিলো। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব ঐ লণ্ঠনের আলোতে লেখাপড়ার কাজ করছিলেন। আমার আম্মা ওয়ালেদ ছাহেবকে বললেন যে, আমি একটু কুঠুরিতে যাবো, লণ্ঠনটি অল্প সময়ের জন্যে দিন, অমুক জিনিসটা নিয়ে আসি। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব লণ্ঠনের আলোতে কিছু একটা লিখছিলেন, তাই লণ্ঠন দিতে চাচ্ছিলেন না। তিনি বললেন, এটা ছোট একটা জিনিস, লণ্ঠন ছাড়াই নিয়ে আসো। আমার আম্মা বললেন যে, 'জিনিসটি তো সামনেই রাখা আছে, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যে, অন্ধকারের মধ্যে সেখানে পা রাখলে আমাকে আবার বিচ্ছু দংশন না করে। তখন হযরত ওয়ালেদ ছাহেবের মুখ দিয়ে একথা বের হয়ে যায় যে, 'আরে ভাই! বিচ্ছু কাটলে তাতে কি, আমার কাছে চলে আসবে, দম করে দিলে ইনশা আল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো, বিচ্ছু দংশন করার তো শুধু সম্ভাবনা রয়েছে। আর যদি দংশন করেও আমি তো তার তদবীর জানি, তদবীর করে দিবো।

আল্লাহ তা'আলার মর্জি, আমার আম্মা কুঠুরিতে পা রাখা মাত্র তাকে বিচ্ছু দংশন করে। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব বলেন যে, আমি অবিলম্বে উঠে তাঁর কাছে যাই এবং দ্রুত বিচ্ছু কাটার সেই তদবীর আরম্ভ করি। কিন্তু তাতে কোনো কাজই হলো না। যে তদবীর দ্বারা শত শত বিচ্ছুকাটা রোগীর চিকিৎসা করলাম, সেই তদবীর আজো করেছি, কিন্তু কোনো কাজ হলো না। তদবীরের সমস্ত শক্তি ব্যয় করলাম, কিন্তু বেদনার লহর কমছিলো না। অবশেষে অন্যের দ্বারা চিকিৎসা করাতে বাধ্য হলাম। আমার সব চিকিৎসাই ব্যর্থ হলো।

এ ঘটনা শুনিয়ে তিনি বলতেন যে, দেখো! আমি এই আমলের উপর ভরসা করে বিচ্ছুর দংশন থেকে সতর্কতা অবলম্বন করিনি। আমি চিন্তা

করেছি যে, বিচ্ছু দংশন করলেও তাতে কি আসে যায়। আমার তো তদবীর জানা আছে। কিন্তু এ ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা একটি শিক্ষা তো এই দান করলেন যে, কোনো চিকিৎসাই আল্লাহর হুকুম ছাড়া কার্যকর হয় না। একই ঔষধ এক রোগীর উপকার করে, আরেক রোগীর ক্ষতি করে। অথচ উভয়ের রোগ একই।

যাইহোক! হযরত ওয়ালেদ ছাহেব বলতেন যে, এ ঘটনার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা একটি শিক্ষা তো এই দেন যে, তোমরা যে নিজেদের তদবীরের উপর ভরসা করে বসে আছো। মনে রেখো! আমার হুকুম না হওয়া পর্যন্ত এসব তদবীরে কিছু হয় না। কোনো ওযীফা এবং কোনো তাবীজের উপর ভরসা করা আর এরূপ বলা যে, রোগ আসে আসুক আমার কাছে তো ঔষধ রয়েছে এটি ভুল কথা। এ ঘটনা একটি শিক্ষা তো এই দেয়।

দ্বিতীয় শিক্ষা এই দেয় যে, মানুষের কাছে যতো উন্নত মানের চিকিৎসাই থাকুক না কেন, তার উপর ভিত্তি করে অসুখকে ডেকে আনা ঠিক নয়। বরং অসুখ থেকে আল্লাহ তা'আলার কাছে পানাহ চাওয়া এবং দু'আ করা উচিৎ যে, হে আল্লাহ! রোগ সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের নেই। যাইহোক! হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. এ বিষয়টি বোঝানের জন্যে এ ঘটনাটি শোনাতেন যে, তাওবার উপর ভরসা করে গোনাহ করা এমন, যেমন কি না তদবীরের উপর ভরসা করে বিচ্ছু দ্বারা দংশন করানো। বিচ্ছু দংশন করার পর ঔষধ ব্যবহার করার সুযোগ পাবে কি পাবে না, তার কোনো খবর আছে? তাছাড়া ঔষধ ব্যবহারের সুযোগ পেলেও তা কার্যকর হবে কি-না তার কী নিশ্চয়তা আছে?

একইভাবে যখন আপনি তাওবার উপর ভরসা করে গোনাহে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা করছেন, তখন গোনাহের পর তাওবার সুযোগ পাবেন কি-না, তা কি আপনার জানা আছে? এ কথার কী নিশ্চয়তা আছে যে, গোনাহের পর তাওবা করার সুযোগ অবশ্যই পাবেন? আর যদি তাওবার সুযোগ পেয়েও যান, তখন তাওবার তাওফীক হবে কি-না তা কি জানা আছে? কারণ, গোনাহ মানুষের ভিতর আল্লাহর বিষয়ে উদাসীনতা সৃষ্টি করে। মানুষকে উদাসীন বানিয়ে দেয়। আপনি তো এ কথা চিন্তা করে গোনাহ করছেন যে, পরে আমি তাওবা করে নিবো। কিন্তু গোনাহ আপনার মনের মধ্যে গাফলত সৃষ্টি করে দিলো। ফলে গোনাহের স্বাদের মধ্যে এমন বিভোর হয়ে পড়লেন যে, তাওবা করার চিন্তাই জাগলো না এবং তাওবা করার তাওফীকই হলো না, তখন কী অবস্থা হবে?

মালাকুল মওতের সাক্ষাৎ

আমার ওয়ালেদ মাজেদ থেকে একটি ঘটনা শুনেছি যে, একবার এক লোকের মালাকুল মওতের সাথে সাক্ষাৎ হয়। (আল্লাহ জানেন কতোটুকু সঠিক। তবে ঘটনাটি শিক্ষণীয়।) লোকটি হযরত আযরাঈল আলাইহিস সালামকে বলে- জনাব! আপনার কাজকর্ম বড়ো বিস্ময়কর। যখন মর্জি এসে হাজির। দুনিয়ার আদালতের নিয়ম হলো, কাউকে সাজা দিতে হলে প্রথমে তাকে বার্তা দেয় যে, তোমার নামে এই মর্মে মামলা দায়ের হয়েছে তুমি এর জবাব দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হও! আর আপনি কোনো প্রকার বার্তা পাঠানো ছাড়াই চলে আসেন। হঠাৎ এসে জান কবজ করেন। এটা কেমন কথা! মালাকুল মওত উত্তর দিলেন- 'আরে ভাই! আমি তো এতো বেশি বার্তা পাঠাই যে, দুনিয়ার কেউই তা পাঠায় না। কিন্তু এর কী সমাধান যে, কেউ তা শোনেই না। কেউ এর পরওয়াই করে না। তুমি জানো না, যখন জ্বর হয়, তা হয় আমার পাঠানো বার্তা। যখন মাথা ব্যথা হয়, তা হয় আমার পাঠানো বার্তা। যখন বার্ধক্য আসে, তা হয় আমার পাঠানো বার্তা। যখন চুল পাকে, তা হয় আমার পাঠানো বার্তা। যখন মানুষের নাতি হয়, তাও হয় আমার পাঠানো বার্তা। আমি তো অবিরাম বার্তা পাঠাতে থাকি। তোমরা তো শোনো না, সে ভিন্ন কথা। সমস্ত রোগ-ব্যাধিই আল্লাহ তা'আলার পাঠানো সতর্কবার্তা যে, দেখো! তোমার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন-

اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ[১]

অর্থাৎ, আখেরাতে আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবো, আমি কি তোমাদেরকে এতোটুকু হায়াত দেইনি, যার মধ্যে কোনো নসীহত গ্রহণকারী নসীহত গ্রহণ করতে চাইলে করতে পারতো। উপরন্তু তোমাদের কাছে ভীতিপ্রদর্শনকারী এসেছে।[২০৬]

আগত এ 'নাযীর' তথা 'ভীতিপ্রদর্শনকারী' কে? এর তাফসীরে কতক মুফাসসির বলেন যে, এর দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্দেশ্য। তিনি মানুষদেরকে সতর্ক করেছেন যে, মৃত্যুর পর তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়াতে হবে।

কতক মুফাসসির বলেন যে, এ আয়াতে 'নাযীর' দ্বারা পাকা চুল উদ্দেশ্য। যখন মাথার বা দাড়ির চুল পেকে যায়, এটা মানুষের জন্যে 'নাযীর'

---

১. ফাতির: ৩৭,

তথা ভীতিপ্রদর্শনকারী হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সে ভীতি প্রদর্শন করতে এসেছে যে, সময় ঘনিয়ে এসছে তৈরী হও।

কতক তাফসীরকারক লিখেছেন যে, 'নাযীর' দ্বারা নাতী উদ্দেশ্য। যখন কারো ঘরে নাতী জন্ম হয়, তখন সে নাতী ভীতিপ্রদর্শনকারী হয়ে থাকে যে, সময় ঘনিয়ে এসেছে, তৈরী হয়ে যাও। এক আরব কবি এ বিষয়টিকেই তার এক কবিতায় এভাবে উপস্থাপন করেছেন-

إِذَا الرِّجَالُ وُلِدَتْ أَوْلَادُهَا
وَبُلِيَتْ مِنْ كِبَرٍ أَجْسَادُهَا
وَجُعِلَتْ أَسْقَامُهَا تَعْتَادُهَا
تِلْكَ زُرُوْعٌ قَدْ دَنَا حَصَادُهَا

'যখন মানুষের নাতির জন্ম হয়।
বার্ধক্যের কারণে দেহ নির্জীব হয়ে যায়।
একের পর এক রোগ দেখা দিতে থাকে।
এক রোগ গেলে আরেক রোগ আসে।
তাহলে বুঝে নাও যে,
এ শস্য কাটার সময় ঘনিয়ে এসেছে।'

মোটকথা, এ সবই আল্লাহ তা'আলার পাঠানো বার্তা। যদিও আল্লাহর সাধারণ নিয়ম হলো, তিনি বার্তা পাঠিয়ে থাকেন, কিন্তু কতক সময় বিনা নোটিশে অকস্মাৎ মৃত্যু চলে আসে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন– তুমি কি এমন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আছো, যা বিনা নোটিশে ও অকস্মাৎ চলে আসবে। জানা তো নেই, কয়টা শ্বাস আর অবশিষ্ট আছে। তার প্রতীক্ষা কেন করছো?

এক ব্যবসায়ীর অন্য রকম ক্ষতি

আমার ওয়ালেদ মাজেদ রহ.-এর নিকট একজন ব্যবসায়ী আসতো। তার অনেক বড়ো ব্যবসা ছিলো। একবার সে এসে বললো, হযরত কী বলবো, কোনো দু'আ বলে দিন, অনেক বড়ো ক্ষতি হয়েছে! ওয়ালেদ ছাহেব বলেন, একথা শুনে আমার খুব দুঃখ হলো যে, আমার তো জানা নেই এ বেচারা কোন মসিবতে লিপ্ত হয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কতো ক্ষতি হয়েছে? লোকটি বললো, হযরত কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। ওয়ালেদ

ছাহেব বললেন, একটু খুলে বলো, কী ধরনের ক্ষতি হলো? সে খুলে বললে জানা গেলো, কোটি কোটি টাকার একটা ব্যবসা হওয়ার কথা ছিলো তা হয়নি। এছাড়া ইতিপূর্বে যে লাখ লাখ টাকা আসছিলো তা এখনো আসছে, এতে কোনো কমতি হয়নি। তবে যে ব্যবসাটি হওয়ার কথা ছিলো তা হয়নি। এ কারণে বলছে যে, অনেক বড়ো ক্ষতি হয়েছে। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলেন, এ ব্যক্তি লাভ না হওয়াকে ক্ষতি বলে উপস্থাপন করেছে। অর্থাৎ, যেই লাভ হওয়ার প্রত্যাশা ছিলো তা হয়নি বলে বলছে যে, বিরাট ক্ষতি হয়েছে।

এ ঘটনা বর্ণনা করার পর ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলতেন, হায়! একথা যদি দ্বীনের বিষয়েও চিন্তা করতো যে, আমি যদি এ সময়কে ঠিক মতো কাজে লাগাতাম তাহলে এর কারণে দ্বীন ও আখেরাতের অনেক বড়ো ফায়দা হতো! তা হয়নি যে কারণে এ ক্ষতি হয়েছে।

এক বণিকের ঘটনা

একটি কথা হাসির হলেও আল্লাহ তা'আলা বোঝার মতো বুদ্ধি দান করলে তার মধ্যে থেকেও কাজের বিষয় বের হয়ে আসে। আমাদের এক মুরুব্বী বিখ্যাত হাকীম ছিলেন। তিনি একদিন এ ঘটনা শোনান যে, একজন ঔষধ বিক্রেতা ছিলো। তার ছেলেও তার সঙ্গে দোকানে বসতো। একদিন কোনো প্রয়োজনে তাকে কোথাও যেতে হয়। যাওয়ার পূর্বে তিনি ছেলেকে বললেন, বেটা! আমাকে একটা কাজে যেতে হবে। তুমি দোকান দেখাশোনা করো। আর সতর্কতার সঙ্গে সদাই বিক্রি করো। ছেলে বললো, ঠিক আছে। লোকটি তার ছেলেকে সব জিনিসের দাম বলে দিলো। এটার এই দাম, ওটার এই দাম, এ কথা বলে সে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর একজন গ্রাহক এলো। দুই বতল শরবত ক্রয় করলো। ছেলে একশ' টাকা করে একেকটি বোতল বিক্রি করলো। কিছুক্ষণ পর পিতা ফিরে এসে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলো, কী কী বিক্রি হয়েছে? ছেলে বললো, অমুক অমুক জিনিস বিক্রি করেছি। এ দুটি বোতলও বিক্রি করেছি। পিতা বললো, বোতল দুটি কতো দামে বিক্রি করেছো। ছেলে বললো, একেকটি একশ' টাকা করে বিক্রি করেছি। একথা শুনে পিতা মাথা ধরে বসে পড়লো। বললো, তুমি আমার সর্বনাশ করেছো। এ বোতলগুলো তো একেকটা দুই হাজার টাকা করে। তুমি একেকটা একশ' টাকা করে বিক্রি করেছো! পিতা খুব অসন্তুষ্ট হলো। ছেলেও খুব ব্যথিত হলো যে, আমি বাবার এতো বড়ো ক্ষতি করলাম। সে কাঁদতে আরম্ভ করলো। বাবার

কাছে মাফ চাইতে আরম্ভ করলো। আব্বাজান, আমাকে মাফ করে দিন। আমার অনেক বড়ো ভুল হয়েছে। আপনার অনেক বড়ো ক্ষতি করেছি। বাবা যখন দেখলো ছেলে অনেক বেশি ব্যথিত ও পেরেশান হয়েছে, তখন ছেলেকে বললো, এতো বেশি দুঃশ্চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। কারণ যে বোতলগুলো তুমি একশ' টাকা করে বিক্রি করেছো, এখনো তাতে একশ' টাকায় আটানব্বই টাকা লাভ রয়েছে। তবে তুমি সতর্কতার সঙ্গে ব্যবসা করলে এককেটা বোতলে দুই হাজার টাকা করে লাভ পেতে। এতোটুকু ক্ষতি হয়েছে। তবে ঘর থেকে কিছু যায়নি।

হযরত মিয়াঁজী নূর মুহাম্মাদ রহ.-এর সময়ের মূল্য দান

আমরা আমাদের উর্ধ্বতন শায়েখ হযরত মিয়াঁজী নূর মুহাম্মাদ রহ.-এর ঘটনা শুনেছি। তিনি ছিলেন হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী রহ.-এর শায়েখ। কেউ তাঁকে কষ্ট দিলে তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। এমন কি কেউ তার টাকা-পয়সা চুরি করলেও বলতেন, হে আল্লাহ! আমি এ টাকা তার জন্যে হালাল করে দিলাম। আমি তার থেকে প্রতিশোধ নিয়ে করবো কী? তাকে শাস্তি দেওয়ালেই বা তাতে আমার লাভ কী? তিনি সর্বক্ষণ আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকতেন। বাজারে কোনো কিছু কিনতে গেলে মাল কেনার পর টাকার থলি দোকনদারকে দিয়ে বলতেন, এখান থেকে দাম নিয়ে নাও। নিজে গুনতেন না। টাকা গুনতে যে সময় ব্যয় হবে, ততক্ষণ যিকির করলে অনেক লাভ।

একবার তিনি বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন। হাতে টাকার থলে ছিলো। এক চোর পিছনে লাগলো। তারপর এক সুযোগে সেটি ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে পালালো। মিয়াঁজী ফিরেও দেখলেন না কে থলেটি ছিনিয়ে নিলো। ভাবলেন, কে শুধু শুধু তার পিছনে দৌড়াবে, আর খোঁজ নেবে কে নিয়েছে? তিনি যিকির করতে করতে বাড়ির পথ ধরলেন। মনে মনে নিয়ত করলেন, হে আল্লাহ! যেই চোর থলেটি নিয়েছে তাকে ক্ষমা করে দিলাম। টাকা তাকে হাদিয়া করে দিলাম। ওদিকে চোর চুরি করে ফ্যাসাদে পড়ে গেলো। বাড়ি ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছিলো, কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছিলো না। এক গলি থেকে আরেক গলি, সেই গলি থেকে অন্য গলি, এভাবে মহা গোলক ধাঁধায় পড়ে গেলো। যে গলি থেকে বের হতো ঘুরে ফিরে আবার সে গলিতেই চলে আসতো। কোন দিক দিয়ে যে বের হবে তা খুঁজেই পাচ্ছিলো না। কয়েক ঘণ্টা এভাবে চক্কর খেয়ে শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লো। কী করবে দিশাই পাচ্ছিলো না। হঠাৎ তার

মাথায় এলো, এটা বড়ো মিয়াঁর কারামত মনে হচ্ছে। আমি তার টাকা চুরি করেছি বলে আল্লাহ আমার পথ বন্ধ করে দিয়েছেন।

এখন মুক্তির উপায় কী? ভাবলো, ওই বুযুর্গের কাছেই ফিরে যাই এবং তাকে ধরে বলি, আপনার টাকা এই নিন, এখন আল্লাহর কাছে দু'আ করে আমার জান বাঁচানোর ব্যবস্থা করুন। এবার সে রাস্তা পেলো। মিয়াঁজী রহ.-এর বাড়ির রাস্তা। সোজা তাঁর বাড়িতে পৌছে দরজায় করাঘাত করলো। মিয়াঁজী রহ. জিজ্ঞাসা করলেন, কে? বললো, হুযূর! আমি আপনার টাকা চুরি করেছিলাম। আমার অন্যায় হয়ে গেছে। আল্লাহর ওয়াস্তে এ টাকা ফেরত নিন। মিয়াঁজী রহ. বললেন, ও টাকা আমি তোমার জন্যে হালাল করে দিয়েছি। তোমাকে দান করে দিয়েছি। এখন আর ও টাকা আমার নয়। আমি ওটা ফেরত নিতে পারবো না। চোর বললো, আল্লাহর ওয়াস্তে ফেরত নিন। এভাবে দু'জনের মধ্যে কথা চলছিলো। চোর বলছিলো, ফেরত নিন। তিনি বলছিলেন, আমি ওটা দান করে দিয়েছি, ফেরত নিতে পারবো না। শেষে মিয়াঁজী রহ. জিজ্ঞাসা করলেন, ফেরত দিতে চাচ্ছো কেন? সে বললো, হযরত! ব্যাপার হলো, আমি বাড়ি যেতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কয়েক ঘণ্টা বাজারের গলিতে ঘুরপাক খেয়েছি। মিয়াঁজী রহ. বললেন, আচ্ছা যাও, আমি দু'আ করছি, তুমি রাস্তা পেয়ে যাবে। সুতরাং তিনি দু'আ করলেন। সে পথ পেয়ে বাড়ি চলে গেলো। যাইহোক, তাঁদের চিন্তা ছিলো, আমাদের সময়কে এমন কাজে কেন নষ্ট করবো, যা আমাদের আখেরাতে কাজে আসবে না।

অন্তরে গুরুত্ব থাকলে সময় হয়

আমার এক উস্তায তাঁর ঘটনা শোনান যে, হযরত থানবী রহ.-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ খলীফা হযরত মাওলানা খায়ের মুহাম্মাদ ছাহের রহ. একবার আমার কাছে অভিযোগ করেন যে, আপনি আমার কাছে কখনোই আসেন না। চিঠিও লেখেন না। যোগাযোগও করেন না। তখন আমি উত্তরে বলি, হযরত অবসর পাই না। হযরত মাওলানা খায়ের মুহাম্মাদ রহ. বলেন, দেখো! যে বিষয়ে বলা হয় যে, অবসর পাইনি তার অর্থ হলো ঐ বিষয়ের এবং ঐ কাজের গুরুত্ব অন্তরে নেই। কারণ, যখন কাজের গুরুত্ব অন্তরে থাকে তখন মানুষ তার জন্যে জোর জোবরদস্তি সময় বের করে। যখন মানুষ বলে যে, অমুক কাজটি আমি সময়ের অভাবে করিনি, তার অর্থ হলো ঐ কাজের গুরুত্ব তার অন্তরে নেই।

আল্লাহওয়ালাদের স্বভাব ও রুচীর বিভিন্নতা

'আরওয়াহে ছালাছা' গ্রন্থে হযরত থানবী রহ. একটি ঘটনা লিখেছেন যে, এক ব্যক্তি জনৈক বুযুর্গকে বললো, হযরত! শুনেছি বযুর্গদের বিভিন্ন রং (স্বভাব) হয়ে থাকে, তাদের একেকজনের একেক ধারা, একেক শান হয়ে থাকে। তো তাদের সেই বিভিন্ন রং ও ধরন আমি দেখতে চাই। বুযুর্গ বললেন, তুমি এ চক্করে পড়ো না। নিজ কাজে লেগে থাকো। কিন্তু লোকটি নাছোড়বান্দা, সে তা দেখবেই।

শেষে বুযুর্গ বললেন, আচ্ছা তুমি এক কাজ করো। দিল্লীর অমুক মসজিদে চলে যাও। মসজিদে তিনজন বুযুর্গ আছেন। তাদেরকে আল্লাহর যিকিরে মশগুল পাবে। তুমি গিয়ে তাদের প্রত্যেককে পিছন থেকে একটি করে ঘুষি মারবে। এতে তাদের কী প্রতিক্রিয়া হয় দেখবে। তারপর এসে আমাকে জানাবে।

তাঁর কথামতো লোকটি সেই মসজিদে চলে গেলো। দেখলো, ঠিকই তিনজন বুযুর্গ মসজিদে আল্লাহ তা'আলার যিকিরে মশগুল। সে প্রথমে এক বুযুর্গকে পিছন থেকে ঘুষি মারলো। তিনি ফিরেও তাকালেন না। আপন মনে যিকিরেই মশগুল থাকলেন। তারপর দ্বিতীয়জনকে ঘুষি লাগালো। বুযুর্গও পিছনে ঘুরে একই রকম জোরে তাকে একটি ঘুষি লাগালেন। তারপর আবার যিকিরে লেগে গেলেন। শেষে তৃতীয়জনকে মারলো। ইনি ঘুরে উঠে তার হাত টিপতে শুরু করলেন এবং বললেন, ভাই ব্যথা পাওনি তো?

লোকটি ফিরে আসলে সেই বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন খবর কী? সে যাকিছু ঘটেছে সবিস্তারে বর্ণনা করলো এবং জানালো যে, তিনজন তিন রকম আচরণ করেছে। বুযুর্গ বললেন, তুমি বুযুর্গদের রংয়ের (স্বভাবের) বৈচিত্র্য জানতে চেয়েছিলে। তো এটাই তাই। তাদের তিনজনের তিন রং ছিলো। প্রথম বুযুর্গ, যিনি তোমার ঘুষির বদলা নিয়েছেন, তিনি কি তোমাকে মুখে কিছু বলেছেন? সে বললো, না, মুখে কিছু বলেননি। ঘুষি মেরে পুনরায় নিজ কাজে মশগুল হয়েছেন। তিনি বললেন, ওই বুযুর্গ চিন্তা করেছেন, সে আমার উপর যে জুলুম করেছে আমি কুরআন মাজীদের নির্দেশনা মোতাবেক তার থেকে সমান বদলা নেবো। সুতরাং তাই করেছেন।

বিষয়টা অনেকেরই বুঝে আসে না। তাদের প্রশ্ন হলো, ওলী-বুযুর্গ প্রতিশোধ নেবে কেন? আসলে তারা প্রতিশোধ নেন আঘাতকারীর প্রতি কল্যাণকামিতায়। চিন্তা করেন, প্রতিশোধ নিয়ে ফেললে সে আখেরাতের ধরা থেকে বেঁচে যাবে। সে কেন আমাকে কষ্ট দিলো, আমি এর প্রতিশোধ

নেবোই, এরূপ মানসিকতা তাদের থাকে না। বরং তাকে আখেরাতের আযাব থেকে বাঁচানোই থাকে লক্ষ্য। কিন্তু সতর্ক থেকেছেন যাতে বাড়াবাড়ি না হয়ে যায়। তাই এও মুখে কিছু বলেনি, তো তিনিও মুখে কিছু বলেননি।

দ্বিতীয় বুযুর্গ চিন্তা করেছেন, বদলা নেওয়ার ঝামেলায় কে জড়ায়? সে আমাকে মেরেছে তো কী হয়েছে! এখন আমি পিছন ফিরে দেখবো। তারপর এর বদলা নেবো। শুধু-শুধু এ চক্করে কেন পড়বো। যে সময় এর পিছনে ব্যয় করবো, ততক্ষণ আল্লাহর যিকির করি। সময় অনেক মূল্যবান। তা নষ্ট করবো কেন? যে মারছে মারুক।

এই বুযুর্গের দৃষ্টান্ত হলো, এক ব্যক্তিকে অনেক মূল্যবান একটি পুরস্কার দেওয়ার জন্যে বাদশা ডেকেছে। লোকটি পুরস্কার নেওয়ার জন্যে অতি আগ্রহে বাদশার মহলের দিকে দৌড়াচ্ছে। হাতে সময় খুব কম। যথা সময়ে পৌছতে হবে। পথে এক ব্যক্তি তাকে ঘুষি মারলো। এখন এ ব্যক্তি যে ঘুষি মারলো তার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হবে, নাকি বাদশার দরবারে দ্রুত পৌছার জন্যে অব্যহতভাবে পথ চলতে থাকবে। বলাবাহুল্য যে, সে ঝগড়া না করে বরং দ্রুত গিয়ে বাদশার থেকে পুরস্কার নিবে।

তৃতীয় বুযুর্গ ছিলেন ভিন্ন রঙের। তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ মিটিয়ে দিয়েছিলেন। তাই নিজে ব্যথা পেয়েছেন সে ভাবনা তার ছিলো না; বরং তার চিন্তা দেখা দিয়েছে আঘাতকারীকে নিয়ে। না জানি আমাকে মারতে গিয়ে সে নিজে কতটা ব্যথা পেয়েছে। তাই উঠে তার হাত টিপতে শুরু করেছেন।

যা হোক বুযুর্গগণের রং ও ধরন বড়ো বিচিত্র! তিনজনের তিন রং। সবগুলোই জায়েয ছিলো। প্রথমটা জায়েয ছিলো এ কারণে যে, তাতে সমমাত্রায় বদলা নেওয়া হয়েছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে,

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

'মন্দের প্রতিশোধ অনুরূপ মন্দ'।[২০৭]

দ্বিতীয়টি ছিলো ক্ষমার পন্থা। এটাও জায়েয। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ

'অবশ্য যে সবর করে ও ক্ষমা করে দেয়, তা তো দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ।'[২০৮]

---

২০৭. সূরা শূরা, আয়াত: ৪০
২০৮. সূরা শূরা, আয়াত: ৪৩

বস্তুত ক্ষমা করাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। ব্যক্তিগত বিষয়ে তিনি কখনও কারো থেকে বদলা নেননি, আর তৃতীয় পন্থা আরও উৎকৃষ্ট ও উন্নত। যেহেতু এ বুযুর্গ নিজের কষ্টের চিন্তা না করে বরং আঘাতকারীর কষ্টের কথা চিন্তা করেছেন।

গীবত করার কারণে শিক্ষণীয় ভয়ংকর স্বপ্ন

রিবঈ নামে একজন তাবেঈ ছিলেন। তিনি তাঁর নিজের ঘটনা বর্ণনা করেন যে, একবার আমি একটি মজলিসে যাই। গিয়ে দেখি মানুষ বসে বসে কথা বলছে। আমিও সেখানে বসি। কথা বলতে বলতে একজন মানুষের গীবত আরম্ভ হয়। মজলিসে বসে কারো গীবত করা আমার কাছে খারাপ লাগে। তাই আমি মজলিস ছেড়ে উঠে চলে যাই। কোনো মজলিসে গীবত হতে থাকলে মানুষের উচিত তাকে থামিয়ে দেওয়া, আর থামিয়ে দেওয়ার মতো শক্তি না থাকলে কমপক্ষে ঐ আলোচনায় অংশগ্রহণ না করা। বরং উঠে চলে যাওয়া। সুতরাং আমি উঠে চলে যাই। অল্প কিছুক্ষণ পর চিন্তা করি যে, এখন মজলিসে গীবতের আলোচনা শেষ হয়েছে, তাই আমি পুনরায় ঐ মজলিসে গিয়ে তাদের সঙ্গে বসি। কিছুক্ষণ এদিক সেদিকের কথা চলতে থাকে, কিন্তু অল্প সময় পরে আবার গীবত আরম্ভ হয়ে যায়। এবার আমার মনোবল দুর্বল হয়ে পড়ে। আমি ঐ মজলিস ছেড়ে উঠে যেতে পারি না। তারা যে গীবত করছিলো প্রথমে তা শুনতে থাকি, পরে আমি নিজেও গীবতের দু'একটি কথা বলি।

ঐ মজলিস থেকে উঠে বাড়িতে ফিরে আসি। রাতে ঘুমাই। স্বপ্নে দেখি নিকষ কালো এক মানুষ বড়ো একটা খাঞ্চায় আমার কাছে গোশত নিয়ে আসে। আমি ভালোভাবে লক্ষ করে দেখি, তা শুয়োরের গোশত। সেই কালো চেহারার লোকটি আমাকে বলে এই শুয়োরের গোশত খাও। আমি বলি, আমি তো মুসলমান, আমি শুয়োরের গোশত কি করে খাবো! সে বলে, না এটা তোমাকে খেতে হবে। তারপর জোরপূর্বক গোশতের টুকরা উঠিয়ে আমার মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে আরম্ভ করে। আমি নিষেধ করতে থাকি আর সে ঢুকাতে থাকে। এমনকি আমার বমি আসতে আরম্ভ করে। কিন্তু সে ঢুকাতেই থাকে। এই প্রচণ্ড কষ্টকর অবস্থায় আমার চোখ খুলে যায়। জাগ্রত হওয়ার পর যখন আমি খেতে বসি তখন স্বপ্নযোগে শুয়োরের গোশতের যেই উৎকট গন্ধ ও পঁচা স্বাদ ছিলো তা আমার খাদ্যের মধ্যে অনুভব হতে থাকে। তিন দিন পর্যন্ত আমার এ অবস্থা চলতে থাকে। যখনই আমি খেতে বসি, খাবারের

মধ্যে শুয়োরের গোশতের পঁচা স্বাদ আমার অনুভব হতে থাকে। এই ঘটনার মধ্যেমে আল্লাহ তা'আলা আমাকে সতর্ক করেন। অল্প সময় আমি যে মজলিসে গীবত করেছিলাম তার পঁচা স্বাদ আমি তিনদিন পর্যন্ত অনুভব করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন।

আবু নাওয়াসের মাগফেরাতের ঘটনা

আবু নাওয়াস নামে আরবে এক প্রসিদ্ধ কবি ছিলো। স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলো। যে সব কবি সব রকম পাপাচারে লিপ্ত থাকতো, আবু নাওয়াসও তাদের একজন। সারাটা জীবন পাপকর্মেই কাটিয়েছে। মদ্যপান তো ছিলোই। মৃত্যুর পর তার সাথে স্বপ্নযোগে এক ব্যক্তির সাক্ষাত হয়। সে তাকে জিজ্ঞাসা করে আল্লাহ তা'আলা তোমার সাথে কেমন আচরণ করেছেন? সে বললো, কী বলবো ভাই! মৃত্যুকালে যা ভয় পেয়েছিলাম! জীবনভর মজা লুটে বেড়িয়েছি, আল্লাহ তা'আলার সাথে যখন সাক্ষাত হবে, না জানি কি কঠিন শাস্তি তখন আমাকে দেওয়া হয়! বড়ই দুশ্চিন্তায় ছিলাম। এই দুশ্চিন্তার ভেতর আমি তিনটি শ্লোক তৈরি করি এবং তারই ওছিলায় আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করে দেন। স্বপ্নে কবি তাকে শ্লোক তিনটি শুনিয়ে দেয়। বড়ো চমৎকার এক কবিতা। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দিলে কবিরাও তাদের কবিতায় অনেক মূল্যবান কথা বলে ফেলেন।

কবিতাটি নিম্নরূপ–

يَا رَبِّ إِنْ عَظُمَتْ ذُنُوْبِيْ كَثْرَةً   فَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفْوَكَ أَعْظَمُ

إِنْ كَانَ لَا يَرْجُوْكَ إِلَّا مُحْسِنٌ   فَبِمَنْ يَلُوْذُ وَيَسْتَجِيْرُ الْمُجْرِمُ

وَمَدَدْتُ يَدِيْ إِلَيْكَ تَضَرُّعًا   فَلَئِنْ رَدَدْتَ يَدِيْ فَمَنْ ذَا يَرْحَمُ

প্রভু হে! যদিও গোনাহ আমার বিপুল বেশুমার,
কিন্তু আমি বিশ্বাস করি তোমার ক্ষমা তারচে' অনেক বড়ো।
যদি কেবল নেককার বান্দাগণই তোমার রহমতের আশা করতে পারে,
তবে বলো, অপরাধী বান্দা কার আশ্রয় নেবে?
বিনয় কাতরভাবে হে মালিক, হাত বাড়ালাম তোমার কাছে,
এখন তুমি যদি ফিরিয়ে দাও, তবে বলো, আর কে দয়া করবে?

অন্তিম মুহূর্তে তিনি কবিতাগুলো বলেন। আল্লাহ তা'আলাই জানেন তখন তার মনের অবস্থা কী ছিলো। আল্লাহপাক সব ক্ষমা করে দিলেন। বললেন-

যা, এই কবিতার বদৌলতে তোকে ক্ষমা করে দিলাম। এ কবিতাটি আবু নাওয়াসের লিখিত পাণ্ডুলিপিতে ছিলো না। থাকার অবকাশও ছিলো না। কারণ, এটি তো বলেই ছিলেন জীবনের একদম শেষ মূহূর্তে। দুনিয়া থেকে যেতে যেতে। পাণ্ডুলিপিতে লেখার অবকাশই পাননি। তাই স্বপ্নযোগে জানিয়ে দেন যে, আমি এ কবিতা বলেছিলাম। যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেছিলেন, তিনি স্বপ্নেরই বরাতে আবু নাওয়াসের দীওয়ান (কাব্য সংকলন)-এ লিখে দিয়েছেন।[২০৯]

আমাদের বুযুর্গগণের বিনয়

যে সকল আল্লাহওয়ালার কথা শুনে ও পড়ে আমরা দ্বীন শিখে থাকি, তাদের জীবনী পড়লে জানা যাবে যে, তাঁরা নিজেদেরকে এতোই মূল্যহীন মনে করতেন, যার কোনো সীমা নেই। সুতরাং হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব থানবী রহ.-এর এই উক্তি আমি আমার অনেক বুযুর্গ থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন,

'আমার অবস্থা এই যে, আমি প্রত্যেক মুসলমানকে বর্তমানে এবং প্রত্যেক কাফেরকে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দিক দিয়ে নিজের থেকে উত্তম মনে করি। মুসলমানকে তো এ জন্যে উত্তম মনে করি যে, সে ঈমানওয়ালা। আর কাফেরকে এ কারণে উত্তম মনে করি যে, হতে পারে আল্লাহ তা'আলা তাকেও ঈমানের তাওফীক দান করবেন এবং সে আমার থেকে আগে চলে যাবে।'

হযরত ডক্টর হাফীযুল্লাহ সাহেব একবার দারুল উলূম করাচীতে তাশরীফ আনেন। তার বাচনিক এ ঘটনা শুনি যে, একবার হযরত থানবী রহ.-এর বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা খায়ের মুহাম্মাদ ছাহেব রহ. হযরত মুফতী মুহাম্মাদ হাসান ছাহেব রহ.-কে বললেন, আমি যখন হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর মজলিসে বসে থাকি, তখন আমার মনে হয় যে, যতো মানুষ মজলিসে বসা আছে সকলেই আমার থেকে শ্রেষ্ঠ। আমি সবার চেয়ে নিষ্কর্মা ও অপদার্থ। হযরত মুফতী মুহাম্মাদ হাসান ছাহেব রহ. শুনে বললেন, আমার অবস্থাও অনুরূপ। অতঃপর উভয়ে পরামর্শ করলেন, আমরা হযরত থানবী রহ.-এর সামনে নিজেদের এ অবস্থার কথা উল্লেখ করি। জানা তো নেই, এ অবস্থা ভালো না মন্দ। সুতরাং তাঁরা উভয়ে হযরত থানবী রহ.-এর খেদমতে হাজির হয়ে নিজেদের অবস্থার বর্ণনা দিলেন। হযরত থানবী রহ. উত্তরে বললেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি সত্য করে বলছি, যখন

২০৯. মুখতাসারু তারীখি দিমাশক, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪২২; বাহজাতুল-মাজালিস, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৫৫

আমি মজলিসে বসা থাকি তখন আমারও এ অবস্থাই হয় যে, এই মজলিসের সবচেয়ে অকর্মণ্য ও অপদার্থ আমিই। এরা সকলে আমার চেয়ে উত্তম।

এটা হলো বিনয়ের হাকীকত। বিনয়ের এই হাকীকত যখন প্রবল হয়, তখন মানুষ নিজেকে মানুষ তো মানুষ পশুর চেয়েও অধম মনে করতে আরম্ভ করে।

এক বুযুর্গের গুপ্তচরবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকা

হযরত থানবী রহ.-এর মুরীদানের মধ্যে এক বুযুর্গ ছিলেন, যিনি এমনিতে ইংরেজি শিক্ষিত লোক ছিলেন, কিন্তু হযরত রহ.-এর সাহচর্যে আসার পর তার বেশভূষা দীনদার ও আলেমদের মতো হয়ে যায়। মুখে দাড়ি, লম্বা জামা ইত্যাদি। একবার তিনি রেলে সফর করছিলেন। কাছেই দু'জন ইংরেজি শিক্ষিত লোক বসা ছিলো। তার বেশভূষা দেখে এরা ভেবেছিলো মওলবী মানুষ ইংরেজি জানবে কোত্থেকে। কাজেই তারা ইংরেজি ভাষায় তারই সম্পর্কে আলাপ শুরু করে দিলো। ইংরেজিতে বলার উদ্দেশ্য তার কাছে লুকানো। মোল্লা মানুষ, ইংরেজি তো বুঝবে না। তারা কথা শুরু করতেই তিনি বুঝে ফেললেন, তারা তার কাছে কথা লুকাতে চাচ্ছে আর সে কারণেই ইংরেজিতে কথা বলছে। তিনি ভাবলেন, এখন যদি বসে বসে তাদের কথা শুনতে থাকি, তা দ্বীনদারীর পরিপন্থী হবে। তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া উচিত যে, আমিও ইংরেজি জানি। সুতরাং তিনি তাদের বললেন, আমি ইংরেজি বুঝি। আপনারা আমার কাছে লুকাতে চাইলে অন্য কোনও পন্থা অবলম্বন করুন। এই ধোঁকায় পড়বেন না যে, আমি ইংরেজি বুঝি না। আপনারা বললে আমি উঠে অন্যত্র চলে যেতে পারি। তাতে আপনাদের সুবিধা হবে। একান্তে বসে আলাপ চালিয়ে যেতে পারবেন।

যা হোক, সেই বুযুর্গ চিন্তা করেছিলেন, এই দুইজন ভাবছে আমি ইংরেজি জানি না। তাই আমার উপস্থিতিতে এ ভাষায় কথা বললে কোনও সমস্যা হবে না। এখন আমি যদি নীরব বসে থাকি তা গুপ্তচরবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত হবে। এ চিন্তা তার মনে কেন জেগেছিলো? এ কারণে জেগেছিলো যে, তিনি কিছুদিন থানাভবনে কাটিয়েছিলেন। হযরত থানবী রহ.-এর সাহচর্য লাভ হয়েছিলো। তা না হলে আজকাল কতো লোকই তো এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। কিন্তু কারও অন্তরে কি এই ভাবনা জাগে যে, আমি আলাপকারীদের জানিয়ে দেই, তোমরা যে ভাষায় কথা বলছো তা কিন্তু আমারও জানা আছে? কেউ তা জানালেও নিজের বিদ্যাবুদ্ধি জাহির করার জন্যে জানাবে। ভাবখানা থাকবে, দেখো আমাকে মূর্খ মনে করো না। ওই ভাষা আমিও জানি। গুপ্তচরবৃত্তির

গোনাহ থেকে বাঁচার লক্ষে জানাবে এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। বরং আজকাল তো চুপিসারে কথা শুনে ফেলাকে কৃতিত্বই গণ্য করা হয়। পরে গর্ব ভরে বলা হয়- তোমরা তো আমার কাছে লুকাতে চেয়েছিলে, কিন্তু আমি সবই বুঝতে পেরেছি।

হযরত জুনায়দ বাগদাদী রহ.-এর ঘটনা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী রহ. লিখেছেন যে, হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ. একবার কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে দেখলেন, একজন লোককে শূলিতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তার ডানহাত ও বাম পা কাটা। তিনি লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তার এ অবস্থা কেন? লোকেরা জানালো, সে প্রথমে একবার চুরি করেছিলো, তখন তার ডানহাত কাটা হয়। তারপর সে আবার চুরি করে, তখন বাম পা কাটা হয়। তারপরেও সে ক্ষান্ত হয়নি। যথারীতি চুরিতে লিপ্ত থাকে। তৃতীয়বার ধরা পড়লে তাকে শূলে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ. এ কথা শুনে তার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তার ঝুলন্ত পা ধরে চুমু খেলেন।

লোকজন তো অবাক! তারা বলে উঠলো, হযরত! আপনার মতো মানুষ একটা চোরের পায়ে চুমু খেলেন? ব্যাপারটা আমাদের বুঝে আসছে না। আপনি কেন তার পায়ে চুমু দিলেন? তিনি বললেন, শোনো, লোকটার মধ্যে একটা মস্ত গুণ আছে, আর তা হচ্ছে 'ইস্তিকামাত' তথা অবিচলতা ও দৃঢ়তা। আমি তার সেই সৎ গুণকেই চুম্বন করেছি। এ কথা সত্য যে, লোকটা তার এতো বড়ো গুণকে গলত কাজে ব্যবহার করেছে, গুনাহের কাজে ব্যবহার করেছে। নিশ্চয়ই এটা তার অন্যায়। অন্যথায় 'অবিচলতা' অনেক ভালো একটি গুণ। লোকটি যদি তার এই গুণকে ভালো কোনও কাজে ব্যবহার করতো, তবে এর মাধ্যমে সে অনেক উচ্চ মার্গে পৌছতে পারতো!

হযরত যুননূন মিসরী রহ.-এর আলোচনা

হযরত যুননূন মিসরী রহ. বড়ো মাপের আল্লাহর ওলী ছিলেন। তিনি এতো উঁচু স্তরের বুযুর্গ ছিলেন যে, আমরা তার কল্পনাও করতে পারবো না। তাঁর সম্পর্কে ঘটনা বর্ণিত আছে যে, একবার তাঁর শহরে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ পেরেশান। বৃষ্টির জন্যে দু'আ করছে। কিছু লোক হযরত যুননূন মিসরী রহ.-এর খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করলো, হযরত! আপনি দেখছেন, পুরো জাতি দুর্ভিক্ষের শিকার। জিহবা ও গলা

শুকিয়ে গেছে। পশুপালকে পান করানোর পানি নেই। জমিতে সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। আপনি আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করুন। আল্লাহ তা'আলা যেন বৃষ্টি দান করেন। হযরত যুননূন মিসরী রহ. বললেন, দু'আ তো আমি করবো ইনশা আল্লাহ, তবে একটি কথা শোনো, কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে, দুনিয়াতে তোমাদের যে কোনো বিপদ বা পেরেশানী হোক তা তোমাদের অপকর্ম ও গোনাহের কারণে হয়ে থাকে। তাই বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার অর্থ এই যে, আমরা বদ আমলে লিপ্ত। আমাদের বদ আমলের কারণে আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বন্ধ করে দিয়েছেন। এজন্যে আমাদেরকে প্রথমে দেখতে হবে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বদ আমলে লিপ্ত কে? আমি যখন আমার উপর জরিপ চালাই, তখন দেখতে পাই, এ পুরো জনপদে আমার চেয়ে খারাপ কোনো মানুষ নেই। আমার চেয়ে বেশি গোনাহগার আর কেউ নেই। আমার প্রবল ধারণা যে, এ জনপদে আমি অবস্থান করার কারণে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। এ জনপদ থেকে আমি বের হয়ে গেলে এখানে আল্লাহ তা'আলার রহমত বর্ষিত হবে, ইনশা আল্লাহ। এজন্যে বৃষ্টি হওয়ার ব্যবস্থা এই যে, আমি এ জনপদ থেকে বের হয়ে যাচ্ছি, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নিরাপদে রাখুন, তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন।

লক্ষ করুন! হযরত যুননূন মিসরীর মতো আল্লাহর কামেল ওলী এবং আল্লাহর নেক বান্দা মনে করছেন যে, এ পৃথিবীর বুকে আমার চেয়ে বড়ো কোনো গোনাহগার নেই। তাই এ জনপদ থেকে আমি বের হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা এখানে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। এবার বলুন! তিনি কি ভুল বলছিলেন? তিনি কি বিনয়ের কারণে এমন বলছিলেন? হযরত যুননূন মিসরী রহ.-এর মতো কামেল ওলীর মুখ থেকে মিথ্যা বের হতে পারে না। বরং বাস্তবেই তিনি নিজেকে নিজে সর্বাধিক গোনাহগার ও খারাপ মনে করতেন। এরূপ কেন মনে করতেন? এ কারণে যে, তাঁর নিজের মধ্যে কি কি খারাপ দিক রয়েছে এবং সেগুলোকে কীভাবে সংশোধন করা যায়, তাঁর দৃষ্টি সবসময় সেদিকে নিবদ্ধ ছিলো?

হযরত যুননূন মিসরী রহ.-এর ঘটনা

'রিসালায়ে কুশায়রিয়া'-গ্রন্থে প্রখ্যাত ওলী হযরত যুননূন মিসরী রহ.-এর ঘটনা লিখেছে যে, একবার তিনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। এক নির্বোধ কষ্ট দেওয়ার জন্যে তাঁর পিছু নিলো। তার হাতে একটি লাঠি ছিলো তা দিয়ে সে হযরত যুননূন রহ.-এর মাথায় প্রহার করতে আরম্ভ করলো।

তখন হযরত যুননূন রহ.-এর মুখ দিয়ে প্রথম কথা উচ্চারিত হয়-

اِضْرِبْ رَأْسًا طَالَمَا عَصَى اللهَ

'পেটাও এ মাথাকে। এ মাথা বহুদিন আল্লাহর নাফরমানী করেছে।'[২১০]

মাথায় যে লাঠির বাড়ি পড়ছিলো, তিনি এটাকে নিজ কৃতকর্মে পরিণতি বলে গণ্য করছিলেন।

জনৈক বুযুর্গের ঘটনা

আমি আমার ওয়ালেদ মাজেদের কাছে ঘটনা শুনেছি যে, জনৈক বুযুর্গের মজলিসে লোকজন আসতো এবং তার ওয়াযের প্রশংসা করতো। তাতে তিনি খুব খুশি হতেন। এক মুরীদ একবার বললো, হযরত! এটা তো খুব আজব ব্যাপার যে, মানুষের প্রশংসায় আপনি খুব খুশি হন। বুযুর্গ বললেন, ব্যাপারটা যা মনে করেছো তা নয়। প্রশংসার কারণে মূলত আমি আনন্দ প্রকাশ করি না। বরং আমি চিন্তা করি যে, আল্লাহ তা'আলা কতো মেহেরবান যে, তিনি আমার মতো মানুষের জন্যে তার অন্তরে এমন সুধারণা সৃষ্টি করেছেন! তিনি নিজেকে বাহ্যিকভাবে তুচ্ছও বলেন নি, আবার নিজের প্রশংসার প্রতিবাদও করেননি; বরং অন্তরে আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহের অনুভূতি রয়েছে।

আল্লাহর পছন্দের চিন্তা করো

এক বুযুর্গের সম্পর্কে কিতাবে লিখেছে যে, তিনি কখনো হাসতেন না। চেহারায় কখনো মুচকি হাসিও ফুটে উঠতো না। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, হযরত আপনাকে কখনো হাসতে দেখিনি। তিনি বললেন, জানা তো নেই দুনিয়া ছেড়ে যখন চলে যাবো, তখন আল্লাহর দরবারে আমার কোনো আমল কবুল হবে কিনা। এই আশঙ্কায় আমি হাসি না। চাক্ষুস দর্শীরা বর্ণনা করেছে যে, তাঁর মৃত্যু হওয়ার সাথে সাথে তাঁর চেহারায় মুচকি হাসি ভেসে উঠে। যার দ্বারা বাহ্যত বোঝা যায় যে, তিনি يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ 'হে প্রশান্ত মন! সম্বোধন লাভ করেন।' এজন্যে চিন্তা থাকা উচিত যে, যার জন্যে কাজ করা হচ্ছে তার যেন কাজটি পছন্দ হয়। মানুষের পছন্দ হোক বা না হোক। আল্লাহ তা'আলার এমন মহব্বত জন্মালে ইনশা আল্লাহ সব ধরনের ব্যাধি

---

২১০. হিলয়াতুল-আওলিয়া, খণ্ড: ৭, ৩৮৮; ওয়াফায়াতুল-আ'য়ান, খণ্ড: ১, ৩২; সিফাতুস-সাফওয়ার, ১ খণ্ড, ৪৪৫; আর রিসালাতুল-কুশায়রিয়্যা, ১ খণ্ড, ৭। উল্লেখ্য এসব গ্রন্থের, বর্ণনা অনুযায়ী এটি হযরত যুন-নূন মিসরী রহ.-এর নয়; বরং হযরত ইব্রাহীম ইবন আদহাম রহ.-এর ঘটনা।

থেকে মুক্তি লাভ হবে। আল্লাহর মহব্বত অর্জনের প্রকৃত পন্থা হলো তাঁকে যারা মহব্বত করে তাদের সান্নিধ্যে বসা। তাহলে সেই মহব্বতের আগুনের অল্প উত্তাপ তোমার উপরেও প্রভাব বিস্তার করবে।

সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভী রহ.-কে হযরত থানবী রহ.-এর নসীহত

হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভী রহ. ছিলেন ভারতবর্ষের এক ক্ষণজন্মা মনীষী। বিখ্যাত 'সীরাতুন-নবী' গ্রন্থের রচয়িতা। অসাধারণ মুহাক্কিক ও গবেষক আলেম। রাজনীতিতেও সুবিখ্যাত ছিলেন। তিনি নিজেই তাঁর ঘটনা বর্ণনা করেন যে, আমি যখন ছয় ভলিউমে সীরাতুন নবী লিখে শেষ করলাম, তখন বারবার মনের মধ্যে এই খটকা সৃষ্টি হতে থাকে যে, যেই মহান ব্যক্তিত্বের এই জীবনচরিত আমি লিখলাম তাঁর বাস্তব জীবনের কোনো ছায়া ও প্রতিবিম্ব আমার জীবনে অর্জন হয়েছে কি? যদি না হয়ে থাকে তাহলে কীভাবে তা হতে পারে? এ উদ্দেশ্যে একজন আল্লাহওয়ালার সন্ধান করতে আরম্ভ করলাম। আগেই শুনেছিলাম যে, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. থানাভবনের খানকায় অবস্থান করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফয়েয অনেক বিস্তার ঘটিয়েছেন। সুতরাং থানাভবনের খানকায় হযরত থানবী রহ.-এর খেদমতে চলে গেলাম। তাঁর সঙ্গে ইসলাহী সম্পর্ক কায়েম করলাম। সেখানে কয়েক দিন অবস্থান করলাম। বিদায়কালে আরয করলাম, হযরত! আমাকে কোনো নসীহত করুন। হযরত থানবী রহ. বলেন, আমার চিন্তা হলো এতো বড়ো একজন আল্লামাকে আমি কী নসীহত করবো! তাই আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করলাম, হে আল্লাহ! ইনি এতো বড়ো আলেম। আমাকে নসীহত করতে বলছেন। হে আল্লাহ! এমন কোনো নসীহত আমার অন্তরে দান করুন, যা তার জন্যেও উপকারী হবে এবং আমার পক্ষেও উপকারী হবে। এরপর হযরত থানবী রহ. হযরত সাইয়্যেদ সুলাইমান নদবী রহ.-কে সম্বোধন করে বললেন-

ভাই! আমাদের এ পথের শুরু ও শেষ তো একটাই,
তা হলো নিজেকে মিটিয়ে দেওয়া-আত্মবিলোপ।

হযরত সাইয়্যেদ সুলাইমান ছাহেব রহ. বলেন, হযরত থানবী রহ. একথা বলার সময় নিজের হাত বুকের কাছে নিয়ে এমন এক ঝাঁকুনি দিলেন, মনে হলো যেন আমার অন্তরে ধাক্কা লেগেছে। যার প্রভাবে অজানতেই আমার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে আরম্ভ করলো।

আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী রহ. বলেন, এরপর হযরত সাইয়্যেদ ছাহেব রহ. নিজেকে এমন মেটানোই মিটিয়েছিলেন যার তুলনা খুঁজে পাওয়া কঠিন। এতো বড়ো আলেম হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে একদম ফানা করে দিয়েছিলেন। আমি একদিন দেখলাম, হযরত থানবী রহ.-এর খানকার বাইরে তিনি মজলিসে আগত লোকদের জুতা সোজা করছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরে এমন বিনয় ও বিলোপ সৃষ্টি করে দিয়ে ছিলেন। এর ফলে সারা বিশ্বে তাঁর এমন সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁ মর্যাদা এ পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

ইলমের ভাণ্ডার তো এই বড়ো মিয়াঁর কাছেই আছে

হযরত ডাক্তার আরেফী রহ. বলেন, একবার আমি দেখি যে, হযরত থানবী রহ. নিজ কক্ষে রচনার কাজে মশগুল আছেন, আর হযরত সাইয়্যেদ ছাহেব রহ. দূরে এমন এক জায়গা থেকে একমনে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন, যেখান থেকে হযরত থানবী রহ.-কে তো দেখা যাচ্ছিলো, কিন্তু হযরত থানবী রহ. তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। আমি পিছন থেকে হঠাৎ তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত এখানে কী করছেন? কী দেখছেন? আমার প্রশ্নে তিনি সজাগ হলেন এবং বললেন, কিছু না। আমি পীড়াপীড়ি করতে থাকলে অবশেষে তিনি বললেন, আমি দেখছিলাম, সারা জীবন যেগুলোকে ইলম মনে করেছি সেগুলো তো অজ্ঞতা প্রমাণিত হলো, প্রকৃত ইলম তো এই বড়ো মিয়াঁর কাছেই আছে।

পরবর্তীকালে আল্লাহ তা'আলা হযরত সাইয়্যেদ ছাহেবকে এমন উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন যে, খোদ তাঁর শায়েখ তাঁর সম্পর্কে এই কবিতা বলেন-

از سلیمان گیر اخلاص عمل　　　　داں تو ندوی را منزہ از دغل

'আমলের ইখলাস তুমি সুলায়মানের কাছ থেকে শিক্ষা
গ্রহণ করো। জেনে রেখ এই নদভী সব কলঙ্ক থেকে মুক্ত।'

হযরত থানবী রহ. নিজেই হযরত সাইয়্যেদ ছাহেব রহ. সম্পর্কে এ বয়েতটি রচনা করেন। বস্তুত কিছু হতে হলে আগে নিজেকে মিটাতে হয়, ফানা করতে হয়।

مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے
کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے

'নিজেকে কিছু বানাতে যদি চাও
তবে আগে নিজ আমিত্বের বিলোপ ঘটাও!

জেনে রেখো, বীজ মাটিতে মিশে যাওয়ার পরই
পরিণত হয় ফুল ও ফুলবাগিচায়!'

কোনও শায়েখের হাতে ঘর্ষণ-পেষণ ছাড়া এ জিনিস হাসিল হয় না। এ কারণেই বলা হয়- সাধনা-মুজাহাদা যা করবে শাইখের তত্ত্বাবধানে থেকেই করবে, তবেই তার ফল পাওয়া যাবে।

হাফেয মুহাম্মাদ আহমাদ ছাহেব রহ.-এর ঘটনা

আমাদের বুযুর্গগণ সাধারণত সেলিমশাহী নাগরা (জুতা) ব্যবহার করতেন। হাফেয মুহাম্মাদ আহমাদ রহ. ছিলেন দারুল-উলূম দেওবন্দের মুহতামিম (মহাপরিচালক)। তিনি ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতুবী রহ.-এর সুযোগ্য পুত্র এবং সুবিখ্যাত মুহতামিম হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তায়্যিব ছাহেব রহ.-এর পিতা। সরকারের পক্ষ থেকে সম্মাননাস্বরূপ তাঁকে 'শামসুল ওলামা' উপাধি দেওয়া হয়েছিলো। সেকালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন ছিলো। ব্রিটেনের পক্ষ থেকে যে শাসক নিযুক্ত হতো, তাকে বলা হতো 'ভাইসরয়'। তৎকালীন ভাইসরায় একবার হযরত মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ আহমাদ রহ.-কে দিল্লীতে গভর্ণর হাউসে নিমন্ত্রণ করেন। নিমন্ত্রণ পেয়ে তিনি দিল্লী গমন করেন। তিনি যখন গভর্ণর হাউসে ঢুকতে যাবেন, জেন্টলম্যান দারোয়ান তাকে আটকে দিলো। বললো, আপনি যে জুতা পরে আছেন, তা নিয়ে ভেতরে যেতে পারবেন না। তখন তাঁর পরিধানে ছিলো পাটের রশি দ্বারা তৈরি জুতা। এখন যে সেলিমশাহী নাগরা (জুতা) চালু আছে, এটা তো নরম ও পাতলা হয়ে থাকে; কিন্তু সেই রশির জুতা বেশ মোটা হতো। যাহোক দারোয়ান বললো, ভাইসরয়ের সাথে সাক্ষাত করতে হলে এ জুতা পরে যেতে পারবেন না। বুট জুতা পরে যেতে হবে।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আহমাদ রহ. বললেন, আমি তো নিজে তার সাথে সাক্ষাত করার জন্যে আবেদন করিনি। সাক্ষাত করার কোনও প্রয়োজনও আমার নেই। তিনিই আমাকে সাক্ষাতের জন্যে ডেকেছেন। এখন সাক্ষাতের জন্যে যদি তিনি এই শর্তারোপ করেন যে, আমাকে নিজ পছন্দের জুতা খুলে তার পছন্দের জুতা পরতে হবে, তবে সাক্ষাতের এ দাওয়াত আমি প্রত্যাক্ষান করলাম। আমি অপারগ। আমার পছন্দের পোশাকে তিনি যদি আমার সাথে সাক্ষাত করতে রাজি থাকেন, তবে আমি সাক্ষাতের জন্যে প্রস্তুত আছি। আমার এ কথা তাকে জানিয়ে দাও। আর যদি সাক্ষাত করতে না চান, তবে আমি চলে যাচ্ছি। এ কথা বলে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন।

তাঁর এ কথায় দারোয়ান বেটার দাপট উবে গেলো। এবার সে চিন্তা করলো, ভাইসরয় যদি জানতে পারেন মাওলানা ছাহেব এসেছিলেন; কিন্তু আমার এ কথার কারণে ফিরে চলে গেছেন, তবে আমার খবর আছে। সুতরাং চটজলদি সে ভিতরে গিয়ে সংবাদ পৌছালো যে, মাওলানা ছাহেব এ কথা বলছেন। ভাইসরয় তার উপর খুব রাগ করলো যে, তুমি তাঁর সাথে এমন ব্যবহার করলে কেন? যাও এখনই তাঁকে নিয়ে এসো। সুতরাং তাঁকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হলো।

মাওলানা সুন্নাত হওয়ার বিশ্বাসে এমন জুতা পরতেন, তা নয়। কাজেই এ আপত্তি অবাস্তব যে, এমন জুতা পরা তো ফরয-ওয়াজিব ছিলো না। তখন তা খুলে অন্য জুতা পরলে তো আর হারাম কাজ হতো না। তা সত্ত্বেও তিনি তাতে অনড় থাকলেন কেন?

বস্তুত তিনি বিষয়টাকে গুরুত্বের সাথে নিয়েছিলেন দুই কারণে। এক তো তিনি নিজ বুযুর্গগণকে এরূপ জুতা ব্যবহার করতে দেখেছিলেন। তাই তিনি এক্ষেত্রেও তাদের অনুসরণ করছিলেন। দ্বিতীয়ত একজন আলেমকে দাওয়াত দেওয়ার পর শর্তারোপ করা যে, এমন পোশাক এবং এমন জুতা পরে আসতে হবে, অন্যথায় ঢুকতে দেওয়া হবে না, এটা আলেমের মর্যাদার পরিপন্থী। তাই হযরত মাওলানা এটা মেনে নেননি।

মুফতী আযীযুর রহমান ছাহেব রহ.-এর বিনয়

আমি আমার ওয়ালেদ মাজেদের নিকট থেকে একথা কয়েকবার শুনেছি যে, হযরত মাওলানা মুফতী আযীযুর রহমান ছাহেব রহ.– যাঁর ফতওয়ার দশ ভলিউম 'ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ' নামে ছেপে বের হয়েছে। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের 'মুফতীয়ে আ'যম' ছিলেন। ফতওয়া বিষয়ে আমার ওয়ালেদ মাজেদের উস্তায ছিলেন। তাঁর বাড়ির নিকটে তিন-চার জন বৃদ্ধা মহিলা থাকতেন। তাঁর নিয়ম ছিলো যে, দারুল উলূমে যাওয়ার জন্যে যখন বের হতেন, তখন প্রথমে ঐ বৃদ্ধাদের বাড়িতে যেতেন এবং তাদের জিজ্ঞাসা করতেন যে, বিবি! বাজার থেকে কোনো সদাই আনতে হলে বলো, আমি এনে দিচ্ছি। তখন কোনো মহিলা বলতেন, এতোটুকু ধনে পাতা, এতোটুকু পুদিনা পাতা, এতোটুকু সবজি এবং এতোটুকু টমেটো আনবেন। সব মহিলার কাছে সদাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করে বাজারে যেতেন। বাজার থেকে সদাই ক্রয় করতেন। সব বৃদ্ধার বাড়িতে ঐ সদাই পৌছিয়ে দিতেন। তারপর দারুল উলূমে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। কতক সময় এমনও হতো যে, কোনো মহিলা

বলতেন, মওলবী ছাহেব! আপনি ভুল সদাই এনেছেন। আমি তো অমুক জিনিসের কথা বলেছিলাম আর আপনি অমুক জিনিস নিয়ে এসেছেন, বা বলতো যে, আমি তো এই পরিমাণ আনতে বলেছিলাম আর আপনি এই পরিমাণ এনেছেন। তিনি বলতেন, আচ্ছা বিবি! কোনো সমস্যা নেই, আমি এখনই বাজারে গিয়ে বদলিয়ে আনছি। সুতরাং পুনরায় বাজারে যেতেন এবং ঐ জিনিস বদলিয়ে এনে বিধবার হাতে দিতেন তারপর দারুল উলূমে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। প্রতিদিন এ কাজ করতেন। তাঁর সর্বপ্রথম কাজ ছিলো প্রতিবেশীদের খবর নেওয়া।

এমন ব্যক্তি, যাঁর সুনামের ডঙ্কা বাজছে। এমন ব্যক্তি, যাঁর ফতওয়াকে অথরীটি বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। সারা দুনিয়ার মানুষ তাঁর কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আসছে। কতো মানুষ তাঁর হাত-পা চুম্বন করার জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু তাঁর অবস্থা এই যে, ফতওয়ার কাজ শুরু করার পূর্বে বিধবা মহিলাদের খবর নিচ্ছেন। এসব লোক এমনিতেই বড়ো হননি। আমার ওয়ালেদ মাজেদ বলতেন যে, আল্লাহ তা'আলা এঁদের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বাস্তবতাও ছিলো তাই। ওলামায়ে দেওবন্দের নাম যে আমরা নিয়ে থাকি, তা কেবল এ জন্যে নয় যে, তাঁদের প্রতি আমাদের ভক্তি রয়েছে, বরং বাস্তবতা এই যে, তাঁদের একেক সদস্য সুন্নাতে নববীর জীবন্ত প্রতীক ছিলেন। শুধু নামায-রোযার ব্যাপারে নয়, বরং জীবনের প্রত্যেকটি শাখায় তাঁরা সুন্নাতে নববীর উপর আমলকারী ছিলেন।

তাঁর ইন্তিকালও হয় এমতাবস্থায় যে, হাতে ফতওয়ার কাগজ ধরা ছিলো। তিনি ফতওয়া লিখছিলেন আর জান কবজ হয়ে যায়।

হযরত মাওলানা কাসেম নানতুবী রহ.-এর বিনয়

হযরত মাওলানা কাসেম ছাহেব নানতুবী রহ. দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে লেখা আছে যে, তিনি সবসময় একটি তপন পরিধান করতেন এবং সাধারণ মানের একটি কোর্তা গায়ে দিতেন। কেউ দেখে তাঁকে চিনতেই পারতো না যে, তিনি এতো বড়ো আলেম। যখন মুনাযারা করতে আসতেন তখন বড়ো বড়োদের দাঁত ভেঙ্গে দিতেন। কিন্তু সরলতা ও বিনয়ের অবস্থা এই ছিলো যে, তপন পরে মসজিদ ঝাড়ু দিতেন।

তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন। ইংরেজদের পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি করা হয়। তাঁকে গ্রেফতার করার

জন্যে এক ব্যক্তি আসে। কেউ একজন বলে দেয় যে, তিনি ছাত্তা মসজিদে রয়েছেন। ঐ ব্যক্তি মসজিদে পৌছে দেখলো, এক ব্যক্তি গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরে মসজিদ ঝাড়ু দিচ্ছে। ওয়ারেন্টের কাগজে লেখা ছিলো যে, মাওলানা কাসেম নানতুবীকে গ্রেফতার করবে। এজন্যে যে ব্যক্তি গ্রেফতার করতে এসেছিলো সে মনে করেছিলো, যিনি এতো বড়ো আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তিনি তো জুব্বা-কুব্বা পরিহিত অনেক বড়ো আল্লামা হবেন। সে লোক চিন্তাও করতে পারেনি যে, যে ব্যক্তি মসজিদ ঝাড়ু দিচ্ছে ইনিই মাওলানা কাসেম ছাহেব। সে মনে করেছে, এ ব্যক্তি তো মসজিদের খাদেম। লোকটি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম ছাহেব কোথায়? হযরত মাওলানা কাসেম ছাহেবের জানা ছিলো যে, আমার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি হয়েছে। এজন্যে নিজেকে লুকানো জরুরী ছিলো। ওদিকে মিথ্যাও বলতে চাচ্ছিলেন না। এজন্যে তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখান থেকে এক ধাপ পিছনে সরে এসে উত্তর দিলেন, 'একটু আগেই তিনি এখানে ছিলেন'। লোকটি মনে করলো একটু আগে তো মসজিদে ছিলেন, এখন আর নাই। সুতরাং সে তালাশ করে ফিরে চলে গেলো।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানতুবী রহ. বলতেন, দুই অক্ষর জানার 'দাগ' মুহাম্মাদ কাসেমের নামে যদি না লাগতো, তাহলে দুনিয়া জানতেও পারতো না যে, কাসেমের কোথায় জন্ম হয়েছিলো, আর কোথায় মৃত্যু হয়েছে? এভাবে বিলোপের জীবন অতিবাহিত করেন তিনি।

মাওলানা মুযাফফর হুসাইন ছাহেবের বিনয়

হযরত মাওলানা মুযাফফর হুসাইন ছাহেব কান্ধলভী রহ. একবার কোনো এক জায়গা থেকে কান্ধলায় তাশরীফ আনছিলেন। রেলগাড়ি থেকে কান্ধলার স্টেশনে নেমে দেখেন এক বুড়া মানুষ মাথায় সামানা নিয়ে যাচ্ছে। সামানার চাপে সে চলতে পারছে না। চিন্তা করলেন, বেচারার কষ্ট হচ্ছে। তিনি ঐ বুড়া লোকটাকে বললেন, আপনি অনুমতি দিলে আপনার বোঝা কিছুক্ষণ আমি বহন করি। বৃদ্ধ লোকটি বললো, আপনি যদি একটু বহন করে দেন, তাহলে আপনার অনেক শুকরিয়া। মাওলানা তার সামানা নিজের মাথায় উঠিয়ে শহরের দিকে রওনা হলেন। চলতে চলতে পথের মধ্যে কথা শুরু হলো।

হযরত মাওলানা জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছেন?

বৃদ্ধ লোকটি বললো, কান্ধলায় যাচ্ছি।

মাওলানা জিজ্ঞাসা করলেন, কেন যাচ্ছেন?

লোকটি বললো, শুনেছি সেখানে একজন বড়ো মৌলভী ছাহেব থাকেন তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে যাচ্ছি।

মাওলানা জিজ্ঞাসা করলেন, সেই বড়ো মৌলভী ছাহেব কে?

লোকটি বললো, মাওলানা মুযাফফর হুসাইন ছাহেব কান্ধলভী। আমি শুনেছি, তিনি অনেক বড়ো আলেম।

মাওলানা বললেন, হ্যাঁ সে আরবীটা পড়তে পারে।

এমতাবস্থায় কান্ধলার নিকটে চলে আসলেন। কান্ধলার সকলে মাওলানাকে চিনতো। লোকেরা যখন দেখলো মাওলানা মুযাফফর হুসাইন ছাহেব মাথায় করে সামানা নিয়ে যাচ্ছেন, তখন তারা তাঁর থেকে সামানা নেওয়ার জন্যে এবং তাকে সম্মান করার জন্যে দৌড়ে এলো। তখন ঐ বুড়ো লোকটির জান বের হয়ে যাওয়ার অবস্থা। সে এ কথা চিন্তা করে অস্থির হয়ে পড়লো যে, আমি এতো বড়ো বোঝা হযরত মাওলানার মাথায় চাপিয়ে দিয়েছি! হযরত মাওলানা তাকে বললেন, ভাই এতে পেরেশান হওয়ার কিছু নেই। আমি দেখলাম, আপনার কষ্ট হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলার শোকর যে, তিনি আমাকে এই খেদমতের তাওফীক দিয়েছেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব ছাহেব নানতুবী রহ.-এর বিনয়

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব ছাহেব নানতুবী রহ. দারুল উলূম দেওবন্দের 'সদরে মুদাররিস' (প্রধান শিক্ষক) ছিলেন। অনেক উঁচুমাপের আলেম ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. এক ওয়াযে বলেন, তাঁর নিয়ম ছিলো কোনো ব্যক্তি তাঁর সামনে তাঁর প্রশংসা করলে, তিনি একদম চুপ হয়ে থাকতেন, কিছু বলতেন না। যেমন বর্তমান যুগে কৃত্রিমভাবে বিনয় অবলম্বন করা হয়। আমাদের সামনে আমাদের কেউ প্রশংসা করলে মনে মনে খুব খুশি হই যে, এ ব্যক্তি আমার প্রশংসা করছে এবং মনে মনে নিজেকে অনেক বড়ো মনে করি, কিন্তু সাথে এ কথাও বলি যে, এটা আপনার সুধারণা, নইলে আমি তো এর উপযুক্ত নই ইত্যাদি। এটা মূলত কৃত্রিম বিনয়, প্রকৃত বিনয় নয়। কিন্তু হযরত মাওলানা ইয়াকুব ছাহেব রহ. নীরব থাকতেন। দর্শকরা মনে করতো হযরত নিজের প্রশংসা পেয়ে খুশি হচ্ছেন। নিজের প্রশংসা শুনতে চাচ্ছেন। এ জন্যে প্রশংসা করতে বাধা দিচ্ছেন না এবং তাকে প্রত্যাখান করছেন না। হযরত থানবী রহ. বলেন, এ অবস্থা দেখে দর্শকরা মনে করতো তাঁর মধ্যে বিনয় নেই। অথচ এর নাম

বিনয় নয়, বিনয় তো অন্তরের মধ্যে অবস্থান করে। বিনয়ের আলামত হলো, মানুষ কোনো কাজকে নিজের থেকে নিম্ন মানের মনে করবে না।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব ছাহেব নানতুবী রহ.-এর একটি ঘটনা রয়েছে যে, এক ব্যক্তি তাকে খানার দাওয়াত দিলো। তিনি দাওয়াত কবুল করলেন। লোকটির বাড়ি ছিলো দূরে। কিন্তু সে বাহনের কোনো ব্যবস্থা করলো না। খাবার সময় হলে তিনি পায়ে হেঁটেই রওনা হয়ে গেলেন। মনে এ চিন্তাও জাগলো না যে, সে ব্যক্তি বাহনের ব্যবস্থা করলো না কেন? তার বাহনের ব্যবস্থা করা উচিত ছিলো। যাইহোক, তিনি তার বাড়িতে পৌছলেন। খানা খেলেন। কিছু আম খেলেন। ফেরার পথেও লোকটি কোনো বাহনের ব্যবস্থা করলো না। বরং উল্টা এই জঘণ্য কাজ করলো যে, অনেকগুলো আমের একটি ভারী বোঝা হযরতকে দিয়ে বললো, কিছু আম বাড়ির লোকদের জন্যে নিয়ে যান। লোকটি চিন্তা করলো না যে, এতো দূর যেতে হবে, বাহনেরও কোনো ব্যবস্থা নেই, এতো বড়ো গাট্টি নিয়ে কীভাবে যাবেন? সে ঐ গাট্টি মাওলানাকে দিলো। মাওলানাও গ্রহণ করলেন এবং কাঁধে উঠিয়ে চলতে আরম্ভ করলেন। মাওলানা সারা জীবনেও এতো বড়ো বোঝা বহন করেননি। শাহাজাদাদের মতো জীবন অতিবাহিত করেছেন। তাই কিছুক্ষণ একহাতে নেন, আবার কিছুক্ষণ অন্য হাতে নেন, এভাবে চলছিলেন। অবশেষে যখন দেওবন্দের কাছে এলেন, তখন উভয় হাত ক্লান্ত হয়ে গেলো, না এ হাতে শান্তি, না ও হাতে শান্তি। অবশেষে গাট্টি উঠিয়ে মাথার উপর নিলেন। মাথার উপর নিলে হাতে কিছুটা আরাম বোধ করেন। তখন বলেন, আমিও বিস্ময়কর মানুষ! আগে চিন্তা হয়নি যে, বোঝাটি মাথায় নেই। তাহলে এতো কষ্ট করতে হতো না। মাথার উপর আমের বোঝা নিয়ে মাওলানা দেওবন্দে প্রবেশ করছেন। পথে যার সাথেই সাক্ষাত হতো, সেই তাকে সালাম করতো, মুছাফাহা করতো। তিনি একহাতে বোঝা সামলিয়েছেন, আরেকহাতে মুছাফাহা করছেন। এ অবস্থায় নিজের বাড়িতে পৌছেন। কিন্তু তাঁর মনে সামান্য চিন্তাও জাগেনি যে, এ কাজ আমার মর্যাদার পরিপন্থী। আমার মর্যাদা থেকে নিচু মানের। যাইহোক, মানুষ কোনো কাজকেই কখনো নিজের মর্যাদার চেয়ে নিম্ন মানের মনে করবে না, এটা হলো বিনয়ের আলামত।

বাইযিদ বোস্তামী রহ.-এর আলোচনা

হযরত বাইযিদ বোস্তামী রহ. অনেক উঁচুমার্গের বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, তাঁর মৃত্যুর পরে এক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখলো। লোকটি

জিজ্ঞাসা করলো, হযরত! আল্লাহ তা'আলা আপনার সঙ্গে কী আচরণ করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমার সঙ্গে খুব বিস্ময়কর আচরণ করা হয়েছে। আমি যখন এখানে পৌছলাম তখন আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করলেন, কী আমল এনেছো? আমি চিন্তা করলাম, কী উত্তর দিবো? আমার কোন আমল পেশ করবো? কারণ পেশ করার মতো কোনো আমলই ছিলো না। এজন্যে আমি জবাব দিলাম, হে আল্লাহ! কিছুই আনিনি। খালি হাতে এসেছি। আপনার দয়া ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই নেই। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তুমি তো বড়ো বড়ো আমল করেছো। কিন্তু তোমার একটা আমল আমার কাছে খুব পছন্দ হয়েছে। সেই আমলের বরকতে আমি তোমাকে মাফ করে দিচ্ছি। সেই আমলটি ছিলো এই যে, একরাতে তুমি উঠে দেখলে একটি বিড়ালের বাচ্চা শীতে কাঁপছে। তুমি তার প্রতি দয়া দেখালে। বাচ্চাটিকে তোমার লেপের মধ্যে জায়গা দিলে। তার কষ্ট দূর করলে। বিড়ালের বাচ্চা সারারাত আরামে কাটালো। তুমি ইখলাসের সাথে এই আমলটি করেছিলে। আমার সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া এর পিছনে আর কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না। তোমার এই আমল আমার এতো পছন্দ হয়েছে যে, এর বদৌলতে আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম।

হযরত বাইযিদ বোস্তামী রহ. বলেন, দুনিয়াতে অনেক ইলম ও মারেফাত হাসিল করেছিলাম। তা কোনো কাজে আসলো না। সেখানে একটি মাত্র আমল পছন্দ হলো, আর তা হলো মাখলুকের সঙ্গে সদাচরণ।

একটি ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় ঘটনা

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা স্মরণ হলো, একজন কৃতদাস বিদ্রোহ করে মনিবকে হত্যা করে নিজে বাদশাহ হলো। দীর্ঘদিন পর্যন্ত সে বাদশাহ থাকলো। তার অনেক সন্তান হলো। তারা হলো শাহজাদা। কিন্তু বাস্তবে তো সে ছিলো বাদশাহর গোলাম। একবার সেই গোলাম বাদশাহ শাইখ ইয্যুদ্দীন আব্দুস সালাম রহ.-কে তার রাজদরবারে ডাকলো। তিনি ছিলেন আল্লাহর ওলী এবং ঐ শতকের মুজাদ্দিদ। সেই গোলাম বাদশাহ তাকে ডেকে বললো, আমি আপনাকে বিচারপতি বানাতে চাই। শাইখ উত্তর দিলেন, একজন প্রকৃত খলীফাই কেবল বিচারপতি নিয়োগ দিতে পারেন, আপনি তো প্রকৃত খলীফা নন। আপনি তো গোলাম। আপনি আপনার মনিবকে হত্যা করে নিজে বাদশাহ হয়েছেন। আপনার মালিকানায় অনেক জমিন রেখেছেন। অথচ আপনি মালিক হতে পারেন না। কারণ গোলামের মধ্যে মালিক হওয়ার

যোগ্যতা নেই। এ কারণে আপনি আপনার অবস্থা সংশোধন না করা পর্যন্ত আমি আপনার দেওয়া কোনো পদবি গ্রহণ করবো না।

সে যুগে মানুষের মধ্যে কিছু হলেও ভালো গুণ ছিলো। নিজের মনিবকে হত্যা করার অপরাধ করলেও বাদশার অন্তরে কিছুটা আল্লাহর ভয় ছিলো। আল্লাহওয়ালাদের বলার ঢংয়েও অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি হয়। বাদশা বললো, আপনি তো সঠিক কথা বলেছেন। বাস্তবেই আমি গোলাম। কিন্তু আমাকে এমন কোনো পথ বলে দিন, যার মাধ্যমে আমি এই গোলামী থেকে বের হয়ে আসতে পারি। শাইখ বললেন, এর ব্যবস্থা এই হতে পারে যে, আপনাকে এবং আপনার সব সন্তানকে বাজারে নিয়ে বিক্রি করা হবে। আপনাদেরকে বিক্রি করে যেই মূল্য পাওয়া যাবে তা আপনাদের মৃত মনিবের ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি আপনাদেরকে কিনবে সে আপনাদেরকে মুক্ত করে দিবে। তাহলে আপনারা স্বাধীন হতে পারবেন। এবার লক্ষ্য করুন! বাদশাকে বলা হচ্ছে, আপনাকে এবং আপনার সন্তানদেরকে বাজারে নিয়ে বিক্রি করা হবে। দরদাম করা হবে। নিলাম করা হবে। তারপর আপনার বাদশাহী দুরুস্ত হবে। কিন্তু যেহেতু অন্তরে আল্লাহর ভয় এবং আখেরাতের ফিকির ছিলো, এ কারণে বাদশা তাতে রাজি হয়ে গেলেন।

ইতিহাসের এক বিরল ঘটনা এটি। বাদশাহ এবং শাহাজাদাদেরকে বাজারে তুলে নিলাম করা হলো। দাম হাঁকা হলো। এক ব্যক্তি তাদেরকে খরিদ করে বিনিময় দিয়ে তাদেরকে মুক্ত করে দিলো। তখন বাদশার বাদশাহী সঠিক হলো। আমাদের ইতিহাসে এমন সব দৃষ্টান্ত রয়েছে, যা দুনিয়ার অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। মোটকথা, যেভাবে একজন কৃতদাস সিংহাসনে বসেও বুঝে যে, আমি কৃতদাস। একইভাবে যখন তুমি কোনো পদে অধিষ্ঠিত হয়েও মনে করবে যে, আমি আল্লাহর বান্দা, তাহলে কখনোই পদে বসে অন্যের উপর জুলুম করতে পারবে না।

এক কাঠুরিয়ার গল্প

মসনবীতে মাওলানা রূমী রহ. একটি গল্প লিখেছেন। এক কাঠুরিয়া জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কেটে এনে বাজারে বিক্রি করতো। একবার সে কাঠ কেটে আনলো। কাঠের সাথে একটি বড়ো সাপও পেঁচিয়ে আসলো। সে বুঝতেই পারলো না। বাড়িতে পৌছে কাঠুরিয়া দেখতে পেলো যে, একটি সাপও এসেছে। তবে সাপটি মৃত বলে মনে হচ্ছে। এ জন্যে কাঠুরিয়া তার দিকে

তেমন ভ্রুক্ষেপ করলো না। ঘরের মধ্যেই ফেলে রাখলো। বাইরে বের করে দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলো না। কিন্তু তাপ পেয়ে সাপটি নড়াচড়া শুরু করলো এবং চলতে আরম্ভ করলো। কাঠুরিয়া নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ছিলো। সাপটি গিয়ে তাকে দংশন করলো। এবার বাড়ির লোকেরা চিন্তায় পড়ে গেলো যে, সাপটি তো মৃত ছিলো। কীভাবে তা জীবিত হয়ে তাকে দংশন করলো?

এ ঘটনা বর্ণনা করে মাওলানা রূমী রহ. বলেন, মানুষের নফসের অবস্থাও অনুরূপ। যখন মানুষ কোনো আল্লাহওয়ালার সোহবতে অবস্থান করে রিয়াযত সাধনা করে। তখন তার নফস দুর্বল হয়ে যায়, মনে হয় যেন মরে গিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা মরে না। মানুষ তার ব্যাপারে গাফেল হলে যে কোনো সময় তাজা হয়ে দংশন করবে। তাই মাওলানা রূমী রহ. বলেন,

نفس اژدہاست مردہ است
از غم بے آلتی افسردہ است

অর্থাৎ, মানুষের নফস অজগরের মতো, যা এখনো মরেনি। মুজাহাদা ও সাধনার আঘাত তার উপর পড়ার কারণে সে নির্জীব হয়ে আছে। যে কোনো সময় তাজা হয়ে সে দংশন করতে পারে। এজন্যে কোনো মুহূর্তেই নফস থেকে গাফেল হওয়া যাবে না।

রাতে ঘুমানোর পূর্বে তাওবা করে নাও!

আমাদের বুযুর্গ হযরত বাবা নাজম আহসান ছাহেব রহ. তাওবার ব্যাপারে খুব জোর দিতেন। একদিন আমি তাঁর কাছে গেলাম। সে সময় এক যুবক কোনো এক কাজে তাঁর কাছে এসেছিলো। ঐ যুবকের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দ্বীনদারীর কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিলো না। হযরত বাবা ছাহেব রহ.-এর নিয়ম এই ছিলো যে, কোনো ব্যক্তি তাঁর কাছে যে কোনো উদ্দেশ্যেই আসুক না কেন তিনি দ্বীনের কোনো না কোনো কথা তাকে শুনিয়ে দিতেন। সে মতে ঐ যুবক যখন ফিরে যেতে চাইলো তখন তিনি তাকে বললেন,

'বেটা! একটি কথা শুনে যাও, মানুষ দ্বীনকে খুব মুশকিল মনে করে। তারা মনে করে যে, দ্বীনের উপর আমল করা খুব কঠিন। আরে কিচ্ছু কঠিন না। শুধুমাত্র রাতে ঘুমানোর পূর্বে অল্প সময় বসে আল্লাহর কাছে তাওবা করবে।'

সে ছিলো একজন যুবক। নামায, রোযা কিছুই করতো না। কিন্তু হযরত তার কানে এ কথাটি পৌঁছিয়ে দিলেন যে, শুধু তাওবা করবে।

একটি বিরল-বিস্ময়কর ঘটনা

হাফেয ইবনে কাছীর রহ. 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' কিতাবে একটি বিরল-বিস্ময়কর সত্য ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত তুর্কিস্তানে তিনজন বুযুর্গ বাস করতেন। তিন জনের নামই ছিলো মুহাম্মাদ। একজন হলেন মুহাম্মাদ ইবনে জারীর তবারী রহ.। 'তাফসীরে ইবনে জারীর' নামে তাঁর তাফসীর গ্রন্থ বিখ্যাত। দ্বিতীয় জন মুহাম্মাদ ইবনে খুযাইমা রহ.। তিনি অনেক বড়ো মুহাদ্দিস ছিলেন। 'সহীফায়ে ইবনে খুযাইমা' নামে তাঁর বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ রয়েছে। তৃতীয় জন মুহাম্মাদ ইবনে নাস্‌র আলমারওয়াযী রহ.। তিনিও অনেক বড়ো মুহাদ্দিস ছিলেন। 'কিয়ামুল লাইল' নামে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ রয়েছে।

প্রথম দিকে তাঁরা নিজ শহরে অবস্থান করে ইলম অর্জন করেন। তাঁরা শুনতে পেয়েছিলেন যে, বড়ো বড়ো আলেম, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও মুফাসসির ইরাকের বাগদাদ নগরীতে বসবাস করেন। সুতরাং তাদের থেকে জ্ঞান অর্জন করার আগ্রহ সৃষ্টি হলো। কিন্তু কোথায় তুর্কিস্তান আর কোথায় বাগদাদ ও ইরাক! অবশেষে যৎ সামান্য পাথেয় নিয়ে বাগদাদের উদ্দেশ্যে তাঁরা যাত্রা করেন। তখন তো উড়োজাহাজ ও রেলগাড়ির যুগ ছিলো না যে, এতো দীর্ঘ সফর সহজে অতিক্রম করবেন। আল্লাহ ভালো জানেন, ঘোড়া বা উটে আরোহণ করে কিংবা পায়ে হেঁটে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছেন। কয়েক মাসের পথ অতিক্রম করার পর যখন তাঁরা বাগদাদ পৌছেন তখন পথসম্বল সব শেষ হয়ে গিয়েছে। খাওয়ার জন্যে একটি দানাও বিদ্যমান নেই। উপরন্তু বাগদাদে জানাশোনা কেউ ছিলো না যে, তার কাছে গিয়ে অবস্থান করবেন। যাইহোক, শহরের প্রান্তে একটি মসজিদ ছিলো, তারা সেই মসজিদে গিয়ে অবস্থান করেন। পরস্পরে পরামর্শ করেন। পথসম্বল তো শেষ, সামনে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে কিছু পানাহারের ব্যবস্থা করা উচিত। এজন্যে কোথাও মজদুর খেটে কিছু পয়সা উপার্জন করা দরকার। যাতে পানাহার সামগ্রী সংগ্রহ করা যায়। তারপর কোনো আলেমের নিকট গিয়ে ইলম অর্জন করবেন। সুতরাং তাঁরা মজদুরীর তালাশে বের হলেন। কিন্তু কোথাও মজদুরী পেলেন না। সারাদিন ঘুরে ফিরে এলেন। এভাবে তিনদিন উপবাসে কেটে গেলো, কিন্তু কোনো কাজ পাওয়া গেলো না। অবশেষে তাঁরা তিনজন পরামর্শ করলেন। এখন তো অবস্থা এমন বেগতিক হয়েছে যে, এখন যদি খাওয়ার মতো কিছু পাওয়া না যায় তাহলে প্রাণনাশের আশঙ্কা রয়েছে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা অন্যের কাছে চাওয়াকে জায়েয করেছেন। তাই

এখন অন্যের কাছে চাওয়া ছাড়া এবং কারো নিকট নিজেদের অবস্থা বর্ণনা করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু এই তিন বুযুর্গের কেউ সারাজীবনে কখনো এমন কাজ করেননি। তাই তাঁরা বললেন, যে কোনো একজন গিয়ে এ কাজ করুক। তখন প্রশ্ন জাগলো, কে এ কাজ করবে? তাঁরা লটারী করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এতে মুহাম্মাদ ইবনে জারীর তবারী রহ.-এর নাম বের হলো। মুহাম্মাদ ইবনে জারীর তবারী রহ. বললেন, লটারীতে যেহেতু আমার নাম বের হয়েছে তাই আমাকেই তো যেতে হবে, তবে যাওয়ার পূর্বে দু' রাকাত নফল নামায পড়ার সুযোগ দিন। সাথীরা অনুমতি দিলো।

মুহাম্মাদ ইবনে জারীর রহ. ওযু করে দু' রাকাত নফল নামাযের নিয়ত করলেন। নামায পড়ার পর আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! এই হাত আজ পর্যন্ত আপনার দরবার ছাড়া অন্য কারো সামনে প্রসারিত হয়নি। আজ চরম অপারগ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। তবে আপনি যদি মেহেরবানী করে কোনো পথ বের করে দেন তাহলে এই হাত অন্য কারো সামনে পাততে হবে না। আপনি তো সর্ব বিষয়ে সক্ষম।' না জানি তাঁর দু'আর মধ্যে কী প্রভাব ছিলো যে, তিনি তখনো দু'আ করছেন এমন সময় মসজিদের দরজায় এক ব্যক্তিকে একটি খাঞ্চা হাতে দাঁড়ানো দেখা গেলো। সে এই তিন বুযুর্গের নাম নিয়ে তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করছে। তাঁরা খুবই অবাক হলেন যে, পুরো বাগদাদে আমাদেরকে চেনার মতো কেউ নেই। আমরা তো ভিনদেশী মুসাফির। যাইহোক, লোকটি বললো, বাগদাদ নগরীর শাসক আপনাদের জন্যে এই খাবার পাঠিয়েছেন। তাঁরা বললেন, খাবার তো পরে নিবো, আগে বলো বাগদাদের শাষকের সাথে আমাদের কী সম্পর্ক? বাগদাদ শহরে তো আমাদের জানাশোনা কেউ নেই। আমাদেরকে কেউ চেনে না। খবর নিয়ে জানা গেলো, আজ রাতে বাগদাদের শাসক ঘুমের মধ্যে স্বপ্নযোগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত লাভ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি বাগদাদের কেমন শাসক? তোমার শহরে আমার তিনজন মেহমান তিনদিন ধরে উপবাস করছেন, অথচ তাদের পানাহারের কোনো ব্যবস্থা নেই। তারপর স্বপ্নেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের পুরো ঠিকানা বলে দিলেন যে, বাগদাদের অমুক মসজিদে তারা তিনজন অবস্থান করছেন। তাদের একজনের নাম মুহাম্মাদ ইবনে জারীর, দ্বিতীয় জনের নাম মুহাম্মাদ ইবনে খুযাইমা এবং তৃতীয় জনের নাম মুহাম্মাদ ইবনে নাসূর। বাগদাদের শাসক ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে সর্বপ্রথম

আমাকে এই খাবার দিয়ে আপনাদের খেদমতে পাঠিয়েছেন। তো দু'আ শেষ হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা এ ব্যবস্থা করে দিলেন।[২১১]

আসল কথা হলো, আল্লাহর দরবারে কেবল চাইতে দেরি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা চাইতেও জানি না। চাইতে জানলে আল্লাহ তা'আলা দান করেন। আমাদের হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ. এই কবিতা পাঠ করতেন।

کوئی جو ناشناس ادا ہو تو کیا علاج؟
ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں

'কেউ চাইতে না জানলে তার কী সমাধান?
তাঁর দানে তো কোনো কমতি নেই।'

হযরত আবু তালহা রাযি.-এর বদান্যতা

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۬

'তোমরা কিছুতেই পুণ্যের স্তরে উপনীত হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু হতে (আল্লাহর জন্যে) ব্যয় করবে।'[২১২] আয়াতটি নাযেল হওয়ার পর হযরত আবু তালহা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মালিকানাভুক্ত সমস্ত জিনিসের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ঐ বাগানটি, যার মধ্যে একটি কুয়া রয়েছে। যার পানি অত্যন্ত মিষ্টি। তাতে প্রচুর পরিমাণ পানি রয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় সেখানে তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং পানি পান করতেন। তিনি বললেন, ঐ বাগানটি আমার সবচেয়ে প্রিয়। আর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۬

'তোমরা কিছুতেই পুণ্যের স্তরে উপনীত হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু হতে (আল্লাহর জন্যে) ব্যয় করবে।'[২১৩]

---

২১১. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২৭০; তাযকিরাতুর হুফ্ফায, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৭৫৩

২১২. সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯২

২১৩. সূরা আল ইমরান, আয়াত: ৯২

এজন্যে আমি তা দান করতে চাই। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

بَخٍ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ

'বাহ বাহ! এতো অনেক লাভজনক সম্পদ।'

তারপর তিনি পরামর্শ দিলেন, নিজের নিকটাত্মীয়দের মধ্যে এটা দান করে দাও। সুতরাং তিনি নিজের নিকটাত্মীয়দের মধ্যে তা দান করে দিলেন। তাদের মধ্যে হযরত সালমান ফারসী রাযি. এবং হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযি. প্রমূখও ছিলেন।[২১৪]

ঔষধও প্রভাব সৃষ্টির জন্যে অনুমতি চেয়ে থাকে

আমাদের একজন সম্মানিত ডাক্তার ছিলেন সগীর আহমাদ হাশেমী। তিনি হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-এর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন। অত্যন্ত অভিজ্ঞ ডাক্তার তিনি। একদিন আমি তাকে বলতে শুনি যে, আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা এই যে, ঔষধ যখন রোগীর গলার মধ্যে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলার কাছে জিজ্ঞাসা করে, কী প্রভাব সৃষ্টি করবো, উপকার না অপকার? তারপর সেখান থেকে যে ইশারা পায়, সে অনুপাতে কাজ করে। এই বুযুর্গই আমাকে শুনিয়েছিলেন যে, একসময় আমি লাহোরের গঙ্গারাম হাসপাতালের ইনচার্জ ছিলাম। একবার আমি রাতের বেলা হাসপাতালে গেলাম। সেখান থেকে ফেরার সময় উপস্থিত কর্মচারীকে বললাম, ছয় নম্বর বেডের রোগীর উপর আমি সমস্ত ব্যবস্থা প্রয়োগ করেছি। তার বাঁচার কোনো আশা নেই। এখন সে দু'-এক ঘণ্টার মেহমান। তার মৃত্যু হয়ে গেলে তার আত্মীয়-স্বজনকে খবর দিবে। আর বারো নম্বর বেডের রোগী সুস্থ হয়ে গিয়েছে। সকাল বেলা তাকে ছেড়ে দিবে। আজ সকালে আসতে আমার দেরী হবে। আমি পরের দিন সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম, ছয় নম্বর বেডের রোগী সুস্থ হয়ে বাড়িতে চলে গেছে, আর বারো নম্বর বেডের রোগী মৃত্যু বরণ করেছে। বোঝা গেলো, ঔষধ আল্লাহ তা'আলার কাছে অনুমতি চায়, তারপর প্রভাব দেখায়।

---

২১৪. সহীহ বোখারী, হাদীস নং- ৪১৮৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ১৬৬৪; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ১১৯৮৫

এক গ্রাম্য হিন্দু ও আমাদের দৃষ্টান্ত

আমার ওয়ালেদ মাজেদ রহ. দৃষ্টান্ত স্বরূপ শোনাতেন যে, একজন গ্রাম্য হিন্দু ছিলো। হিন্দুস্থানে নতুন নতুন রেলগাড়ি চালু হলে সে দেখলো যে, পুরো শহর একা একাই দৌড়ে চলছে। তার বড়ো বিস্ময় জাগলো, ব্যাপার কী! সে অবাক হয়ে মানুষকে জিজ্ঞাসা করলো, পুরো শহর নিজে নিজে কীভাবে চলছে? তখন এক ব্যক্তি বললো, ভাই এই গাড়ি নিজে নিজে চলছে না, বরং গার্ড যখন সবুজ পতাকা নাড়ে তখন গাড়ি চলে। বিধায় গাড়িচালক তো আসলে সবুজ পতাকা। একথা শুনে সে ব্যক্তি সবুজ পতাকাকে অত্যন্ত সম্মানিত মনে করলো এবং গিয়ে তাকে সম্মান করতে আরম্ভ করলো। লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করলো, এ কি করছো? সে বললো, এই সবুজ পতাকার অনেক ক্ষমতা। এতো বড়ো রেলগাড়ি সে চালিয়ে থাকে। লোকেরা বললো, মূলত এটা গার্ডের একহাতের যোগ্যতা। যেই হাতে সে এই পতাকা ধারণ করে আছে। এজন্যে আসল তো হলো ঐ গার্ড, সবুজ পতাকা কিছুই নয়। তখন সে গার্ডের কাছে গিয়ে তার প্রশংসা করতে আরম্ভ করলো। আপনি তো অনেক শক্তিশালী মানুষ। কারণ আপনার বদৌলতেই এই পুরো গাড়ি চলছে। সে বললো, আমি তো এতো বড়ো শক্তিশালী মানুষ নই যে গাড়ি চলাতে পারি। আসল তো হলো ড্রাইভার, যে সবার আগে বসা আছে, সে গাড়ি চালিয়ে থাকে। তখন ঐ ব্যক্তি ড্রাইভারের কাছে গিয়ে বললো, আপনি অত্যন্ত শক্তিশালী মানুষ, এতো বড়ো গাড়ি আপনি চালান। তখন সে বললো, ভাই! আমি তো শক্তিশালী মানুষ নই, এই যে কতগুলো কলকব্জা দেখছো, এর দ্বারা গাড়ি চলে এবং এ সব কলকব্জাও কিছু না, বরং এর পিছনে বাষ্প রয়েছে। বাষ্পের শক্তি একে চালিয়ে থাকে। গ্রাম্য লোকটি এ পর্যায়ে এসে থেমে গেলো। সে বুঝতে পারলো গাড়ি কে চালায়? কিন্তু যদি চিন্তাভাবনা করার যোগ্যতা থাকতো, তাহলে বুঝতে পারতো বাষ্পের মধ্যেও কোনো শক্তি নেই। এর মধ্যে শক্তি সৃষ্টিকারী অন্য কোনো সত্তা আছেন। আমাদের অবস্থাও একই রকম। কখনো ঐ গ্রাম্য ব্যক্তির মতো সবুজ পতাকার উপর ভরসা করি, কখনো গার্ডের উপর, কখনো ড্রাইভারের উপর, আর কখনো বাষ্পের উপর। কিন্তু আরো সম্মুখে সবচেয়ে বড়ো শক্তি যার তার দিকে মনোযোগ যায় না। যে কারণে তাওয়াক্কুল থেকে আমরা বঞ্চিত হই। তাওয়াক্কুল হলো, প্রত্যেক বিষয়ে মানুষ এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে যে, কোনো কিছুর মধ্যে কোনো শক্তি নেই, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই এ কাজ করছেন।

তাওয়াক্কুল সংক্রান্ত একটি ঘটনা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী রহ. একটি ঘটনা লিখেছেন যে, এক ব্যক্তি শুনলো যে, আল্লাহর কতক দৃঢ়সংকল্প বান্দা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে বসে থাকে। এর ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে অস্বাভাবিক উপায়ে বিভিন্ন নি'আমতে ভূষিত করেন। কিছু বিলম্বে হলেও তারা স্বচ্ছল জীবন যাপন করেন। সে ব্যক্তিও এরূপ করার ইচ্ছা করলো। জঙ্গলে গিয়ে বসে পড়লো। একদিন দুইদিন এমনকি তিনদিন অতিবাহিত হয়ে গেলো। উপবাসের পর উপবাস চলছে। কেউ আসছে না। তখন বিভিন্ন রকম চিন্তা মনে জাগ্রত হচ্ছে। তৃতীয় দিন অতিবাহিত হলে সে দেখলো যে, এক ব্যক্তি খাঞ্চা সাজিয়ে নিয়ে আসছে। তখন তার প্রাণে পানি আসলো যে, এখন কাজ হয়েছে। কিন্তু লোকটি সেখানে এসে তার দিকে পিছন ফিরে খাবার খেতে আরম্ভ করলো। এতক্ষণ তো এ ব্যক্তি মনে করছিলো যে, আমার জন্যে খানা নিয়ে আসছে। কিন্তু খানা এনে লোকটি নিজেই খেতে আরম্ভ করলো। কিছু সময় তো সে দেখতে থাকলো। তারপর আর সহ্য করতে না পেরে নিজের উপস্থিতি বোঝানোর জন্যে গলা খাঁকারি দিতে লাগলো। সুতরাং লোকটি তার দিকে ঘুরে তাকে দেখতে পেয়ে বললো, আসুন আপনিও খানা খান। তখন সেও খেতে আরম্ভ করলো। পরবর্তীতে তার সঙ্গে এক ব্যক্তির দেখা হলো। তখন সে বলতে লাগলো, আমি তো শুনেছিলাম তাওয়াক্কুল করলে আল্লাহ তা'আলা কোথাও না কোথাও থেকে খানার ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা হলো, এমনটি হয়ে থাকে ঠিক তবে কিছুটা গলা খাঁকারি দিতে হয়ে। হযরত থানবী রহ. বলেন, মেহনত মজদুরী করে খাওয়া এমন তাওয়াক্কুলের চেয়ে হাজার গুণ উত্তম। যেই তাওয়াক্কুলে গলা খাঁকারি দিতে হয় সেই তাওয়াক্কুল থেকে আল্লাহ রক্ষা করুন।

সুন্নাতের উপর আমলকারী ব্যক্তিই নৈকট্যপ্রাপ্ত

হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযি. একজন বিখ্যাত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যাধিক প্রিয় সাহাবী ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অনেক সময় নিজের মনের কথাও বলতেন এবং কখনো কখনো ধমকও দিতেন।

আনুমানিক নবম হিজরীর ঘটনা। দ্বীনী প্রয়োজনে তাঁকে ইয়েমেন পাঠাতে হয়। ইয়েমেন তখন বিজিত হয়েছিলো। সেখানে এমন কোনো শাসক

পাঠানোর প্রয়োজন পড়ে, যিনি শাসনকার্যও চালাবেন এবং মানুষকে তা'লীম-তারবিয়াতের দায়িত্বও পালন করবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্বাচনী দৃষ্টি হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযি.-এর উপর নিবদ্ধ হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, তুমি ইয়েমেন চলে যাও। তিনি তাঁকে মদীনা শরীফ থেকে এমন সম্মানের সাথে বিদায় দিলেন যে, হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযি. ঘোড়ায় আরোহণ করা ছিলেন, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে হেঁটে চলছিলেন। তাঁকে বিদায় জানানোর জন্যে তিনি অনেক দূর পর্যন্ত সাথে সাথে যান। তখন ওহীর মাধ্যমে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পেরেছিলেন যে, এই দুনিয়ায় আমার অবস্থান হবে আর অল্প কিছু দিন। ওদিকে হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযি.-এর দ্রুত ফিরে আসার সম্ভাবনা ছিলো না। তাই তিনি যেতে যেতে হযরত মুআয রাযি.-কে বললেন, হে মুআয! হয়তো বা এটি আমার আর তোমার শেষ সাক্ষাত। এরপর তুমি আর আমাকে দেখতে পাবে না। হযরত মুআয রাযি.-এর মতো নিবেদিত প্রাণ সাবাহী এতক্ষণ পর্যন্ত অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করছিলেন। কিন্তু যখন একথা শুনলেন, হে মুআয! আজকের পর হয়তো তুমি আর আমাকে দেখতে পাবে না। তখন ভিতরের দুঃখ ও বেদনার লাভা একসঙ্গে ফেটে পড়ে। হযরত মুআয রাযি.-এর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে আরম্ভ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখেও অশ্রু চলে আসে। তিনি জনপদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলেন, হে মুআয! যদিও তুমি আমার থেকে দূরে চলে যাচ্ছো, কিন্তু মনে রাখবে, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতের উপর আমল করবে, বাহ্যিকভাবে সে দূরে অবস্থান করলেও সবসময় সে আমার কাছে থাকবে। আর যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতের উপর আমল করবে না, সে বাহ্যিকভাবে যতো কাছেই থাকুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে সে আমার থেকে দূরে।[২১৫]

আমার ওয়ালেদ মাজেদ রহ. যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা শরীফে হাজির হতেন, তখন সাধারণত তিনি রওজা শরীফের জালির সামনে কিছু দূরে যেই খুঁটি রয়েছে, তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেন। জালির নিকটে যেতেন না। একদিন তিনি বললেন, একবার আমার চিন্তা জাগলো, তোমার অন্তর এতো শক্ত, সবাই তো জালির কাছে গিয়ে বসে, আর তুমি সম্মুখে অগ্রসর হতে পারো না। পিছনে থেকে যাও। তখন অনুভূত হলো, যেন রওজা শরীফ থেকে আওয়াজ আসছে, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতের উপর

২১৫. মুখতাসর তারীখে দেমাশক, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৩১১

আমল করে সে আমার নিকটবর্তী, বাহ্যিকভাবে সে যতো দূরেই অবস্থান করুক না কেন। আর যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতের উপর আমল করে না, সে আমার থেকে দূরে বাহ্যিকভাবে সে রওজার জালি জড়িয়ে থাকলেও।

সারকথা হলো, একজন ঈমানদারের জীবনের উদ্দেশ্য হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের উপর আমল করে আল্লাহ তা'আলার সুন্তুষ্টি লাভ করা।

نہ تو ہے ہجر ہی اچھا، نہ وصال اچھا ہے
یار جس حال میں رکھے، وہی حال اچھا ہے

'না বিচ্ছেদ উত্তম, না মিলন,
বন্ধু যে অবস্থায় রাখেন, তাই উত্তম।'

এক বুযুর্গ এবং এক মহিলার বাসনা

হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. তাঁর এক ওয়াযের মধ্যে ইরশাদ করেন, এক বুযুর্গকে আল্লাহ তা'আলা অনেক ধন-সম্পদ দিয়েছিলেন। তাকে উঁচু মানের বুযুর্গও মনে করা হতো। শেষজীবনে তিনি চিন্তা করলেন, মদীনা শরীফ চলে যাই, যাতে সেখানে মৃত্যু হয় এবং জান্নাতুল বাকীর মাটি নসীব হয়। সুতরাং তিনি সেখানে গিয়ে বসবাস শুরু করলেন। সেখানে তার মৃত্যু হলো। জান্নাতুল বাকীতে তাকে দাফন করা হলো। বাহ্যিকভাবে তার আশা পুরা হলো। কিছুদিন পর কোনো এক কারণে তার কবর খনন করার প্রয়োজন দেখা দিলো। তার কবর খনন করা হলে দেখা গেলো, ঐ বুযুর্গ সেখানে নেই। তার জায়গায় এক ইউরোপীয়ান মহিলা রয়েছে। লোকেরা খুব অবাক হলো। পেরেশান হলো। এ সংবাদ শুনে সেখানে অনেক লোক সমবেত হলো। তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিলো, যে কিছুদিন ফ্রান্সে অবস্থান করে এসেছে। সে বললো, আমি তো এই মহিলাকে চিনি। এই মহিলা প্যারিসে ছিলো। মুসলমান হয়েছিলো। লোকেরা বললো, আমরা তো এখানে অমুক বুযুর্গকে দাফন করেছিলাম। এ মহিলা এখানে কীভাবে এলো? পরে বিষয়টি যাচাই করা হলো। লোকেরা তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলো যে, বিশেষ কোনো কারণ আছে কি, যার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে এখানে দাফন হওয়ার ফযীলত থেকে বঞ্চিত করলেন? স্ত্রী বললো, এমনিতে তিনি বুযুর্গ মানুষ ছিলেন। তবে কখনো কখনো তিনি বলতেন, ইসলামের সব বিষয় তো

অত্যন্ত সুন্দর, কিন্তু ফরয গোসলের নিয়মটি বড়ো কঠিন। খ্রিস্টধর্মে এ বিষয়টি ভালো, তাতে ফরয গোসলের বিধান নেই। পক্ষান্তরে ঐ মহিলার বিষয়ে সেই লোকটি বললো, মুসলমান হওয়ার পর এই মহিলার মনে বড়ো বাসনা ছিলো, হায় কোনো উপায়ে যদি আমি মদীনায় গিয়ে মৃত্যু বরণ করতে পারতাম, আর জান্নাতুল বাকীতে আমার কবর হতো! তাই আল্লাহ তা'আলা কবরস্থ হওয়ার পর এই মহিলার বাসনাকে এভাবে পূর্ণ করেছেন যে, তাকে মাটির ভিতর দিয়ে জান্নাতুল বাকীতে স্থানান্তরিত করে দিয়েছেন।

তাই নেক আমলের তাওফীক হলে সে জন্যে আল্লাহর শোকর আদায় করুন। আর কোনো নেক আমল করতে না পারলে কমপক্ষে মনে মনে নিয়ত রাখুন, আমার যদি সুযোগ হয় তাহলে আমি এ কাজ করবো। তাহলে আল্লাহ তা'আলা ভূষিত করতে কোনো কমতি করবেন না।

শেখ সা'দীর গুলিস্তাঁর একটি ঘটনা

শেখ সাদী রহ. গুলিস্তাঁ কিতাবে তাঁর একটি ঘটনা লিখেছেন যে, আমি একবার সফর করছিলাম। এক শহরে এক ব্যবসায়ীর ঘরে অবস্থান করি। সে ছিলো অনেক বড়ো ব্যবসায়ী। তার বাড়িও ছিলো আলীশান। তার বাড়িতে সবকিছু বিদ্যমান ছিলো। খেতে বসে কথা আরম্ভ হলো। ঐ ব্যবসায়ীর বয়স প্রায় সত্তর বছর। আমি ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে অনেক ধন-দৌলত দিয়েছেন, এখন কী করার ইচ্ছা? সে বললো, আমি সারা দুনিয়া ঘুরেছি। আল্লাহ তা'আলা আমাকে অনেক কিছু দান করেছেন। তবে আমার অন্তরে একটি বাসনা রয়েছে তা হলো, আমি শেষবারের মতো একটি বাণিজ্য সফর করতে চাই। তারপর অবশিষ্ট জীবন নিজের বাড়িতে কাটাবো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সেই শেষ সফরটা কোথায় হবে? ঐ ব্যবসায়ী তার শেষ সফরের বর্ণনা এভাবে দিলো। আমি ইরান থেকে গন্ধক ক্রয় করে চীনে যাবো। সেখান থেকে চিনা পাত্র ক্রয় করে রোমে নিয়ে বিক্রি করবো, রোম থেকে রেশম ক্রয় করে হিন্দুস্তানে বিক্রি করবো, হিন্দুস্তান থেকে লোহা ক্রয় করে হলবে বিক্রি করবো, হলব থেকে আয়না ক্রয় করে ইয়েমেনে বিক্রি করবো এবং ইয়েমেন থেকে চাদর ক্রয় করে ইরানে বিক্রি করবো। তারপর সফর ছেড়ে দিয়ে একটি দোকানে বসে অবশিষ্ট জীবন কাটাবো। তারপর লোকটি শেখ সাদী রহ.-কে বললো, তুমি তোমার সফরে যাকিছু দেখেছো ও শুনেছো সে সম্পর্কে কিছু বলো। শেখ সাদী রহ. বললেন, এ দু'টি শের শোনো,

آں شنیدی کہ در صحرائے غور

بار سالارے بیفتاد از ستور

گفت چشم تنگ دنیادار را

یا قناعت پر کند یا خاک گور

'তুমি কি এ ঘটনা শুনেছো যে, গউরের মরুভূমিতে একজন সর্দার তার খচ্চরের উপরে সামান বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছিলো। খচ্চর সেই ব্যবসায়ীকে নীচে ফেলে দেওয়ার কারণে ব্যবসায়ী মরে যায় এবং ব্যবসার সমস্ত সামান ময়দানের মধ্যে পড়ে থাকে। সেই বিক্ষিপ্ত সামানাপত্র যেন বলছিলো, দুনিয়াদারের সংকীর্ণ দৃষ্টি হয় অল্পেতুষ্টি পূর্ণ করতে পারে, আর না হয় কবরের মাটি। এছাড়া অন্য কিছু তার সংকীর্ণ দৃষ্টিকে পূর্ণ করতে পারে না।'[২১৬]

লক্ষ্ণৌর এক নবাবের ঘটনা

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, লক্ষ্ণৌর একজন লোক বড়ো নবাব ও বড়ো জমিদার ছিলেন। তাঁর অনেক প্রাসাদ ও দুর্গ ছিলো। অনেক চাকর-নকর ও পাইক-পেয়াদা ছিলো। অনেক নাজ-নেয়ামতে পরিপূর্ণ ছিলো তার প্রাসাদ। কিন্তু সে পেটের এরূপ এক পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলো যে, তাঁর চিকিৎসক তাঁকে বলে দিয়েছিলো, 'সারা জীবন আপনাকে খাসীর গোশতের এক পোয়া কিমা সিদ্ধ করে সেই সিদ্ধ করা গোশতের পানি খেতে হবে। ব্যস আপনার খাদ্য শুধু এটাই। আর কিছু আপনি খেতে পারবেন না।' ঘরে নানারকম উপাদেয় খাদ্য রান্না হচ্ছে, হরেক রকমের ফল-ফলাদি ঘরে বিদ্যমান, দুনিয়ার সবরকম নেয়ামতই তাঁর ঘরে বিদ্যমান; কিন্তু দেখুন, বেচারা নবাব সাহেবের ভাগ্যে জুটছে শুধু কিমার জুস, আর কিছুই নয়।

একদিন নবাব সাহেব নদীর তীরে অবস্থিত তাঁর একটি প্রাসাদে বসে নদীর দৃশ্য উপভোগ করছিলেন। হঠাৎ দেখলেন, পুরোনো ও ছেঁড়া কাপড় পরিহিত এক মজদূর এসে নদীর তীরের একটি গাছের নীচে বসলো এবং থলের ভেতর থেকে যবের মোটা মোটা দুটি রুটি ও পেঁয়াজ বের করে খুব তৃপ্তি সহকারে পেঁয়াজ দিয়ে রুটি দু'টি খেয়ে নদীর পানি পান করলো।

২১৬. গুলিস্তাঁ, পৃষ্ঠাঃ ১২০

তারপর ঐ গাছের নীচেই শুয়ে পড়লো এবং নাক ডেকে ঘুমোতে লাগলো। নবাব সাহেব প্রাসাদে বসে এই দৃশ্য দেখছিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ যদি আমার এই বাংলো, আমার এই সহায়-সম্পত্তি সবকিছু ছিনিয়ে নেন তাতেও আমি রাজী আছি, যদি তিনি এগুলোর পরিবর্তে ঐ মজদূর যে তৃপ্তি নিয়ে খেলো এবং যে আরামের ঘুম ঘুমোচ্ছে সেই ঘুম আমাকে দিয়ে দেন, তাতেও আমি সন্তুষ্ট থাকবো। তো ভাই দেখুন, সম্পদ আছে কিন্তু বরকত নেই।

হযরত মা'রূফ কারখী রহ.-এর ঘটনা

হযরত মা'রূফ কারখী রহ. অতি উঁচুস্তরের একজন বুযুর্গ ছিলেন। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ.-এর দাদা পীর ছিলেন। হযরত জুনায়েদ রহ. ছিলেন হযরত সিররী সাকতী রহ.-এর খলীফা, আর হযরত সিররী সাকতী রহ. ছিলেন হযরত মা'রূফ কারখী রহ.-এর খলীফা। তিনি সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলার যিকিরে মশগুল থাকতেন। একটা মুহূর্তও যিকির ছাড়া কাটাতেন না। এমন কি একবার তিনি নরসুন্দরকে দিয়ে চুল কাটাচ্ছিলেন। যখন গোঁফ কাটার সময় আসলো নরসুন্দর দেখলো তাঁর জিহ্বা ও ঠোঁট নড়াচড়া করছে। নরসুন্দর বললো, হযরত কিছুক্ষণের জন্যে মুখ বন্ধ রাখুন। যাতে আমি ভালোভাবে গোঁফ কাটতে পারি। হযরত মা'রুফ কারখী রহ. বললেন, তুমি তো নিজের কাজ ঠিকই করছো, আমি আমার কাজ করবো না? এই ছিলো তাঁর অবস্থা। যবানে সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলার যিকির জারি থাকতো।

কিতাবে তাঁর ঘটনা লিখেছে যে, একবার তিনি রাস্তায় চলছিলেন। দেখলেন এক ভিস্তিওয়ালা মানুষকে পানি পান করাচ্ছে আর ডেকে বলছে, আল্লাহ সেই বান্দাকে রহম করুন, যে আমার কাছ থেকে পানি পান করবে। হযরত মা'রূফ কারখী রহ. ভিস্তিওয়ালার কাছে গেলেন এবং বললেন, এক পেয়ালা পানি আমাকেও পান করাও। ভিস্তিওয়ালা তাকে পানি দিলো এবং তিনি তা পান করলেন। তাঁর সঙ্গী লোকটি বললো- হযরত! আপনি না রোযা রেখেছিলেন? অথচ তার কাছ থেকে পানি পান করলেন? তিনি বললেন, এই আল্লাহর বান্দা দু'আ করছিলো। বলছিলো, আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে আমার কাছ থেকে পানি পান করবে। আমার মনে হলো, অসম্ভব কি আল্লাহ তা'আলা আমার জন্যে তার দু'আ কবুল করবেন? আমার রোযা নফল। অন্য সময় তা কাযা করে নিতে পারবো, কিন্তু এই ব্যক্তির দু'আ আমি পরে আর পাবো কি না তার তো ঠিক নেই। তাই তার দু'আ পাওয়ার জন্যে আমি পানি পান করেছি।

চিন্তা করে দেখুন! এতো বড়ো বুযুর্গ ও আল্লাহওয়ালা হওয়া সত্ত্বেও একজন মামুলি ভিস্তিওয়ালার দু'আ লাভের জন্যে নিজের রোযা পর্যন্ত ভেঙে ফেলেছেন। কেন ভেঙেছেন? কেবল এ জন্যে যে, এ সকল বুযুর্গ আল্লাহর বান্দাদের দু'আ পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল থাকেন। কার দু'আ কখন কবুল হয় তা তো জানা নেই।

কষ্ট এতো চেপে রাখা ভালো নয়

আমি আমার মুহতারাম ওয়ালেদ ছাহেবের নিকট থেকে শুনেছি যে, এক বুযুর্গ অসুস্থ ছিলেন। আরেক বুযুর্গ তাকে দেখতে এসেছেন। এসে দেখেন, অসুস্থ বুযুর্গ 'আলহামদু লিল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ' ওযীফা পাঠ করছেন। অস্থিরতাও প্রকাশ করছেন না, অসুখ ভালো হওয়ার জন্যে দু'আও করছেন না। আগন্তুক বুযুর্গ তাকে বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত এ কাজ করতে থাকবে, রোগমুক্তি লাভ হবে না। যদি রোগমুক্তি চাও, নিরাময় চাও, তাহলে আল্লাহ তা'আলার কাছে কিছুটা অস্থিরতা প্রকাশ করোএবং দু'আ করো– হে আল্লাহ! আমি দুর্বল, আমি অক্ষম! আমি কষ্ট সহ্য করতে পারছিনা! আমার কষ্ট দূর করে দিন! আমাকে সুস্থতা নসীব করুন! মোটকথা আল্লাহ তা'আলার নিকট অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলার সামনে বাহাদুরি দেখানো কাম্য নয়।

আমার বড়ো ভাই মুহাম্মাদ যাকী কাইফী মরহুম উঁচুমানের কবি ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন, আমীন। তিনি নিম্নের কবিতায় বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করেছেন,

اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں

توڑنا ہے حسن کا پندار کیا

'এতো বেশি সংযমও ভালো নয়,
সৌন্দর্যের অহমিকা চূর্ণ করতে হবে কি!'

দুঃখ-কষ্ট চেপে রাখা তো ভালো। কিন্তু এতো বেশি চেপে রাখাও ভালো নয়, যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সামনে বাহাদুরি প্রকাশ পায়। তুমি কি আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব চূর্ণ করতে চাও? দুঃখ-কষ্ট চেপে রেখে কি তার সামনে বাহাদুরি প্রকাশ করতে চাও যে, যতো কষ্টই দেন না কেন পরওয়া নেই, আমি অত্যন্ত বীর বাহাদুর, সব বরদাশত করে নেবো? মনে রাখবেন

এটা আবদিয়্যাত ও দাসত্বের পরিপন্থী। দাসত্বের দাবি হলো আল্লাহ তা'আলার নিকট সুস্থতা প্রার্থনা করা।

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা কাহিনী শোনাতেন যে, এক বুযুর্গ ব্যক্তি বসে কাঁদছিলেন। কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, হযরত, কাঁদছেন কেন? সমস্যা কী? বুযুর্গ ব্যক্তিটি বললেন, আমার ক্ষুধা লেগেছে, তাই আল্লাহর নিকট কেঁদে-কেটে বলছি যে, হে আল্লাহ, আমার ক্ষুধা লেগেছে, আপনি আমাকে খাবার দিন। কেউ একজন বললো, আপনি তো একদম শিশুর মতো কান্নাকাটি করছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষুধা দিয়েছেনই তো এ জন্যে যে, আমি যেন তাঁর নিকট কেঁদেকেটে খাবার চাই এবং তাঁর সামনে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করি।

এক মুসলমান ও এক ইহুদীর কাহিনী

হযরত থানবী রহ. একটি কাহিনী লিখেছেন যে, এক শহরে একজন ইহুদী ও একজন মুসলমান বাস করতো। দু'জনই মৃত্যুশয্যায় মৃত্যুর জন্যে প্রহর গুনছিলো। ইহুদীর অন্তরে মাছ খাওয়ার বাসনা জাগলো। সে কামনা করলো, যদি মাছ পাওয়া যেতো তাহলে খেতাম! আর মুসলমানের মন চাইলো যাইতুনের তেল খেতে। আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতাকে বললেন, অমুক শহরে একজন ইহুদী আছে, সে মাছ খেতে ইচ্ছা করেছে। তুমি যাও এবং একটি মাছ নিয়ে তার বাড়ির হাউজে ছেড়ে দাও, যাতে সে হাউজ থেকে মাছ তুলিয়ে নিয়ে খেতে পারে। আর আরেকজন ফেরেশতাকে আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিলেন, অমুক মুসলমানের মন যাইতুনের তেল খেতে চাচ্ছে। তার ঘরের আলমারীতে যাইতুনের তেল রয়েছে। তুমি যাও এবং ঐ তেল বাইরে নিয়ে ফেলে দাও। উভয় ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়লো।

পথে উভয় ফেরেশতার পরস্পরে সাক্ষাত হলো। একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কোথায় যাচ্ছো? সে জবাব দিলো, আল্লাহ তা'আলা আমাকে হুকুম করেছেন যে, এক ইহুদীর মাছ খেতে মন চাচ্ছে, আমি যেন তার বাড়ির হাউজে মাছ ছেড়ে দিয়ে আসি, যাতে সে তা খেতে পারে। জবাব দিয়ে এই ফিরিশতা প্রথমজনকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কোথায় যাচ্ছো? সে জবাব দিলো, আমাকে আল্লাহ তা'আলা হুকুম করেছেন যে, অমুক মুসলমানের যাইতুনের তেল খেতে মন চাচ্ছে, তুমি যেয়ে তার আলমারীতে সংরক্ষিত তেল ফেলে দাও, যাতে সে খেতে না পারে। আল্লাহ তা'আলার

হুকুম তো হুকুমই, তা পালন করা অবশ্যই জরুরী। কাজেই উভয় ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলার হুকুম মোতাবেক নিজ নিজ কাজ করলো।

উভয় ফেরেশতা নিজ নিজ কাজ সম্পন্ন করে আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হলো এবং আরয করলো, ইয়া আল্লাহ, বিষয়টা তো আমরা বুঝতে পারলাম না। একদিকে তো ইহুদী কাফের। তার ইচ্ছা ও বাসনা আপনি পূরণ করলেন। তাও এভাবে যে, তার হাউজে মাছ ছিলো না। তা সত্ত্বেও তার বাসনা পূরণের জন্যে আপনি তার হাউজে মাছ পাঠিয়ে দিলেন। অপরদিকে আরেকজন মুসলমান। তার ঘরে তার চাহিদার বস্তু যাইতুনের তেল মজুদ ছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার বাসনা ও চাহিদা যেন পূরণ না হয় সে জন্যে তার ঐ তেল ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। বিষয়টা বুঝে আসলো না।

আল্লাহ তা'আলা বললেন, আসলে বিষয়টা হলো, অমুসলিম ও কাফেরের সঙ্গে আমার আচরণ এই যে, অমুসলিম কাফের দুনিয়ায় যেসব ভালো কাজ করে, যেমন দান-সদকা, মানুষের সঙ্গে ভালো আচরণ ইত্যাদি, আমি তার সেসব ভালো কাজের বিনিময় দুনিয়াতেই দিয়ে দিতে চাই। সে যখন আখিরাতে আমার কাছে আসবে, তখন যেন তার কোনো ভালো কাজের বিনিময় পাওনা না থাকে। দুনিয়াতেই যেন তার সকল ভালো কাজের হিসাব-নিকাশ চুকে যায়। এ জন্যে তার ভালো কাজের বিনিময় আমি দুনিয়াতে দিয়ে থাকি। এই ইহুদীও অনেক ভালো কাজ করতো। তার সকল ভালো কাজের বিনিময় দুনিয়াতেই আমি তাকে দিয়ে দিয়েছিলাম। শুধু একটা ভালো কাজের বিনিময় দেওয়া বাকী ছিলো। এখন তার আমার কাছে আসার সময় হয়ে গেছে। তাই আমি চাইলাম তার মাছ খাওয়ার এই ইচ্ছা পূর্ণ হোক, যাতে তার ভালো কাজের বিনিময়ের হিসাব-নিকাশ দুনিয়াতেই চুকে যায়। কোনো ভালো কাজের বিনিময় তার আখেরাতে পাওনা না থাকে। অতএব তার ইচ্ছা পূরণ করে মূলত আমি তার ভালো কাজের হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে দিলাম। এখন যখন সে আমার নিকট আসবে তখন আমার দায়িত্বে তার কোনো ভালো কাজের বিনিময় বাকী থাকবে না।

আর মুসলমানের সঙ্গে আমার আচরণের ধরন এ রকম যে, মুসলমান দুনিয়াতে কিছু না কিছু গোনাহ করে থাকে। তো আমি চাই যে, তার গোনাহসমূহের হিসাব-নিকাশ দুনিয়াতেই চুকে যাক। যাতে সে যখন আমার নিকট আসবে তখন তার গোনাহের কোনো হিসাব তার খাতায় না থাকে এবং আযাব দেওয়ার জন্যে যেন তাকে জাহান্নামে পাঠানোর প্রয়োজন না পড়ে। আর এ উদ্দেশ্যেই যখন কোনো মুসলমানের যিম্মায় কোনো গোনাহ বাকী

থাকে, তখন আমি তাকে অসুস্থতাসহ নানারকম বিপদাপদ দিয়ে, নানারকম কষ্টে নিপতিত করে তার গোনাহকে নিঃশেষ করে দিই। তো এই মুসলমান লোকটির সকল গোনাহ মাফ হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু একটা গোনাহ অবশিষ্ট ছিলো। আমি চাইলাম তার এ গোনাহটিও যেন বাকী না থাকে। সে যখন আমার কাছে আসবে তখন যেন গোনাহ থেকে পাক-পবিত্র হয়ে আসে। তাই যখন তার অন্তরে যাইতুনের তেল খাওয়ার ইচ্ছা জাগলো তখন আমি তার ঘরে সংরক্ষিত তেল নষ্ট করার ব্যবস্থা করে তার অন্তরে একটি কষ্ট দিলাম। ফলে তার অবশিষ্ট গোাহটিও শেষ হয়ে গেলো। এখন সে আমার নিকট গোনাহ থেকে পাক-পবিত্র হয়ে আসবে।

এবার বুঝুন যে, মানুষ কাহাঁতক আল্লাহ তা'আলার হিকমত ও প্রজ্ঞা বুঝতে পারে! তাঁর কাজকর্মের রহস্য কতটুকু সে উপলব্ধি করতে পারে!

হযরত কারী ফাতেহ মুহাম্মাদ ছাহেব রহ.-এর কুরআনপ্রীতি

হযরত কারী ফাতেহ মুহাম্মাদ রহ. ছিলেন আজীবন একজন মূর্তিমান তিলাওয়াত। তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে কুরআনুল কারীম প্রোথিত ছিলো। কুরআনুল কারীমের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিলো হুবহু এই দু'আর অনুরূপ-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ وَنُوْرَ بَصَرِيْ وَجَلَاءَ حُزْنِيْ وَذَهَابَ هَمِّيْ

'হে আল্লাহ, কুরআনুল কারীমকে আমার হৃদয়ের বসন্ত, চোখের জ্যোতি এবং দুঃখ-কষ্ট, পেরেশানী ও দুশ্চিন্তা দূর হওয়ার উপকরণ বানিয়ে দাও।'[২১৭]

যদি কারী ফাতেহ মুহাম্মাদ ছাহেবকে আমি না দেখতাম তাহলে কখনও বিশ্বাসই হতো না যে, এরূপ মানুষও দুনিয়ায় হতে পারে। কুরআনুল কারীম তাঁর জীবনের সাথে একাকার হয়ে গিয়েছিলো, তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিলো। সারাক্ষণ তিনি ছিলেন আপাদমস্তক তিলাওয়াত। তাঁর একটি মুহূর্তও তিলাওয়াত-শূন্য কাটতো না।

শেষ বয়সে তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। জবান বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। যে ব্যক্তির জবান সর্বদা তিলাওয়াতে সজীব থাকতো, তাঁর জবান গেলো বন্ধ হয়ে। যখন আমি তাঁকে এ অবস্থায় দেখতাম তখন মাঝে মাঝে আমার অন্তর খুব বেদনাহত হতো যে, হে আল্লাহ, যাঁর সারাটা জীবন কুরআন তিলাওয়াতে কেটেছে, তাঁর জবান বন্ধ হয়ে গেলো! জীবনের শেষ মুহূর্তে অন্তত শুয়ে শুয়ে তিলাওয়াত করবেন তাও আর সম্ভব নয়। যাহোক

২১৭. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ৩৭১২,৪৩১৮

তাঁকে দেখে খুব কষ্ট লাগতো। কিন্তু সাথে সাথে আমার অন্তরে এ কথা জাগলো যে, আসলে আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে এটাই দেখাতে চাচ্ছেন যে, না তিলাওয়াত করার মধ্যে কিছু আছে, না তিলাওয়াত না করার মধ্যে কিছু আছে। আমি বান্দাকে যে অবস্থায় রাখি সেটাই তার জন্যে কল্যাণকর। যখন তাঁর তিলাওয়াতের তীব্র আগ্রহ ছিলো এবং জবানে তিলাওয়াত জারী ছিলো, সে সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দিয়ে তিলাওয়াত করিয়ে তাঁর দরজা বুলন্দ করছিলেন, তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করছিলেন। এখন যখন তিলাওয়াত তাঁর জীবনের অংশে পরিণত হয়েছে, তখন তাঁর জবান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন তিনি তাঁর নীরবতায় এবং তাঁর বন্ধ জবানে ঐ সওয়াব ও পুরস্কার লাভ করছেন, যা তিনি তিলাওয়াত করে লাভ করতেন। বরং হয়তো বা তিলাওয়াতের চেয়েও অধিক সওয়াব লাভ করছেন। কারণ, তিলাওয়াতে তো তিনি স্বাদ ও মজা লাভ করতেন। এখন তাঁর জবান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তিলাওয়াত করতে তাঁর ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু জবান বন্ধের কারণে তিলাওয়াত করতে পারছেন না। ফলে অন্তর কষ্ট পাচ্ছে, হৃদয় ব্যথিত হচ্ছে। তাই তিলাওয়াতের সওয়াবও তিনি পাচ্ছেন, আবার তিলাওয়াত করতে না পারার কারণে যে মর্মযাতনা ভোগ করছেন তার কারণেও ভিন্ন সওয়াব পাচ্ছেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বিগুণ মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এ সবকিছু আল্লাহ তা'আলার হিকমত ও প্রজ্ঞায় সংঘটিত হচ্ছে। কে আছে এতে হস্তক্ষেপ করার? মাওলানা রূমী রহ. বলেন,

چونکہ بر میخذ بند بستہ باش
چوں کشاید چابک و برجستہ باش

'আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বেঁধে ফেলে রাখলে বন্দী অবস্থায় পড়ে থাকো! আ.র খুলে দিলে তৎপর ও ব্যস্ত হও!'

এটাই তোমাদের ইবাদত। কারণ এটা তাঁর পক্ষ থেকেই হচ্ছে।

হযরত মির্জা মাযহার জানে জানাঁ রহ.-এর একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. একটি শিক্ষণীয় ঘটনা লিখেছেন। হযরত মির্জা মাযহার জানে জানাঁ শহীদ রহ. অনেক বড়ো আল্লাহর ওলী ছিলেন। থাকতেন দিল্লীতে। আল্লাহ তাঁকে অনেক

উঁচু মর্যাদা দান করেছিলেন। তাঁর স্বভাব ও তবীয়ত ছিলো অত্যন্ত নাযুক। তাঁর নাযুক মেজাযের অনেক ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে।

একবার দুইজন তালিবে ইলমের মনে হযরত মির্জা মাযহার জানে জানাঁ রহ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বাইআত গ্রহণ করে তাঁর সঙ্গে ইসলাহী সম্পর্ক গড়ার ইচ্ছা জাগলো। দুজনই তদানিন্তন তুর্কিস্তানের বল্খ শহর থেকে রওয়ানা হয়ে দিল্লী পৌছলো। হযরত যেই মসজিদে অবস্থান করতেন সেখানে গেলো। নামাযের সময় নিকটবর্তী। দুজন মসজিদের হাউজের পাড়ে বসে অজু করতে লাগলেন। হযরত মির্জা মাযহার রহ. অদূরেই কোথাও ছিলেন। তারা তাঁকে চিনতো না। ওযু করতে করতে তাদের একজন অপরজনকে প্রশ্ন করলো, এই হাউজ বড়ো, না আমাদের বল্খের মসজিদের হাউজ বড়ো? দ্বিতীয়জন উত্তর দিলো, আমার কাছে এটা বড়ো মনে হয়। প্রথমজন বললো, না, বল্খের হাউজ বড়ো। এবার দু'জনের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়ে গেলো। একজন বলে বলখের হাউজ বড়ো, আর অপরজন বলে দিল্লীর হাউজ বড়ো। উভয়ে স্ব স্ব পক্ষে দলীল পেশ করতে থাকলো। এর মধ্যে উভয়ের অজু শেষ হলো, কিন্তু বিতর্কের কোনো সমাধান হলো না।

এরপর তারা নামায আদায় করলো এবং হযরতের খেদমতে উপস্থিত হলো। হযরত প্রশ্ন করলেন, কী উদ্দেশ্যে এসেছো? তারা উত্তর দিলো, হযরত আমরা বাইআত হতে এবং আপনার সঙ্গে ইসলাহী সম্পর্ক গড়ার উদ্দেশ্যে এসেছি। হযরত বললেন, বাইআতের বিষয় পরে হবে আগে বলো, বল্খের হাউজ বড়ো, না দিল্লীর হাউজ বড়ো– তোমাদের এই সিদ্ধান্ত হয়েছে কি না? তারা অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বললো, না হযরত ফয়সালা হয়নি। হযরত বললেন, আচ্ছা তাহলে এক কাজ করো; প্রথমে এই হাউজ মাপো, তারপর বল্খে গিয়ে সেই হাউজটি মেপে আগে সামাধান করো কোন হাউজটি বড়ো। তারপর বাইআতের কথা বলো। তোমাদের দুইজনের বিতর্ক থেকে বোঝা গেছে যে, তোমাদের অনর্থক কাজে জড়ানোর আগ্রহ অনেক। মনে করো, বল্খের হাউজ বড়ো, না দিল্লীর হাউজ বড়ো- সে সিদ্ধান্ত যদি হয়-ও, তাহলে তাতে দুনিয়া-আখেরাতের কী ফায়দা আছে? অথচ এমন একটি অনর্থক কাজে তোমরা নিজেদেরকে লাগিয়ে রেখেছো। তাই বলখে ফিরে যাও এবং হাউজ মেপে আসো, তা না হলে বাইআত করবো না।

আগের জামানায় এভাবেই চিকিৎসা করা হতো। তাদের জন্যে এই চিকিৎসা তো অনেক কড়া ও তিক্ত ছিলো, তবে সারা জীবনের জন্যে এই এক

চিকিৎসাই যথেষ্ট হয়েছে। এরপর সারা জীবন আর যাছাই ছাড়া কোনো কথা বলবে না। অহেতুক কোনো কথা আর কোনো দিন মুখ দিয়ে বের হবে না। যাইহোক, এভাবে আগের জামানায় চিকিৎসা করা হতো। শুধু যিকির-তাসবীহ বলে দিলো আর বসে বসে ওযীফা পাঠ করছে। ওযীফা পাঠ করে করেই কামেল হয়ে গেছে, ব্যাপারটা এমন ছিলো না। এভাবে ঘষা-মাজা খাওয়ার পরেই ইসলাহ হতো।

এই ঘটনা শুনিয়ে হযরত থানবী রহ. বলেন যে, কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, এই ছাত্র দু'জন বেশির চেয়ে বেশি একটি ভুল কাজ করেছে। ভুল কাজ যদি নাই করতো তাহলে সংশোধনের জন্যে আর আসার প্রয়োজন কী ছিলো। তারা তো নিজেদের ইসলাহের উদ্দেশ্যেই এসে ছিলো। আগে থেকেই যদি কামেল হতো। জিহ্বা নিয়ন্ত্রণে থাকতো, চিন্তা নিয়ন্ত্রণে থাকতো, তাহলে শায়েখের নিকট আসার কী প্রয়োজন ছিলো? তাহলে এই ভুলের কারণে শায়েখ বাইআত করতে অস্বীকার করলেন কেন? আগে বাইআত করতেন তারপর ইসলাহ করতেন।

এ কথা বলে হযরত থানবী রহ. নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর দেন যে, এখানে দু'টি বিষয় রয়েছে। প্রথম বিষয় হলো, কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে একজন সালেক, মুরীদ ও তালেবের পূর্ব থেকেই মনোযোগ ও চিন্তা থাকা উচিৎ। শায়েখ দ্বারা কেবল তখনই ফায়দা হতে পারে, যখন আগে থেকেই বড়ো বড়ো বিষয়ে সজাগ ও সচেতন হয়। তবে আধ্যাত্মিক জগতের সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়সমূহের ইসলাহ শায়েখ দ্বারা করাতে হবে। এ কারণে শায়েখ বাইআত করতে অস্বীকার করেন যে, তোমাকে এখনই বাইআত করবো না।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, আল্লাহ তা'আলাই শায়েখের অন্তরে ঢেলে দেন যে, এই ব্যক্তির সঙ্গে এ সময় কিরূপ আচরণ করা উচিৎ। প্রত্যেকের চিকিৎসা ভিন্ন রূপে হয়ে থাকে। কাউকে থাপ্পড় মারার দ্বারা চিকিৎসা হয়ে যায়। কাউকে ধমক দেওয়ার দ্বারা চিকিৎসা হয়ে যায়। কারো চিকিৎসা হয় আদর-সোহাগের মাধ্যমে। আর কারো চিকিৎসা একবার দৃষ্টিদানের মাধ্যমেই হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলাই শায়েখের অন্তরে ঢেলে দেন যে, এর জন্যে এ সময় কোন জিনিস উপকারী। অন্যে দেখে মনে করে যে, শায়েখ কিছুটা অতিরঞ্জন করলেন। কিন্তু সে জানে না যে, আল্লাহ তা'আলা এ ব্যক্তির ইসলাহ এর মধ্যেই রেখেছেন।

এক নবাবের শিক্ষণীয় ঘটনা

হযরত থানবী রহ. তাঁর ওয়াযে অত্যন্ত শিক্ষণীয় একটি ঘটনা বলেছেন।

ঢাকায় এক নবাব ছিলেন। অনেক বড়ো নেতা ও সম্পদশালী। মৃত্যুকালে অঢেল সম্পদ রেখে গেছেন। সন্তান ছিলো মাত্র এক পুত্র, আর এক কন্যা। দুজনই যাকে বলে পুরোদমে 'নবাবজাদা'। দেমাক তাদের সব সময়ই সপ্ত আকাশে ওঠে থাকতো। গর্ব অহঙ্কারের মত্ততায় কারো সঙ্গে কথা বলার জন্যেও প্রস্তুত ছিলো না। একদিন নবাবজাদার ম্যাচ জ্বালানোর প্রয়োজন হলো। ম্যাচের বারুদে দিয়াশলাই ঘর্ষণ করলে বারুদ পোড়ার গন্ধ বের হলো। বারুদপোড়া গন্ধ নবাবজাদার খুব ভালো লাগলো। এই ঘটনার পর থেকে এখন তার সকাল সন্ধ্যা একই কাজ। দিয়াশলাই কিনে তা জ্বালাও, আর গন্ধ শোঁকো! এভাবে তার পয়সা বরবাদ হতে থাকলো।

অপরদিকে নববাজাদী একদিন বাজারে গিয়ে কাপড় খরিদ করলো। দোকানী কেঁচি দিয়ে সামান্য কেটে দুই হাতে টান দিয়ে কাপড় ছিঁড়ে ফেললো। কাপড় ছেঁড়ার এই আওয়াজ তার খুব ভালো লাগলো। দিন-রাত এখন তার একই কাজ। থানে থানে কাপড় ক্রয় করে, কাপড় ছেঁড়াতো, আর আওয়াজ উপভোগ করতো। এভাবে পয়সা বরবাদ হতে থাকলো।

পরিণতিতে অঢেল সম্পদ এভাবেই একদিন শেষ হয়ে গেলো। এরপর তারা ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বাজারে ভিক্ষা করে ফিরতো। যেই বাজারে ভিক্ষা করতো, তা আজো 'বেগমবাজার' নামে প্রসিদ্ধ। একটি সময় ছিলো: ইচ্ছা করলে তারা সঠিক পথে অনেক সম্পদ ব্যয় করতে পারতো। কিন্তু তা না করায় এমন দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বে নিপতিত হলো যে, এখন চাইলেও সঠিক পথে খরচ করার সামর্থ্য নেই। এজন্যেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– সম্পদ হাতছাড়া হওয়ার আগেই স্বচ্ছলতাকে গনিমত মনে করো।

জনৈক নবাব সাহেবের একটি মজার ঘটনা

আমার আব্বাজান রহ. একটা মজার ঘটনা শোনাতেন। জনৈক নবাব সাহেব প্রত্যেক কাজের একটি নিয়ম ঠিক করে রেখে ছিলেন। দৈনন্দিন কাজের রুটিনও তার একটি নিয়ম মতো ছিলো। অমুক সময় নাস্তা করবো, অমুক সময় ঘুমাবো, অমুক সময় পায়চারি করবো ইত্যাদি। তার রুটিনের একটি অংশ ছিলো, আমি রাত এগারটা থেকে সকাল ছ'টা পর্যন্ত ঘুমাবো। এখন বাস্তবে সে এ সময় না ঘুমালেও বলতো, রুটিন অনুপাতে তো আমি

এখন ঘুমন্ত। এমনকি সকাল ছ'টার আগে চোখ খুলে গেলেও বলতো, রুটিন অনুযায়ী আমি এখনো ঘুমিয়ে আছি। একদিন ছ'টার আগে ঘুম থেকে জেগে দেখলো, একটি বানর ঘরে প্রবেশ করে তার টুপি নিয়ে যাচ্ছে। একটু পর আবার এসে তার লাঠি নিয়ে যাচ্ছে। এভাবে একের পর এক তার অনেক সামানপত্র নিয়ে গেলো। কিন্তু সে কিছুই বললো না। যেই ঘড়ির কাঁটা ছ'টার ঘরে পৌছলো, অমনি নবাব সাহেব চেঁচিয়ে উঠলো, হায়! তোমরা কোথায়? সবাই মরে গেলে নাকি? কোথায় কি হচ্ছে কারোই কোনো খবর নেই। বানর আমার সবকিছু নিয়ে যাচ্ছে, দেখার কেউ নেই... ইত্যাদি ইত্যাদি। চাকররা দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, জনাব! কী হয়েছে? তিনি বললেন, দেখো না কি হয়েছে? বানর আমার সবকিছু নিয়ে গেছে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, বানর নিয়েছে আপনি কীভাবে বুঝলেন? নবাব সাহেব বললেন, হাঁ আমি স্বচক্ষে দেখেছি। তারা বললো, তাহলে আপনি তাড়ালেন না কেন? তিনি বললেন, আরে আহমকের দল! রুটিন অনুপাতে তখন তো আমি ঘুমিয়ে। কারণ ছ'টা পর্যন্ত আমার ঘুমের রুটিন। ঘুমিয়ে থেকে আমি কীভাবে বানর তাড়াবো?

তো এ ধরনের নিয়ম বা রুটিনের গোলাম যারা, তারা রুটিনের চক্করেই পড়ে থাকে। এটা দ্বীনের চাহিদা নয়। তুমি একটি সময় বিশেষ একটি কাজের জন্যে ঠিক করলে, কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে তখন অন্য কাজের তাগাদা এলো, তাহলে যেটা সময়ের দাবি সেটা করাই তখন জরুরি।

সুন্নাত ও বিদআতের মনোমুগ্ধকর দৃষ্টান্ত

মুহতারাম আব্বাজান রহ.-এর নিকট তাবলীগ জামাতের প্রসিদ্ধ একজন মুরুব্বী আসা যাওয়া করতেন। নাম তাঁর শাহ আব্দুল আযীয। বড়ো আশ্চর্য রকমের বুযুর্গ ছিলেন তিনি। একদিন এসে আব্বাজানকে অদ্ভুত এক স্বপ্নের কথা শোনালেন। তিনি স্বপ্নে দেখেছেন, আব্বাজান একটি ব্লাক বোর্ডের নিকট দাঁড়িয়ে আছেন। কিছু লোক তাঁর সামনে বসা। তিনি তাদেরকে কিছু পড়াচ্ছেন। চক দিয়ে ব্লাকবোর্ডে ১ লিখে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কী? সবাই বললো এটা এক। তারপর ডান দিকে একটি শূন্য দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কী হয়েছে? সবাই বললো দশ (১০) হয়েছে। আরেকটি শূন্য দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এবার কতো হয়েছে? সবাই বললো এবার একশ (১০০) হয়েছে। আরেকটি শূন্য দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এবার কতো হয়েছে? সবাই বললো এক হাজার (১০০০) হয়েছে। এরপর বললেন, এভাবে ডান দিকে

যতো শূন্য বাড়াতে থাকবে, প্রত্যেক পরবর্তী সংখ্যার মান পূর্ববর্তী সংখ্যার দশগুণ করে বাড়তে থাকবে।

এবার ডান দিকের সবগুলো শূন্য মুছে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কতো আছে? সবাই বলল এক (১)। এবার বাম দিকে একটি শূন্য দিয়ে (০১) জিজ্ঞাসা করলেন এখন কতো হয়েছে? সবাই বললো একের দশ ভাগের এক ভাগ। তারপর আরেকটি শূন্য দিয়ে (০০১) জিজ্ঞাসা করলেন, এবার কতো হয়েছে? সবাই বললো, একের একশ ভাগের এক ভাগ। আরেকটি শূন্য দিয়ে (০০০১) জিজ্ঞাসা করলেন, এবার কতো হয়েছে? সবাই বললো, একের এক হাজার ভাগের এক ভাগ। এরপর বলেলন, এভাবে ডান দিকে যতো শূন্য বাড়াতে থাকবে, ততোই একের মান বাড়তে থাকবে; আর বাম দিকে যতো শূন্য বাড়াতে থাকবে ততোই একের মান কমতে থাকবে। ডান দিকের শূন্য হলো সুন্নতের দৃষ্টান্ত; বাম দিকের শূন্য হল বিদআতের দৃষ্টান্ত। দুই শূন্য দেখতে একই রকম। কিন্তু যখন ডান দিকে লাগে তো সুন্নাত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক হওয়ার কারণে এর মর্যাদা অনেক বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে যখন বাম দিকে লাগে, তখন শুধু যে তাতে সওয়াব হয় না তাই নয়; বরং তা ঐ ব্যক্তির অন্যান্য আমলও নষ্ট করে দেয়। সুন্নাত ও বিদআতের মধ্যে এই হলো পার্থক্য।

ভাই! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যই হলো পুরো দ্বীন। তাঁরা যখন যা যেভাবে করতে বলেন, তখন তা সেভাবে করলে সওয়াব হবে। পক্ষান্তরে তা থেকে সরে গিয়ে নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত পদ্ধতিতে যাই করবে তাতে কোনো সওয়াব হবে না।

এক বেদুইনের ঘটনা

আগের জামানায় নিয়ম ছিলো যে, কেউ কোনো বাদশাহর দরবারে গেলে নযরানাস্বরূপ তার জন্যে কিছু হাদিয়া নিয়ে যেতো। এই হাদিয়া মূলত বাদশাহর প্রয়োজন পূরণের জন্যে নেওয়া হতো না। নেওয়া হতো বাদশাহকে খুশি করার জন্যে। বাদশাহ যদি তা কবুল করেন, বোঝা যাবে তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং এ উসিলায় হয়তো সে বাদশাহর নিকট থেকে অনেক কিছুই পেয়ে যাবে।

মাওলানা রূমী রহ. এ বিষয়ে একটি ঘটনা লিখেছেন। বাগদাদের নিকটে একটি গ্রাম ছিলো। সেখানে এক বেদুইন বাস করতো। তার ইচ্ছা হলো, বাগদাদের বাদশাহ আমীরুল মুমিনীনের সঙ্গে দেখা করবে। (তৎকালে

বাগদাদের খলীফা সাধারণ কোনো বাদশাহ ছিলেন না; তিনি প্রায় অর্ধ দুনিয়া শাসন করতেন।) বেদুইন যাওয়ার আগে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করলো। বাদশাহর দরবারে যাবো, তো বাদশাহর মর্যাদা মতো কোনো নযরানা নিয়ে যাওয়া দরকার, যা দেখে বাদশাহ খুশি হবেন। যেমন বেদুইন, তেমন তার স্ত্রী। ছোট্ট গ্রামের বাসিন্দা তারা। দুনিয়ার তেমন খোঁজ খবর ছিলো না তাদের। স্ত্রী পরামর্শ দিলো, আমাদের কলসিতে নদীর যেই স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন মিঠা পানি আছে; এমন পানি বাদশাহ কোথায় পাবেন, আপনি কলসির পানিগুলো নিয়ে যান। স্ত্রীর পরামর্শ তার কাছে যথার্থ মনে হলো।

বেদুইন পানির কলসি নিয়ে বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলো। বর্তমান যুগের মতো তখন বিমান বা রেলগাড়ির ব্যবস্থা ছিলো না। পায়ে হেঁটে কিংবা উটে সওয়ার হয়ে সফর করতে হতো। সে পায়ে হেঁটে রওয়ানা দিলো। রাস্তার ধূলাবালি সব কলসিতে এসে পড়তে থাকলো। বাগদাদ যেতে যেতে পানির উপর ধুলার স্তর পড়ে গেলো। বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললো, বাদশাহ! আমি আপনার জন্যে একটি উপঢৌকন এনেছি। বাদশাহ বললেন দাও, কি উপঢৌকন এনেছো। সে বললো, আমার গ্রামের নদীর পনি খুব স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন ও মিষ্টি। ভাবলাম আপনি এমন সুন্দর পানি কোথায় পাবেন। এজন্যে নযরানা স্বরূপ এক কলসি পানি নিয়ে এসেছি। আপনি তা গ্রহণ করুন!

বাদশাহ বললেন, আচ্ছা বেশ ভালো! কলসির ঢাকনা খোলো। ঢাকনা খুলতেই পুরো কক্ষ দুর্গন্ধে ভরে গেলো। কারণ পানির উপরে ধুলার স্তর পড়ে গেছে এবং এ অবস্থায় কয়েকদিন ঢাকনা বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

বাদশাহ চিন্তা করলেন, বেচারা বেদুইন তেমন কিছু জানে না। তার ধারণামতে খুব ভালো নযরানা দিয়ে মহব্বত ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করেছে। সুতরাং তার মন ভাঙ্গা যাবে না।

এবার কলসির মুখ বন্ধ করে বললেন, মাশাআল্লাহ! তুমি খুব চমৎকার উপঢৌকন এনেছো। গ্রামের এমন সুন্দর পানি আমি শহরে কোথায় পাবো বলো? এভাবে তার পানির অনেক প্রশংসা করে বললেন, তাকে এক কলসি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দাও। বেদুইন খুব খুশি হলো। আলহামদু লিল্লাহ, আমার নযরানা বাদশাহর দরবারে কবুল হয়েছে! আমি অনেক স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছি!! যখন সে ফিরে যাচ্ছিলো, বাদশাহ এক চাকরকে বললেন, তাকে একটু দজলা নদীর পাশ দিয়ে নিয়ে যাও।

বেদুইন খুব খুশি হয়ে বাড়ি ফিরছে। বাদশাহর চাকর তার সঙ্গে। দজলা নদীর কাছে গিয়ে বেদুইন চাকরকে জিজ্ঞাসা করলো, ভাই এটা কী? সে

বললো, এটা নদী। এখান থেকে একটু পানি পান করে দেখো। বেদুইন পান করে দেখলো পানি অনেক পরিচ্ছন্ন ও মিষ্টি। এবার সে চিন্তা করলো, হায় আল্লাহ! আমি বাদশাহর জন্যে কি পানি নিয়ে গেলাম! তার মহলে তো দেখি আরো কতো উন্নত পানি প্রবাহিত হচ্ছে। তাঁর তো পানির কোনো প্রয়োজনই নেই। তিনি তাহলে আমার প্রতি অনেক বড়ো দয়া করেছেন যে, আমার পানির কলসি গ্রহণ করেছেন। না হয় আমি তো শাস্তির উপযুক্ত ছিলাম। কারণ আমি বাদশাহর নযরানা হিসাবে নষ্ট দুর্গন্ধ পানি পেশ করেছি। তিনি আমার প্রতি কতো মেহেরবানী করেছেন। যেখানে শাস্তি দেওয়ার কথা ছিলো, তা তো দিলেনই না; আমার নযরানাও সুন্দরভাবে গ্রহণ করলেন এবং প্রতিদান হিসাবে আমাকে এক কলসি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে খুশি করলেন!

মাওলানা রূমী রহ. বলেন, আমরা আল্লাহর দরবারে যেই ইবাদত পেশ করি, তার হাকীকত এই বেদুইনের পানির কলসির মতো। যা ধুলা-বালিযুক্ত দুর্গন্ধ পানিতে ভরা। এই ইবাদতের উপযুক্ত পাওনা তো ছিলো, আমাদের মুখের উপর ছুঁড়ে মারা। কিন্তু আল্লাহর বড়ো মেহেরবানী, তিনি তা আমাদের প্রতি ছুঁড়ে না মেরে কবুল করে নেন এবং এর বিনিময়ে তাঁর শান মোতাবেক অনেক সওয়াব দান করেন। তিনি চিন্তা করেন, আমার দুর্বল বান্দা তো এর চেয়ে বেশি কিছু কল্পনাও করতে পারে না। আমার যোগ্য ইবাদতের নযরানা সে কোত্থেকে দিবে। এখলাসের সঙ্গে সে যাই করতে পেরেছে, কবুল করে নেই।

মাওলানা রূমী রহ. এখানে ইবাদতের যেই দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, আমাদের তো আসলে জীবনের সব ইবাদতই এরকম। বেদুইনের কলসির পানির মতো দুর্গন্ধময়।

এক বুযুর্গের শিক্ষণীয় ঘটনা

আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এক বুযুর্গের ঘটনা শুনিয়েছেন যে, এক আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ কোথাও যাচ্ছিলেন। কিছু লোক তাকে নিয়ে ঠাট্টা করে। যেভাবে বর্তমানে আল্লাহওয়ালা এবং সাদা সিধা আলেমদের নিয়ে মানুষ ঠাট্টা করে থাকে। যাইহোক, ঠাট্টা করার জন্যে এক ব্যক্তি ঐ বুযুর্গকে জিজ্ঞাসা করে বলে, আপনি উত্তম না আমার কুত্তা উত্তম? এই প্রশ্ন শুনে ঐ বুযুর্গের রাগ হয়নি, মনের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি এবং কষ্টও লাগেনি। তিনি উত্তরে বলেছেন, এখন তো

আমি বলতে পারবো না যে, আমি উত্তম না তোমার কুত্তা উত্তম। কারণ, আমার তো জানা নেই কি অবস্থায় আমার মৃত্যু হবে। যদি ঈমান ও নেক আমলের উপর আমার মৃত্যু হয় তাহলে আমি তোমার কুত্তার চেয়ে উত্তম। আর আল্লাহ না করুন, যদি আমার শেষ অবস্থা খারাপ হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তোমার কুত্তা আমার চেয়ে উত্তম। কারণ, সে তো জাহান্নামে যাবে না এবং তাকে কোনো আযাবও দেওয়া হবে না। আল্লাহর নেক বান্দাদের এ অবস্থাই হয়ে থাকে। তাদের দৃষ্টি শেষ অবস্থার প্রতি নিবদ্ধ থাকে।

এ কারণেই বলা হয়েছে যে, খারাপ থেকে খোরাপ কোনো মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করো না। মন্দ বলো না। হ্যাঁ তার কাজ-কর্মকে মন্দ বলো যে, সে মদ পান করে। কুফুরীতে লিপ্ত। কিন্তু পরিণতি না জানা পর্যন্ত ব্যক্তিকে মন্দ বলা জায়েয নয়।

এক বুযুর্গের মাগফেরাতের ঘটনা

আমি আমার শাইখ হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ.-এর কাছে এ ঘটনা শুনেছি যে, এক বুযুর্গ অনেক বড়ো মুহাদ্দিস ছিলেন। হাদীসের দরস-তাদরীস ও রচনা-গ্রন্থনার কাজে সারাটি জীবন অতিবাহিত করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর একজন তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো– হযরত আপনার সঙ্গে আল্লাহ কি আচরণ করেছেন? আমার সঙ্গে বড়ো আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। তা হলো, আমার সারাটা জীবন তো আমি দ্বীনের খেদমত এবং হাদীসের খেদমতে অতিবাহিত করেছি। দরস-তাদরীস, ওয়ায-নসীহত, রচনা-গ্রন্থনা ও তাবলীগসহ অনেক খেদমত করেছি। আমার চিন্তা ছিলো এ সব খেদমতের পুরস্কার পাবো। কিন্তু ঘটনা হলো এই যে, যখন আল্লাহর সম্মুখীন হলাম তখন আল্লাহ বললেন, তোমাকে আমি ক্ষমা করে দিচ্ছি। তবে কি কারণে ক্ষমা করছি জানো? চিন্তায় আসলো, আমি দ্বীনের যেসব খেদমত আঞ্জাম দিয়েছি হয়তো সেগুলোর বদৌলতে আমাকে ক্ষমা করে দিচ্ছেন। কিন্তু আল্লাহ বললেন, আমি তোমাকে অন্য এক কারণে ক্ষমা করছি, তা হলো– একদিন তুমি কিছু লিখছিলে। তখন কাঠের কলম কালিতে চুবিয়ে চুবিয়ে লেখা হতো। তুমি লেখার জন্যে যখন কালিতে কলম চুবিয়ে উঠালে, তখন একটি মাছি এসে কলমের মাথায় বসে কালি চুষতে লাগলো। তুমি তখন থেমে গিয়েছিলে এবং চিন্তা করেছিলে যে, মাছিটা পিপাসার্ত। সে কালি পান করে যাক, তারপর আমি লিখবো। তখন এভাবে তোমার কলম বন্ধ করে রাখাটা আমার মহব্বতে এবং আমার মাখলুকের মহব্বতে ইখলাসের সঙ্গে

হয়েছিলো। তোমার অন্তরে তখন অন্য কোনো প্রেরণা ছিলো না। যাও, আজ আমি সেই আমলের বদৌলতে তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং জান্নাতুল ফিরদাউস দান করলাম।

এক বুযুর্গের চোখ বন্ধ করে নামায পড়ার ঘটনা

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মাক্কী রহ. একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যা হযরত থানবী রহ. তার ওয়াযের মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর সমসাময়িক একজন বুযুর্গ ছিলেন। তিনি চোখ বন্ধ করে নামায পড়তেন। ফকীহগণ লিখেছেন, নামাযের সময় চোখ বন্ধ রাখা মাকরূহ। তবে কারো যদি এছাড়া খুশু লাভ না হয় তার জন্যে 'চোখ বন্ধ করে নামায পড়া জায়েয, কোনো গোনাহ হবে না। ঐ বুযুর্গ খুব উত্তমরূপে নামায পড়তেন। নামাযের সবগুলো অঙ্গ সুন্নাত মোতাবেক আদায় করতেন। মানুষের মধ্যে তার নামায বিখ্যাত ছিলো। অত্যন্ত বিনয় ও খুশু-খুযুর সঙ্গে নামায পড়তেন। কিন্তু চোখ বন্ধ করে নামায পড়তেন। ঐ বুযুর্গ কাশফের অধিকারী ছিলেন। একবার তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে আবেদন করলেন, হে আল্লাহ! আমি যেই নামায পড়ি তা আপনার নিকট কবুল কি না এবং কোন পর্যায়ের কবুল ও তার আকৃতি কেমন তা আমাকে দেখান। আল্লাহ তা'আলা তার এই দরখাস্ত কবুল করেন। অনিন্দ্য সুন্দরী এক নারী সামনে আসে। যার মাথা থেকে পাতা পর্যন্ত সবগুলো অঙ্গ অত্যন্ত উপযোগী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু তার চোখ নেই, অন্ধ। তাকে বলা হলো, এই হলো তোমার নামায। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ! এতো অপূর্ব সুন্দরী নারী কিন্তু তার চোখ কোথায়? উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বললেন, তুমি চোখ বন্ধ করে নামায পড়ে থাকো, এ কারণে তোমার নামাযকে অন্ধ নারীর আকারে দেখানো হয়েছে।

ঘটনাটি হযরত হাজী ছাহেব রহ. বর্ণনা করেছেন। হযরত থানবী রহ. এ ঘটনার উপর মন্তব্য করে বলেন, আসল কথা হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল চোখ খুলে নামায পড়ার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। সিজদার জায়গায় দৃষ্টি রাখা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শেখানো পদ্ধতি। অন্য পদ্ধতি যদিও জায়েয, কিন্তু তাতে সুন্নাতের নূর অর্জন হতে পারে না। ফকীহগণ বলেছেন, নামাযের মধ্যে অনাহূত চিন্তা অধিক হলে তা প্রতিহত করার জন্যে এবং খুশু লাভের জন্যে কোনো ব্যক্তি যদি চোখ বন্ধ করে নামায পড়ে, তবে তা জায়েয, এতে কোনো গোনাহ হবে না। কিন্তু তা সুন্নাতের পরিপন্থী। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোনো নামায চোখ বন্ধ করে পড়েননি।

সাহাবায়ে কেরামও কখনো কোনো নামায চোখ বন্ধ করে পড়েননি। এজন্যে বলেছেন যে, এমন নামাযে সুন্নাতের নূর লাভ হবে না।[২১৮]

যেভাবে একজন ডাকাত পীর হলো

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. একবার নিজ মুরীদদের লক্ষ করে বলেন, তোমরা এভাবে আমার পিছনে লাগলে কেন? আমার অবস্থা তো সেই ডাকাতের মতো, যে পীর বনে বসেছিলো। সে যখন দেখলো যে, মানুষ পীর ছাহেবদেরকে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, হাদিয়া-তোহফা দেয় এবং চুমু খায় তখন চিন্তা করে দেখলো, আরে এটা তো একটা ভালো পেশা! শুধু শুধু রাত জেগে কষ্ট করি। তাতে কঠিন ঝুঁকিও রয়েছে। যে-কোনও সময় ধরা পড়তে পারি। তখন জেলে পঁচে মরতে হবে। আর ধরা না পড়লেও কষ্ট-ক্লেশের তো কোনও শেষ নেই। তারচে' ভালো পীর বনে বসি। মানুষ আমার কাছে আসবে। হাতে চুমু খাবে। হাদিয়া-তোহফা দেবে। আরও কতো কি! যেই চিন্তা সেই কাজ। লোকটি ডাকাতি ছেড়ে দিলো এবং একটা খানকা বানিয়ে বসে পড়লো। হাতে নিলো হাজার দানার তসবীহ। গায়ে লম্বা জামা এবং পীরদের মতো বেশভূষা। মানুষ দেখলো এক দরবেশ খানকা পেতে বসে আছে। মনে করলো নাজানি কতো বড়ো পীর! সুতরাং তারা দলে-দলে এসে তার কাছে মুরীদ হওয়া শুরু করে দিলো। অল্প দিনের মধ্যেই তার বিপুল ভক্ত জুটে গেলো। তাদের কেউ আসে হাদিয়া নিয়ে, কেউ নজরানা নিয়ে, কেউ আসে তসবীহ শেখার জন্যে, কেউ আসে মানতের গরু-ছাগল আর টাকা-পয়সা নিয়ে। কেউ এসে হাতে চুমু খায়, কেউ পায়ে পড়ে গড়াগড়ি খায়। পীর সাহেবও মুরীদদেরকে বিশেষ-বিশেষ আমল দেয়। কাউকে বলে তুমি এতোবার এই যিক্‌র করবে, কাউকে বলে এতোবার এই যিক্‌র করবে। যিক্‌রের ফল অব্যর্থ। তার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষের মর্যাদা উঁচু করেন। মুরীদগণ যেহেতু ইখলাসের সাথেই যিক্‌র করতো, তাই তারা সুফলও পেয়ে গেলো। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অনেক উঁচু মর্যাদা দিয়ে দিলেন এবং কাউকে-কাউকে কাশ্‌ফ ও কারামতেরও অধিকারী করলেন।

একদিনের কথা। মুরীদগণ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তো এতো উঁচু মর্যাদা দান করেছেন, এসো

---

২১৮. ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয়া 'যাদুল মা'আদে' لَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ تَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ فِي الصَّلَاةِ শিরোনামে একটি অধ্যায় এনেছেন। তাতে তিনি এ বিষয়ে দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে চোখ বন্ধ করতেন না।
–যাদুল মা'আদ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৮৩

আমরা দেখি আমাদের শায়েখ কোন অবস্থানে আছেন। তার মাকাম কতো উঁচুতে। সুতরাং তারা মুরাকাবায় বসে গেলো, যাতে কাশ্‌ফের মাধ্যমে শায়েখের অবস্থা জানা যায়। মুরাকাবা তো করলো, কিন্তু শায়েখকে কোথাও দেখতে পেলো না। কেন পাওয়া যাচ্ছে না? তারা পরামর্শে বসলো। কেউ কেউ বললো, আমাদের শায়েখ নাজানি কতো উঁচু অবস্থানে আছেন, যেখানে পৌঁছা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, আর সে কারণেই তাকে দেখতে পাচ্ছি না। শেষ পর্যন্ত তারা গিয়ে শায়েখকেই ধরলো। আরয করলো, হযরত! আমরা আপনার মাকাম কোথায় তা জানতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু আপনি এতো উঁচু মাকামে পৌঁছে গেছেন যে, সেখানে আমাদের পক্ষে পৌঁছা সম্ভব নয়। সুতরাং আপনি নিজেই বলে দিন, আপনার মাকাম কোথায়?

তাদের এ কথায় শায়েখের মনে অনুশোচনা জাগলো। তার নিজ অবস্থার দিকে নজর গেলো। নিজে কোথায় পড়ে আছে আর তার মুরীদগণ কোথায় পৌঁছে গেছে, তা চিন্তা করে আক্ষেপের সীমা থাকলো না। তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে আরম্ভ করলো। কাঁদতে কাঁদতে বললো, ভাইয়েরা, আমি নিজ অবস্থা তোমাদেরকে কী বলবো? আসলে তো আমি একজন ডাকাত। দুনিয়া কামানোর জন্যেই এ বেশ ধরেছি। আল্লাহ তা'আলা যিক্‌রের বদৌলতে তোমাদেরকে উঁচু মাকাম দান করেছেন। কিন্তু আমি অতল গর্তেই পড়ে আছি। তোমরা আমাকে খুঁজে পাবে কী করে? আমি কেবলই একজন চোর ও ডাকাত। আমার কাছে কিছুই নেই। এখন তোমরা আমার কাছ থেকে চলে যাও। অন্য কোনও পীর তালাশ করে নাও।

শায়েখের মুখে তার এ অবস্থার কথা শুনে মুরীদদেরও খুব আফসোস হলো। তারা সকলে মিলে শায়েখের জন্যে দু'আ করলো, হে আল্লাহ! ইনি চোর হোন বা ডাকাত, তার উছিলায়ই তো আপনি আমাদেরকে এ মাকাম দান করেছেন। হে আল্লাহ! আপনি তারও ইসলাহ করে দিন। তাকেও উঁচু মর্যাদা দান করুন। মুরীদগণ যেহেতু আল্লাহওয়ালা ছিলো, তাদের মনে ইখলাস ছিলো, আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'আ কবূল করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে উঁচু মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করলেন।

হযরত শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর একটি ঘটনা

হযরত শাইখুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া রহ. তার ঘটনা লিখেছেন যে, আমি যখন দাওরায়ে হাদীস পড়ি, তখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, ইনশা আল্লাহ কোনো হাদীস উস্তায ছাড়া পাঠ করবো না।

নিয়মিত উপস্থিত থাকবো যাতে কোনো সবক বা হাদীসের কোনো অংশ ছুটে না যায়। আমার একজন সাথী (মওলবী হাসান আহমাদ) ছিলেন। তিনিও একই সংকল্প করেছিলেন। দাওরায়ে হাদীসের দরসে ভোর থেকে পড়তে বসা হয় এবং কখনো চার ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টা করে একাধারে সবক পড়তে হয়। মাঝে মানবীয় প্রয়োজনও দেখা দেয়। কোনো কোনো সময় নতুন ওযু করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ওযু করতে গেলে সেই অবসরে দু'-চার হাদীস পার হয়ে যাবে। তাহলে সব হাদীস উস্তাযের কাছে পড়া হবে না। তিনি বলেন, আমি আমার সঙ্গীর সাথে চুক্তি করি যে, আমার তাজা ওযু করার প্রয়োজন দেখা দিলে আমি তোমাকে ইঙ্গিত করে উঠে যাবো। তখন তুমি উস্তাযকে কোনো প্রশ্ন করবে, উস্তায উত্তর দিতে আরম্ভ করবেন, আর আমি এ সুযোগে ওযু করে আসবো। যদি সেই প্রশ্নের উত্তর তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়, তাহলে তুমি আরেকটি প্রশ্ন করবে। যাতে করে ততক্ষণে আমি ওযু করে চলে আসতে পারি। আমি ফিরে এলে তারপর হাদীস আরম্ভ হবে। হযরত বলেন, সে তেমনই করতো। আর তার ওযুর প্রয়োজন দেখা দিলে আমাকে ইঙ্গিত করে চলে যেতো। আমি উস্তাযকে কোনো প্রশ্ন করতাম তিনি উত্তর দিতে দিতে সে ওযু করে আসতো।

কিছুদিন পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকে। কিছুদিন পর উস্তায বুঝতে পারেন যে, এরা পরস্পরে এই ধারা চালিয়েছে। হযরত বলেন, একবার আমার ওযুর প্রয়োজন দেখা দিলো। আমি আমার সাথীকে ইঙ্গিত করে উঠে যেতে আরম্ভ করি, তখন সাথী উস্তাযকে উদ্দেশ্য করে বলে যে, হযরত আপনি যে বলছিলেন, আল্লামা ইবনে হুমাম রহ.-এর একটি কথা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে, সেখানে এ কথা রয়েছে, তো এতে আপত্তি কি? তখন উস্তায বললেন, মিঞা আল্লামা ইবনে হুমামকে বাদ দাও! তোমার সাথীর ওযু করতে হবে সে ওযু করে আসুক। আমি এ সময় পড়া বন্ধ রাখছি। অহেতুক আমার মাথা নষ্ট করছো কেন? হযরত বলেন, আলহামদু লিল্লাহ! পুরো দাওরায়ে হাদীসে কোনো কিতাবের একটি হাদীসও এমন যায়নি, যা উস্তাযের সামনে পড়া হয়নি। এভাবে তিনি 'শাইখুল হাদীস' বনেছেন। আর তাঁর ফয়েয সারা দুনিয়ায় বিস্তার লাভ করেছে।

চরম সতর্কতা

হযরত শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. তার 'আপবীতী' গ্রন্থে দারুল-'উলূম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মাওলানা মুনীর আহমাদ ছাহেবের ঘটনা

লিখেছেন– তিনি একবার মাদরাসার চাঁদা সংগ্রহের জন্যে দিল্লী গমন করেন। সেখানে তিন শ' টাকা চাঁদা সংগ্রহ হয়। সেকালের তিন শ' টাকা বর্তমানের তিন লাখের কম নয়। পথে এক জালেম সে টাকা চুরি করে নিয়ে যায়। হযরত মাওলানা মুনীর আহমাদ ছাহেব রহ. খুব অস্থির হয়ে পড়েন। এগুলো তো মাদরাসার টাকা! তিনি নিজের সমস্ত মালপত্র বিক্রি করে মাদরাসার সেই চাঁদার জরিমানা আদায় করার জন্যে একত্রিত করলেন। লোকেরা যখন দেখলো যে, হযরত মাওলানা নিজের মালপত্র সব বিক্রি করে দিয়ে খুব অভাব ও কষ্টে পড়ে যাবেন। মাদরাসার টাকাগুলো তো তাঁর নিকট আমানত স্বরূপ ছিলো। এতে তাঁর পক্ষ থেকে কোনো অন্যায় হস্তক্ষেপ হয়নি। তাই শরীয়তের বিধান মতে তাঁর উপর কোনও জরিমানা ওয়াজিব হয়নি। সুতরাং তারা এ বিষয়ে হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.-এর কাছে চিঠি লিখলো। হযরত গাঙ্গুহী রহ. হযরত মাওলানা মুনীর আহমাদ রহ.-এর কাছে চিঠি লিখলেন যে, 'আপনার দ্বারা তো কোনও ক্রটি হয়নি তাই এর জরিমানা দেওয়াও আপনার উপর ওয়াজিব নয়।' চিঠিটি মাওলানার কাছে এলে তিনি বলে উঠলেন– বেশ বেশ, হযরত গাঙ্গুহী তো দেখছি সব ফিক্হ আমার জন্যেই পড়েছেন! এরপর যে কথা বললেন, তা তাঁর মতো লোকের পক্ষেই সম্ভব। তিনি বললেন– 'হযরত গাঙ্গুহী ছাহেব, মাসআলা তো আপনি আমাকে বলে দিলেন। নিজ বুকে হাত রেখে একটু বলুন তো দেখি, এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন আপনি নিজে যদি হতেন তবে আপনি কী করতেন?' অর্থাৎ, তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস ছিলো, এরূপ ঘটনা হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর ঘটলে তিনিও জরিমানা না দিয়ে স্থির থাকতে পারতেন না। এমন ছিলেন আমাদের ওলামায়ে দেওবন্দ! যাদের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করে আমরা গর্ববোধ করি। এই একটা ঘটনা নয়; বরং তাদের পুরো জীবনের প্রত্যেকটা আমল ও প্রত্যেকটা গতিবিধি দ্বীনের ছাঁচে ঢালাইকৃত ছিলো।

ত্যাগ ও সহমর্মিতা

হযরত মাওলানা সায়্যিদ আসগর হুসাইন ছাহেব রহ. ছিলেন আমার মহান পিতার উসতায। তিনি 'মিয়াঁ ছাহেব' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আমার ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলেন,

একদিন আমি তাঁর খেদমতে হাজির হলাম। দেখলাম, তাঁর কাঁচা ঘরটির বিপর্যস্ত অবস্থা। যখনই বৃষ্টি আসে, বিভিন্ন জায়গা থেকে ভেঙে পড়ে। হযরত মিয়াঁ ছাহেব রহ. একবার এখানে সংস্কার করেন, আরেকবার ওখানে সংস্কার

করেন। আমি আরয করলাম, হযরত! আপনি একবার যদি বাড়িটি পাকা করে নিতেন, তাহলে নিত্যদিনের এই ঝামেলা থেকে বেঁচে যেতেন। হযরত মিয়াঁ ছাহেব রহ. বললেন, ওহ্হো, মুহাম্মাদ শফী'! তুমি তো খুব বুদ্ধির কথা বলেছো! আমি বুড়ো হয়ে গেলাম, আজ পর্যন্ত কথাটা আমার মাথায় আসলোনা। আরয করলাম, হযরত! আপনি নারাজ হয়েছেন? আমার ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করে দিন। তখন হযরত মিয়াঁ ছাহেব আমাকে নিয়ে দরজার বাইরে গেলেন। তারপর বললেন, দেখ তো, এ গলির এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত কোনও পাকা ঘর চোখে পড়ে কি না? আমি বললাম, না হযরত, একটিও পাকা বাড়ি দেখছি না। তিনি বললেন, তাহলে বলো তো, এসব কাঁচা বাড়ির ভেতরে আমার একটাই পাকা বাড়ি হবে, এটা কেমন দেখা যাবে? কীভাবে আমি এসব কাঁচা বাড়ির মধ্যে নিজ বাড়িকে পাকা করি?

এই ছিলো আমাদের ওলামায়ে দেওবন্দ। তাদের এরূপ দু'-একটা ঘটনা নয়, তাদের প্রত্যেকেরই জীবনে এরূপ অসংখ্য ঘটনা আছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রত্যেককেই আলাদা আলাদা গুণ দিয়েছিলেন। তাঁদের ঘটনাবলী সাহাবায়ে কেরামের যমানাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাদের সম্পর্কে আমাদের পড়াশোনা করা উচিত। তাদেরকে জানা উচিত। মনে রাখতে হবে, শুধু ইলম উদ্দেশ্য নয়, আমলই আসল লক্ষবস্তু। সুতরাং ইলমকে আত্মশুদ্ধির উপায় বানানোর চেষ্টা করতে হবে।

হযরত ফুযাইল ইবনে 'ইয়ায রহ.-এর ঘটনা

হযরত ফুযাইল ইবন 'ইয়ায রহ. এক বিখ্যাত বুযুর্গ ছিলেন। আমরা যাদেরকে আল্লাহর ওলী হিসেবে গণ্য করি, ফুযাইল ইবন 'ইয়ায রহ.-এর নাম সেই তালিকার শীর্ষস্থানে। প্রথম জীবনে তিনি একজন ডাকাত ছিলেন। এতো বড়ো দস্যু ছিলেন যে, মায়েরা শিশুদেরকে তার নাম নিয়ে ভয় দেখাতো। বলতো, বাবা ঘুমাও, ফুযাইল এসে পড়বে। কাফেলা যাওয়ার পথে তিনি লুটতরাজ করতেন। কাফেলার লোকজনও তার ভয়ে ভীত থাকতো। কোথাও শিবির ফেললে সতর্ক থাকতো, পাছে ফুযাইলের লোকজন হামলা না চালায়। মূলত দস্যুবৃত্তিই ছিলো তার কাজ। একদিন তিনি ডাকাতি করতে বের হলেন। সময়টা ছিলো শেষ রাত। সেখানে আল্লাহর এক বান্দা কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন–

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَ مَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

'যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্যে কি এখনও সেই সময় আসেনি যে, আল্লাহ স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের অন্তর বিগলিত হবে?'[২১৯]

কুরআনে কারীমের সম্বোধন-ভঙ্গিও বিরল-বিস্ময়কর!

ফুযাইল যাচ্ছিলেন ডাকাতি করতে। ডাকাতির উদ্দেশ্যে এক বাড়িতে প্রবেশের জন্য রশীর ফাঁদ ঝুলিয়েছেন। ঠিক সেই মুহূর্তে কুরআন মাজীদের এই আয়াত তার কানে পড়লো। আল্লাহ তা'আলাই জানেন এই মুহূর্তে তিনি এই আয়াতের মধ্যে কী তাছীর রেখেছিলেন! শোনামাত্রই তার অন্তর আলোড়িত হলো। অথচ এ আয়াত তিনি নিজেও হয়তো অনেকবার পড়েছেন। কারণ তিনি তো মুসলমান ছিলেন। কিন্তু এ মুহূর্তে যখন ওই ব্যক্তির জবান থেকে এ আয়াত শুনলেন, তার অন্তরে এক অভাবনীয় বিপ্লব ঘটে গেলো। তখনই সংকল্প নিলেন– ডাকাতি আর নয়, সব দুষ্কর্ম এখনই ছেড়ে দিচ্ছি। চিৎকার করে বলে উঠলেন–

بَلٰى يَا رَبِّ قَدْ اٰنَ

'অবশ্যই হে প্রতিপালক! সে সময় এসে গেছে!'

তিনি ডাকাতি ছেড়ে দিলেন। লেগে পড়লেন আল্লাহকে পাওয়ার সাধনায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন মর্যাদা দিলেন যে, আউলিয়া কেরামের শাজারা (ধারা-পরম্পরা) তাঁর সঙ্গে গিয়ে যুক্ত হয়।

কোন মুহূর্তে কার জবান থেকে নিসৃত কোন কথা কি আছর করবে, আগে থেকে কেউ তা অনুমান করতে পারে না। তাই কখনই নিজেকে অন্যের নসীহত থেকে বে-নিয়ায মনে করা উচিত নয়। কে জানে, আল্লাহ তা'আলা কোন কথাকে ইসলাহের উপায় বানিয়ে দেন? সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারটা এ রকমই ছিলো।

ইমাম রাবী'আতুর রায়-এর মাতার উদ্দীপনা

হযরত ইমাম মালেক রহ.-এর ওস্তাদ হযরত রাবী'আতুর রায় রহ. অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম মালেকের মতো মহান ইমামের ওস্তাদ ছিলেন। তাঁর পিতার ঘটনা ইতিহাসে এসেছে যে, তিনি মদীনা মুনাওয়ারায়

২১৯. সূরা হাদীদ, আয়াত ১৬

বসবাস করতেন। তাঁর বিবাহের কিছুদিন পরেই হঠাৎ করে তাঁকে জিহাদের প্রয়োজনে মদীনা শরীফ ছেড়ে যেতে হয়। মদীনা শরীফ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে জিহাদ চলছিলো। সেই জামানায় বিমান ও রেলগাড়ি ছিলো না। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তিনি জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। আল্লাহ তা'আলার মর্জী জিহাদে অংশগ্রহণ করার পর একটার পর একটা প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে বাড়িঘর ও বিবি ছেড়ে প্রায় পঁচিশ বছর তিনি জিহাদের ময়দানে অবস্থান করেন। পঁচিশ বছর পর তিনি মদীনা শরীফ ফিরে আসেন। নিজের বাড়ির দুয়ারে পৌছে তিনি দেখেন, অতীব সুন্দর এক যুবক দরজা দিয়ে বের হচ্ছে। তিনি চিন্তা করলেন, আমার বাড়িতে এই অপরিচিত যুবক কে? আমি তো আমার স্ত্রীকে একা রেখে গিয়েছি। তিনি কঠোর স্বরে যুবককে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? যুবকও কঠোর ভাষায় তার উত্তর দেয়। এমনকি উভয়ের মধ্যে তিক্ত কথাবার্তা আরম্ভ হয়। আওয়াজ উঁচু হয়। ঘরে বসা মহিলা অনুভব করেন যে, দরজায় কিছুটা তিক্ত ভাষায় কথা হচ্ছে। কাছে এসে দেখেন যুবক ও আগন্তুকের মাঝে কথা হচ্ছে। তিনি আওয়াজ শুনে বুঝতে পারেন যে, আগন্তুক আমার স্বামী। যিনি বহুদিন পূর্বে মদীনা শরীফ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। মহিলা তার স্বামীকে বললেন, যার সঙ্গে আপনি ঝগড়া করছেন সে আপনারই ছেলে। তখন উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে অনেক কাঁদলেন। এরপর তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি যাওয়ার সময় তোমার প্রয়োজনে ব্যয় করার জন্যে ত্রিশ হাজার দীনার দিয়ে গিয়েছিলাম, তোমার জন্যে কি তা যথেষ্ট হয়েছিলো? স্ত্রী বললো, আমি আপনাকে তার হিসাব দিচ্ছি। ইতোমধ্যে নামাযের সময় হয়ে গেলো। মসজিদে নববী কাছেই ছিলো। স্ত্রী বললো, আপনি নামায পড়ে আসুন, তারপর আমি বলবো যে, ত্রিশ হাজার দীনার কী কাজে ব্যয় করেছি। তিনি নামায পড়তে গেলেন। দেখলেন নামাযের পরে অনেক মানুষ একব্যক্তিকে ঘিরে বসে আছে। সে যুগে মসজিদে নববীতে যিনি হাদীসের দরস দান করতেন তার মাথা রুমাল দিয়ে ঢাকা থাকতো। যার ফলে দূর থেকে মুখোমণ্ডল ভালোভাবে দেখা যাচ্ছিলো না। তিনি দেখলেন এক ব্য ক্তিকে ছাত্ররা ঘিরে বসে আছে। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস পাঠ করছেন, আর মানুষ তা শুনছে ও লিখছে। তিনি অনেক হাদীস শোনালেন আর ছাত্ররা সেগুলো লিখলো। তখন তিনি কাছে গিয়ে দেখলেন, পাঠদানকারী লোকটি তাঁরই ছেলে। এটা দেখে তার আনন্দের অন্ত রইলো না।

তিনি ঘরে ফিরে এসে স্ত্রীকে বললেন, তুমি তাকে এ পর্যায়ে পৌছিয়েছো যে, সারা দুনিয়ার মানুষ তার থেকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা লাভ করছে। তখন স্ত্রী বললেন, আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আপনি ত্রিশ হাজার দীনার রেখে গিয়েছিলেন, তা আমি কী করেছি? এবার শুনুন! আপনি দুটি আমানত রেখে গিয়েছিলেন। একটি আমানত পেটে ছিলো আর অপরটি হলো ত্রিশ হাজার দীনার। আমি এক আমানত অন্য আমানতের পিছনে ব্যয় করেছি। তাকে এভাবে গড়েছি যে, আজ মসজিদে নববীতে তার এমন বিশাল বিস্তৃত দরস হয় যে, সারা দুনিয়ার মানুষ তার থেকে ইলমে হাদীস অর্জন করে। ঐ যুবকের নাম হলো 'রাবী'আতুর রায়'। তাঁরই শাগরেদ হলেন ইমাম মালেক ইবনে আনাস রহ.। মানুষ রাবী'আতুর রায় রহ. ও তাঁর জ্ঞান-গরিমা সম্পর্কে তো জানে, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রশংসাবাণী তো কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু যেই মা অন্তহীন ত্যাগ স্বীকার করে, রাত্রি জাগরণ করে এবং কষ্টের বোঝা বহন করে তাঁকে গড়ে তুলেছেন তাঁর আলোচনা খুব কম মানুষই জানে।

প্রশংসাবাক্যে হযরত যুন নূন মিসরী রহ.-এর খুশি হওয়া

হযরত যুন নূন মিসরী রহ. উচ্চস্তরের বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁর সামনাসামনি কেউ প্রশংসা করলে তিনি খুশি হতেন। যদি বলতো, আপনি খুব সুন্দর ওয়ায করেছেন, আপনি একথাটি বড়ো চমৎকার বলেছেন বা এ জাতীয় কোনো প্রশংসাবাক্য, তবে তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠতো। দর্শকের মনে হতো এ বুযুর্গ নিজের প্রশংসা শুনলে খুশি হন। কারও অন্তরে অহঙ্কার থাকলে সে তো এটাই কামনা করবে যে, লোকে তাঁর প্রশংসা করুক। সামনাসামনি প্রশংসা করলে সে খুশি হবে।

হযরত যুন নূন মিসরী রহ. একজন স্বীকৃত বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর তো সম্মুখ প্রশংসায় খুশি হওয়ার কথা নয়; কিন্তু তিনি হতেন। এ কারণে কারও কারও খটকা লেগেছিলো– ব্যাপার কী? তিনি খুশি হন কেন? একজন তো জিজ্ঞাসাই করে বসলো, হযরত! আপনাকে দেখছি প্রশংসা করলে খুশি হন। কেউ আপনার কোনও কাজের প্রশংসা করলে আনন্দে হাসেন। এর কারণ কী? উত্তরে তিনি বললেন, হাঁ ভাই আমি প্রশংসাকালে খুশি হই, কিন্তু ব্যাপার তোমরা যা মনে করছো তা নয়। আসলে আমি খুশি হই এই ভেবে যে, লোকে যে আমার প্রশংসা করছে, আমি তো তার উপযুক্ত নই, আমার নিজের তো কোন আমল নেই। যা-কিছু করা হচ্ছে তা আল্লাহ তা'আলার

তাওফীকেই হচ্ছে। তিনি করাচ্ছেন বলেই কিছু কাজ করা হচ্ছে। কাজেই প্রশংসা যা করা হয়, তা মূলত আমার আল্লাহ তা'আলারই করা হয়। আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করা হচ্ছে দেখে আমি আনন্দবোধ করি। এ কথা চিন্তা করে খুশি হই যে, আমার মালিক আমাকে দিয়ে কাজ করাচ্ছেন বলে প্রশংসা করা হচ্ছে। দর্শক মনে করে তিনি নিজের প্রশংসা শুনে খুশি হচ্ছেন। তিনি অহঙ্কার ও আত্মশ্লাঘায় আক্রান্ত। বাস্তবিকপক্ষে তিনি ছিলেন শোকরগোযারীর উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত।

শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর ঘটনা

হযরত শায়েখ আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী রহ. অনেক উঁচু স্তরের আল্লাহর ওলী ছিলেন। তিনি হযরত শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. সম্পর্কে একটি ঘটনা লিখেছেন। একবার হযরত শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. তাহাজ্জুদের নামায পড়ছিলেন। এমন সময় তিনি দেখলেন যে, একটি নূর চমকালো। পুরো পরিবেশ আলোকিত হয়ে উঠলো। সেই আলোর মধ্যে থেকে আওয়াজ এলো– হে আব্দুল কাদের! তুমি আমার ইবাদতের হক আদায় করেছো। এ পর্যন্ত তুমি যতো ইবাদত করেছো, তাই যথেষ্ট। আজকের পর থেকে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত সমস্ত ইবাদতের কষ্ট তোমার থেকে তুলে নেওয়া হলো। এখন তোমার যেমন ইচ্ছা আমল করো। আমি তোমাকে জান্নাতী বানিয়ে দিয়েছি।

আলোর মধ্যে থেকে এই আওয়াজ এলো। যেন আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, তোমার ইবাদত এ পর্যায়ে কবুল হয়েছে যে, ভবিষ্যতে তোমার আর ইবাদত করতে হবে না। হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহ. যখন এ নূর দেখলেন এবং এ আওয়াজ শুনলেন, তখন সাথে সাথে তিনি উত্তরে বললেন,

'হতভাগা! দূর হ, আমাকে ধোঁকা দিচ্ছিস। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তো ইবাদত মাফ হয়নি, তাঁর উপর থেকে ইবাদতের দায়িত্ব রহিত হয়নি, আর আমার থেকে রহিত হচ্ছে। তুই আমাকে ধোঁকা দিতে চাস।'

দেখুন, শয়তান কতো বড়ো আক্রমণ করেছে! তার অন্তরে যদি ইবাদতের অহঙ্কার চলে আসতো, তাহলে সেখানেই পদস্খলন ঘটতো। যেসব লোক অনেক বেশি কাশফ ও কারামতের পিছনে লেগে থাকে, তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে তো শয়তানের এটা উত্তম আক্রমণ ছিলো। কিন্তু তিনি

তো ছিলেন শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী রহ.। অবিলম্বে তিনি বুঝে ফেললেন যে, এ কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে হতে পারে না। কারণ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর থেকে ইবাদতের দায়িত্ব লোপ পায়নি। তাহলে আমার উপর থেকে কি করে লোপ পায়?

অল্পক্ষণ পর আরেকটা নূর ভেসে উঠলো। দিগন্ত আলোকিত হয়ে উঠলো। সেই নূরের মধ্যে থেকে আওয়াজ এলো-

'হে আব্দুল কাদের! তোমার ইলম আজ তোমাকে রক্ষা করেছে। অন্যথায় কতো আবেদকে যে আমি এই আক্রমণ দ্বারা ধ্বংস করেছি, তার হিসাব নেই।'

হযরত শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. পুনরায় বললেন,

'হতভাগা আবারও আমাকে ধোঁকা দিচ্ছিস। আমার ইলম আমাকে রক্ষা করেনি, আল্লাহর অনুগ্রহ আমাকে রক্ষা করেছে।'

এই দ্বিতীয় আক্রমণ ছিলো প্রথম আক্রমণের চেয়ে বিপদজনক ও মারাত্মক। কারণ, এর মাধ্যমে তার মধ্যে ইলমের অহমিকা ও গর্ব সৃষ্টি করতে চেয়েছিলো।

হযরত শায়েখ আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী রহ. এ ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেন যে, প্রথম আক্রমণ অধিক মারাত্মক ছিলো না। কারণ, যার কাছে সামান্য শরীয়তের ইলম থাকবে, সেও এ কথা বুঝতে পারবে যে, জীবনে যতক্ষণ হুঁশ-জ্ঞান ঠিক আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো মানুষের ইবাদত মাফ হতে পারে না। কিন্তু দ্বিতীয় আক্রমণটি ছিলো অতি মারাত্মক। কতো মানুষ যে, এই আক্রমণে বিপথগামী হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। কারণ, এর মাধ্যমে ইলমের অহঙ্কার সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য ছিলো, যা একটি সূক্ষ্ম বিষয়।

মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুবরণ করা উচিৎ

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবী নু'ম রহ. নামে অনেক বড়ো একজন বুযুর্গ ও মুহাদ্দিস অতিবাহিত হয়েছেন। তাঁর যুগের এক ব্যক্তির শখ হলো, আমি বিভিন্ন আলেম, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও বুযুর্গের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবো, আপনি যদি জানতে পারেন, কাল আপনার মৃত্যু হবে; জীবনের একটিমাত্র দিন হাতে আছে, তাহলে আপনি কি করবেন? তার উদ্দেশ্য ছিলো, আমার এই প্রশ্নের উত্তরে নিশ্চয় সবাই সেই আমলের কথাই বলবে, যা তিনি সবচেয়ে সওয়াবের মনে করেন। এভাবে আমি দ্বীনের ভালো ও জরুরী

বিষয়গুলো জানতে পারবো এবং আমার জীবনকে সে সব কাজে অতিবাহিত করতে পারবো।

একে একে অনেক বুযুর্গের নিকট গেলেন। তারা বিভিন্ন জন বিভিন্ন উত্তর দিলেন। এক পর্যায়ে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত আব্দুর রহমান ইবনু আবী নু'ম রহ.-এর নিকট প্রশ্নটি রাখলেন, আপনি যদি নিশ্চিত হন যে, আগামীকাল আপনার মৃত্যু হবে, তাহলে সেই দিনে আপনি কি আমল করবেন? তিনি উত্তর দিলেন, সেই আমলগুলোই করবো, যা আমি দৈনিক করে থাকি। তাতে অতিরিক্ত একটুও যোগ করার সুযোগ নেই। কারণ আমার দৈনন্দিনের সময়সূচী এমনভাবে করেছি, যেন প্রতিদিনই আমার জীবনের শেষদিন। জীবনের শেষদিন হলে যা করা দরকার ছিলো, প্রতিদিন আমি তাই করে যাচ্ছি।[২২০]

এটাই হলো এ কথার বাস্তবায়ন। مُوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا 'তোমরা মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যু বরণ করো।' তাঁরা সবসময় মৃত্যুর কথা স্মরণ রেখে এমনভাবে জীবনকে ঢেলে সাজিয়ে ছিলেন যে, সবসময় মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন, মৃত্যু যখন আসার আসুক।

দুঃখ-কষ্টও নেয়ামত

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী রহ. এক বৈঠকে এ বিষয়ে বয়ান করছিলেন যে, মানুষের জীবনে যে সব দুঃখ-কষ্ট ও ব্যথা-বেদনা আসে, ভালো করে চিন্তা করলে মানুষ বুঝতে পারবে যে, এ সব দুঃখ-কষ্টও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত। রোগ-ব্যাধিও আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত। অভাব-উপবাসও আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত।

এখন প্রশ্ন হলো, এসব জিনিস নেয়ামত হলো কী করে? তার উত্তর এই যে, আল্লাহ তা'আলা যখন আখেরাতে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদে ধৈর্য ধারণকারীদেরকে অফুরন্ত পুরস্কার দান করবেন, তখন দুনিয়ায় যে সব লোকের উপর দিয়ে বেশি কষ্ট ও বিপদ যায়নি, তারা আশা করবে– হায়! দুনিয়ায় যদি আমাদের চামড়া কেঁচি দ্বারা কাটা হতো আর আমরা ধৈর্য ধারণ করতাম![২২১]

---

২২০. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, তাযকিরাতু আব্দির রহমান ইবনু আবী নু'ম: ৫/৬২

২২১. কানযুল উম্মাল, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩০৩ হাদীস নং- ৬৬৬০; আলমু'জামুল কাবীর লিত তবরানী, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৬৬, হাদীস নং- ৮৬৮৯; আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবাইর, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪২৭

সেই ধৈর্যের ফলে আমরাও তেমন সওয়াব পেতাম যেমন আজ এ সব ধৈর্য ধারণকারী পাচ্ছে। মোটকথা, এ সব কষ্টও নেয়ামত, কিন্তু আমরা দুর্বল হওয়ার কারণে সে কথা আমাদের স্মরণ থাকে না।

হযরত হাজী ছাহেব রহ. একবার এ বিষয়ে বয়ান করছিলেন, এমন সময় বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে জর্জরিত এক মাজুর ব্যক্তি মজলিসে এসে তাঁকে বললো, হযরত আমার জন্যে দু'আ করুন, আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে এ সব কষ্ট থেকে মুক্তি দান করেন। হযরত থানবী রহ. বলেন, আমরা যারা মজলিসে হাজির ছিলাম, আমরা তো অবাক যে, হযরত এখন কীভাবে দু'আ করবেন! কারণ, হযরত বয়ান করছিলেন যে, সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ নেয়ামত, আর এ ব্যক্তি কষ্ট দূর হওয়ার জন্যে দু'আ চাচ্ছে। এখন যদি হাজী ছাহেব কষ্ট দূর হওয়ার জন্যে দু'আ করেন, তার অর্থ হবে তিনি নেয়ামত দূর হওয়ার জন্যে দু'আ করছেন।

হযরত হাজী ছাহেব অবিলম্বে হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন– হে আল্লাহ! প্রকৃতপক্ষে এ সমস্ত কষ্ট ও মুসিবত নেয়ামত। কিন্তু হে আল্লাহ! আমরা দুর্বল। আপনি আমাদের দুর্বলতার দিকে তাকিয়ে এ কষ্টের নেয়ামতকে সুস্থতার নেয়ামত দ্বারা পরিবর্তন করে দিন।

হৃদয়পটে অঙ্কিত করার মতো কথা

আমার দ্বিতীয় শায়েখ মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান ছাহেব রহ.-কে আমি পত্রযোগে লিখি যে, হযরত অমুক বিষয়ের কারণে চরম পেরেশানিতে আছি। উত্তরে হযরত লেখেন,

'মহান আল্লাহর সঙ্গে যার সম্পর্ক, তার আবার পেরেশানি কিসের।'

অর্থাৎ, পেরেশান হওয়া একথার প্রমাণ যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক মজবুত নয়। আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে পেরেশানি আসতেই পারে না। যে ব্যথা-বেদনা দেখা দিচ্ছে তার জন্যে আল্লাহকে বলো, হে আল্লাহ! এ কষ্ট দূর করে দিন। তারপর আল্লাহ তা'আলা যেই ফয়সালা করেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকো; তাহলে আর পেরেশানি কিসের। তাই 'রেযা বিল কাযা' হালে পরিণত হলে এবং দেহ-মনে প্রবেশ করলে পেরেশানি তার নাগালও পাবে না।

আমার নিজের ঘটনাবলী

লন্ডন এয়ারপোর্টের একটি বিরল ঘটনা

আমি লন্ডন থেকে করাচী ফিরছিলাম। লন্ডনের হিথ্রো এয়ারপোর্টে অনেক বড়ো একটি মার্কেট আছে। ওখানে নানা ধরনের পণ্যের বহুসংখক স্টল আছে। একটি স্টল ছিলো বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ব্রিটানিকা'র। আমি এই স্টলে ঢুকে বই দেখতে লাগলাম। এক পর্যায়ে এমন একটি বই দেখতে পেলাম, যেটি দীর্ঘদিন যাবত আমি খুঁজছিলাম। বইটির নাম 'গ্রেট বুক্স'। ইংরেজি ভাষায় লেখা এই বইটি ৬৫ খণ্ডে সমাপ্ত। বইটিতে এরিস্টেটল থেকে নিয়ে সাম্প্রতিককালের দার্শনিক ব্রাটারেন্ডাসল পর্যন্ত সকল দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও বড়ো বড়ো চিন্তাবিদের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে এবং সবগুলো বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ তাতে বিদ্যমান আছে।

আমি স্টলে দাঁড়িয়ে বইটি দেখছিলাম। দোকানদার আমাকে বললো, আপনি কি এই বইটি নিতে চান? আপনার সংগ্রহে 'এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ব্রিটানিকা' আছে কি?

আমি বললাম, হ্যাঁ, এই বইটি আমি নিতে চাই। আর 'এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ব্রিটানিকা' আগে থেকে আমার কাছে আছে।

দোকানদার বললো, 'এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ব্রিটানিকা' যদি আগে থেকে আপনার কাছে মজুদ থাকে, তা হলে এটি আপনাকে আমরা ৫০% কমিশনে দেবো। অর্থাৎ, আসল মূল্যের অর্ধেক দামে আপনি এই বইটি ক্রয় করতে পারবেন।

আমি বললাম, আমার কাছে আছে বটে; কিন্তু কোনো প্রমাণ তো নেই।

দোকানদার বললো, প্রমাণ বাদ দিন। আপনি মুখে বলেছেন; ব্যস আপনি ৫০% কমিশনের হকদার হয়ে গেছেন।

আমি হিসাব করে দেখলাম, ৫০% কমিশন বাদ দিলে পাকিস্তানি রুপিতে প্রায় ৪০ হাজার হয়। বইটি আমার দারুল উলূমের লাইব্রেরীর জন্যে ক্রয় করা দরকার ছিলো। আর দারুল উলূমে 'ব্রিটানিকা' আগে থেকেই মজুদ আছে। আমি বললাম, আমি এখন তো চলে যাচ্ছি। এই বই আমার কাছে কীভাবে আসবে? দোকানদার বললো, আপনি ফরম পূরণ করে দিয়ে যান আমরা বই বিমানযোগে আপনার কাছে পৌছিয়ে দেবো।

আমি ফরম পূরণ করে দিলাম। এবার দোকানদার বললো, আপনার ক্রেডিট কার্ডের নম্বরটা দিয়ে স্বাক্ষর করে দিন।

আমি খানিক ভাবনায় পড়ে গেলাম যে, স্বাক্ষর করবো কি-না। কারণ, স্বাক্ষর করার অর্থ হলো, মূল্য পরিশোধ হয়ে গেছে; ইচ্ছা করলে এখনই সে টাকা তুলে আনতে পারবে। কিন্তু আমার আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হলো যে, লোকটি আমাকে আমার কথায় বিশ্বাস করলো; এখন আমিও তাকে বিশ্বাস করবো। তাই আমি স্বাক্ষর করে দিলাম।

এবার আমার মনে একটি চিন্তা জাগলো। আমি তাকে বললাম, এখানে আপনারা বইটি ৫০% কমিশনে দিচ্ছেন। কিন্তু অনেক সময় এমনও হয় এবং একাধিকবার হয়েছেও যে, এখান থেকে অনেক কমিশনে ক্রয় করে পাকিস্তান গিয়ে আরও সস্তায় পেয়েছি। জানি না, তারা কীভাবে সংগ্রহ করে এবং সস্তায় দেয়? কাজেই এ ক্ষেত্রেও এমন হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হতে পারে, পাকিস্তানে আমি আরও কম মূল্যে পেয়ে যাবো।

দোকানদার বললো, ঠিক আছে; কোনো সমস্যা নেই। আপনি গিয়ে পাকিস্তানে জেনে নিন, এর চেয়েও কম দামে পাচ্ছেন কি-না। যদি পান, তা হলে আমাদের এই অর্ডার বাতিল করে দেবেন। আর না পেলে আমরা পাঠিয়ে দেবো।

আমি বললাম, আমি আপনাদেরকে কীভাবে জানাবো?

দোকানদার বললো, খোঁজ নিতে আপনার কয়দিন সময় লাগবে? চার-পাঁচদিন, মানে বুধবার নাগাদ কি খবর নিতে পারবেন?

আমি বললাম, তা পারবো ইনশা আল্লাহ।

দোকানদার বললো, বুধবার দিনের বারোটার সময় আপনাকে ফোন দিয়ে আমি জেনে নেবো।

আমি বললাম, ঠিক আছে।

আমি ফরমে দস্তখত করে রওনা হয়ে এলাম। কিন্তু সারা পথে আমার মনে খুতখুত করতে থাকলো যে, স্বাক্ষর তো করে এলাম। লোকটি চাইলে তো এখনই আমার একাউন্ট থেকে চল্লিশ হাজার টাকা তুলে নিতে পারে।

ফলে করাচি পৌছে আমি দ্রুত দুটি কাজ করলাম। একটি কাজ এই করলাম যে, ক্রেডিট কার্ডের কোম্পানি 'আমেরিকান এক্সপ্রেস'কে পত্র লিখলাম যে, আমি এভাবে স্বাক্ষর করে এসেছি। কিন্তু আমি পুনর্বার না বলা পর্যন্ত আপনারা পেমেন্ট দেবেন না।

আরেকটি কাজ করলাম, এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিলাম, তুমি বাজারে গিয়ে দেখে আসো, এই বইটি পাও কি-না। পেলে নিয়ে আসো। বইটি আমি আগেও খুঁজেছি; কিন্তু পাইনি।

কিন্তু ঘটনাক্রমে করাচী সদরের এক দোকানে বইটি পাওয়া গেলো এবং সস্তায়ই পাওয়া গেলো, মাত্র ত্রিশ হাজারে। ওখানে ৫০% কমিশনে চল্লিশ হাজার আর এখানে ত্রিশ হাজার।

এবার আমার পেরেশানি আরও বেড়ে গেলো। কথা তো ছিলো, সে বুধবার ফোন করবে। কিন্তু আল্লাহ জানেন, করে কি-না। ফলে সাবধানতার খাতিরে আমি সেদিনই চিঠি লিখে দিলাম যে, বইটি আমি এখানে পেয়ে গেছি। তারপর বুধবার ঠিক দুপুর বারোটার সময় ওখান থেকে ফোন এলো।

দোকানদার জিজ্ঞাসা করলো, বলুন, আপনি বইটি পেয়েছেন কি-না।

আমি বললাম, হ্যাঁ, পেয়েছি এবং অনেক কমে পেয়েছি।

দোকানদার বললো, তা হলে কি আমি আপনার অর্ডার বাতিল করে দেবো?

আমি বললাম, হ্যাঁ, বাতিল করে দিন।

দোকানদার বললো, ঠিক আছে, আমি বাতিল করে দিচ্ছি আর আপনি যে ফরমটি পূরণ করে দিয়ে গেছেন, সেটি ছিঁড়ে ফেলছি। ভালোই হলো যে, আপনি সস্তায় পেয়ে গেছেন। আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

চার-পাঁচদিন পর এ মর্মে তার পত্র এলো যে, আমরা এ জন্যে আনন্দিত যে, আপনি বইটি আমাদের চেয়েও কম মূল্যে পেয়ে গেছেন। কিন্তু আক্ষেপ হলো, আমরা আপনার সেবা করার সুযোগ পেলাম না। কিন্তু আপনি বইটি পেয়ে গেছেন এটিই বড়ো কথা। আপনার প্রয়োজন মিটে গেছে। আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি, আগামীতেও আপনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন।

লোকটি লন্ডন থেকে করাচীতে আমার সঙ্গে ফোনে কথা বললো। তাতে তার একটি পয়সারও উপকার হয়নি। তারপর আবার পত্রও লিখলো।

এরা তারা, আমরা যাদেরকে গালাগাল করি। কিন্তু এরা সেই ইসলামী চরিত্র প্রদর্শন করছে, যেগুলো আমরা ছেড়ে দিয়েছি।

যাইহোক, কুফরের কারণে আমাদেরকে তাদের ঘৃণা করতে হবে। কিন্তু পাশাপাশি এই বাস্তবতাও স্বীকার করতে হবে যে, তারা এমন কিছু চরিত্র অবলম্বন করে নিয়েছে, যেগুলো মূলত আমাদের চরিত্র ছিলো। আর সেই চরিত্র অবলম্বনের ফলেই আল্লাহপাক তাদেরকে উন্নতি দান করেছেন।

এক যুবকের তাওয়াক্কুলের বিস্ময়কর ঘটনা

একবার আমি দারুল উলূমে আমার দফতরে বসা ছিলাম। এক যুবক আমার কাছে এলো। ঐ যুবকের মধ্যে মাথা থেকে পা পর্যন্ত বাহ্যিকভাবে ইসলামী বেশ-ভূষার কিছুই চোখে পড়ছিলো না। পশ্চিমা পোশাকে সজ্জিত। তার বাহ্যিক আকার দেখে মোটেই বোঝা যাচ্ছিলো না যে, তার ভিতরেও দ্বীনদারির কিছু না কিছু থাকতে পারে। আমার কাছে এসে বললো যে, আমি আপনার নিকট একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। আমি বললাম, কী সেই মাসআলা? সে বললো, মাসআলা এই যে, আমি 'একচুয়ারি' (Actuary) (ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে কতো প্রিমিয়াম হওয়া উচিত এবং কতো টাকার ইন্সুরেন্স হওয়া উচিত, এ জাতীয় হিসাব রাখার জন্যে 'একচুয়ারি' রাখা হয়। তখন পুরো পাকিস্তানের কোথাও এই শিক্ষা দেওয়া হতো না) ঐ যুবক বললো, আমি এই বিদ্যা অর্জনের জন্যে ইংল্যান্ড সফর করি। সেখানে গিয়ে শিক্ষা অর্জন করি। (সে সময়ে পুরো পাকিস্তানে এ বিষয়ে দু'-তিন জনের অধিক শাস্ত্রজ্ঞ ছিলো না। যে ব্যক্তি একচুয়ারি হয়, সে ইন্সুরেন্স কোম্পানি ছাড়া অন্য কোথাও কাজ করার উপযুক্ত থাকে না। যাইহোক, ঐ যুবক বললো যে,) আমি এখানে এসে একটি ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে চাকুরি নেই। পুরো পাকিস্তানে যেহেতু এ শাস্ত্রের দক্ষ লোক খুব কম, এ জন্যে আমার বেতন ও সুযোগ-সুবিধা অনেক। এজন্যে আমি এ চাকুরি গ্রহণ করি। যখন এসব কিছু হয়ে গেলো– বিদ্যার্জন করলাম, চাকুরি নিলাম, তখন আমাকে একজন বললো যে, ইন্সুরেন্সের কাজ হারাম। এটা জায়েয নেই। এখন আমি আপনার কাছে সত্যায়ন করতে এসেছি যে, বাস্তবে এটা হালাল, না হারাম?

আমি তাকে বললাম যে, বর্তমানে ইন্সুরেন্সের যতোগুলো পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, সেগুলোর কোনোটির মধ্যে রয়েছে সুদ, কোনোটির মধ্যে রয়েছে জুয়া, এজন্যে সে সবই হারাম। এ কারণে ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে চাকুরি করাও জায়েয নেই। তবে আমাদের বড়োরা বলেন যে, কেউ যদি ব্যাংক বা ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে চাকুরি করে, তাহলে তার উচিত নিজের জন্যে অন্য কোনো হালাল ও জায়েয জীবিকার সন্ধান করা। এমন গুরুত্ব ও চেষ্টার সাথে সন্ধান করবে, যেমন একজন বেকার লোক করে থাকে। যখন অন্য কোনো হালাল উপায় পেয়ে যাবে, তখন এই হারাম মাধ্যম ছেড়ে দিবে। আমাদের বড়োরা এ কথা এজন্যে বলেন যে, জানা তো নেই কার কি অবস্থা। কেউ যদি সাথে সাথে হারাম উপায় ছেড়ে দেয়, তাহলে পেরেশানিতে পড়তে পারে। তখন শয়তান এসে তাকে ফুসলাবে যে, দেখো! তুমি দ্বীনের উপর

আমল করার ফলে তোমার উপর এই বিপদ এসেছে। এজন্যে আমাদের বড়োরা বলেন, সাথে সাথে এই হারাম চাকুরি ছেড়ো না, বরং অন্যত্র চাকুরির খোঁজ করো। হালাল জীবিকার ব্যবস্থা হলে তখন এটা ছেড়ে দাও।

আমার এই উত্তর শুনে ঐ যুবক বললো যে, মাওলানা ছাহেব! আমি আপনার কাছে এ পরামর্শ নিতে আসিনি যে, চাকুরি ছাড়বো কি ছাড়বো না। আমি শুধু জিজ্ঞাসা করতে এসেছি যে, এ কাজ হালাল না হারাম। আমি তাকে বললাম, হালাল-হারাম হওয়ার বিষয় আমি তোমাকে বলেছি। সাথে বুযুর্গদের শোনা কথাও বলে দিয়েছি। ঐ যুবক বললো, আপনি আমাকে এই মশওয়ারা দিবেন না যে, চাকুরি ছাড়বো কি ছাড়বো না। আপনি পরিষ্কার ভাষায় আমাকে বলুন এই চাকুরি হালাল কি না? আমি বললাম, হারাম। ঐ যুবক বললো, বলুন, এটা আল্লাহ হারাম করেছেন, না আপনি হারাম করেছেন? আমি বললাম, আল্লাহ হারাম করেছেন। ঐ যুবক বললো, যে আল্লাহ এটাকে হারাম করেছেন, তিনি আমাকে রিযিক থেকে মাহরুম করবেন না। এ কারণে আমি এখন এখান থেকে আর ঐ অফিসে ফিরে যাবো না। আল্লাহ যখন হারাম করেছেন, তখন তিনি আমার উপর রিযিকের দরজা বন্ধ করবেন না। এজন্যে আমি আজ থেকে এটা ছেড়ে দিলাম।

অমুসলিমরা ইসলামের মূলনীতি পালন করছে

একবার আমি হযরত ওয়ালেদ ছাহের রহ.-এর সঙ্গে ঢাকার সফরে যাই। বিমানের সফর ছিলো। পথে আমার বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। আপনারা দেখে থাকবেন বিমানের বাথরুমে ওয়াশ বেসিনের উপর লেখা থাকে,

'ওয়াশ বেসিন ব্যবহার করে কাপড় দিয়ে মুছে তা পরিষ্কার ও শুষ্ক করুন, যাতে পরবর্তী ব্যবহারকারীর ঘৃণা না জন্মে।'

আমি বাথরুম থেকে ফিরে এলে হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বললেন, বাথরুমে ওয়াশ বেসিনে যেই কথা লেখা আছে, তা সেকথাই যা আমি তোমাদেরকে বারবার বলে থাকি যে, অন্যকে কষ্ট থেকে বাঁচানো দ্বীনের অংশ। যা এই অমুসলিমরা অবলম্বন করেছে। এর ফলে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে তাদেরকে উন্নতি দান করেছেন। আমরা এসব বিষয়কে দ্বীনের গণ্ডি থেকে বের করে দিয়েছি। দ্বীনকে শুধু মাত্র নামায-রোযার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছি। মুআশারাতের এসব আদবকে একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। যার ফলে আমরা অধঃপতন ও অবনতির দিকে যাচ্ছি। এর কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা এই দুনিয়াকে উপকরণের জগত বানিয়েছেন। এখানে যেমন উপকরণ অবলম্বন করবে, আল্লাহ তা'আলা তার তেমনই ফলাফল দান করবেন।

সৌদী আরবের এক দোকানীর ঘটনা

১৯৬৩ ঈসায়ীতে আমি যখন সৌদি আরব যাই, তখন সেখানকার এক অধিবাসী নিজে আমাকে তার ঘটনা শুনিয়েছেন যে, 'একবার আমি কাপড় ক্রয় করার জন্যে বাজারে যাই। একটি দোকানে প্রবেশ করে অনেকগুলো কাপড় দেখি। দোকানদার অত্যন্ত ভদ্রজনোচিতভাবে আমাকে অনেকগুলো কাপড় দেখাতে থাকেন। অবশেষে আমি একটি কাপড় পছন্দ করি। দোকানদার আমাকে কাপড়ের মূল্য বলে দেয়। দোকানদারকে আমি বলি– এই কাপড়টি আমাকে এতো গজ কেটে দিন। আমার কথা শুনে দোকানদার এক মূহূর্তের জন্যে নীরব থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কাপড় কি আপনার পছন্দ হয়েছে? আমি বললাম, জি, হ্যাঁ। তিনি বললেন, দাম আপনার বুঝমতো হয়েছে কি? আমি বললাম, জি, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে আপনি আমার এই সম্মুখের দোকানে যান এবং সেখান থেকে এই কাপড় একই মূল্যে ক্রয় করুন। তার কথা শুনে আমি খুব আশ্চর্যান্বিত হলাম। আমি তাকে বললাম, আমি ঐ দোকানে কেন যাবো? আমি তো আপনার সাথে কারবার করেছি। তিনি বললেন, এ নিয়ে আপনার বির্তকে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনার যে কাপড় প্রয়োজন, তা ঐ দোকানে আছে এবং এই মূল্যেই আপনি পেয়ে যাবেন। আপনি সেখান থেকে নিয়ে নিন। আমি বললাম, প্রথমে আপনি এর কারণ বলুন। ওটি কি আপনারই দোকান? তিনি বললেন, না। এবার আমিও জিদ ধরলাম। আমি বললাম, যতোক্ষণ আপনি এর কারণ না বলবেন, আমি ঐ দোকানে যাবো না। অবশেষে তিনি নিরুপায় হয়ে বললেন, আপনি অনর্থক কথা বাড়াচ্ছেন। ব্যাপারটি মাত্র এই যে, আমার নিকট সকাল থেকে এ পর্যন্ত অনেক গ্রাহক এসেছে এবং এ পরিমাণ মাল বিক্রি হয়েছে যে, আজকের দিনের জন্যে তা আমার যথেষ্ট হবে। কিন্তু আমি লক্ষ করলাম যে, আমার প্রতিবেশী দোকানদার সকাল থেকে খালি বসে আছে। তার নিকট কোনো গ্রাহক আসেনি। তাই আমি চাচ্ছি যে, তারও কিছু বিক্রি হোক। আপনি সেখানে গেলে তার উপকার হবে, এতে আপনার তো কোনো ক্ষতি নেই?

জনৈকা ইংরেজ নারীর ঘটনা

গেল বছর আমার লন্ডনের সফর হয়েছিলো। ট্রেনযোগে লন্ডন থেকে এডিনবরা যাচ্ছিলাম। পথে বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন পড়লো। বাথরুমের কাছে গিয়ে দেখি এক ইংরেজ মহিলা দরজায় দাঁড়ানো। ভাবলাম ভেতরে লোক আছে। মহিলা অপেক্ষা করছে। ভেতরের লোকটি বের হলে সে যাবে।

আমি ফিরে এসে নিজ আসনে বসে গেলাম। অনেকক্ষণ বসে থাকার পরও যখন দেখলাম মহিলা যথারীতি দাঁড়িয়ে আছে, ভেতর থেকে কেউ বের হচ্ছে না, তখন আমি আবারও সেখানে গেলাম। গিয়ে দেখি দড়জায় লেখা আছে ভেতর খালি আছে, কেউ নেই। আমি মহিলাকে বললাম, ভেতরে তো কেউ নেই, আপনি ইচ্ছা করলে যেতে পারেন। মহিলা বললো, আসলে আমিই বাথরুমে গিয়েছিলাম। প্রয়োজন শেষে যখন ফ্ল্যাশ করতে যাবো, এমন সময় গাড়ি স্টেশনে পৌছে দাঁড়িয়ে গেছে। নিয়ম হলো গাড়ি যতক্ষণ প্লাটফরমে দাঁড়ানো থাকবে ততক্ষণ বাথরুম ব্যবহার করা বা পানি ঢালা যাবে না। তাই আমি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি। গাড়ি ছাড়লে ফ্ল্যাশ করবো এবং কমোট পরিষ্কার করে তারপর সিটে ফিরে যাবো।

চিন্তা করে দেখুন! যেহেতু ফ্ল্যাশ করা হয়নি, কেবল এ কারণেই মহিলা দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। আর ফ্ল্যাশও করতে পারছে না কেবল এ কারণে যে, গাড়ি প্লাটফরমে দাঁড়ানো অবস্থায় পানি ঢালা নিষেধ। ঢাললে তাতে আইন অমান্য করা হবে। এ সময় আমার হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-এর কথা মনে পড়লো। তিনি বলতেন, টয়লেটে পানি ঢালার কাজকে গুরুত্ব দেওয়া এবং পরের লোকটি যাতে কষ্ট না পায় সেজন্যে যথারীতি ফ্ল্যাশ করা মূলত দ্বীনেরই শিক্ষা, কিন্তু একজন অমুসলিম দ্বীনের এ শিক্ষাকে যেই গুরুত্বের সাথে মান্য করছে, বলুন তো আমরা কজন সেই গুরুত্বের সাথে এটা পালন করি? সম্মিলিত ব্যবহারের কোনও বস্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা অন্যের সুবিধার প্রতি কতটুকু লক্ষ রাখি? আমরা তো টয়লেট ব্যবহারের পর অমনিই নোংরা রেখে দিয়ে আসি। যেন মনে করি পরবর্তী লোক কীভাবে ব্যবহার করবে না করবে তা তার বিষয়। আমার কাজ তো সারলাম!

রিযিকের ব্যবহার

আমার স্মরণ আছে যে, আমি প্রথমবার যখন একটি সরকারি নৈশ ভোজে অংশগ্রহণ করি, তখন আমার জানা ছিলো না যে, ড্রাইভারদের জন্যে খাবারের ব্যবস্থা থাকবে কি না। সুতরাং আমি সতর্কতা স্বরূপ ড্রাইভারকে খাবারের জন্যে টাকা দিয়ে বলি যে, এখানে খাবারের ব্যবস্থা না থাকলে কোনো হোটেলে খেয়ে নিও। আমি ভিতরে পৌছলাম। আমার টেবিলে একজন উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার আমার সঙ্গেই বসাছিলেন। তিনি দেশের দরিদ্রদের দুরাবস্থার বিষয়ে অত্যন্ত দরদমাখা লেকচার দিচ্ছিলেন। সেই লেকচারে জনসাধারণের অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যের কারণে ব্যথা-বেদনাও

প্রকাশ করা হচ্ছিলো। নিজেরদের অর্থব্যবস্থার নিন্দাবাদও ছিলো। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের প্রশংসাও ছিলো। স্বদেশের পূজিবাদ, জায়গিরদার ও সমাজতন্ত্রবিরোধী লোকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আপত্তিও ছিলো। তার আলোচনার এ বিষয়বস্তু শেষ হলে খাবার শুরু হয়। সেখানে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা হতে থাকে। তখন আমি তাকেই বললাম, 'মনে হচ্ছে এখানে ড্রাইভারদের খাবারের কোনো ব্যবস্থা নেই।'

তিনি বললেন, জি হাঁ, এই পর্যায়ের দাওয়াতে সাধারণত এ ব্যবস্থা থাকে না। আমি বললাম, আমার তো এটা খুবই খারাপ লাগে যে, আমরা এখানে খানা খাচ্ছি আর আমাদের ড্রাইভাররা বাহিরে, ক্ষুধার্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। একথার উত্তরে তিনি যথেষ্ট অবজ্ঞার সূরে বললেন, জি হাঁ, এটা তো কষ্টকর বিষয়ই, কিন্তু এতোগুলো ড্রাইভারের ব্যবস্থা করাও তো মুশকিল। আর তারা এতে অভ্যস্তও। পরবর্তীতে বাড়িতে গিয়ে খেয়ে নেয়।

সেই দাওয়াতে আমি ডেগে ও পাতিলে বেঁচে যাওয়া খানা অনুমান করলাম, তো আমার প্রবল ধারণা হলো যে, এর সাথে সামান্য পরিমাণ বৃদ্ধি করলে সকল ড্রাইভারের জন্যে যথেষ্ট হতো। ভোজের পর সেখানে বক্তব্যের ধারাও চলছিলো। তা এতো দীর্ঘ হয় যে, এগারটার পরে আমরা সেখান থেকে রওয়ানা হতে পারি। পথে আমি আমার ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করি, তোমার খানার কি ব্যবস্থা হলো? সে বললো, আমি আর আমার কতক সাথী নিকটবর্তী একটি হোটেলে খাবার খেয়ে নেই। তারপর সে নিজেই বললো, তবে কতক ড্রাইভারের নিকট খাবারের টাকা ছিলো না, তারা এখনো না খেয়ে আছে। উদাহরণস্বরূপ সে কয়েকজন ড্রাইভারের কথা উল্লেখ করলো। তারপর বললো যে, তারা এখন তাদের সাহেবদেরকে বাসায় পৌছিয়ে বাসে চড়ে নিজেদের বাসায় যাবে এবং বারটা-একটার দিকে বাসায় পৌছে খানা খাবে।

মিথ্যা মেডিকেল সার্টিফিকেট: একটি মারাত্মক অপরাধ

আফসোস! মিথ্যা এখন মহামারিতে পরিণত হয়েছে। এমনকি যেসব লোক হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েয বিচার করে এবং শরীয়তের উপর চলার চেষ্টা করে তাদেরকে পর্যন্ত দেখা যায় বিভিন্ন রকম মিথ্যাচারে অবলীলায় জড়িয়ে পড়ে। তারা সেগুলোকে মিথ্যার সীমারেখা থেকে খারিজ করে দিয়েছে। মনে করে তা আদৌ মিথ্যা নয়। অথচ যে কাজ করছে তা মিথ্যা এবং যা বলছে তা অসত্য। এতে তো দু'রকম অপরাধ। প্রথমত মিথ্যা বলার অপরাধ, আর দ্বিতীয়ত পাপকে পাপ মনে না করার অপরাধ।

এক ব্যক্তি বেশ নেককার। নামায-রোযায় যত্নবান। যিকির-আযকারেও নিয়মিত। বুযুর্গানে দ্বীনের সাথেও সম্পর্ক রাখে। বিদেশে থাকে। একবার দেশে ফিরলে তিনি আমার সাথে মোলাকাত করতে আসলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি ফিরে যাচ্ছেন কবে? বললেন, আরও আট-দশ দিন থাকার ইচ্ছা। ছুটি তো শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে ছুটি বৃদ্ধির জন্যে গতকালই একটি মেডিকেল সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দিয়েছি।

তিনি মেডিকেল সার্টিফিকেট পাঠানোর কথাটা এমন সহজভাবে বললেন, যেন এটা একটা তুচ্ছ ব্যাপার। এ নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, মেডিকেল সার্টিফিকেট বিষয়টা কী? তিনি উত্তর দিলেন, বাড়তি ছুটির জন্যে এটা পাঠাতে হয়েছে। এমনি আবেদন করলে ছুটি পাওয়া যেতো না। এখন ছুটি পাওয়া যাবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সার্টিফিকেটে আপনি কী লিখেছেন? তিনি বললেন, তাতে লেখা হয়েছে, এই ব্যক্তি অসুস্থ, সফর করার উপযুক্ত নয়। আমি বললাম, দ্বীন কি শুধু নামায-রোযার নাম? যিকির-আযকারের নাম? বুযুর্গানে দীনের সাথে আপনার সম্পর্ক, তা সত্ত্বেও এরূপ মেডিকেল সার্টিফিকেট ব্যবহার করছেন? লোকটি যেহেতু নেককার, তাই পরিস্কার স্বীকার করলো, আমি আজ এই প্রথমবার শুনলাম যে, এটা একটা অন্যায় কাজ। আমি বললাম, এটা কি মিথ্যা নয়? মিথ্যা বলা কি এ ছাড়া অন্য কিছু? তিনি বললেন, তা হলে অতিরিক্ত ছুটি কীভাবে নেওয়া যাবে? বললাম, যে পরিমাণ ছুটি আপনার প্রাপ্য কেবল তাই নেবেন। তার বেশি দরকার হলে তা বিনা বেতনেই নেবেন। এই মিথ্যা সার্টিফিকেটের তো কোনো বৈধতা নেই।

আজকাল মানুষ মনে করে মিথ্যা মেডিকেল সার্টিফিকেট বানানো মিথ্যার অন্তর্ভুক্তই নয়। কেবল নামায-রোযার মধ্যেই দ্বীনকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অবলীলায় মিথ্যা বলছে। তা যে দ্বীন-বিরোধী কাজ সেদিকে কোনো খেয়ালই নেয়।

একজন বেশ উচ্চ শিক্ষিত নেককার সমঝদার ব্যক্তি আমার কাছে একটি চিঠি পাঠালেন। আমি তখন জিদ্দায়। তাতে লেখা ছিলো, পত্রবাহক লোকটি ইন্ডিয়ান। সে পাকিস্তান যেতে চাচ্ছে। আপনি এ মর্মে পাকিস্তানী দূতাবাসে সুপারিশ করে দিন যে, সে একজন পাকিস্তানী নাগরিক। তার পাসপোর্ট এখানে সৌদী আরবে হারিয়ে গেছে। তাকে একটি পাকিস্তানী পাসপোর্ট দিয়ে দিন। সে নিজেও দূতাবাসে দরখাস্ত জমা দিয়ে রেখেছে যে, তার পাসপোর্ট হারিয়ে গিয়েছে। সুতরাং আপনি তার জন্যে সুপারিশ করবেন।

এবার আপনারা বলুন! একদিকে তো হজ্জ ও ওমরা করা হচ্ছে, তাওয়াফ ও সাঈ-ও করা হচ্ছে, অন্যদিকে এরূপ মিথ্যা ও প্রতারণাও করা হচ্ছে! এটা যেন দ্বীনের অংশ নয়। দ্বীনের সাথে এর যেন কোনো সম্পর্ক নেই? মানুষ যেন মনে করে যে, যখন মিথ্যাকে যথারীতি মিথ্যা মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে বলা হবে, কেবল তখন মিথ্যা হবে। কিন্তু ডাক্তার দ্বারা মিথ্যা সার্টিফিকেট বানানো, মিথ্যা সুপারিশ করানো বা মিথ্যা মামলা সাজানো– এসব কোনো মিথ্যা নয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝

মানুষ মুখে যে কথাই উচ্চারণ করে, এক সদাতৎপর প্রহরী উপস্থিত থেকে তা সঙ্গে-সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে ফেলে।[২২২]

আমার একটি কিতাব সংকলনের ঘটনা

আজ থেকে প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগের ঘটনা। সে সময় মরহুম আইয়ুব খানের আমলে 'পারিবারিক আইন' নামে (ইসলামের পারিবারিক আইন পরিপন্থি একটি আইন) জারী করা হয়েছিলো। যা ছিলো শরীয়তবিরোধী আইন। একব্যক্তি সেই আইনের পক্ষে একটি কিতাব লেখে। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. আমাকে বলেন, এর উত্তর লেখো। আমি সবেমাত্র দাওরায়ে হাদীস ফারেগ হয়েছি। আবেগ-উদ্দীপনাও ছিলো। মগজে খান্নাসও ছিলো। সাহিত্যপূর্ণ এবং প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার মতো তীর্যক বাক্য লেখার প্রতি বিশেষ আগ্রহও ছিলো। যাইহোক, আমি আমার আঙ্গিকে পারিবারিক আইনের পক্ষে যে ব্যক্তি কিতাব লেখেছিলো তার বিরুদ্ধে একটি কিতাব লেখি। তীর্যক বাক্য লেখি। সাহিত্যপূর্ণ বাক্যে তাকে ঘায়েল করি আর খুশি হই যে, খুব যুতসই বাক্য বসিয়েছি। লেখা শেষ হলে হযরত ওয়ালেদ মাজেদ রহ.-কে পুরোটা শোনাই। কিতাবটি ছিলো প্রায় দুইশ পৃষ্ঠার। দুই শ' পৃষ্ঠার এই কিতাব শুনে শেষ করার পর হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বললেন, তুমি সাহিত্যের দিক থেকে তো খুব উন্নত মানের কিতাব লিখেছো এবং তথ্য-উপাত্তের দিক থেকেও তা উন্নত মানের হয়েছে। কিন্তু তুমি বলো– এই কিতাব লেখার পিছনে তোমার উদ্দেশ্য কী ছিলো? যে সব লোক ভ্রান্ত পথে চলছে তাদেরকে সঠিক পথ দেখানো তোমার উদ্দেশ্য, নাকি যে সব লোক আগে থেকেই তোমার পক্ষের তাদের থেকে বাহবা কুড়ানো তোমার উদ্দেশ্য?

---

২২২. সূরা ক্বাফ, আয়াত: ১৮

তোমার পক্ষের লোকদের থেকে প্রশংসা কুড়ানো যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে তোমার কিতাব খুব সফল। আর এর ফলে তোমার পক্ষের লোকদের কাছে যখন এ কিতাব পৌছবে, তখন তারা খুব প্রশংসা করবে। তারা বলবে- কেমন দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছে! বড়ো সাহিত্যপূর্ণ লেখা লিখেছে! মানুষ খুব প্রশংসা করবে। আর যদি বিপথগামী লোকদেরকে সঠিক পথে আনা তোমার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তোমার কিতাবের এক কড়িও মূল্য নেই। কারণ, তুমি তাদের বিরুদ্ধে এমন এমন বাক্য লিখেছো, যেগুলো দেখে তাদের মনে তোমার বিরুদ্ধে জিদ তৈরি হবে। ফলে তারা হক তলবের উদ্দেশ্যে তোমার কিতাব পড়বে না। পরিণতিতে শত্রুতা সৃষ্টি হবে।

যাইহোক, আমার ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বললেন, তুমি এ কিতাবে যে তরীকা অবলম্বন করেছো তা নবীগণের তরীকা নয়। নবীসুলভ দাওয়াতের তরীকা নয়। ইসলাহের তরীকা এটা নয়। এটা ফাসাদ বিস্তারের তরীকা। এর কারণে যদি কেউ হক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তার গোনাহ তোমার উপর বর্তাবে। তাই এটা সঠিক পদ্ধতি নয়। আলহামদু লিল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আমার উপর ফযল ও করম করেছিলেন ফলে হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-এর কথা আমার অন্তরে বসে গিয়েছিলো। আলহামদু লিল্লাহ, তখন আমি বললাম, হযরত! আমি আপত্তিকর সব কথা ঠিক করে পুনরায় লিখবো। সুতরাং আমি ঐ দুই শ' পৃষ্ঠা কিতাবের আপত্তিকর সব কথা ঠিক করে এবং তীর্যকপূর্ণ সমস্ত বাক্য ও উপস্থাপন বাদ দিয়ে নতুন করে কিতাব লিখি। যা এখন 'হামারে আয়েলী মাসায়েল' (ہمارے عائلی مسائل) নামে ছেপে বের হয়েছে।

সে সময় আর এ সময়ের মধ্যে কতো পার্থক্য! এখন তো এ কথা দিলে বসে গিয়েছে যে, একজন সত্যের পথে আহ্বানকারীর জন্যে তীর্যক ও তিরস্কারের পন্থা অবলম্বন করা ঠিক নয়। এটি নবীগণের তরীকা নয়।

বারবাডোজের একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

ওয়েষ্ট ইন্ডিজের একটা দ্বীপের নাম 'বারবাডোজ'। একবার সেখানে সফর হয়েছিলো। সেখানে অতীব শিক্ষণীয় একটি ঘটনা দেখলাম। এক লোকের জিহ্বা আছে এবং তা রীতিমতো নড়াচড়াও করে কিন্তু তার কণ্ঠনালিতে এমন এক রোগ দেখা দিয়েছে, যদ্দরুন জিহ্বা নাড়াচড়া সত্ত্বেও কোনও শব্দ বের হয় না। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে তাকে একটি যন্ত্র দেওয়া হয়েছে। সেটি সর্বদা তার হাতে থাকে। সে কোনও কথা বলতে চাইলে সেটি

তার কণ্ঠনালিতে সজোরে চেপে ধরে। তাতে চাপ দিলে তার কথার শব্দ বের হয়। কিন্তু তা কোনো মানুষের শব্দ মনে হতো না। মনে হতো কোনো জন্তু-জানোয়ারের শব্দ। তা শুনে আপনাআপনি শিশুদের হাসি পেতো। তবে এর মাধ্যমে সে কোনও মতে নিজের কথা অন্যকে বোঝাতে সক্ষম হতো।

আমি তার চরম অস্থিরতা লক্ষ করছিলাম যে, তার মাথায় কোনো কথা এলে সাথে সাথে তা বলতে পারছিলো না। যন্ত্রটি কণ্ঠনালিতে চাপ দিয়ে বসালে তবে আওয়াজ বের হতো। এভাবে মাথায় কোনো ভাবনা আসা ও মুখ দিয়ে তা বলার মাঝে যেই ছেদ পড়তো, সেই সময়টুকু খুব অস্থিরভাবে পার হতো।

মায়ের পা ধরে ক্ষমা চাও!

আমার এক বন্ধু অত্যন্ত মেজাযী মানুষ। রাগ উঠলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। এমনকি মা-ও যদি কিছু বলে, তার সাথেও রাগারাগি শুরু করে দেয়। আমাকে বারবার জিজ্ঞাসা করে, ফজরে কী যিকির করবো, যোহরে কী তাসবীহ পড়বো ইত্যাদি। আমি তাকে বলেছি, তোমাকে কিছুই করতে হবে না। কেবল মায়ের কাছে ক্ষমা চাইবে। তার পা জড়িয়ে ধরে বলবে, আমার অন্যায় হয়ে গেছে ক্ষমা করে দিন। এ কথা শুনে অবাক হয়ে বললো, হযরত! তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবো? এটা তো অনেক কঠিন। আমি বললাম, তোমাকে তা করতেই হবে। তার পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাইতে হবে। আর এটা করবে সকল ভাইবোনের সামনে। সে বললো, অনেক কঠিন কাজ। আমি বললাম, যতো কঠিনই হোক! তোমাকে এভাবে তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। সকল ভাইবোনের সামনে মায়ের পা ধরে ক্ষমা চাওয়াটা তার কাছে যারপরনাই কঠিন মনে হচ্ছিলো। যা হোক, শেষ পর্যন্ত সে তা করলো। তারপর এসে আমাকে বললো, হযরত! কী বলবো, তখন আমার বুকের উপর দিয়ে যেন সাপ বেয়ে নামছিলো, মাথার উপর যেন করাত চলছিলো। বললাম, আমি তো সেটাই চাচ্ছিলাম। বার কয়েক তাকে দিয়ে এটা করালে তার মেজায ঠিক হয়ে গেলো।

বস্তুত এসব করতে মনে অনেক চাপ পড়ে। কিন্তু কখনও কখনও এছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কয়েক মাত্রায় এই তেতো ওষুধ গিলতে পারলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে শিফা লাভ হয়। তিনি এই কঠিন রোগ থেকে মুক্তি দান করেন। তবে এ কাজও শায়েখের তত্ত্বাবধানে করা উচিত। নিজের বুদ্ধিতে করা ঠিক নয়। নিজের পক্ষ থেকে ওষুধ নির্বাচন অনেক সময় ক্ষতির কারণ

হয়ে থাকে। ফল উল্টো হয়। কেননা কোন ওষুধ কী মাত্রায় দিতে হবে তা শায়েখই ভালো বোঝেন। প্রয়োজনের বেশি মাত্রায় দিলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয়, আবার কম দিলেও কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায় না। তাই এলাজ করাতে হবে শায়েখের দ্বারাই।

কুদরতের বিস্ময়কর কারিশমা

একবার আমি দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে রেলগাড়িতে সফর করছিলাম। পথে একজায়গায় পাহাড়ী এলাকায় গাড়ি দাঁড়িয়ে গেলো। আমরা নামায পড়ার জন্যে নীচে নামলাম। সেখানে আমি একটি খুব সুন্দর গাছের চারা দেখতে পেলাম। তার পাতা ছিলো খুবই চমৎকার। দেখতে খুবই আকর্ষণীয় মনে হচ্ছিলো। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার পাতা ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো। আমি পাতা ছেঁড়ার জন্যে হাত বাড়ানোর সাথে সাথে আমার পথপ্রদর্শক চিৎকার করে উঠলেন। বললেন, হযরত এতে হাত লাগাবেন না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? তিনি বললেন, এটা মারাত্মক বিষাক্ত গাছ। এর পাতা দেখতে তো খুবই সুন্দর, কিন্তু তা এতোই বিষাক্ত যে, স্পর্শ করার সাথে সাথে মানুষের দেহে বিষক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। বিচ্ছু দংশন করলে যেভাবে বিষক্রিয়া শুরু হয়, এই গাছ স্পর্শ করলেও সেভাবে বিষক্রিয়া শুরু হয়। আমি বললাম, আল্লাহর শোকর আমি হাত লাগাইনি। হাত লাগানোর আগেই এর বিষক্রিয়ার কথা জানতে পেরেছি। এটা তো মারাত্মক জিনিস! অথচ দেখতে খুবই সুন্দর! তারপর আমি বললাম, ব্যাপারটা তো খুবই বিপজ্জনক! আপনি আমাকে বলেছেন, তাই আমি বেঁচে গিয়েছি। কিন্তু কোনো অজানা মানুষ যদি হাত লাগায় তাহলে তো বেচারা বিপদে পড়ে যাবে।

এ কথা বলায় তিনি এর চেয়েও বিস্ময়কর কথা শোনালেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার কুদরতের বিস্ময়কর কারিশমা এই যে, যেখানেই এই বিষাক্ত গাছ থাকে, তার আশে পাশেই আরেকটি চারা গাছ অবশ্যই থাকে। এই বিষাক্ত চারায় কোনো মানুষের হাত লেগে গেলে অপর গাছটির পাতায় হাত দিলে সাথে সাথে তার বিষক্রিয়া শেষ হয়ে যায়। সুতরাং তিনি ঐ গাছের গোড়াতেই এর প্রতিষেধক চারাটিও দেখালেন।

একই দৃষ্টান্ত আমাদের গোনাহের এবং তাওবা-ইস্তিগফারের। গোনাহের বিষক্রিয়া শুরু হওয়ার সাথে সাথে তাওবা ও ইস্তিগফারের প্রতিষেধক ব্যবহার করলে অবিলম্বে সেই বিষক্রিয়া শেষ হয়ে যাবে।

কথার হাত-পা

আমার কাছে প্রায় পাঁচ-দশ জায়গা থেকে চিঠি আসে। তারা লেখে যে,

'এক ব্যক্তি তার বয়ানের মধ্যে আপনার সাথে সম্পৃক্ত করে মাসআলা বর্ণনা করছিলো যে, আপনি বলেছেন, টেপ রেকর্ডারে কুরআনে কারীম শোনা গান শোনার চেয়ে বড়ো গোনাহ।'

আমার ফেরেশতারাও জানে না যে, আমি কখনো এরূপ মাসআলা বর্ণনা করেছি। আমি যখন চিন্তা করলাম, এ কথার উৎস কী? তখন বুঝতে পারলাম, একবার এক মজলিসে আমি ওয়ায করেছিলাম। সেই মজলিসের এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলো, টেপ রেকর্ডারে কুরআনে কারীম শোনার সময় তিলাওয়াতের সিজদা আসলে সিজদা ওয়াজিব হবে কি না? আমি জবাব দিয়েছিলাম, টেপ রেকর্ডারে যেই তিলাওয়াত হয় সেটা প্রকৃত তিলাওয়াতের বিধান রাখে না। এজন্যে তা শুনলে তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব হবে না। আমি যেহেতু বলেছিলাম, টেপ রেকর্ডারের তিলাওয়াত প্রকৃত তিলাওয়াতের সমান নয়, তাই এখান থেকে তারা এ কথা বুঝেছে যে, তাহলে সে তিলাওয়াত হারাম ও নাজায়েয। এরপর নিজের পক্ষ থেকে অন্যের কাছে বলেছে যে, ঐ তিলাওয়াত গান শোনার চেয়েও নিকৃষ্ট। এ ব্যক্তি জেনে বুঝে মিথ্যা বলেনি। কিন্তু অসতর্কতা ও অসাবধানতার ফলে নিজের চিন্তাকে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে।

অল্প কয়েকদিন পূর্বে জনাব ভাই কালীম ছাহেব আমাকে বলছিলেন যে, যে এলাকায় ভূমিকম্প হয়েছে, আমার দিকে সম্পৃক্ত হয়ে সেখানে একথা ছড়িয়ে পড়েছে যে, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি, তাতে বলা হয়েছে, রমাযানুল মুবারকের কারণে আল্লাহ তা'আলা ভূমিকম্প হালকা করেছেন। ঈদের পরে এর চেয়ে বড়ো ভূমিকম্প হবে। এখন আমার কাছে বিভিন্ন দিক থেকে টেলিফোন আসছে যে, আপনি কি এ স্বপ্ন দেখেছেন? আল্লাহ জানেন এ কথা কোত্থেকে বের হলো এবং কীভাবে ছড়ালো। আগের কথাটির তো কিছু হলেও উৎস খুঁজে পেয়েছিলাম, কিন্তু একথার কোনো উৎসই আমি খুঁজে পাচ্ছি না যে, কোত্থেকে একথা বের হলো।

মোটকথা, অন্যের কাছে কথা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সতর্কতা নেই। মানুষ যেন কোনো ভুল কথা না বলে, শরীয়ত এবং দ্বীন এ বিষয়ে যতো বেশি গুরুত্বারোপ করেছে, আজ আমরা ততো বেশি অসতর্কতা অবলম্বন করছি। যার ফলে অনেক ফেৎনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ছে। উড়ো কথা ছড়িয়ে পড়ছে। হয় একজনের কথা আরেকজনের কাছে বলবেনই না, আর যদি বলতেই হয়,

তাহলে আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের উপর দয়া করুন এবং যে কথা অন্যের কাছে পৌছাবেন তা ঠিকভাবে মনে রেখে তারপর তা আরেকজনের কাছে বর্ণনা করুন।

মানুষের কিডনির মূল্য

করাচীতে একজন কিডনি বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। তাকে একবার আমার ভাই ছাহেব জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনারা একমানুষের দেহ থেকে কিডনি নিয়ে অন্য মানুষের দেহে স্থাপন করেন। এখন তো বিজ্ঞান অনেক উন্নতি করেছে, তাই কৃত্রিম কিডনি তৈরী করা হয় না কেন? যাতে অন্য মানুষের কিডনি ব্যবহার করার প্রয়োজনই না পড়ে। তিনি হেসে উত্তর দিলেন– প্রথমত, বিজ্ঞান উন্নতি করা সত্ত্বেও কৃত্রিম কিডনি বানানো খুবই কঠিন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা কিডনির মধ্যে এমন একটি ছাঁকনি লাগিয়ে দিয়েছেন। যা এতই সূক্ষ্ম ও পাতলা যে, এখনো পর্যন্ত এমন কোনো যন্ত্র আবিষ্কার হয়নি, যা এতো সূক্ষ্ম ও পাতলা ছাঁকনি বানাতে পারে। ধরুন, এমন কোনো যন্ত্র যদি আবিষ্কার করাও হয়, তবুও তা তৈরি করতে মিলিয়ন মিলিয়ন রূপী ব্যয় হবে। আর যদি এতো বিশাল অঙ্কের টাকা ব্যয় করে এমন ছাঁকনি তৈরীও করা হয়, তবুও কিডনির মধ্যে এমন একটি জিনিস রয়েছে, যা বানানো আমাদের সাধ্যের বাইরে। তা হলো, আল্লাহ তা'আলা কিডনির মধ্যে একটি ব্রেইন সৃষ্টি করেছেন, যা সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে যে, এ লোকের দেহে কী পরিমাণ পানি রাখা উচিৎ, আর কী পরিমাণ পানি বের করে দেওয়া উচিত। প্রত্যেক মানুষের কিডনি ঐ মানুষের অবস্থা, দেহের আকার ও তার ওজন অনুপাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, কী পরিমাণ পানি তার দেহে থাকা উচিত, আর কী পরিমাণ বের করে দেওয়া উচিত। তার এ সিদ্ধান্ত শতভাগ সঠিক হয়ে থাকে। এর ফলে দেহের প্রয়োজন পরিমাণ পানি সে রেখে দেয়, আর অতিরিক্তটুকু পেশাবের আকারে বের করে দেয়। তাই আমরা যদি মিলিয়ন মিলিয়ন রূপী ব্যয় করে রাবারের কৃত্রিম কিডনি তৈরি করি, তবুও আমরা তার মধ্যে সেই ব্রেইন দিতে পারবো না, যা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের কিডনিতে সৃষ্টি করেছেন।

মাআরিফুল কুরআনের ইংরেজী তরজমার একটি ঘটনা

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. উর্দূ ভাষায় 'মাআরিফুল কুরআন' নামে কুরআনে কারীমের একটি প্রসিদ্ধ তাফসীর লিখেছেন। মানুষ তা দ্বারা খুব উপকার লাভ করছে। আমার ইচ্ছা

ছিলো, তাফসীরটির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ হোক। এক ব্যক্তি ইংরেজীতে অনুবাদের কাজ শুরু করলো। যখন তিনি সূরা বাকারার 'إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ' আয়াতের তাফসীর পর্যন্ত পৌঁছলো, তখন তার ইন্তিকাল হয়ে গেলো। লোকটি খুব দক্ষ অনুবাদক ছিলো। সুন্দর অনুবাদ করছিলো। তার ইন্তিকালের পর আমি একজন দক্ষ অনুবাদকের সন্ধান করলাম। কিন্তু বহু খোজাখুঁজির পরও সে রকম দক্ষ অনুবাদকের সন্ধান পেলাম না। এরই মধ্যে আমার মক্কা মুকাররমায় উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়। ওমরা আদায় শেষে মুলতাযামে গিয়ে অন্যান্য দু'আর সঙ্গে এই দু'আও করি যে, হে আল্লাহ! আপনার কালামে পাকের তাফসীরের ইংরেজী অনুবাদের কাজ করাতে হবে, উপযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান পাচ্ছি না, হে আল্লাহ! আপনি দয়া করে এমন একজন উপযুক্ত ব্যক্তি দান করুন, যে কাজটিকে পূর্ণতায় পৌঁছিয়ে দিতে পারে।

এই দু'আ করে দেশে ফেরার পর আমার অফিসে আমাকে একজন জানায় যে, আপনার অনুপস্থিতিতে এক ব্যক্তি আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছিলো। আমি বললাম, তাকে আসতে বলো। পরের দিন লোকটি আসলো এবং বললো, আমেরিকায় আমার ছেলে থাকে। আমিও আমেরিকা গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফেরার পথে ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমায় গিয়েছিলাম। ওমরা আদায় করে আমি মুলতাযামে গিয়ে এই দু'আ করেছি যে, হে আল্লাহ, আমার অবশিষ্ট জীবনকে আপনি কুরআনের খেদমতে ব্যয় করিয়ে দিন। তো দেশে এসে আমি শুনলাম, আপনি আপনার পিতার তাফসীরগ্রন্থ 'মাআরিফুল কুরআন'-এর ইংরেজী অনুবাদ করাতে চাচ্ছেন। এ কাজের জন্যে আমি নিজেকে পেশ করছি। আমি তাকে বললাম, আপনি মুলতাযামে এই দু'আ করে এসেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যেন আপনাকে কুরআনের খেদমতের কাজ দান করেন। অপরদিকে আমি এই দু'আ করে এসেছি যে, হে আল্লাহ! কুরআনের কোনো খেদমতকারী আমাকে দান করুন। উভয়ের দু'আর সম্মিলন ঘটেছে। সুতরাং আপনি নিজে এখানে আসেননি, বরং কোনো প্রেরণকারী কর্তৃক প্রেরিত হয়ে এখানে এসেছেন। আর সেই প্রেরণকারী হলেন আল্লাহ।

আল্লাহর ঐ বান্দা কোনো পারিশ্রমিক ব্যতীত এবং দুনিয়ার কোনো স্বার্থ ছাড়া শুধুই আল্লাহকে রাজী-খুশী করার উদ্দেশ্যে কয়েক বছর যাবত তাফসীরটির ইংরেজী অনুবাদ করছেন। আলহামদু লিল্লাহ এ পর্যন্ত পাঁচ খণ্ড ছাপা হয়ে গেছে। (কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই লোকটিও কয়েকদিন পূর্বে ইন্তিকাল করে গেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।) বাহ্য দৃষ্টির অধিকারী ব্যক্তিরা মনে করবে যে, লোকটি ঘটনাক্রমে এখানে এসেছিলো।

কিন্তু মনে রাখবেন, এ মহাজগতে কোনো কিছুই ঘটনাক্রমে ঘটে না। বরং সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার হিকমত ও ব্যবস্থাপনার অধীনে ঘটে থাকে।

তবে কোনো ঘটনার বাহ্যিক কোনো কারণ যখন আমরা খুঁজে পাই না, তখন নির্বুদ্ধিতার কারণে আমরা বলি যে, ঘটনাচক্রে এমনটি ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে ঘটনাচক্র বলে কিছু নেই। বরং সব ঘটনাই আল্লাহ তা'আলার হিকমতের অধীনে ঘটে থাকে।

শুধু সম্পদ থাকলেই হয় না

আমার এক বন্ধু একটি ঘটনা শোনাচ্ছিলেন যে, আমি একবার এক রমাযানে ওমরাহ করতে যাচ্ছিলাম। আমার পাশে বসা এক ভদ্রলোকও যাচ্ছিলেন ওমরা করতে। লোকটি খুব বড়ো বিত্তশালী ছিলো। পাশে বসে সে আমার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলো। কথাবার্তার এক পর্যায়ে আমি তাকে বললাম, রমাযানে হারাম শরীফে প্রচুর ভীড় হয়। প্রচুর মানুষ ওমরাহ করতে যায়। কাজেই আগে থেকেই থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করে নেওয়া উচিত, যাতে মসজিদে যথাসময়ে উপস্থিতির ব্যাপারে কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হয়। লোকটিকে তার সম্পদের প্রাচুর্যে বেশ অহঙ্কারী মনে হচ্ছিলো। সে আমার কথার জবাবে বললো, পয়সা থাকলে সবকিছুই হয়। শুধু পয়সা থাকা দরকার, পয়সা আছে তো সবকিছুই আছে। কাজেই আপনি আমার ব্যাপারে চিন্তা করবেন না।

দু'দিন পর ঐ সম্পদশালী লোকটির সঙ্গে মসজিদে সাক্ষাত হলো। দেখলাম, তিনি মাথায় হাত দিয়ে হারাম শরীফের সিঁড়িতে বসে আছেন। জিজ্ঞেস করলাম, ভালো আছেন তো? আপনার সবকিছু ঠিকঠাক আছে তো? লোকটি বললো, সাহরীর খাবার সংগ্রহ করতে পারিনি, ফলে সাহরী খেতে পারিনি। আমি বললাম, সাহরীর খাবার সংগ্রহ করতে পারেননি কেন? আপনার কাছে তো অনেক পয়সা আছে, তবুও সাহরী খেতে পারলেন না কেন? সে বললো, পয়সা তো আমার কাছে প্রচুর আছে, কিন্তু পয়সা নিয়ে যখন আমি সাহরী কিনতে রেষ্টুরেন্টে গেলাম, তখন সেখানে লম্বা লাইন ছিলো। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে যখন আমার পালা এলো, তখন সাহরী খাওয়ার সময় শেষ হয়ে যায়।

এরপর লোকটি নিজেই বললো, আমি আপনাকে বলেছিলাম, পয়সা থাকলে সবকিছুই হয়। ব্যস শুধু পয়সা দরকার, পয়সা হলে সবকিছুই কেনা যায়। কিন্তু আজ আল্লাহ তা'আলা আমাকে দেখিয়ে দিলেন যে, পয়সা

থাকলেই সব কাজ হয় না, যতক্ষণ না আমি চাই এবং যতক্ষণ না আমার পক্ষ থেকে তাওফীক দান করা হয়। আমার পক্ষ হতে উপযুক্ত ও অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতির সৃষ্টি করা না হলে পয়সা দ্বারা কিছুই হবে না। দুনিয়ার সব সুখ আর আরাম পয়সা দিয়ে খরিদ করা যায় না। এই পয়সাকে তো আমি সুখের উপকরণ বানিয়েছি। পয়সা নিজে কোনো সুখ ও আরামের বস্তু নয়, বরং সুখ ও আরামের উপকরণমাত্র। কাজেই পয়সা দ্বারা সবকিছু খরিদ করে নেবো– এরূপ চিন্তা শয়তানের পক্ষ থেকে এক মারাত্মক ধোঁকা।

তুমি পয়সা উপার্জন করলেও সেই পয়সা দ্বারা উপযুক্ত খাদ্য খরিদ করতে পারা আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থাপনার অধীন। নিজের জন্যে উপযুক্ত খাদ্য প্রস্তুত করা বা খাদ্যের ব্যবস্থা করা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত বিষয়।

আমার একটি সংশয় ও তার নিরসন

আমাদের শায়েখ হযরত আরেফী রহ. একবার কয়েক মুহূর্তে আমার একটি সংশয় দূর করে দেন। আমি যখন সহীহ মুসলিমের শরাহ 'তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম' লিখছি, তখন তার জন্যে আমার দৈনিক দুই ঘণ্টা নির্ধারিত ছিলো। এ সময় উপরে কুতুবখানায় গিয়ে লিখতাম। অনেক সময় এমন হতো যে, কুতুবখানায় গিয়ে অধ্যয়ন করেছি; চিন্তা ভাবনা করে কথা গুছিয়ে কলম হাতে নিয়েছি এবং এক দুই লাইন লিখেছি, এমন সময় একজন এসে আসসালামু আলাইকুম বলে মুসাফাহা করে তার সমস্যা উত্থাপন করে বসলো। মুহূর্তেই আমার এতক্ষণের মেহনত সব পানি হয়ে গেলো!

যা হোক, তার সমস্যার সমাধান করলাম এবং তাকে বিদায় করলাম। দ্বিতীয়বার প্রস্তুতি নিয়ে লিখতে শুরু করেছি, আবার আরেকজন এসে একই কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটালো। মুহূর্তে আমার সব শ্রম পণ্ড হয়ে গেলো। এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটতো। এ কারণে আমার বেশ পেরেশানী হতো এবং কাজের পরিমাণ অনেক কম হতো।

একদিন আমি হযরত আরেফ বিল্লাহ রহ.-কে পত্র লিখলাম। হযরত! আমার সঙ্গে নিত্যদিন এমন ঘটনা ঘটছে এবং এ কারণে আমার অনেক কষ্ট ও পেরেশানী হচ্ছে। সময় নষ্ট হচ্ছে এবং রচনার কাজে ব্যাঘাত ঘটছে।

হযরত বললেন, আরে ভাই তুমি যে কিতাব রচনার কাজ করছো, তা কার জন্যে করছো? নিজের খাহেশ পুরা করার জন্যে, নাকি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে? যদি সুখ্যাতি অর্জন, খাহেশ মিটানো কিংবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে রচনার কাজ করে থাকো, তাহলে তো সাক্ষাতপ্রার্থীর কারণে কষ্ট হওয়াই

স্বাভাবিক। তবে মনে রাখতে হবে, এই যদি হয় তাসনীফ ও রচনার উদ্দেশ্য, তাহলে এতে তোমার কোনো সওয়াব হবে না। পক্ষান্তরে যদি তুমি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যে রচনার কাজ করে থাকো, তাহলে তার দাবি হলো, সেই কাজ বন্ধ রেখে তোমার নিকট যে মেহমান আসবে, যুক্তিসঙ্গত সীমানা পর্যন্ত তার সমাদর ও আদর আপ্যায়ন করতে হবে। এটাও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যেই করতে হবে এবং তখন এটাই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আনুগত্য। যেমনিভাবে কিতাব রচনা নেকী ও সওয়াবের কাজ, তেমনি মেহমানের সমাদরও নেকী ও সওয়াবের কাজ। আল্লাহই যখন তোমার কাছে মেহমান পাঠিয়েছেন, তো এর অর্থ হলো এ সময় তোমার রচনার কাজ আল্লাহর নিকট কাম্য নয়; বরং এখন যেন আল্লাহ চাচ্ছেন– এক ব্যক্তিকে আমি তোমার নিকট পাঠালাম, তুমি তার মাসআলার সমাধান করে দাও।

সুতরাং এই মেহমান যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে, এজন্যে এর উপরও সন্তুষ্ট থাকো, যদিও তোমার ইচ্ছা ছিলো এ সময় রচনার কাজ করা। কারণ তোমারই বা কি মূল্য, আর তোমার সিদ্ধান্তেরই বা কি মূল্য? আল্লাহ যখন তোমাকে অন্য কাজে লাগাচ্ছেন, তো সন্তুষ্টচিত্তে তুমি সেটাই করো। একথা বলে হযরত আরেফী রহ. যেন আমার চিন্তাজগতের দরজা খুলে দিলেন। তারপর থেকে অসময়ে কারো আগমনে যদিও স্বভাবগত কিছু কষ্ট হয়, কিন্তু যৌক্তিকভাবে আলহামদুলিল্লাহ একদম শান্ত ও স্থির থাকি যে, এতে আমার কোনো ক্ষতি নেই ইনশাআল্লাহ।

এরপর হযরত আরেফী রহ. অনেক মূল্যবান একটি কথা বললেন। বললেন, দ্বীন হলো সময়ের দাবি ও চাহিদা মোতাবেক আমল করার নাম। এই মুহূর্তে আমার নিকট শরীয়ত কী চায়? এই তাকাযা ও চাহিদা পূরণ করার নাম দ্বীন ও ইত্তিবা। নিজের চাহিদা ও শখ পূরণ করা কিংবা নিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার নাম দ্বীন নয়। যেমন আমি ঠিক করে নিলাম, এই সময় আমি এই কাজ করবো, চাই দুনিয়া উল্টে যাক এবং সময়ের চাহিদা যাই হোক; আমি তো আমার রুটিনের কাজই করে যাবো। এটা কখনো যৌক্তিক হতে পারে না।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সবকিছু উল্টা

হযরত কারী মুহাম্মাদ তাইয়্যিব ছাহেব রহ. বলতেন, পাশ্চাত্যের আধুনিক সভ্যতার সবকিছুই আগের সভ্যতার বিপরীত ও উল্টা। তারপর তিনি রসিকতা করে বলতেন, আগে তো বাতির নীচে অন্ধকার হতো, এখন

বাতির উপরে অন্ধকার হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের ঐতিহ্যকে সযত্নে উল্টিয়ে দিয়েছে। আজকালের সভ্যতা হলো, খানা খাওয়ার সময় ডান হাতে ছুরি ও কাঁটা ধরবে আর বাম হাতে খাবে।

আজ থেকে কয়েক বছর পূর্বে আমি উড়োজাহাজে সফর করছিলাম। আমার পাশের সিটে এক ব্যক্তি বসা ছিলো। সফরকালে তার সঙ্গে কিছুটা অকৃত্রিম সম্পর্ক হয়ে যায়। খানা এলে লোকটি তার নিয়ম মতো ডান হাতে ছুরি ধরে বাম হাতে খেতে আরম্ভ করে। আমি তাকে বললাম, আমরা সব বিষয়ে ইংরেজদের অনুকরণ শুরু করেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত হলো তিনি ডান হাতে খেতেন। আপনি ডান হাতে খেলে আপনার জন্যে এ কাজটি সওয়াবের কারণ হবে। উত্তরে তিনি বললেন, মূলত মুসলিম জাতি এ কারণেই পিছে রয়েছে যে, তারা এসব ছোট ছোট জিনিসের পিছনে পড়ে আছে। এই মওলবীরা এসব জিনিসের মধ্যে আমাদেরকে ফাঁসিয়ে উন্নতির পথ বন্ধ করে দিয়েছে। বড়ো বড়ো কাজে আমরা পিছিয়ে পড়েছি।

আমি তাকে বললাম, মাশাআল্লাহ আপনি তো দীর্ঘদিন ধরে এই উন্নত পদ্ধতিতে খাচ্ছেন। এই উন্নত পদ্ধতিতে খাওয়ার ফলে আপনার কতোটুকু উন্নতি লাভ হয়েছে? আপনি কতোটুকু সামনে অগ্রসর হয়েছেন? কতোজন মানুষের উপর আপনার প্রাধান্য লাভ হয়েছে? তখন তিনি চুপ হয়ে গেলেন। তারপর আমি তাকে বোঝালাম, মুসলমানদের উন্নতি ও মর্যাদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতিতে আমল করার মধ্যে নিহিত। অন্য কোনো পদ্ধতিতে আমল করার মধ্যে নয়। মুসলমান অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করে মর্যাদা লাভ করতে পারে না। লোকটি বললো, আপনি বিস্ময়কর কথা বলছেন যে, সুন্নাতের মধ্যে আমল করার মধ্যে উন্নতি। এই পশ্চিমা বিশ্ব কতো উন্নতি করছে অথচ তারা তো বাম হাতে খেয়ে থাকে। সব কাজ সুন্নাত ও শরীয়তের বিপরীত করে থাকে। তারা চরমভাবে গোনাহে আক্রান্ত। পাপাচার করে, মদ পান করে, জুয়া খেলে, এতদসত্ত্বেও তারা উন্নতি করছে। সারা বিশ্বের উপর তাদের আধিপত্য বিস্তার লাভ হয়েছে। আপনি তো বলছেন সুন্নাতের উপর আমল করার দ্বারাই উন্নতি হয়, কিন্তু আমরা তো দেখছি সুন্নাতের বিপরীত ও শরীয়তের বিপরীত কাজ করার দ্বারাই দুনিয়াতে উন্নতি হচ্ছে।

আমি তাকে বললাম, আপনি বলছেন পশ্চিমা জাতি সুন্নাত ছেড়ে দেওয়া সত্ত্বেও উন্নতি করছে, তাই আমরাও একইভাবে উন্নতি করতে পারি। এ বিষয়ে আমি তাকে একটি গল্প শোনালাম যে,

এক ব্যক্তি খেজুর গাছে আরোহণ করলো। কোনোভাবে আরোহণ করলেও নামতে পারছিলো না। তখন সে গাছের উপর থেকে গ্রামের লোকদেরকে চিৎকার করে বললো, আমাকে নামাও। লোকেরা জমা হয়ে গেলো। পরস্পরে পরামর্শ করলো কীভাবে তাকে গাছ থেকে নামানো যায়। কারো কোনো পদ্ধতি বুঝে আসছিলো না। সে যুগে গাঁয়ে একজন 'মোড়ল' থাকতো। তাকে সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান মনে করা হতো। গ্রামের লোকেরা তার কাছে গেলো। পুরো অবস্থা বিস্তারিত জানালো যে, এভাবে একব্যক্তি গাছে আরোহণ করেছে, তাকে কীভাবে নামানো যেতে পারে? তখন মোড়ল বললো, এটা তো কোনে কঠিন কাজ নয়। একটি রশি আনো। রশি আনা হলো। বললো, রশিটি তার দিকে ছুড়ে মারো এবং তাকে রশি দিয়ে শক্তভাবে কোমর বাঁধতে বলো। রশি কোমরে বাঁধলে লোকদেরকে বললো, তোমরা রশি ধরে জোরে টান দাও। লোকেরা রশি ধরে টান দিলে লোকটি গাছ থেকে নীচে পড়ে গেলো। নীচে পড়ে লোকটি মরে গেলো। লোকেরা মোড়লকে বললো, আপনি এটা কেমন পদ্ধতি বললেন! লোকটি তো মরে গেলো! সে উত্তর দিলো, জানি না কেন মরে গেলো, হয়তো তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে তাই মরে গেছে। অন্যথায় আমি তো এ পদ্ধতিতে অনেক মানুষকে কুয়া থেকে বের করেছি। তারা সুস্থ ও অক্ষত অবস্থায় বের হয়ে এসেছে।

ঐ মোড়ল খেজুর গাছে আরোহণকারী ব্যক্তিকে কুয়ায় পড়া ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করেছে। এখানেও একই রকম তুলনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, অমুসলিম জাতি পাপাচার, নাফরমানী ও গোনাহের কাজ করে উন্নতি করছে, একইভাবে আমরাও নাফরমানী করে উন্নতি করবো। এ তুলনা সঠিক নয়। মনে রাখবেন! মুসলিম জাতি, যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কালেমার উপর ঈমান এনেছে, তারা যদি মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত ঐ পশ্চিমা জাতির পদ্ধতি অবলম্বন করে এবং নিজেদের সবকিছু পরিবর্তন করে তবুও সারাজীবনে কখনোই উন্নতি করতে পারবে না। হ্যাঁ, তারা যদি উন্নতি করতে চায়, তাহলে ইসলামের আবরণকে নিজেদের দেহ থেকে একবার নামিয়ে ফেলুক এবং বলুক যে, আমরা মুসলমান নই (নাউযুবিল্লাহ) তারপর কাফেরদের পদ্ধতি অবলম্বন করুক, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও দুনিয়াতে উন্নতি দান করবেন। কিন্তু মুসলমানদের উন্নতির নিয়ম আর কাফেরদের উন্নতির নিয়ম এক নয়। মুসলমানদের জন্যে দুনিয়াতেও উন্নতি করার একমাত্র রাস্তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করা। এছাড়া মুসলমানদের উন্নতির কোনো পথ নেই।

ইংল্যান্ডে স্কুলের শিশুদের মাসনূন দু'আ শিক্ষা করা

একবার আমার ইংল্যান্ডে যাওয়া হয়। ইংল্যান্ডের স্কটল্যান্ড প্রদেশের একটি শহরের নাম গ্লাসগো। সেখানে যাওয়ার সুযোগ হয়। পুরো স্কটল্যান্ডে মুসলমানদের যতো স্কুল রয়েছে, তার সবগুলোর কনভেনশন আহবান করে তাতে সমস্ত শিশুকে একত্রিত করার প্রোগ্রাম করা হয়। আমাকে সেই কনভেনশনের সভাপতিত্ব করার এবং সেখানে কিছু নছীহত করার জন্যে দাওয়াত দেওয়া হয়। আমি তা মঞ্জুর করি। সেই কনভেনশনে পুরো স্কটল্যান্ডের স্কুলসমূহের মুসলমান শিশুরা একত্রিত হয়, যাদের সংখ্যা ছিলো আড়াই-তিন হাজারের মতো। অনেক বড়ো সমাবেশ ছিলো। আমিও সেখানে যাই। আমাকে ব্যবস্থাপকগণ বলেন যে, এখানে প্রায় তিন হাজার শিশু রয়েছে। আমরা সব স্কুলের একটি ফেডারেশন বানিয়েছি। সেই ফেডারেশন মুসলমান শিশুদের দ্বীনী তারবিয়াত ও তালীমের ব্যবস্থা করে থাকে। মুসলমান শিশুদের অন্তরে দ্বীনের আযমত ও মহব্বত সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আমরা অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছি। একটি পদক্ষেপ এই নিয়েছি যে, আমরা সেসব শিশুকে মাসনূন দু'আসমূহ মুখস্থ করিয়েছি। এখানে তিন হাজার শিশু আপনার সামনে বসা আছে। আপনি যেকোনো শিশু থেকে যেকোনো সময়ের দু'আ ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করুন।

সুতরাং আমি একটি শিশুকে জিজ্ঞাসা করলাম, ঘুমানোর সময়ের দু'আ কী? সাথে সাথে সে দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করলো। আরেক শিশুর কাছে বাজারে যাওয়ার দু'আ জিজ্ঞাসা করলাম, সে অবিলম্বে ঐ দু'আ শুনিয়ে দিলো। হাজার হাজার শিশু উপস্থিত ছিলো। প্রত্যেক শিশুর সবগুলো দু'আ মুখস্থ রয়েছে। এসব শিশু বৃটেনের মতো রাজ্যে বাস করে। তারা মাদরাসা পড়ুয়া নয়, স্কুল পড়ুয়া। এ অবস্থা দেখে আমার আনন্দও হয় এবং ঈর্ষাও জাগে যে, এসব জিনিস তো আমাদের দ্বীনী মাদরাসার ছাত্রদের মধ্যেও নেই, যা আল্লাহ তা'আলা এদেরকে দান করেছেন।

মুক্তচিন্তার পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান

আমি আপনাদেরকে একটি মজার কথা শোনাচ্ছি। কিছুদিন পূর্বে একদিন আমি মাগরিবের নামায পড়ে ঘরে বসে ছিলাম। বাহির থেকে এক ব্যক্তি সাক্ষাতের জন্যে আসে। কার্ড পাঠিয়ে দেয়। কার্ডে লেখা ছিলো, বিশ্ব বিখ্যাত মানবাধিকার সংরক্ষণের ধ্বজাধারী প্রতিষ্ঠান 'এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল'-এর একজন ডাইরেক্টর প্যারিস থেকে পাকিস্তানে এসেছে। তিনি আপনার সঙ্গে

সাক্ষাত করতে চান। আমি তাকে ভিতরে ডেকে পাঠালাম। আগে থেকে সময় না নিয়ে তিনি হঠাৎ করে চলে এসেছেন। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন উচ্চপদস্থ অফিসারও তার সঙ্গে ছিলেন। আপনারা জানেন যে, 'এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল'-কে মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং লেখা ও বলার স্বাধীনতার পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান দাবি করা হয়। পাকিস্তানে যে কয়টি শরয়ী আইন বাস্তবায়ন করা হয়েছে, উদাহরণত কাদিয়ানীদের বিষয়ে যেসব বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে সেগুলোর উপর আপত্তি ও প্রতিবাদের ধারা অব্যাহত রয়েছে। যাইহোক, তিনি আসলেন এবং আমাকে বললেন, আমি এ জন্যে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি যে, আমাদের প্রতিষ্ঠান আমাকে লেখা ও বলার স্বাধীনতা এবং মানবাধিকার বিষয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাধারণ জনমত জরিপ করার জন্যে নিযুক্ত করেছেন। অর্থাৎ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলমানগণ মানবাধিকার, লেখা ও বলার স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়ে কিরূপ মনোভাব পোষণ করে এবং এ বিষয়ে তারা কদ্দূর পর্যন্ত আমাদের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত, সে বিষয়ে জরিপ করার জন্যে আমি প্যারিস থেকে এসেছি। আমি এ সম্পর্কে আপনার ইন্টারভিউ নিতে চাই। সাথে তিনি এ দুঃখও প্রকাশ করেন যে, সময় স্বল্পতার কারণে আমি আগে থেকে সময় নিতে পারিনি। কিন্তু আমি চাই আপনি আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিবেন, যাতে করে তার ভিত্তিতে আমি রিপোর্ট তৈরি করতে পারি।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কবে এসেছেন?

তিনি বললেন, আমি কাল এসেছি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আগামীতে কী প্রোগ্রাম?

তিনি বললেন, কাল আমাকে ইসলামাবাদ যেতে হবে।

আমি বললাম, তারপর?

তিনি বললেন, ইসলামাবাদে এক-দু'দিন অবস্থান করে দিল্লী যাবো।

আমি বললাম, সেখানে আপনি কতোদিন অবস্থান করবেন?

তিনি বললেন, দু'দিন।

আমি বললাম, তারপর?

তিনি বললেন, তারপর আমাকে মালয়েশিয়ায় যেতে হবে।

আমি বললাম। কাল আপনি করাচী এসেছেন। আজ সন্ধ্যায় এখন আমার নিকট এসেছেন। কাল সকালে আপনি ইসলামাবাদ চলে যাবেন। আজকের দিন আপনি করাচীতে অতিবাহিত করলেন। আপনি কি করাচীর সাধারণ

জনমত জরিপ করে ফেলেছেন? আমার এ প্রশ্নে তিনি চরম বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে গেলেন। বললেন, এতো অল্প সময়ে বাস্তবে পুরোপুরি জরিপ তো হতে পারে না। তবে এ সময়ে আমি অনেক লোকের সঙ্গেই সাক্ষাত করেছি এবং এ বিষয়ে কিছুটা ধারণাও লাভ হয়েছে। আমি বললাম, আপনি কতো জনের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন? তিনি বললেন, পাঁচজনের সঙ্গে, আপনি ষষ্ঠ। আমি বললাম, ছয় ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত করে আপনি করাচীর জরিপ করে ফেলেছেন! এরপর আগামীকাল ইসলামাবাদ চলে যাবেন, সেখানে একদিন অবস্থান করবেন। সেখানে ছয়জন মানুষের সঙ্গে আপনার সাক্ষাত হবে। ছয়জনের সঙ্গে সাক্ষাত করে ইসলামাবাদের জনমতের জরিপ হয়ে যাবে! তারপর দু'দিন দিল্লীতে অবস্থান করবেন। সেখানে কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করবেন। এভাবে সেখানের জরিপ হয়ে যাবে। আপনিই বলুন! এটা জরিপের কোন পদ্ধতি?

তিনি বললেন, আপনার কথা যুক্তিযুক্ত, বাস্তবেই যেই পরিমাণ সময় আমার দেওয়া উচিত ছিলো, তা আমি দিতে পারছি না। কিন্তু আমি কি করবো? আমার কাছে সময়ই কম।

আমি বললাম, মাফ করবেন! আপনার কাছে সময় কম, তো কোন ডক্টর আপনাকে পরামর্শ দিয়েছে যে, আপনি জরিপ করুন। জরিপ যদি করতেই হয় তো এমন মানুষের করা উচিত, যার কাছে সময় রয়েছে। যিনি মানুষের নিকট গিয়ে দেখা করতে পারবেন। মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। সময় কম থাকলে জরিপের দায়িত্ব নেওয়ার কি প্রয়োজন ছিলো আপনার?

তিনি বললেন, আপনার কথা তো ঠিক, কিন্তু আমাকে এতোটুকু সময়ই দেওয়া হয়েছে। এজন্যে আমি অপারগ।

আমি বললাম, মাফ করবেন, আপনার এই জরিপের গুরুত্বের বিষয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে। আমি এই জরিপকে যথাযথ মনে করছি না। তাই এতে আমি অংশ নিতে প্রস্তুত নই। আপনার কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতেও আমি প্রস্তুত নই। কারণ আপনি পাঁচ-ছয় জন মানুষের সঙ্গে কথা বলে রিপোর্ট দিবেন যে, সেখানের সাধারণ জনমত এই। এই রিপোর্টের কি মূল্য-মর্যাদা রয়েছে! এজন্যে আমি আপনার কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো না।

লোকটি খুব দিশেহারা হয়ে পড়লো এবং বললো, আপনার কথা তো বাস্তবসম্মত। কিন্তু যেহেতু আমি আপনার কাছে একটি বিষয় জিজ্ঞেস করতে এসেছি, তাই আপনি আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই দিন।

আমি বললাম, না, আমি আপনার কোনো প্রশ্নের উত্তর দিবো না। যে পর্যন্ত আমার এ বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাস না হবে যে, আপনার জরিপ বাস্তবিকই

জ্ঞানগর্ভ এবং ওজস্বী। আপনি আমাকে মাফ করবেন, আপনি আমার মেহমান। যতটুকু পারি আমি আপনার আদর-আপ্যায়ন করবো, কিন্তু কোনো প্রশ্নের উত্তর দিবো না।

আমি বললাম, আমার কথা যদি অযৌক্তিক হয়ে থাকে তাহলে আমাকে বুঝিয়ে বলুন যে, আমার অবস্থান ভুল এবং এ কারণে ভুল।

তিনি বললেন, আপনার কথা তো যৌক্তিক। কিন্তু আমি আপনার নিকট শুধু ভ্রাতৃসুলভ আবেদন করছি যে, আপনি কিছু উত্তর দিন।

আমি বললাম, না আমি উত্তর দিবো না, তবে আপনি অনুমতি দিলে আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।

তিনি বললেন, প্রশ্ন তো আমি করতে এসেছিলাম, কিন্তু আপনি যেহেতু আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে চাচ্ছেন না, ঠিক আছে আপনিই প্রশ্ন করুন। আপনি কী প্রশ্ন করতে চান?

আমি বললাম, আমি আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করছি। আপনি যদি অনুমতি দেন, তবেই প্রশ্ন করবো। আর যদি অনুমতি না দেন, তাহলে আমিও প্রশ্ন করবো না। আমাদের দু'জনের সাক্ষাত হয়েছে, কথা শেষ।

তিনি বললেন, না আপনি প্রশ্ন করুন।

আমি বললাম, আপনি মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের পতাকা বহন করে চলছেন। এ বিষয়ে আমি আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, মত প্রকাশের স্বাধীনতার যেই প্রচার-প্রসার আপনারা করতে চাচ্ছেন এবং করে চলছেন, এটা কি নিঃশর্তভাবে? এর জন্যে কি কোনো বিধি-নিষেধ ও কোনো শর্ত নেই? নাকি মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর কিছু শর্ত ও বিধি-নিষেধ থাকা উচিত?

তিনি বললেন, আমি আপনার কথা বুঝতে পারিনি।

আমি বললাম, আমার উদ্দেশ্য তো আমার কথা দ্বারা সুস্পষ্ট। আমি আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছি, আপনি যেই মত প্রকাশের স্বাধীনতার দাওয়াত দিচ্ছেন, তা কি এরূপ যে, যার যে মত হবে, তাই খোলামেলা প্রকাশ করবে এবং তার দিকেই মানুষকে দাওয়াত দিবে। তার উপর কোনো বাধা-নিষেধ থাকবে না। কোনো নিয়ম-নীতি থাকবে না। এটাই কি উদ্দেশ্য আপনাদের? এটাই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে বলুন, এক ব্যক্তির মত হলো, ধনী লোকেরা অনেক টাকা কামিয়েছে, গরীবেরা না খেয়ে মরছে, তাই ধনীদের ঘরে ডাকাতি করে এবং তাদের দোকানে লুট করে গরীবদেরকে টাকা দেওয়া উচিত। কোনো ব্যক্তি যদি সৎ উদ্দেশ্যেই এই মত পোষণ করে এবং

তা প্রকাশ করে এবং মানুষকে তার দিকে দাওয়াত দেয় যে, আপনারা আসুন আমাকে সঙ্গ দিন। যতো ধনী লোক আছে, প্রতিদিন তাদের বাড়িতে ডাকাতি করবো। তাদের সম্পদ লুট করে গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দিবো, তাহলে আপনি এমন মত প্রকাশের স্বাধীনতার সহযোগী হবেন কি না? এর অনুমতি প্রদান করবেন কি না?

তিনি বললেন, এর অনুমতি দেওয়া হবে না যে, মানুষের মাল লুট করে অন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দিবে।

আমি বললাম, আমার কথার উদ্দেশ্য এটাই ছিলো যে, এর অনুমতি যদি দেওয়া না হয়, তাহলে এর অর্থ হলো, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এতো উন্মুক্ত ও নিঃশর্ত নয় যে, তার উপর কোনো শর্ত, কোনো বিধি-নিষেধ ও কোনো নিয়ম-নীতি আরোপ করা হবে না। কিছু না কিছু শর্ত আরোপ করতেই হবে।

তিনি বললেন, হ্যাঁ, কিছু না কিছু শর্ত আরোপ করতেই হবে।

আমি বললাম, সেই শর্তের ভিত্তি কী হবে এবং কে তা আরোপ করবে? কিসের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যে, এ ধরনের মত প্রকাশ করা তো বৈধ, আর ঐ ধরনের মত প্রকাশ করা অবৈধ। এ ধরনের মতের প্রতি দাওয়াত দেওয়া বৈধ, আর ঐ ধরনের মতের প্রতি দাওয়াত দেওয়া অবৈধ। এটা কে নির্ধারণ করবে এবং কিসের ভিত্তিতে করবে? এ বিষয়ে আপনাদের প্রতিষ্ঠান কোনো জ্ঞানগর্ভ জরিপ ও গবেষণা করে থাকলে আমি তা জানতে চাই।

তিনি বললেন, এই দৃষ্টিভঙ্গিতে এ বিষয়ে ইতিপূর্বে আমরা চিন্তা-ভাবনা করিনি।

আমি বললাম, দেখুন আপনারা এতো বড়ো মিশন নিয়ে চলছেন, পুরো মানবতাকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়ানোর জন্যে এবং তাদের অধিকার দেওয়ানোর জন্যে সংগ্রাম করে চলছেন, অথচ আপনারা মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করেননি যে, মত প্রকাশের স্বাধীনতার ভিত্তি কী হওয়া উচিত? কী নীতিমালা হওয়া উচিত? কী শর্ত ও বিধি-নিষেধ হওয়া উচিত।

তিনি বললেন, আচ্ছা আপনিই বলুন!

আমি বললাম, আমি তো আগেই বলেছি, আমি কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে বসিইনি। আমি তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। আপনি আমাকে বলুন, কী শর্ত ও বিধি-নিষেধ হওয়া উচিত, আর কোনটা হওয়া উচিত নয়? আমি তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি যে, আপনার দৃষ্টিভঙ্গি এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এর উত্তর কী হওয়া উচিত?

তিনি বললেন, আমার জানামতে এখনো পর্যন্ত এমন ফর্মূলা নেই। একটি ফর্মূলা এই মাথায় আসে যে, এমন মত, যার মধ্যে হিংস্রতা ও অন্যের প্রতি কঠোরতা থাকে, তা প্রকাশের স্বাধীনতা থাকা উচিত নয়।

আমি বললাম, এটা তো আপনার মাথায় এসেছে যে, হিংস্রতামুক্ত হওয়ার শর্ত থাকা উচিত। অন্য কারো মাথায় অন্য কোনো বিষয় আসতে পারে যে, এই বিধি-নিষেধও থাকা উচিত। এটা কে সিদ্ধান্ত দিবে এবং কিসের ভিত্তিতে দিবে যে, কোন ধরনের মত প্রকাশের নিঃশর্ত অনুমতি থাকা উচিত এবং কোন ধরনের মত প্রকাশের অনুমতি থাকা উচিত নয়? এর কোনো ফর্মূলা ও মানদণ্ড থাকা উচিত।

তিনি বললেন, আপনার সঙ্গে কথা বলার পর এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি আমার মাথায় এসেছে। আমি দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের পর্যন্ত এ কথা পৌছাবো। এরপর এ বিষয়ে কোনো লিটারেচার পেলে তা আপনার নিকট পৌছাবো।

আমি বললাম, ইনশা আল্লাহ আমি অপেক্ষায় থাকবো। আপনি যদি এর উপর কোনো লিটারেচার পাঠাতে পারেন, এ বিষয়ে কোনো দর্শন বলে দিতে পারেন, তো একজন তালেবে ইলম হিসেবে আমি অধীর আগ্রহে তার জন্যে অপেক্ষা করবো। তিনি যখন চলে যাচ্ছিলেন, তখন আমি তাকে বললাম, আমি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টি আপনাকে বলছি। এটি কোনো ঠাট্টা নয়। আমি আন্তরিকভাবেই চাচ্ছি, বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হোক। এ বিষয়ে আপনি আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরবেন। কিন্তু একটি কথা আপনাকে বলে রাখছি, আপনাদের যতো চিন্তা ও দর্শন রয়েছে, সবগুলো সামনে রাখুন, কিন্তু এমন কোনো সর্বসম্মত ফর্মূলা তুলে ধরতে আপনারা সক্ষম হবেন না, যার উপর সারা বিশ্বের মানুষ একমত হবে যে, অমুক ভিত্তিতে মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকা উচিত এবং অমুক ভিত্তিতে থাকা উচিত নয়। তো এ কথা আমি আপনাদেরকে বলে রাখছি, যদি আপনারা পেশ করতে পারেন, তাহলে আমি প্রতীক্ষায় রইলাম। আজ দেড় বছর হয়ে গেলো এখনো কোনো উত্তর আসেনি।

বাগদাদে দ্বীনী মাদরাসার সন্ধানে

এর মধ্যে আমার বাগদাদ যাওয়ার সুযোগ হয়। বাগদাদ শহর কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের রাজধানী ছিলো। সেখানে খেলাফতে আব্বাসিয়ার দুরদণ্ড প্রতাপ বিশ্ববাসী দেখেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাও খুব ছিলো। সেখানে আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কোনো মাদরাসা

আছে, ইলমে দ্বীনের এমন কোনো কেন্দ্র আছে, যেখানে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেওয়া হয়? আমি তা দেখতে চাই।

এক ব্যক্তি বললো এমন কোনো মাদরাসার নাম-গন্ধ এখানে নেই। সব মাদরাসা এখন স্কুল কলেজে পরিণত হয়েছে। এখন দ্বীনের শিক্ষার জন্যে ইউনির্ভাসিটির ফ্যাকালটি আছে। যেখানে দ্বীনী তালিম দেওয়া হয়। সেখানকার শিক্ষকদেরকে দেখে এটা বোঝাও কঠিন যে, আলেম হওয়া তো দূরের কথা এরা আদৌ মুসলমান কি না। এসব প্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষা চালু রয়েছে। নারী-পুরুষ একসঙ্গে শিক্ষা লাভ করে। ইসলাম নিছক একটি দর্শনের অবস্থানে রয়েছে। ঐতিহাসিক দর্শন রূপে তা পড়ানো হয়। বাস্তব জীবনে তার কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। যেমন প্রাচ্যবীদেরা ইসলাম পাঠ করে থাকে। বর্তমানে আমেরিকা, কানাডা ও ইউরোপের ইউনির্ভাসিটিসমূহেও ইসলামের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। ইসলাম পড়ানো হচ্ছে। সেখানেও হাদীস ফিক্‌হ ও তাফসীর শেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে। তাদের প্রবন্ধ-সন্দর্ভ পাঠ করলে এমনসব কিতাবের উদ্ধৃতি চোখে পড়বে যেগুলো আমাদের সহজ সরল আলেমরা জানেও না। বাহ্যত অনেক গবেষণামূলক কাজ হচ্ছে। কিন্তু তা দ্বীনী শিক্ষা কি করে হয়, যা মানুষকে ঈমানের দৌলতও দিতে পারে না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাগরে ডুবে থাকা সত্ত্বেও তারা ব্যর্থ হয়েই ফিরছে। তার এক ফোঁটা পানি দিয়ে কণ্ঠও সিক্ত করছে না। পশ্চিমা বিশ্বের সেসব শিক্ষাকেন্দ্রে শরীআ কলেজও রয়েছে। 'উসূলুদ দ্বীন' কলেজও রয়েছে। কিন্তু তার কোনো প্রভাব বাস্তব জীবনে দৃষ্টিগোচর হয় না। এসব ইলমের রূহ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

এরপর আমি তাদেরকে বললাম, কোনো মাদরাসা না হোক প্রাচীন ধাঁচের কোনো আলেমের ঠিকানা আমাকে বলো। আমি তার খেদমতে হাজির হতে চাই। তখন তারা বললো যে, শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর পবিত্র মাযার সংলগ্ন একটি মসজিদে মক্তব রয়েছে। সেই মক্তবে একজন প্রাচীন ধাঁচের উস্তায অবস্থান করেন। তিনি প্রাচীন ধাঁচে লেখা পড়া করেছেন। আমি খুঁজতে খুঁজতে তার খেদমতে পৌছি। দেখি যে বাস্তবেই তিনি প্রাচীন ধাঁচের এক মহান বুযুর্গ। তাকে দেখে অনুভূত হয় যে, একজন পরহেযগার আল্লাহ ওয়ালা আলেমের সাথে মোলাকাত হলো।

তিনি হলেন শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুল কারীম আলমুদাররিস (আল্লাহ পাক তাঁকে নিরাপদে রাখুন)-এর সাক্ষাত ও নছীহত শ্রবণ করার সৌভাগ্য লাভ হয়। শাইখ আমজাদ আয্যাহাবী রহ.-এর অন্যতম সঙ্গী তিনি। আধুনিক

ইউনিভার্সিটির ডিগ্রীসর্বস্ব পন্থা পরিহার করে, তিনি পারদর্শী উস্তায ও শাইখদের নিকট থেকে প্রাচীন পদ্ধতিতে দ্বীনী ইলমসমূহে পূর্ণতা অর্জন করেন। চাটাইতে বসে শুকনা খাবার খেয়ে এবং মোটা পোশাক পরিধান করে লেখাপড়া করেন। আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহে চেহারায় ইলমে শরীয়তের নূর দৃষ্টিগোচর হয়। তার খেদমতে অল্প সময় বসে অনুভূত হয় যে, আমি জান্নাতের পরিবেশে অবস্থান করছি।

মাস্টার্স ও ডক্টরেটের এ যুগে এমন আলেমদের মূল্যায়নকারীর সংখ্যা খুবই অল্প, কিন্তু সত্য হলো, ইলমে দ্বীনের যেই ঘ্রাণ এবং শরীয়ত ও সুন্নাতের যেই সুগন্ধ সহজ সরল জীবনের অধিকারী এ সকল বুযুর্গের নিকট অনুভূত হয়, তা সাধারণত ইউনিভার্সিটির সুউচ্চ ভবনসমূহ এবং তার জৌলুসপূর্ণ পরিবেশে দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই যেখানেই যাওয়ার সুযোগ ঘটে, সেখানেই আমি এমন আলেমগণের সন্ধান করে থাকি।

শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুল কারীম আলমুদাররিস মাদারাসার এক কোণায় সাদামাটা একটি ফ্লাটে বাস করেন। প্রাচীন আরবীয় ঢংয়ের উপবেশন, আশেপাশে কিতাবের স্তূপ। প্রত্যেক আগমনকারীর জন্যে উন্মুক্ত দরজা। গোলাপ ফুলের মতো সদা হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল। কথাবার্তায় অসম্ভব রকম পবিত্রতা। অকপট ও অকৃত্রিম আচরণ। লৌকিকতা ও সুনাম অর্জনের মনোবৃত্তি থেকে বহু ক্রোশ দূরে অবস্থান। তাঁর সাক্ষাত লাভে প্রথম দৃষ্টিতেই অন্তর আনন্দে ভরে যায়।

ড. মুহাম্মদ শরীফ সাহেব (ওয়াকফ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা) শাইখকে পূর্বেই ফোনে আমাদের আগমন সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। শাইখ এ কথা শুনে খুবই আনন্দিত ছিলেন যে, অধমেরও সেই প্রাচীন ধারার ধর্মীয় মাদরাসাসমূহ ও তার আলেমদের সঙ্গে খাদেমসুলভ নিসবত (সম্পর্ক) রয়েছে। সুতরাং প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের পর তাঁর প্রথম প্রশ্ন ছিলো আমাদের মাদরাসাসূহের পাঠ্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে। আমি যখন আমাদের পাঠ্যপুস্তকের মধ্য থেকে 'কাফিয়া', 'শরহে জামী', 'শরহে তাহযীব', 'নূরুল আনওয়ার' 'তাওযীহ' প্রভৃতি কিতাবের নাম বললাম, তখন তিনি প্রায় চিৎকার করে উঠে ওসিয়ত করেন যে, দৃঢ় যোগ্যতা সৃষ্টকারী এ জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা কখনো পরিত্যাগ করবেন না। কারণ, আমরা এ শিক্ষাব্যবস্থা ত্যাগ করার কুফল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছি। সাথে সাথে তিনি এ ওসিয়তও করেন যে, ইরাক যেই যুদ্ধে আক্রান্ত তা থেকে পরিত্রাণের জন্যে দু'আ করতে ভুলবেন না। পাকিস্তানের অন্যান্য আলেমদের দ্বারাও এ ব্যাপারে দু'আ করাবেন।

ইসলামের শাস্তির বিধান কি বর্বরতা?

একদম তাজা একটা ঘটনা আপনাদের শোনাচ্ছি। সম্প্রতি সিঙ্গাপুরে এক আমেরিকান তরুণ, আনুমানিক ১৭-১৮ বছর বয়স হবে, কোনোও এক অপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছে। সিঙ্গাপুরের আইনে তার শাস্তি ছিলো উন্মুক্ত বাজারে বিশটি বেত্রাঘাত করা। সিঙ্গাপুরে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করা আইনসম্মত। ইউরোপিয়ানরা ইসলামের উপরে প্রশ্ন তুলতে ক্লান্তিবোধ করে না। কিন্তু সিঙ্গাপুর তাদের চোখে পড়ে না। সিঙ্গাপুরে চাবুক মারার নিয়ম হলো, অপরাধীকে বেঁধে কাপড় খুলে এমনভাবে চাবুক মারা হয় যে, চাবুকের সাথে চামড়া খুলে চলে আসে। কিন্তু এখানে তো অপরাধী আমেরিকান। সারা আমেরিকা হইচই পড়ে গেলো। তাদের সভ্য ছেলেকে সিঙ্গাপুরে চাবুক মারা হবে? এটা একটা বর্বরতা। এ শাস্তি রহিত করতে হবে। এই প্রতিবাদকালে ওখানকার সাপ্তাহিক 'নিউজ উইক'-এর পক্ষ থেকে জনমত যাচাই করার জন্যে জরিপ চালানো হয়। জনগণের কাছে প্রশ্ন রাখা হয়, এই তরুণকে শাস্তি দেওয়া উচিত কি না? মাত্র দু' সপ্তাহ আগে ওই 'নিউজ উইক'-এ জরিপের রিপোর্ট প্রকাশ পেয়েছে। তাতে জানানো হয়েছে যে, আমরা বিভিন্ন স্তরের গুরুত্বপূর্ণ লোকদের কাছে গিয়ে এ বিষয়ে মতামত চেয়েছি। তাতে ছাপ্পান্ন শতাংশ লোক মত দিয়েছে যে, দৈহিক শাস্তি অবশ্যই দেওয়া উচিত। এর স্বপক্ষে তারা যুক্তি দেখিয়েছে যে, আমাদের সমাজে ইদানীং এমন সব যুবক জন্ম নিচ্ছে, যারা মনুষ্যত্বের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। কাজেই কঠিন শাস্তি দিয়ে তাদেরকে এ অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনা উচিত। আর চুয়াল্লিশ শতাংশের রায় হলো, শারীরিক শাস্তি তো দেওয়া সমীচীন নয়, তবে তরুণরা বিপথগামী কেন হচ্ছে তা খতিয়ে দেখা উচিত। তাদের অভিমত হলো, যুবসমাজের বিপথগামিতার অন্যতম প্রধান কারণ পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়া। বর্তমান সমাজে পারিবারিক বন্ধন ছিঁড়ে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে। ঘরের ভেতর তা'লীম-তারবিয়াতের উপযুক্ত কোনোও ব্যবস্থা নেই। যে কারণে বর্তমানে যেসব শিশু জন্ম নিচ্ছে, তারা অপরাধপ্রবণতা নিয়েই বড়ো হচ্ছে। নানারকম বিকৃত মানসিকতা তাদেরকে গ্রাস করে ফেলছে। সুতরাং সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে পারিবারিক ব্যবস্থা সংশোধন করা।

আমার বিচারপতির পদ গ্রহণের ঘটনা

আমাকে যখন বিচারপতির পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়, তখন আমি নিজেকে রক্ষার অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু পালানোর হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এ ফাঁস গলায় আটকেই যায়। সংক্ষিপ্ত ঘটনা এরকম–

'ওলামায়ে কেরামের দাবিতে এক পর্যায়ে পাকিস্তানে 'শরীআ আদালত' প্রতিষ্ঠিত হয়। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক এ আদালত কায়েম করেন। সারাদেশের বিভিন্ন মতাদর্শের প্রায় পঁয়তাল্লিশটি দলের ওলামায়ে কেরাম সম্মিলিতভাবে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সঙ্গে সাক্ষাত করে দাবি জানিয়েছিলেন যে, এদেশের প্রচলিত বহু আইন শরীয়তবিরোধী। সে আইনের আওতায় যেসব বিচার-আচার হয়ে থাকে, তাতে মানুষের বহু দ্বীনী অধিকার খর্ব হয়। এর প্রতিকারকল্পে 'শরীআ আদালত' গঠন করা হোক। যাতে এর মাধ্যমে ওসব শরীয়তবিরোধী আইনকে চ্যালেঞ্জ করা যায়। এ দেশে বহু যোগ্য আলেম আছেন, তাদের মাধ্যমে এ আদালত সুচারুরূপে পরিচালনা করা সম্ভব। প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক তাদের এ অনুরোধ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নেন। তিনি তাদেরকে বলেন, আমি অবশ্যই এ আদালত গঠন করবো। এজন্যে আপনারা উপযুক্ত নাম পেশ করুন।

জিয়াউল হক সাহেবের সাথে মুলাকাত করার পর রাওয়ালপিন্ডিতে সকল শ্রেণীর ওলামায়ে কেরামের সমাবেশ হয়। আমার নাম চলে আসার আশঙ্কায় আমার বিবেচনায় যোগ্য দু'জন আলেমের নাম একটি কাগজে লিখে ওলামায়ে কেরামের নিকট পেশ করে জানাই যে, এ দুই হযরত আমার দৃষ্টিতে এ কাজের উপযুক্ত। আপনারা পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। তারপর আমি অতিদ্রুত করাচী চলে আসি। আমার ভয় ছিলো সভাস্থলে থাকলে তারা আমাকে এ পদের জন্যে বাধ্য করবেন। তিনদিন পর্যন্ত ওলামায়ে কেরামের সেই সভা চলতে থাকে। তাতে বিশেষভাবে আলোচনা চলতে থাকে যে, শরীআ আদালতের প্রধান বিচারপতি হিসেবে কার নাম পেশ করা যায়।

তিনদিন পর ওলামায়ে কেরাম তাদের তিনজন প্রতিনিধি করাচীতে আমার কাছে প্রেরণ করেন। তাদের একজন হলেন হযরত মুফতী যাইনুল আবেদীন ছাহেব, আরেকজন হাকীম আব্দুর রহীম আশরাফ এবং তৃতীয় আরেকজন তাদের সঙ্গে ছিলেন। তারা আমাকে জানান যে, তিনদিনের আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে ওলামায়ে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, তোমাকে এ পদ গ্রহণ করতে হবে।

আমি তাদের কাছে এই বলে অক্ষমতা জানালাই যে, একে তো আমি এ পদের যোগ্য নই, দ্বিতীয়ত বর্তমানে যে সব দায়-দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হচ্ছে, সে অবস্থায় এরকম কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব গ্রহণ আমার পক্ষে সম্ভবই নয়। আমি দারুল উলূম করাচী ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না। অথচ ওই দায়িত্ব নিলে আমাকে দারুল উলূম ছাড়তে হবে।

কারণ ওই দায়িত্ব পালন করতে হলে আমাকে স্থায়ীভাবেই রাওয়ালপিন্ডিতে অবস্থান করতে হবে। এ কারণে আমি এ দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম। এমনকি আমি করজোড়ে নিবেদন করি যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে এ দায়িত্ব গ্রহণ করা থেকে রেহাই দিন। তারা অনেক পীড়াপীড়ি করেন। আমি বললাম, আমি আপনাদের যে কোনোও কথা মানতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এই একটি কথা মানা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। শেষে তারা বললেন, এ পদ গ্রহণ না করলে তোমার গোনাহ হবে। এখন তুমি মানো আর না মানো, আমরা তোমার নাম দিয়ে দিচ্ছি।

আমি বললাম, আপনারা আমার নাম দিলে নিজ দায়িত্বেই দেবেন। পরে যখন আমার নাম ঘোষিত হবে, তখন আমি পত্র-পত্রিকা মারফত প্রচার করে দেবো যে, আমার সম্মতি ছাড়াই আমার নাম দেওয়া হয়েছে। তারা বললেন, তোমার যা ইচ্ছা হয় করো, আমরা কেবল তোমাকে অবহিত করতে এসেছি, পরামর্শ করার জন্যে আসিনি।

এ ঘটনার আগে জিয়াউল হক সাহেব আমার সামনে উল্লেখ করেছিলেন যে, এরকমের একটি আদালত প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি, আমি আপনাকে তাতে রাখতে চাই। আমি তাকেও স্পষ্ট বলে দিয়েছিলাম যে, আমি এ কাজের জন্যে মোটেই প্রস্তুত নই।

যাইহোক, ওই তিন ব্যক্তি চলে গেলেন। পরে তাদের একজন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে বললেন, আমরা শেষবারের মতো জানাচ্ছি যে, ওই পদের জন্যে আপনার নাম দিয়ে দিচ্ছি। আমি বললাম, আমিও শেষবারের মতো বলছি যে, এ পদ আমি কিছুতেই গ্রহণ করবো না। কিন্তু জিয়াউল হক সাহেব হঠাৎ করেই আমার নাম ঘোষণা করে দিলেন। তারপর ফোন করে আমাকে বললেন, আমরা এরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার জানা আছে যে, আপনি এটা কবুল করার জন্যে প্রস্তুত নন, কিন্তু তা সত্ত্বেও অনুরোধ করছি, এই মুহূর্তে আমার মান রক্ষার্থে কিছুদিনের জন্যে এটা গ্রহণ করুন। পরে ইচ্ছে হলে ইস্তফা দিয়ে দিবেন।

তখন আমি আমার শায়েখ হযরত ডাক্তার আব্দুলহাই ছাহেব রহ.-এর কাছে গিয়ে পরামর্শ করি। সময়টা ছিলো শাবান মাস। দারুল উলূমের ছুটি হতে যাচ্ছিলো। হযরত বললেন, মাদরাসা যতদিন ছুটি থাকবে ততদিন সেখানে গিয়ে কাজ করো, ছুটি শেষে ইস্তফা দিয়ে দিও। সুতরাং হযরত রহ.-এর নির্দেশ মোতাবেক দারুল উলূমের ছুটিতে সেখানে চলে যাই এবং আল্লাহর

নাম নিয়ে কাজ শুরু করে দেই। দু' মাস পর যখন শাওয়াল মাস শুরু হয়, তখন ইস্তফা দেওয়ার জন্যে আমি জিয়াউল হক সাহেবের সাথে যোগাযোগ করি। জিয়াউল হক সাহেব বললেন, ইস্তফা দেওয়ার জন্যে তাড়াহুড়া কিসের? আপনি ইস্তফা না দিয়ে বরং ছুটি নিয়ে নিন। ছুটি নিয়ে দারুল উলূমে চলে যান এবং সবক পড়াতে থাকুন। আমার ইচ্ছা পরবর্তীতে আপনাকে সুপ্রীমকোর্টে পাঠিয়ে দেবো। সেখানে কাজের চাপ কম থাকবে, ফলে ইসলামাবাদে অবস্থান করার দরকার হবে না। আমি আবার আমার শায়েখ হযরত ডাক্তার আব্দুলহাই রহ.-এর কাছে চলে যাই। তিনিও বললেন, হ্যাঁ, এরকমই করো। সুতরাং যতদিন আমি শরীআ আদালতে থাকি, বেশিরভাগ সময় ছুটিতে থাকি এবং দারুল উলূমে সবক পড়াতে থাকি। যখন গুরুত্বপূর্ণ কোনোও মোকদ্দমা আসতো তখন চলে যেতাম। পরিশেষে জিয়াউল হক সাহেব আমাকে সুপ্রীমকোর্টে পাঠিয়ে দেন। আমি আবারও আমার শায়েখ রহ.-এর সাথে মশওয়ারা করি। তিনি বললেন, 'তোমার ব্যাপারে যখন সমস্ত ওলামায়ে কেরাম একমত এবং দেওবন্দী, বেরেলবী ও আহ্‌লে হাদীস– এ তিনও চিন্তাধারার আলেমগণ তোমাকে চাচ্ছেন, আবার কাজটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং লোকে মনে করে তুমি এ কাজ যথাযথভাবে আঞ্জাম দিতে পারবে, তখন আর তোমার পিছিয়ে থাকা উচিত হবে না, এরূপ অবস্থায় অস্বীকৃতি জানানো সমীচীন নয়। তাছাড়া তোমাকে যখন সুপ্রীমকোর্টে পাঠানো হচ্ছে, তখন দারুল উলূমের দায়িত্ব পালনেও কোনোও সমস্যা হবে না। এখানকার কাজও ঠিক-ঠিক আঞ্জাম দিতে পারবে, আবার একই সাথে ওখানকার কাজও চালিয়ে যেতে পারবে। কাজেই আল্লাহর নাম নিয়ে কবুল করে নাও'। ব্যস এই হলো আমার বিচারপতির পদ গ্রহণের ইতিবৃত্ত।'

ইসলাম ও ট্রাফিক

বছর পনের আগে আমি প্রথমবার দক্ষিণ আফ্রিকায় যাই। সেটা ছিলো কোনোও আধুনিক উন্নত দেশে আমার প্রথম সফর। এখনতো দক্ষিণ আফ্রিকা শান্তিপূর্ণভাবে স্বাধীন হয়েছে। বর্ণবাদী নীতি এখন সেখানকার অতীত কাহিনী। কিন্তু প্রথমবার যখন আমি সেখানে যাই, তখন শ্বেতাঙ্গ ডাচ শাসকদের রাজত্ব চলছিলো। বর্ণবৈষম্যমূলক আইন পূর্ণ প্রভাব-প্রতিপত্তির সাথে কার্যকর ছিলো। বড়ো বড়ো নগরে কেবল শ্বেতাঙ্গদেরই বসবাসের অধিকার ছিলো। অন্য জাতির লোকদের জন্যে পৃথক পৃথক জনপদ ছিলো এবং তা ছিলো ও সব বড়ো বড়ো শহর থেকে যথেষ্ট দূরে।

জোহানেসবার্গ থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে 'আযাদবেল' নামে এরকমই একটি মনোরম শহর গড়ে উঠেছিলো। এ শহরটি কেবল ভারতীয় বংশোদ্ভূত লোকদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিলো। আমাদের মেজবান যেহেতু সেই এলাকার বাসিন্দা ছিলেন, তাই আমাদের সেখানেই অবস্থান করতে হয়। এলাকাটির পরিবেশ ছিলো বড়ই চমৎকার। বেশিরভাগ স্থাপনাই ছিলো আবাসিক। অল্পসংখ্যক বাসিন্দার জন্যে বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর পরিকল্পিতভাবে ঘর-বাড়ি তৈরি করা হলে বলাইবাহুল্য এলাকাটির প্রশস্ততা ও উন্মুক্ত পরিবেশ চোখে পড়ার মত হবে। ঠিক এ দৃশ্যই এখানে বিরাজ করছিলো। জনপদটি খুবই সুদৃশ্য, উন্মুক্ত, শান্ত এবং অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এখানকার অধিবাসীদের প্রায় প্রত্যেকেরই নিজস্ব গাড়ি রয়েছে। কিন্তু সড়কে যানজটের কোনোও প্রশ্নই নেই। পদযোগে চলাচলকারীদের সংখ্যা খুবই কম। সড়কে কদাচিৎ দু'-একজন পদচারী দেখা যায়। তাও বেশির ভাগ ফুটপাতের উপর। সড়কে বেশির ভাগ সুনসান নীরবতা বিরাজ করে। কিন্তু সেই নীরব-নিস্তব্ধ সড়কেও প্রতিটি ছোট ছোট মোড়ে মাটির উপর কালো রেখা অঙ্কিত, যা সুস্পষ্ট দেখা যায়। কোথাও কোথাও মোড় ছাড়াও সেরকম রেখা দেখা যায়। আমি মোটরকারে সফরকালে দেখতে পাই গাড়িচালক সেই রেখার উপর পৌঁছে কয়েক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে যায় এবং ডানে বামে নজর দিয়ে ফের সামনে অগ্রসর হয়।

আমার খুব বিস্ময়বোধ হচ্ছিলো যে, সড়ক দূর-দূরান্ত পর্যন্ত জনশূন্য। কোথাও যাতায়াতকারীর নাম-নিশানাও নেই। তা সত্ত্বেও ড্রাইভারের যতোই তাড়া থাক কিংবা কথাবার্তায় যতোই মশগুল, সেই কালো রেখায় পৌঁছে অবশ্যই থেমে যায় এবং তার ঘাড় ডানে-বামে আপনা-আপনিই ঘুরে যায়। যেন স্বয়ংক্রিয় কোনোও যন্ত্র রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে ঘুরে যাচ্ছে। এর রহস্য কী! প্রথম প্রথম আমি মনে করেছিলাম, ড্রাইভারের হয়ত আকস্মিক কোনোও সংশয় দেখা দিয়েছে, তাই গাড়ি থামিয়ে ফেলেছে। কিন্তু যখন বার বার এ দৃশ্য চোখে পড়ে তখন লোকজনকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করি। তারা জানায়, এটা আমাদের দেশের ট্রাফিক আইন যে, প্রত্যেক মোড়ে অথবা যেখানেই এই কালো রেখা অঙ্কিত আছে, ড্রাইভার সেখানে অবশ্যই গাড়ি থামিয়ে ডানে-বামে লক্ষ করবে। এখন আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে যে, কোথাও কোনোও মোড় দেখা দিলে কিংবা অন্য কোথাও কালো রেখা চোখে পড়লে পা আপনা-আপনিই ব্রেকে চলে যায় এবং গাড়ি থামা মাত্রই ঘাড় ডানে-বামে ঘুরে যায়।

এরপর যতদিন আমার সেখানে থাকা হয়, প্রতিদিন বার বার এই একই দৃশ্য দেখতে পাই। একজন লোকও এমন পাইনি, যে এ আইন ভঙ্গ করে। আমাকে আমার অবস্থানস্থল থেকে মূল সড়ক পর্যন্ত রোজ কয়েকবার যেতে হতো। প্রতিবারই দেখেছি গাড়িচালক মেইনরোডে পৌছার আগ পর্যন্ত সেই জনশূন্য সড়কে কয়েকবার থেমে যেতো, অথচ এই পুরো সময়কালে সড়কে এমন কোনোও ট্রাফিক পুলিশ আমার নজরে পড়েনি, যে মানুষকে এ আইন পালনে বাধ্য করছে। সেখানে আমাদের দেশের মতো কোনোও স্পিডব্রেকারও দেখিনি, যেগুলোকে 'স্পিডব্রেকার' না বলে 'কারব্রেকার' বলাই বেশি সমীচীন।

এ দৃশ্য আমি সর্বপ্রথম দক্ষিণ আফ্রিকাতেই দেখেছিলাম, ফলে আমার কাছে তা অদ্ভুত মনে হয়েছিলো। কেননা চোখ তো পাকিস্তানের স্বাধীন ও বল্গাহীন ট্রাফিক ব্যবস্থা দেখেই অভ্যস্ত ছিলো। পরে অবশ্য এ দৃশ্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক উন্নত দেশেই দেখতে পেয়েছি। এখন তো চোখ তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আমি যখন নিজ দেশের ট্রাফিক ব্যবস্থার হাল দেখি, তখন তাতে কোনোও পরিবর্তন লক্ষ করি না শুধু তাই নয়, বরং মনে হয় যেন পরিস্থিতি উল্টো দিকে চলছে। বিষয়টা সবার চোখের সামনে, তাই বিস্তারিত বলার দরকার নেই।

দাড়িও গেলো, চাকরিও মিললো না

জনৈক বুযুর্গ আমাকে একটি সত্য ঘটনা শুনিয়েছেন। বড়ই শিক্ষণীয় ঘটনা। ঘটনাটি এই,

তাঁর এক বন্ধু লন্ডনে থাকতো। সেখানে সে চাকরির সন্ধানে ছিলো। এক জায়গায় ইন্টারভিউ দিতে গেলো, তখন তার মুখে দাড়ি ছিলো। যে ব্যক্তি ইন্টারভিউ নিচ্ছিলো সে বললো, এখানে দাড়ি নিয়ে কাজ করা কঠিন হবে, তাই তোমাকে দাড়ি কামিয়ে ফেলতে হবে। সে চিন্তায় পড়ে গেলো, দাড়ি কামিয়ে ফেলতে হবে? এটা কী করে সম্ভব? অনেক চিন্তা করেও নিজেকে প্রস্তুত করতে পারছিলো না। তখনকার মতো সে ফিরে এলো। দু'-তিন দিন অন্য জায়গায় চাকুরি খুঁজতে থাকলো। কিন্তু কোথাও চাকরি পেলো না। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলো। বেকারত্ব ও পেরেশানির মধ্যে দিন অতিবাহিত করছিলো। শেষ পর্যন্ত দাড়ি কামানোরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। আগে চাকরি তো পাই! শেষ পর্যন্ত দাড়ি কামিয়ে চাকরির জন্যে পূর্বের সেই জায়গায় চলে গেলো। সেখানে গেলে তারা জিজ্ঞাসা করলো, কী জন্যে এসেছেন? লোকটি বললো, আপনারা বলেছিলেন দাড়ি কামিয়ে ফেললে চাকরি পাওয়া যাবে,

তাই আমি দাড়ি কামিয়ে এসেছি। তারা জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কি মুসলমান? বললো, হাঁ, আমি একজন মুসলমান। তারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলোা, আপনি দাড়ি রাখাকে জরুরি মনে করেন, নাকি মনে করেন না? সে উত্তর দিলো, আমি জরুরি মনে করতাম এবং সেজন্যেই তো রেখেছিলাম। তারা বললো, আপনি যখন জানতেন এটা আল্লাহর হুকুম আর আল্লাহর হুকুম মেনেই দাড়ি রেখেছিলেন। এখন শুধু আমাদের কথায় দাড়ি কামিয়ে ফেললেন? এর অর্থ তো এই যে, আপনি আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনে বিশ্বস্ত নন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম পালনে বিশ্বস্ত নয়, সে নিজ অফিসারের হুকুম পালনেও বিশ্বস্ত হতে পারে না। সুতরাং আমরা আপনাকে চাকুরি দিতে অপারগ।

এভাবে তার আখেরাতও গেলো, দুনিয়াও হারালো। দাড়িও গেলো, চাকরিও পেলো না।

কেবল দাড়িই নয়; বরং মানুষের হাসি-ঠাট্টার ভয়ে আল্লাহ তা'আলার যে কোনো হুকুম ছেড়ে দেওয়া অনেক সময় দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টাই বরবাদ হওয়ার কারণ হয়ে থাকে।

সুইজারল্যাণ্ডে আগা খানের মহল

একবার আমি সুইজারল্যাণ্ডে যাই। সেখানে একটি পথ দিয়ে যাওয়ার সময় এক ব্যক্তি এক আলিশান মহল দেখিয়ে বললো যে, এটি আগাখানের মহল। মহলটিকে ঝিলের তীরে অবস্থিত এক আলিশান ভূস্বর্গ মনে হচ্ছিলো। ওসব দেশে সাধারণত ছোট ছোট বাড়ি হয়। বড়ো বাড়ি ও মহলের ধারণা তাদের নেই। সেই মহলটি দুই তিন কিলোমিটার ব্যাপী বিস্তৃত ছিলো। তাতে বাগান, ঝিল ও সুউচ্চ অনেক ভবন ছিলো। চাকর নকরের এক বাহিনী ছিলো। এ কথা তো সকলেরই জানা, ভোগ-বিলাসিতা, নগ্নতা ও অশ্লীলতা সবকিছুই তাদের কাছে বৈধ। মদপানের ধারাও অব্যাহত থাকে।

আমি আমার মেজবানদেরকে বলি যে, এসব লোক স্বচক্ষে দেখে যে, তাদের গুরু ও অনুসরণীয় ব্যক্তি কেমন ভোগ-বিলাসিতায় ডুবে আছে। যে কাজ একজন সাধারণ মুসলমানও নাজায়েয ও হারাম মনে করে, তাদের এসব অনুসরণীয় ব্যক্তি সেগুলোতে লিপ্ত, কিন্তু এর পরেও তাদের অনুসারী ও ভক্তরা তাদেরকে গুরু ও অনুসরণীয় মনে করে থাকে। আমার এ কথা শুনে মেজবানদের একজন বললেন, ঘটনাচক্রে আমিও এই একই কথা আগা খানের এক ভক্তের সামনে বলি যে, তোমরা কোনো নেককার পরহেযগার

ব্যক্তিকে গুরু বানাতে তাহলে তা বুঝে আসতো, কিন্তু তোমরা এমন এক মানুষকে গুরু ও অনুসরণীয় বানিয়েছো, যাকে তোমরা স্বচক্ষে বিলাসিতায় লিপ্ত দেখো। এতো বড়ো বড়ো আলিশান বাড়ি বানিয়ে রেখেছে। এসব কিছু দেখা সত্ত্বেও তোমরা তাকে স্বর্ণের মূল্যে পরিমাপ করো এবং নিজেদের ইমাম বলে স্বীকার করো।

আগা খানের সেই ভক্ত উত্তরে বললো যে, আসল কথা হলো, এটা তো আমাদের ইমামের অনেক বড়ো ত্যাগ যে, তিনি দুনিয়ার এসব মহলের উপর সন্তুষ্ট আছেন। অন্যথায় তার আসল জায়গা তো ছিলো জান্নাতে। কিন্তু তিনি আমাদের হেদায়াতের জন্যে জান্নাতের সেসব নেয়ামত কুরবানী করে দুনিয়াতে এসেছেন। দুনিয়ার এসব স্বাদ উপভোগও তার জন্যে তুচ্ছ বিষয়। তিনি তো এর চেয়ে অধিক নেয়ামত ও উপভোগ্য বস্তুর হকদার।

এটা আসলে সে কথাই, যার দিকে হাদীসে নিম্নোক্ত শব্দে ইঙ্গিত করা হয়েছে,

أَنْ يُطَاعَ الْمُغْوِيَ

অর্থাৎ, পথভ্রষ্টকারীদের আনুগত্য করা হবে।

সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে যে, এক ব্যক্তি গোমরাহীর পথে চলছে, পাপ পঙ্কিলতায় ডুবে আছে; এরপরেও বলছে যে, ইনি আমাদের ইমাম, ইনি আমাদের অনুসরণীয়, ইনি আমাদের গুরু।

আমেরিকান কাউন্সিলরের সাথে কথোপকথন

আমার কাছে কখনও কখনও আমেরিকার লোকজনও এসে থাকে। অর্থনীতি বিষয়ক ওয়াশিংটন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল অফিসার এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিষয়ক ডাইরেক্টর আমেরিকান কাউন্সিলরও আমার নিকট কখনও কখনও এসে থাকেন।

প্রথমবার তিনি যখন আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসেন, তখন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আমি তো কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি নই, আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন? আপনি রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত করুন।

তিনি বললেন, একজন স্কলার হিসেবে আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছি।

তারপর থেকে তিনি প্রতি পঞ্চম কি ষষ্ঠ মাসে এসে থাকেন এবং নতুন কোনো কাউন্সিলর আসলে তিনিও সাক্ষাত করতে আসেন। আসার পর খুব কড়া কড়া কথা শুনে যান, কিন্তু তারপরও আসেন। একবার তিনি এসে

অনেক কথা বলতে লাগলেন। একপর্যায়ে আমি তাকে বললাম, আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করছি, আপনি তার উত্তর দিন।

আমি বললাম, ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম বিশ্বের একটা সাধারণ প্রতিক্রিয়া হলো আমেরিকা তাদের দুশমন, তাদের পথের বাধা, সর্বদা তাদের স্বার্থবিরোধী কাজ করে থাকে।

আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে, সমগ্র মুসলিম বিশ্বের এই অনুভূতি আপনাদের পক্ষে ভালো না মন্দ? এটাকে কি আপনারা নিজেদের জন্যে উপকারী মনে করেন না ক্ষতিকর?

তিনি বললেন, সত্যিই যদি এরকম অনুভূতি থাকে, তবে আমাদের পক্ষে তা অবশ্যই ক্ষতিকর, কিন্তু আমার ধারণা জনগণের মধ্যে এরকম প্রতিক্রিয়া নেই।

আমি বললাম, আপনাদের কাছে যদি এরকম তথ্য থাকে যে, জনগণের মধ্যে আপনাদের সম্পর্কে এরকম প্রতিক্রিয়া নেই, তবে এরূপ তথ্যের কারণে আমি বিস্মিত। আপনাদের সি.আই.এ. তো তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে বিখ্যাত। সি.আই.এ. যদি আপনাদেরকে এরকম রিপোর্ট দিয়ে থাকে যে, জনমনে আপনাদের প্রতি কোনো অসন্তোষ নেই, তবে এটা সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার!

তিনি বললেন, আমাদের বিরুদ্ধে এসব সাদ্দাম হোসেন, খোমেনী ও গাদ্দাফীর প্রোপাগাণ্ডা, নয়ত জনসাধারণের মধ্যে এরকম ধারণা নেই।

আমি বললাম, আপনার এ কথায় আমার আরও বেশি আশ্চর্য বোধ হচ্ছে। কেননা সাদ্দাম হোসেন, খোমেনী বা গাদ্দাফী যেই হোক না কেন, আপনার তো জানা থাকার কথা যে, এ জাতীয় নেতারা জনপ্রিয় হতে চায়। তারা জনগণের নিকট সমাদৃত ও প্রভাবশালী হয়ে থাকতে চায়। আর সে কারণে তারা এমন শ্লোগান দেয় এবং এমন কথা বলে থাকে, যা জনগণ পছন্দ করে এবং খুশি হয়।

তারা দেখেছে, জনমনে আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা, তাই তারা উচ্চকণ্ঠে আমেরিকার নিন্দা ও সমালোচনা করে থাকে। জনমনে যদি আমেরিকার বিরুদ্ধে ঘৃণা না থাকতো, তবে তারা কখনই আমেরিকার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতো না এবং আমেরিকাকে গালমন্দও করতো না।

আমি বললাম, আমার এ কথা সত্য কি না তা আপনি এভাবে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে, আপনি এখান থেকে যখন ফিরবেন, তখন পথে পতাকা নামিয়ে গাড়িটি বহুল পরিচিত কোনো স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখবেন। তারপর যে-কোনোও রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকবেন আর লোকজনকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের এক নম্বর শত্রু কে? উত্তরে তারা যদি আমেরিকাকে এক

নম্বরের শত্রু না বলে, তবে আমি আমার কথা প্রত্যাহার করে নেবো। কাজেই আপনার যদি ধারণা থাকে জনমনে আমেরিকার বিরুদ্ধে কোনো ঘৃণা নেই, তবে এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ঘৃণা অবশ্যই আছে এবং প্রচণ্ড রকমের আছে।

তিনি বললেন, এই ঘৃণা কেন? এর কারণ কী?

আমি বললাম, এর কারণ কেবল আপনাদের কর্মনীতি। আপনাদের কাজের কারণেই মানুষ আপনাদেরকে ঘৃণা করে থাকে।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোন নীতির কারণে?

আমি বললাম, আপনারা প্রতিটি বিষয়ে মুসলিমদের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেন। যখনই কোথাও ইসলামী কোনো বিষয়ের উত্থান ঘটতে শুরু করে, ওমনি তা দমন করার জন্যে আপনারা সর্বশক্তি ব্যয় করেন। আপনারা সর্বদা ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কমিউনিস্টদের সাথে লড়াই করার জন্যে আপনারা মুসলিমদেরকে লাগিয়ে দিয়েছেন। যখন আপনাদের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেছে এবং কমিউনিজম পিছনে হটেছে, তখন এই মুসলমানদেরকেই আপনারা নিশানা বানিয়েছেন।

আফগানিস্তানে মুজাহিদগণ যতদিন রাশিয়ার সঙ্গে লড়াই করেছে, ততদিন তারা ফ্রিডম ফাইটার বা মুক্তিযোদ্ধা ছিলো, কিন্তু যেই না রাশিয়া পিছনে হটলো, আফগানিস্তান স্বাধীন হয়ে গেলো, ওমনি তাদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিলেন। আপনাদের এ কর্মপন্থা ভুল? আপনারা গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে চিৎকার করেন, অথচ আলজেরিয়াতে মুসলমানদের দল যখন বিজয় লাভ করলো এবং তারা সরকার গঠন করতে শুরু করলো, তখন আপনারা বলে দিলেন এরা গণতন্ত্রের শত্রু।

আমি তো প্রথমেই আপনাকে বলেছি যে, আমি কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি নই, তাই রাজনৈতিক ভঙ্গির কথাবার্তাও আমার আসে না। আমি তো একজন তালেবে ইলম। আমার কোনো কথা যদি আপনার অপছন্দ হয়, তবে আগেই আপনার কাছে মাফ চেয়ে নিচ্ছি। তবে সত্যি কথা হলো, আপনারা মুসলমানদেরকে ভয় পান।

তিনি বললেন, আমাদের এ ভয় পাওয়াটা সঠিক কি না?

আমি বললাম, আপনাদের নীতি যদি এরকমই থাকে তবে এ ভীতি বিলকুল সঠিক, কিন্তু আপনারা যদি এ নীতি বদলে ফেলেন এবং সঠিক কর্মপন্থা অবলম্বন করেন, তবে ভয়ের কোনো কারণ নেই।

তিনি বললেন, আমরা আমাদের নীতির কী পরিবর্তন করবো?

আমি বললাম, আসুন আমরা একটা আপস করি। তাতে মানবতা অনেক উপকৃত হবে। কুরআন বলছে পূর্ব ও পশ্চিমের কোনো পার্থক্য নেই। আসুন একটা সন্ধি করি। একটা জিনিস আপনাদের কাছে আছে কিন্তু আমাদের কাছে নেই কিংবা কম আছে, আরেকটা জিনিস আমাদের কাছে আছে কিন্তু আপনাদের কাছে নেই। যে জিনিসটি আমাদের কাছে আছে আমরা তা আপনাদেরকে দেবো, আর যে জিনিসটি আপনাদের কাছে আছে তা আমাদেরকে দিন। এভাবে আমরা পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করি, তারপর উভয় মিলে সারাবিশ্বের সেবা করি।

তিনি বললেন, তা কী?

আমি বললাম, যে জিনিস আপনাদের কাছে আছে আমাদের কাছে নেই বা কম আছে, তা হচ্ছে টেকনোলজি। অর্থাৎ আধুনিক প্রযুক্তি ও আবিষ্কারে আপনারা অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। এ জিনিস আমাদের কাছেও আছে, তবে আপনাদের কাছে যতটা, ততটা নয়। এ ক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছিয়ে। আর যে জিনিস আমাদের কাছে আছে কিন্তু আপনাদের কাছে নেই তা হচ্ছে 'আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ'। আপনাদের গোটা সমাজ এবং আপনাদের যাবতীয় দৌড়ঝাঁপ বস্তুকেন্দ্রিক আর এ কারণেই আপনারা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌছে গেছেন। আপনাদের পরিবার-ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে। বস্তুগত পর্যাপ্ত উপকরণ থাকা সত্ত্বেও আপনারা আত্মিক সুখ থেকে বঞ্চিত। আপনাদের মনে শান্তি নেই। আত্মহত্যার পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। মাদকাসক্তির বিস্তার ঘটছে। সর্বত্র অস্থিরতা বিরাজ করছে। এসবই আপনাদের আধ্যাত্মিক ও রূহানী মূল্যবোধ না থাকার পরিণতি। এই জিনিস আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিন আর আপনাদের টেকনোলজি আমাদেরকে দিন, তারপর উভয়ে মিলে আসুন আমরা মানবতার সেবা করি। একদিকে থাকবে আপনাদের প্রযুক্তি, অন্যদিকে আমাদের রূহানিয়াত। মানবতার শান্তির জন্যে এ উভয়ের সম্মিলন অতীব জরুরি। মানুষের মুক্তির জন্যে এরচে' উত্তম কোনো পথ হতে পারে না।

আপনাদের কাছে হাতিয়ার আছে, কিন্তু কোথায় কী পরিমাণে তা ব্যবহার করতে হবে তার নিয়ম আপনাদের জানা নেই। এরও নিয়ম-নীতি আছে এবং সেটা আছে আমাদের কাছে। আপনারা আমাদের কাছ থেকে তা নিয়ে নিন, তারপর দেখুন সারাবিশ্বে কীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আপনারা শান্তির কথা বলে থাকেন, কিন্তু তা প্রতিষ্ঠার নিয়ম জানেন না। শান্তিপ্রতিষ্ঠা কেবল এ পথেই হতে পারে, অন্য কোনো পথে নয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার একটি ঘটনা

আমার স্মরণ হলো, আজ থেকে প্রায় সাত বছর পূর্বে আমার দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়ার সুযোগ হয়। আফ্রিকা মহাদেশের সর্ব দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত দেশ হলো 'দক্ষিণ আফ্রিকা'। এর কেপটাউন শহরটি সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। আমি সেখানে গিয়ে দেখি, সেখানের অধিকাংশ অধিবাসী মালয়-এর লোক। যে মালয়কে বর্তমানে 'মালেশিয়া' বলা হয়। সেখানের মুসলমান অধিবাসীদের আশি শতাংশই মালয়-এর লোক। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি যে, মালয়-এর লোক এখানে কীভাবে এলো। তখন আমাকে এক বিস্ময়কর ঘটনা শোনানো হলো। যা আমাদের জন্যে অত্যন্ত শিক্ষণীয়।

লোকেরা বললো, সপ্তদশ খ্রিস্ট শতাব্দীতে হল্যাণ্ডের ডাচ জাতি একদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার উপর নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। অপরদিকে সে সময়েই মালয় ও তার পার্শ্ববর্তী দ্বীপসমূহকেও ঔপনিবেশিকতার পাঞ্জায় চেপে ধরে। মালয় ও তার পার্শ্ববর্তী দ্বীপসমূহে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলো। সেখানে মুসলমানদের পক্ষ থেকে বার বার স্বাধীনতা আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। ডাচ সম্প্রদায় তাদের স্বভাব মাফিক সবসময়ই এ সমস্ত আন্দোলনকে জুলুম-নির্যাতনের মাধ্যমে দমন করে। সেখানকার অনেক মুজাহিদ মুসলমানকে বন্দী করে দাস বানিয়ে রাখে। এতদসত্ত্বেও ডাচ গোষ্ঠীর আশঙ্কা ছিলো যে, এরা যে কোনো সময় বিদ্রোহ করে বসতে পারে। তাই সরকার তাদেরকে দেশান্তর করে কেপটাউনে পাঠিয়ে দেয়। যেন স্বদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থান করে তারা চরম অসহায় হয়ে পড়ে। সুতরাং মালয় ও আশপাশের প্রায় তিনশ' মুজাহিদকে দাস বানিয়ে পায়ে শিকল পরিয়ে কেপটাউনে নিয়ে আসা হয়।

কেপটাউনে মালয় মুসলমানদের দ্বারা চরম কষ্ট-সাধ্য কাজ নেওয়া হতো। ডাচ শাসকগোষ্ঠীর ভালো করেই জানা ছিলো যে, তাঁদের স্বাধীনতা লাভের এ অদম্য স্পৃহা মূলত তাঁদের অন্তরস্থ প্রজ্জ্বলিত ঈমানের উত্তাপে উজ্জীবিত। তাই তাঁদেরকে স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে ও তাঁদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে ঈমানের নূর থেকে বঞ্চিত করতে সবধরনের প্রচেষ্টাই তারা চালায়। নামায পড়া তো দূরের কথা, ডাচ মনিবদের পক্ষ থেকে তাদের কালেমা পড়ার অনুমতিটুকুও ছিলো না। অসহায় সেই মুসলমানদের থেকে সারাদিন চরম কষ্টসাধ্য কাজ নেওয়া হতো। কোনো ব্যক্তি নামায পড়া বা অন্য কোনো ইবাদতে লিপ্ত হওয়ার দুঃসাহস দেখালে তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হতো।

কিন্তু এমন চরম নির্যাতন ও নিপীড়নের মাধ্যমেও এ সমস্ত দেশান্তরিত নিঃস্ব মুসলমানদের অন্তর থেকে ঈমানের প্রদীপ নির্বাপিত করা সম্ভব হয়নি। জুলুম-নির্যাতনের যাঁতায় নিষ্পেষিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদের দ্বীনকে বুকে ধরে রাখেন। চরম অপারগতার এ অবস্থাতেও তাঁরা নামায পর্যন্ত ছাড়েননি। সারাদিন কষ্টকর পরিশ্রম করার পর দৃঢ় সংকল্পী এই মুজাহিদগণ রাতে যখন নিজেদের অবস্থান স্থলে ফিরে যেতেন, তখন ক্লান্তিতে নিথর হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের তত্ত্বাবধায়কদের ঘুমিয়ে পড়ার অপেক্ষা করতেন। তারা ঘুমিয়ে পড়লে মুজাহিদগণ রাতের অন্ধকারে চুপে চুপে অবস্থান স্থল থেকে বের হয়ে একটি পাহাড়ে আরোহণ করে সারাদিনের নামায একসঙ্গে পড়তেন। বর্তমানে কেপটাউনের প্রত্যেক মুসলমান অধিবাসী সেই জায়গা সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন, যেখানে নিপীড়িত ও নিগৃহীত এ সমস্ত মুসলমান নিস্তব্ধ নিশীতে স্বীয় প্রভুর সমীপে সেজদায় লুটিয়ে পড়তেন। আমিও সে জায়গা দেখেছি। প্রাচীন শহর থেকে বেশ দূরে সেই পাহাড়টি। পাহাড়ের মাঝের প্রশস্ত একটি জায়গাকে নিরাপদ মনে করে স্বীয় প্রভুর সম্মুখে দাসত্বের সেজদাহ করার জন্যে তাঁরা তা নির্বাচিত করেছিলেন। সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত শ্রান্ত মুসলমানদের প্রতিদিন এখানে এসে নামায পড়া এমন একটি সাধনা, যার কল্পনাও চোখকে অশ্রুসিক্ত করে। এখানকার পরিবেশে আল্লাহ-পাগল সেই মুজাহিদদের যিকির ও তাকবীরের সুরভি আজও অনুভূত না হয়ে পারে না।

প্রায় আশি বছর আল্লাহর এই নেক বান্দাগণ দাসত্বের শিকলে একইভাবে বন্দী থাকেন। দীর্ঘ এ সময়ে তাঁদের মসজিদ বানানো তো দূরের কথা একাকী নামায পড়ারও অনুমতি ছিলো না। অবশেষে এমন একটি পর্যায় আসে, যখন বৃটিশ শ্বেতাঙ্গরা কেপটাউনের উপর আক্রমণ করে ডাচ জাতি থেকে এ অঞ্চল ছিনিয়ে নিতে চায়। তারা বিশাল এক সেনাবাহিনী নিয়ে 'উত্তমাশার' কূলে পৌছে যায়। এ যেন চোরের ঘরে বাটপারের হানা। এ অবস্থায় ডাচ শাসকদের ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করার জন্যে এমন নিবেদিতপ্রাণ সিপাহীদের প্রয়োজন পড়ে, যারা জান বাজি রেখে ইংরেজদের পথ রোধ করবে। প্রাণদানের জন্যে ভিনদেশী এই মুসলমানদের চেয়ে অধিক উপযুক্ত আর কেউ ছিলো না। সুতরাং ডাচ সরকার নির্যাতিত ও নিপীড়িত এ সমস্ত মুসলমানের নিকট এই লড়াইয়ে ডাচ সরকারের পক্ষ হয়ে শুধু লড়াই করারই নয়; বরং ইংরেজদের মোকাবেলায় এদের অগ্রবাহিনীর দায়িত্ব পালনের দাবি জানায়।

এ পর্যায়ে প্রথমবারের মতো এ সমস্ত মুসলমান ডাচ সরকারের নিকট থেকে কোনো সুবিধা লাভের সুযোগ লাভ করে। কিন্তু এ সুযোগকে কাজে

লাগিয়ে তাঁরা কোনো টাকা পয়সার আবদার করেননি বা নিজেদের জন্যে অন্য কোনো সুবিধাও চাননি। তারা এসবের পরিবর্তে ডাচ মনিবদেরকে বলেন যে, আমাদের জন্যে ইংরেজ ও ডাচ শাসকদের মধ্যে যদিও কোনো তফাত নেই, তবুও আমরা আপনাদের খাতিরে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করার জন্যে একটি শর্তে আমাদের জান নজরানা স্বরূপ পেশ করতে পারি, আর তা হলো, এই লড়াই শেষ হলে আমাদেরকে কেপটাউনে একটি মসজিদ নির্মাণ করার এবং সেখানে জামাআতের সাথে নামায আদায় করার অনুমতি দিতে হবে। ডাচ সরকার এ শর্ত মেনে নেয়। এভাবে বহু সংখ্যক মুসলমান নিজেদের জানের বিনিময়ে এখানে একটি মসজিদ বানানোর অনুমতি লাভ করেন। এটি ছিলো দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম মসজিদ, যা ঐ সমস্ত নিপীড়িত ও নিগৃহীত মুসলমানগণ নির্মাণ করেন।

ঐতিহাসিক এ মসজিদটি আমি দেখেছি। কম বেশি তিনশ' বছর পূর্বে নির্মিত এ মসজিদটি এখনও সেই অবকাঠামোতেই রয়েছে, যে অবকাঠামোতে নিবেদিতপ্রাণ নির্মাতাগণ তা নির্মাণ করেছিলেন। মেহরাব এখনও পূর্ববৎ রয়েছে। তার দ্বার-প্রাচীর থেকে তার নির্মাতাদের ইখলাসের সাক্ষ্য মিলে। ঘটনাক্রমে কেপটাউন নগর অনেক উন্নতি করলেও এ মসজিদটি পূর্বের সেই সাদামাটা অবস্থায় অপরবিবর্তিত রয়েছে। এখানকার মসজিদসমূহে আজও সেই বংশ থেকেই ইমাম নিযুক্ত করা হয়, যাঁদেরকে মসজিদ নির্মাণের সময় ইমাম বানানো হয়েছিলো। একটি মাত্র পার্থক্য এই সৃষ্টি হয়েছে যে, যে সমস্ত সহায়-সম্বলহীন মুসলমান এ মসজিদটি বানিয়েছিলেন, তাঁদের নিকট কেবলার সঠিক দিক জানার উপযুক্ত কোনো যন্ত্র ছিলো না, তাই সম্ভবত তারা অনুমানের ভিত্তিতে কেবলার দিক নির্ধারণ করে মেহরাব তৈরি করেন। এখন দিক-নির্ণয়ক যন্ত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে, কেবলার সঠিক দিক থেকে মেহরাব বেশ সরানো। তাই এখন নামাযের কাতার মেহরাবের দিকে না করে ঘুরিয়ে কেবলার সঠিক দিকে করা হয়।

মূলত: এমন লোকদেরই ঈমানের মধুরতা লাভ হয়ে থাকে। আমরা আপনারা তো ঘরে বসে বসে দ্বীন পেয়েছি। মুসলমান মা-বাবার ঘরে জন্মেছি। জন্ম থেকেই মা-বাবাকে মুসলমান পেয়েছি। দ্বীন লাভের জন্যে কোনো প্রকার কুরবানী করিনি। কোনো পয়সা ব্যয় করিনি। কোনো প্রকার পরিশ্রম করিনি। যার ফলে আমাদের অন্তরে দ্বীনের কোনো মূল্য নেই। কিন্তু যারা এই দ্বীনের জন্যে মেহনত করেছে। ত্যাগ স্বীকার করেছে। কষ্ট সহ্য করেছে। তাদের মূলত ঈমানের প্রকৃত মধুরতা লাভ হয়েছে।